

বিশ্ভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬



বিষয়সূচী

‘দুরোপযাজী’র ভাষ্যের পসড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন	শ্রীনাথস্বরজন রায়	১২
ভারতীয় সংগীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	১০
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ		
রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	৫০
ভারতীয় সাহিত্য		
ওড়িয়া সাহিত্যে উপকাসের সৃষ্টি	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	৬১
গ্রন্থপরিচয়		
বাস্তবিক প্রামাণ্য : রামচরিতমানস	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	৬৭
মহাভারত : মহাভারতের সমাজ	শ্রীশশিকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	৭২
স্ববলিপি	শ্রীহিন্দ্রবা দেবী	৮৪

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলী	১, ৫০, ৬০
সংগ্রহমণ্ডিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র	১৭
ককীলমোহন সেনাপতি	৬১

মূল্য এক টাকা



কলস্থিায় কয়েকটি নূতন রবীন্দ্র-সঙ্গীত

দেবপ্রভু বিশ্বাস

কুমারী সাবিত্রী না

৭৫৯৩ { এসো শব্দের মাঝে
তুমি হবে নীরবে

GE7573 { মহলা জাদিগালা তোর
এবার বিধাঘ বেলায় হ

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পূর্ণতালিকা চাহিয়া পাঠান

এবার পূজায় নূতন রেকর্ড-নাট্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

৮৩০৩৭৭

GE 7580 + GE 7586

রচনা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতপরিচালক—নিতাই ঘটক

সাতখানি রেকর্ডে সমাপ্ত নূতন ধরণের নাটক

অমর মল্লিক প্রোডাক্সন্সের জনপ্রিয় বাগীচ

GE7560 { প্রভু মেরো অবগুণ
যায় গুলাম তু দেওয়ান
—মুন্সী বাঈএর গান

‘স্বামীজি’

GE7561 { যন চল নিজ নিকেতন
হাবে কিহে দিন আন
—স্বামীজীর গ

কলস্থিায় গ্রাফোফোন কোং লিঃ

কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী



75-63
1.02.81/2

জন্মদিন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

স্রাবণ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ - ১৯৪৫

২৩৫৭



‘মুরোপযাত্রীর ডায়ারি’র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮২০ সালের ২৬ অগষ্ট রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গলার। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমোৎসব পালিত সমভিব্যাহারে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। ইটালি ও ফ্রান্স ইহা গমনে পৌছিয়া সেখানে কিছুকাল কাটাইয়া ৪ নভেম্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।—এই আড়াই মাসের দিনলিপি ও চিন্তা পুনর্নিষিত হইয়া ‘মুরোপযাত্রীর ডায়ারি’ নামে দুই খণ্ডে স্বাক্ষর ১৯২৮ ও ১৯৩০ সালে প্রকাশ্যে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড তৎপূর্বে ‘সাধনা’ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

মূল ডায়ারিখানি শ্রীকৃষ্ণ ইন্ডিয়া-বেবী জৌদুগাণ্ডীর কাছে রক্ষিত ছিল, সম্ভ্রান্ত আমাষের গোচরে আসিয়াছে। বেঙ্গা যায়, সাময়িক পক্ষে তথা প্রকাশ্যে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রকৃত মারিত ঋণিয়াছেন। ফলে অনেক ঐচ্ছিকানক আলোচনা, ও ঘটনার বিবরণ হার পড়িয়াছে বা সংক্ৰান্ত হইয়াছে। এই বিস্তারিত বিবরণ পাঠকসাধারণের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে মনে করিয়া বর্তমান সংখ্যা হইতে মূল ডায়ারির প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।

বন্ধনীয় [] মুরোপযাত্রীর ‘ডায়ারি’ গ্রন্থ হইতে তাদ্রিখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যোগসা পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া পড়িতে চান তাহারের সুবিধার জন্য। বানান ও চিত্রাদি পাঠলিপিতে বেঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহাই রাখা হইয়াছে।

সন্ধ্যা সন্ধ্যা, নীল তীর, বেধাজ্জর আকাশ। ভাবতবর্ষের প্রতি একান্ত আকর্ষণ। ভাবতবর্ষ যেন বাহ্যিকের মধ্যে। জীবনের নত নত হৃৎ হৃৎ ভালবাসা ঐশেনেই। বেচারা হরিত যক্ষ্ম স্নেহের ভাবতবর্ষ। ক্রমে সন্ধ্যা। ক্রমে তীর তিরোহিত। lighthouse—সাগরে ভাসমান সন্ধানের জ্ঞে ভূমিতার কাগজ পুড়ি। মনে হল মিথ্যা সত্যতা, মিথ্যা জীবনসংগ্রাম—মিথ্যা মুরোপীয় উন্নতিচক্রেও আকর্ষণ—নিফল ছুঁশা—বাহ্য্যার এক প্রান্তে ভালবাসার একটু স্বরক্ষিত নীড়, এই আমাষের ডেব। এই মর্দা প্রবহমান মানবলোভের মধ্যে আমাষের পড়বার কি স্বরকার ছিল। আমাষ চতুর্দিকে মানসিক বেড়া দিলে কালক্রান্ত বন্ধ করে দিয়ে বেশ আমাষে শুষ্কিবে বলে ছিলুম। কেবলি ছিত্র দিয়ে চিত্র-অন্যন্ত মানবলোভ-কেনে পড়ে আমাষের সমস্ত ছায়খার গুলিয়ে মিলে গেল। আমাষ আমাষের এই মূহ কীল প্রাণের মধ্যে এত দুঃখাশার আকেশ কেন এনে দিলে? কেন দুঃখাশা ঐ মুরোপীয় বহির্নিখার প্রতি আমাষের

আকর্ষণ করতে ? আনন্দের মাধ্যম উপরে হিমালয় এবং পদতলে সমুদ্র বাধা আছে। দুর্গম হল না কেন ? বেশ অজ্ঞাত নিকৃষ্ট বেটনের মধ্যে একমল মাহুং আটকে থাকৃত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে বন্ধ হয়ে একটি নিকৃষ্ট পাক্ষিকের স্থানব একটি দ্বীপ বেদন নিশ্চরকভাবে চিরদিন কেবল আকাশের প্রভাত সন্ধ্যার দ্বারা আপনাদের মধ্যে পড়িত করে।

২২ অগষ্টকু স্কুয়াব। ১৮২০। ক্রায়। মঙ্গলবার পর্যন্ত একটা দিন বলে থরা যেতে পারে।^১ Seasickness^২। সান্তির পথের ক্যাথিনে ঢুকে পথের কথল অপরূপ।^৩ স্বপ্ন।^৪ লোকের প্রীতি মানসিক অসুস্থ।—মঙ্গলবারে ডেকে উঠে লোকের প্রীতি অসাধারণ আসক্তি। বুঝাবে প্রণাম সমুদ্র, উজ্জল সূর্যালোক, কবিচ চিত্রা ও ভাস্কর্য কথোপকথন। বৃহস্পতিবারে চমৎকার দিন—চিট্রি লেখা। বারো চম্রালোকে একটা বেড়টা পর্যন্ত আলোচনা। ঘন বৃষ্টি। তার পরদিন সমস্ত দিন বৃষ্টি। সন্নিবেশ: চিট্রি। অতি বীর পতি। দুই একটা পাহাড়পর্বতের বেধা। চমৎকার সন্ধ্যা। চম্রালোকে এডেন। হঠাৎ জাহাজ বরল। দীর্ঘ জাহাজ, সহস্র আলোকচক্। জিনিষপত্র পোলমা। দুই হল দুই দিকে। মাদেলিয়া জাহাজ। নতুন লোকজন।

পুৰোণে জাহাজের সহকারী—মার্টীন কতকগুলি মেয়ের একটি কন্যা বাণ—বেচারা।^৫ একটি চিরহাস্যের বালক civilian। Gambling।—নতুন জাহাজের সর্বোচ্চ ছাত। অনেক রাতে ছাড়লে। শান্ত সমুদ্র, সৌন্দর্য্য রাত, বেশ বাতাস। “ডেকে” নিহা। নতুন লোক। একটি মেয়ের প্রীতি বহু পুরুষের বৃষ্টি। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আজ শনিবার [৩০ অগষ্ট]। ব্যাণ্ড বেশ লাগছে। সন্নিবেশ কনুয়ের^৬ চিট্রি—বেশ রোহ—সবলুৎ বেপ। লোকের দীর্ঘব। দুই সমুদ্রতীরের আরবদেশের পাহাড়গুল রোহে^৭ ও কাপাসা সেখানে—বেন ভাসার দ্বারা পড়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

(আমি লোকটা স্বভাবত একটু চুপচাপ এবং একটু কোণ ভাসবাসি। দুই একজন বাবের ভালবাসি তাদের কাছের পোড়ায় নিয়ে বেশ একটুখানি সন্ধ্যালোক এবং একটু মধুর চিত্রার মধ্যে থাকা আমার জীবনের একমাত্র সাধ। হৃদিত্তা হৃদেটা প্রবল কর্তব্যের আদ্যো আদ্যের নয়। কিন্তু আমি কাউকে পাইনে—কারো চুপ করে বসে থাকবার সময় নেই, পৃথিবীতে আমি এবং সন্ধ্যা এবং আকাশ এবং সৌন্দর্য্য ছাড়া আরো ডের জিনিষ আছে, কত কর্তব্য কত উদ্বেগ আছে, পৃথিবী দুই বেগে চলছে। কাছেই আকাশে কেবল একলা বসে থাকতে হয়। তাও গেরে উঠিনে—কাছেই থারা উদ্যম বেগে কর্তব্যের দিকে এবং আবেশের দিকে থাকে—তাদের সহ বাব্বার কল্পে আমার চিত্রা কেলে সন্ধ্যা কেলে ত্যাকাতিকি ছুটেতে হয়, স্কটল্যান্ড আমার ভাবটা, না তাদের মত না আমার মত, না বাটতে পারি হাসতে পারি, না কাত্বে পারি উপভোগ করতে পারি—না আমি পৃথিবীর সেবক না আমি পৃথিবীর নবাব।

১ এই ‘অপরূপ’-এর সৌন্দর্য্যকর বিবরণ বিবাহিত আকারে ‘সুন্দরমায়ী চামারি’ দ্বিতীয় কণ্ডে আছে—পৃ ১২২; হরীজ-চন্দ্রাবলী ১, পৃ ৪০৭-৪০৮

২ অষ্টম চিট্রির ১, ২০, অগষ্ট ১৮২০ তারিখের চিট্রি

৩ জারিসেরী সরলা দেবী

৪ চিট্রির ৪৫৫৬-৬০ অগষ্ট তারিখের চিট্রিতে ইহাযের বিবাহিত উল্লেখ অষ্টম

৫ কনুয়ান প্রাচীর

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়, তারি প্রাচীন তারি প্রায়। আমি অনেক সময়ে নিজেই, নমো
আমাদের আতীয় প্রাচীনত্ব অহুত্ব করি— বিজ্ঞান এবং চিন্তা এবং বৈরাগ্য। আমাদের যেন এখন দ্বিটি
সময়। বা উপার্জন করা গেছে তারি উপরে নিশ্চিন্তে শেখ বেলাটা কাটাবার সময়। এমন সময় হঠাৎ
সেখা পেল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে— যে তখনটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভাল হলি পেশাতে পারিনি
বলে নতুন বাজার ব্যস্তের ক্রোক হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরীব। পৃথিবীর চারিদিক যে বকন খাটতে এবং
খাননা দিকে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতকে নতুন ঢেউ আসতে করতে হয়েছে। চিন্তা
গ্রন্থ বিজ্ঞান গ্রন্থ গৃহকোণ ছাড়— কঠিন বাটের ঢেলা ভাঙ— পৃথিবীকে উর্দ্ধ করা এবং নব-মানব জাতের
বাহন নেও। উঠেছি ত, চলেওছি— খেজুরি খুব কাজের লোক হয়েছি— কিন্তু ভিতরে ভিতরে কতটা
নিরাশাস কতটা নিকটম। খেজুরি ২ মনে হয় আমরা কাজের লোকের লোক কিছুতেই ভাল বেপা
চলতে পারব না— অথচ আমাদের বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রের অবসর হইল না। হাঃ ভারতবর্ষের বেড়া ভেঙ্গে
যত্নবোত কেন আমাদের মধ্যে এসে গড়ল— কেন আমাদের লজ্জা দিলে, কেন আমাদের মাঝে কঁপে
নিফল কাজে লাগলো— পুরাতন বন্দীরা বঙ্গের দারিদ্র্য কেন পৃথিবীর সামনে প্রচার করচে। তবে গুটী—
Political agitation কর— Joint stock company খোল— শিখিল মানসগণি নিয়ে মাক্কেটের
সহস্র সৌহারবর সঙ্গে দড়তে আরম্ভ কর— বেশ কি হয়। কিন্তু আমি বুঝা বটে, তোমাদের বন্দী বটে,
তবু দস্যব হাইনে, ঠাণ্ডার খাতা নিয়ে ঘুরিয়ে, খবরের কাগজে লিখিয়ে— আমি নিত্যকাল ঘাঁড় ভারতবর্ষী
— আমি তারি কি হবে! শেখ বন্ধা করবে কে! অথচ ইচ্ছা আছে। যখন বেশি মানবজাত চলতে,
বিচিত্র কল্যাণ, প্রবল গতি, মহান বেগ— অবিশ্রাম কর, তখন আমার মনে নেচে ওঠে, তখন ইচ্ছা করে
সহস্র বঙ্গবীরের গৃহপ্রাচীর ভেঙ্গে কেলে বেহিরে পড়ি। আবার তখন মনে হয় যখন শিখিয়ে পড়ব তখন
কিরব কোথায়, যখন সবাই কেলে থাকে তখন পাড়াব কোথায়! তার চেয়ে পৃথিবীজাতের এই
অজ্ঞাতবাস ভাল, এই ক্ষুদ্র স্থল এবং অগাধ শান্তি ভাল।— তখন মনে হয় আমরা কিছু অপভ্রাতা বর্কব নই;
আমরা হয় তৈরি কর্তে পারিনি, জগতের সমস্ত নিগূঢ় বসব বের কর্তে পারিনি— কিন্তু খুব ভালবাসতে
পারি— ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের মস্তে জায়গা ছেড়ে দিতে পারি। অপেক্ষা করে সেখা হাক পৃথিবীর
এই নতুন সভ্যতা কবে আমাদের কোমলতা মেখে আমাদের ভালবাসবে— কবে আমাদের দুর্বলতা মেখে
অবজ্ঞা করবে না, কবে তাদের নতুন উন্নতি যৌবনের বলান্ধমান এবং জ্ঞানান্ধমান কালক্রমে নবর হয়ে
আসবে এবং আমাদের বৈধীন্যতা মেখে আমাদের প্রতি বৈধ করবে— দুর্বল হয়েও অনেক ভুলো বিধবে
নতুন সংসার না রেখেও— আমাদের কেবল কোমল জলটুকু নিয়ে মানবগণিরাবের মধ্যে স্থান পাব।
গোলাবের মোটা মোটা মুঠি প্রচণ্ড ধাপট এবং নিষ্ঠুর অগহিকতা মেখে আপাতত সেদিন কল্পনা করা দুঃস্থ
হয়ে পড়ে। আচ্ছা না হয় তাই হল, আমরা না হয় একপাশেই পড়ে বইলুম, Times-এর শুভে আমাদের
নাম না হয় নাই উঠল— আপনা আপনি ভালবেসেই কি যথেষ্ট স্থান পাব না। যিহেন আমি ত আপনাকে
তাই বোঝাচ্ছি। জোরমত কান্না কবচ-বোথ হয় ভালই কবচ, আমি পারিনি, আমার বিশ্বাস এবং উৎসাহ
জাপে না, আমি কাছাকাছির মধ্যে ভালবেসে বতটা পারি স্থখে থাকি এবং বতটাপারি স্থখে থাকি।

কিন্তু স্থখ আছে দারিদ্র্য আছে, ক্ষমতার অভ্যাচার আছে, অসহায়ের অপমান আছে কোণে
যশে ভালবেসে তার কি করবে! হাঃ, ভারতবর্ষের সেই ত দুঃস্থ কষ্ট! আমরা কার সঙ্গে দুঃস্থ করব!

তুচ্ছ মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতাব লক্ষ্যে। প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্ঘণ, আমবা সেই আদিম শত্রু প্রকৃতিকে কি করে অর করব? সত্য করে, ধরখাত্ত করে? আশ একটু ভিত্তি নিয়ে কাল একটা লাঠি খেয়ে? তা কখনই হবে না। প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে হটে। কিন্তু এখন তোম দেখি যুরোপ কত দিকে প্রবল কত কারণে প্রবল— এখন এই অনীম শক্তিকে একবার সর্বতোভাবে অসুচব করে দেখি তখন কি আর আশা হয়। তখন মনে হয় এল তাই সহিষ্ণু হয়ে থাকি, প্রবল হতে না পারি তবু ভাল হবার চেষ্টা করি এবং ভালবাসি।

আমি এখন Matthew Arnoldএর কবিতা পড়ি তখন মনে হয় যুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে বড়তুচ্ছ প্রাচীন হয়ে পড়েচে তারি যেন আপনাব কথা শুনেচে পাচ্ছি। হঠাৎ এই অবিজ্ঞান কৰ্ম এবং জীবনসংগ্রামের মধ্যে একটা জাতি এবং সম্বন্ধ এসে কীল খাবে বলচে শুধো একটু রোসো, একটু থামো— এম্ব কি হচ্ছে, একটু তাবো, একটু তাবতে সময় দাও। মাহুব কেবল হাসকাসু করে ষাটবার জন্তে হর নি যাক মাকে চুপচাপ করে তাবা আবস্তক। এখন একটা জাত আপনাব কাজের হিসেব নিতে যায়, এখন সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে এতদিন বা কয়লে ডাব থেকে অবশেষে হল কি, তখনি বোকা ধায় তার পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। এখন মাহুব কেবল কাজের প্রবাহে প্রাণের উৎসাহে আপনি কাজ করে যার তখনি তাহ বল। যুরোপে এখন সকল বিষয়েরই নিবেশের বাতা বেঘিরেচে। খৰ্চ বল মানবজন্মের সম্বন্ধ উচ্চ আশা মৎ প্রকৃতি বল স্বকলেই ধ্যানভঙ্গারী চলচে। একটা বড় বিশ্বাসের জাহগার ছোট্ট সহস্র মত বাসা করচে। যেমন একটা বৃহৎ প্রাণীর কৃত বেধে সহস্র ক্ষুদ্র প্রাণী অগ্রগ্রহণ করে— কিন্তু সেটা ঈর্ষ্যতারই লক্ষণ। [১]

শনিবারটা [৩০ অগষ্ট] চলচে। বানিকটা ভাবচি বানিকটা লিখচি— বানিকটা ছেলেদের খেলা দেখচি— বানিকটা Band শোনা যাচ্ছে— মাঝে২ জাহাজ, মাঝে২ পাহাড় অজুর্জর কঠিন কালো বহু তল্ল বনহীন, মাঝে২ তীরপুত্র সমুদ্র— এইরকম করে সূর্য্যাস্তের সময় হল। Band বাজচে। Castle of Indolence ঘনি কোথাও থাকে ত সে হচ্ছে জাহাজ— বিশেষত গরম- দিনে প্রশান্ত Red sea উপরে— ইংরেজতনয়রাও সমস্ত দিন ডেকের উপর আরামকোয়ারার পড়ে বিবাহধন দেখচে— কেবল জাহাজ চলচে, এবং তার দুই পাশের আবহ নীল জল নাকো খেয়ে অলস আপত্তির কীলখরে পান কাটিবে একটুখানি গয়ে থাকে— আর বিকেলের দিকে বাতাসও একটুই বইতে আরম্ভ করেছে— জগতের আর সমস্ত বস্তু দেখচে— দুই একটা শাখা লক্ষ্য দেখেও তাবাও নড়চে না।—

সূর্য্য অস্ত গেছে। আকাশের এবং জলের চমৎকার বং হয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি বেধা মাত্র নেই। নিগন্তবিশুদ্ধ অটুট জলরাশি নিটোল স্তুতোল কোমল পরিপূর্ণ বৌবনের মত স্তম্ভ হয়ে রয়েছে। এখন একটা জাহগার এসেছে যার উর্ভে আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই, বা অবিজ্ঞান চাকল্যের পথম পরিসিতি, চরম নির্ঝাঁপ। সন্দের সময় ডিল আকাশের বে একটা সর্বোচ্চ নীলিখায় নীলার কাছে দ্বিগুণ সমস্ত পাখা সমস্ত বেধার বিস্তার করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়— চিরচক্ল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা চরম প্রপাত্তির শেষ নীলার এসে অগ্নেকের জন্তে পতিত অন্ত্যস্তলের দিকে দৃঢ় করে স্থির

হয়ে গাড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার বং হয়েছিল তাকে আকাশের ছায়া বলে খেন ঠিক বলা হত না— খেন এই মানেত্রকণে সন্ধ্যাকালের স্পর্শ লাভ করে হঠাৎ সমুদ্রের অন্তলস্পর্শ স্বচ্ছতার গভীরতায় মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার বীজী স্ফুর্তি পেয়েছে— সে কতটা তার কতটা আকাশের বলা যায় না। আমায়ের কত কবিতা কত গান আরেফজনের দুখানি নেত্রের চায়া— এও সেই বকন। সমুদ্রের এবং আকাশের সেই আকর্ষণ বং বেধে কেবল মনে হচ্ছিল ঠিক এইটেকে ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাস্য কোথায়? আবার তখনি খেন হলধরকার কি? আমায় মধ্যে এচকলতা কেন? এই সমুদ্রের এবং আকাশেরই মত আমায় মনের সমুদ্র চোটা নির্জ্ঞান লাভ করে না কেন— জলের সমুদ্র তরঙ্গকে একেবারে খানিহে সিরে কেন কেবল চেয়ে থাকিনে? এই বৃৎকে ছোটর মধ্যে বেঁধে আশন আরন্তের মধ্যে পেতে চাই কেন? সবই ধরতে হবে হাখতে হবে এই কেবল চোটা। অনেক সময় এই বকম হৃৎচোটার বশে, বহুটুহু পাওয়া যেতে পারে তাও ভাল করে শাবার সময় থাকে না।— কিন্তু খেন হং সমুদ্র এবং আকাশের মধ্যেকার এই স্পর্শ সন্ধ্যাতুহু যদি শাবিহাতপুষের মত তুলে নিয়ে কারো হাতে না নিতে পারি তবে কিছুই হল না। এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে বেধবার এবং মুদ্র হবার ভ্রান্তে নয়— কিন্তু মাছখেন ভালবাসার উপরে এই আলো ফেলবার ভ্রান্তে। ঠিক এই উজ্জল হ্রান নিতৃত উদার সন্ধ্যার ঠিক বর্ষখলে যদি আমায় দুখনে পাড়াতে পারি তাহলে আমায় খেন আশনাসের আবে। বেশি বৃন্তে পারি আতো বেশি ভালবাসি। কারণ ভালবাসা বোকাতে গেলে সৌখর্গ্যের ভাষা চাই এবং চাহিখিকের নিয়ন্ত্রতা চাই। এমন আলোক এমন বর্ণ এমন ভাষা আমায় নিজেই মধ্যে কোথায় পাব— এই বৃৎ প্রকৃতি বকন তার একটা চরম মুহূর্তে আমায়ের আচ্ছন্ন করে আমায়েরই অস্তরের কথা ব্যক্ত করে বলে তখন আমায়ের আর কোন চোটার আবস্তক করে না— কেবল ভালবাসবার পূর্ণ অবসর পাওয়া যায়— ভালবাসা প্রকাশ করবার আবস্তকটুকুও থাকে না। একথা হয়ত সকলে বৃন্তে পারবে না— কিন্তু একথা নিশ্চয় সত্যি যে এই আকাশ আমায়ই অসীম বৃন্তির মত, এবং এই সমুদ্র আমায়ই ভালবাদুদ্র জলের মত— এই মুহূর্তে এই সমুদ্রে আমায় আশনাকে ব্যক্ত করবার ভ্রান্তে একটি কথা বলবার আবস্তক থাকত না। যদি এর অল্পহ্রস একটা কথা থাকত তাহলে সেইটি সিরে নিয়ে যেতুম যে ভ্রান্ত সে সমস্ত বৃন্তে পারত। থাকুগ— কবিত্ব থাক্। রাত্তিরে ডিনার টেবিলে Inspector-General of Police-এর সঙ্গে মোবেরনের তর্ক— আরো দুই একজন বোঙ্গ বিরছিল।

রবিবার [৩১ আগষ্ট]। সকালে Evans-এর সঙ্গে জ্রনেজ্রমোহনের* বিবর্ এবং ভ্রাখবিবর্হ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল— তাতে সে কতকটা আশ্বাস নিলে— কিন্তু ভাল করে ভেবে বেধলে অনেক ব্যাখ্যাত দেখা যায়। আশ সকালে এখানে উপাসনা হল। একটা ঘেবে হারি বিরক্ত করেছিল— একে ত সে*বোঙ্গ খেরনি— তার পত্তু হো হো করে হাসছিল— এমন খাখাশ লাগছিল, বকন উপাসকতা সহাই মিলে গান গাচ্ছিল আমায় বেশ লাগছিল। এর মধ্যে সমস্ত মানবের কঠননি শোনা যায়— চিরমজাত চিরহস্তের বিকে সূত্র স্মরণকরনের কি একটা বিশ্বাসের গান উঠে! আকর্ষণ!— ঐ যেচোটা মাঝে মাঝে বকন সেই গানে বোঙ্গ মিছিল তখন আমায় নিতাত blasphemous বলে ঠেঁকেছিল— তার

অষ্টমাত্রও ভুত খায়াশ চৈকেনি। বিখাল না থাকলে কি ছব্বণও থাকতে নেই ?— আচ্ছ Breakfast-এর সময় একটা খবরের সপ্তিক করা গেল। কটি কাটতে গিয়ে দু'বিটা ছিটকে সবলে আমার দুটো আঙুলের উপর পড়ল— বন্ধ ছিটকে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল— বানিকটা বরফ দিয়ে ত্রাণকিনে আঙুল অড়িয়ে ক্যাবিনে ছুট— গা বসি করতে লাগল। অনেকক্ষণ বাঘে ভাকনাধের ঘরে পেসুই সে আমার হাত বেঁধে দিলে— মিতে মিতে মাথা ঘূরে এল অচ্ছকার বেথতে লাগল, কানে শুনে পেসুই না— এমন লজ্জা করতে লাগল। অনর্থক অনেক বক্তব্য করেছি— না বেণের জন্তে না ধর্ষের জন্তে না স্বার্থের জন্তে। সময়মিন কিছু না কিছু লিখেছি। আমরা এদের সকলকে ঘূরে পরিহার করে বেরকম একটা কোণ খেঁবে আছি তাতে বেশ বোকা বায় এরা একটু Piqued হই— আমায় সেটা মন্য লাগে না। তাহে এরা কখন বিহোহী নব্যবস্থাবাসী।

এমন মধুর করে' (ভূমি) ভাবিতে পার না মোরে,
এমন বপন এমন বেধন এমন সুখের ঘোরে।
এমন বাতাস মনের বিলাস এমন আকাশ মাঝে,
ভুলিতে পাও না কেমন করিয়া উদাস বাণীর মাঝে !
এমন অলস বেলা— অলস মেঘের ঘেলা
সারাদিন ধরে জলেতে আলোতে এমন অলস খেলা !
জীবন তরঙ্গী তাসিয়া চলেছে মরণ অকুল বাগে,
দিবসে নিশীথে সুদূর হইতে তোমার বাতাস লাগে।
এমনি করিয়া যৌবে, যিশাবে সুদূর নীরে
যেন করিয়া সজ্জা নীরব নিশায় নিশীথতীরে।
তখন বারেক চাহিয়া দেখিবে কলণ নহন-তুলি
বিদ্যাবের পথ ঈধাবে চাকিবে তার গবে ধোয়া তুলি।
সজ্জা আসিবে হবে তোমার সুদূর ভবে
দিবসের শেষে প্রান্ত হইবে জীবনের কলরবে—
তখন বারেক আসিবে আমার গাড়াইয়ে ঈধানে,
কলণের তরে চেয়ে দেখো ঐ অন্ত অচল পানে।
বেধানেতে শব্দ দেখা রাখিয়া গিয়াছে বেধা
জ্যোতিষ এক অদর অস্ত্র তারা আলোকোক্তে দেখা—
বাকি আর সব গুহ্র নীরব তিমির নির্যাস নিশি
অজানা অশার অকুল ঈধার প্রপাঁচিয়া ধপমিদি।

Cancelled

সোমবার [১ সেপ্টেম্বর]। সকাল বেলাট্টা নবীৰ ভাল ছিল না চুপচাপ কাটিয়ে বিরছি। ভূই একজন লোক আপনি আলাপ করে গেল। এরা কাল খেকে জানিতে পেরেছে আমরা, Tagores, তাই কাল খেকে কাছাকাছি, সুদূর কনুতে। একটা কবিতা লেখবার চেষ্টা করা গেছে সেটাতে মনের ভাব

ভাল ব্যক্তি হইনি।^১ বহুলাংশে হইবে। টিকিনের পর সেখানে বসে থাকিবে^২ চিঠি লিখিতে বসিবে— তরঙ্গ উঠে আমাকে এবং আমার চিঠিগুলোকে ভিজিয়ে দিলে তাতে দুই একজন এদেশে আসা উচিত করে গেল। সন্দের পর আহারান্তে চুপচাপ করে ডেকের উপর জমিয়েছি, লোকের একটা চৌকির উপরে অগাধ নিদ্রাসম— বেগুনী চুইট টানছেন— এমন সময়ে নীচেকার ডেক নাচের বাজনা বেজে উঠল— সকলে ঘিলে নাচের ঘুম পড়ে গেল। মহা যুগ্মাক মহা উত্তেজনা চলচে— তখন পূর্বদিকে নবকলপসময় ঈশ্বর ভাঙ্গা ঠাণ্ডা ঘরে ঘরে উঠতে আরম্ভ করেছে— এই তীররেখাপূর্ণ জলবর মহামহর পূর্বদীপান্তে চাঁদের পাতুর আলোক পড়ে সেখিঁকটা ভাবি একটা অসীম ঐশ্বর্য এবং নৈরাজ্যের ভাবে পূর্ণ দেখাছিল। চাঁদের উত্তরণের নীচে থেকে আমাদের আহার্য পর্যন্ত একটা প্রশস্ত বীর্ষ আলোকপথ ত্রিকৃতিক করচে— এই বিদ্যন সমুদ্রের হৃদয়খানে প্রকৃতি চুপিচুপি আপন প্রাণের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সমস্তই ঘরে নীতবে হৃদয় হয়ে উঠে, রাত্রির হৃদয় শান্তি একটি বহনগন্ধা কুঁড়ির মত পাগড়ির মত অলঙ্কিত সিন্ধবে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে থাকে— আর মাহুগলো পরম্পরকে জড়ায়তি করে ধরে পাগলের মত যুগ্মাক থাকে— ভাবি আমাদের করচে— সর্গাধের বক্ত গরম হয়ে বাথার কেনিয়ে উঠে, বিবলগার সমস্ত যুগ্মে, ইপায়ে, তপ্ত হয়ে উঠে,— আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে, এবং যুবদ্বারাভবের তরঙ্গ ধান চম্প্রাণোক্ত অনন্তকালের চিবুপুতন গাথা সমস্তের গান করচে— এই বহনীতে এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে কতকগুলি পরিচিত অপরিচিত লোক জুড়ি-জুড়ি জড়ায়তি করে লাঠিমেঘের মত ধৌঁধৌঁ করে ঘুর খাওয়ায় ঘুর হৃদয় মনে করচে— একটু লজ্জা নেই, সংকম নেই, চিন্তা নেই, পরম্পরের মধ্যে একটা শোভন অস্ত্রবাল নেই। আমি এটা কিছুতেই ভাল বুঝতে পারিনি।^৩ হাক্সে, বক্সে, দাবের যুক্তি গার যুক্তগে— আমার বা আছে তাই আমার থাক। আমার এই চম্প্রালোককে নিয়ে কোন ইংরেজের ছেলে Polka নাচতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিক ভয় হয় পাছে সর্বস্বামী ইংরেজতনয় আমার জীবনের কোন একটি অঙ্গ শান্তিহৃদকে টেনে নিয়ে এখনি করে Polka নাচায়।

মঙ্গলবার [২ সেপ্টেম্বর]। সকালে ডেক বেড়াবার সময় Evans-এর সঙ্গে আমার বেশ দীর্ঘ আলাপ হয় বেশ লাগে। আজ সকালে বেধু লুম সে একটা নিত্য বোচারা ইংরেজবান্ধার কাছে Modern thoughts and modern science-এর কথা পেড়েছে— সে ব্যক্তি নিত্য বিকল্প উদ্ভাস উদ্ভিৎ হয়ে বানিকটা ইতস্তত করে বেঁটুট দিলে। Evans হতাশাল হয়ে চৌকিতে বসে পড়ল। আমি তার কাছে একটা কথা পাচ্ছিলাম। আমি বহন আমি Ibsen-এর নাটক পড়ছিলাম তাতে একটা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বেশ সুন্দর, বক্ত সব স্রীলোকেরাই সমানবিষয়ের জন্তে ব্যাকুল এবং পুরুষেরাই সমানের প্রাচীন সংস্কারকদের উপর আকৃষ্ট হয়ে আছে। বহাবর আমি যেহেতাই সমাজের বহন। আমার

১ পূর্বপূর্ব ‘বৃত্তি’। কবিভাট্টর পাতৃসিগিত ‘Cancelled’ মতঃ লিখিত আছে। কিরিরার পর একাধিক কবিতার এটি ‘ভাব অভিব্যক্তি’ কবিগোষের বর্গ হইতে পারে— কুমারী ‘খাবনী’ অর্থে ‘বিলার’, ‘আমার হৃদ’ ইত্যাদি— ভাব্যমত বিলত লক্ষ্যসী

২ এইশিখর বৌ ঠাণ্ডা

৩ এই এসবে জীবনবৃত্তি (১০১৪ সা) গ্রন্থপত্রের ২১০-১১ পৃষ্ঠার বৃত্তি সদস্যবর্তিক পর উভয়

বোধ হয় ধর্মবান্ধব যুবোপাধী সত্যতা এমন অস্বাভাবিক খণ্ডন করেছে যাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অগ্রহণীয় হয়ে আছে। জীবিকান্ধ্য গ্রাম এতদূর প্রবল হয়েছে যে সমস্ত শক্তি তাতেই প্রয়োগ করতে হচ্ছে পুত্রের জন্য অতি অল্প অংশই থাকে—গোকেষা চতুর্দিকে বিকশিত হয়ে পড়তে পুরুষেরা বিষয়ে করতে চান না, এককম স্থলে স্ত্রীলোকের অবস্থা সেই অহুলাবে পরিবর্তিত না হলে তারা সুখী হতে পারে না। এইজন্যে যুবোপাধী ঘেরাঘেরা মতো একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছে। নিহিলিষ্ট, সম্ভাব্যের মতো অনেক ঘেরা আছে তারা পুরুষের চেয়ে প্রচণ্ড। ক্রমে ভারতবর্ষের কথা উঠল। শিক্ষিত অনিশ্চিত দুই ভাগ। জনসংখ্যাগুণিত্বপনতঃ বেহার প্রভৃতি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা—কুলি-চালানু নিয়ে বাতলা কাগজের পাগলামি। Elective Principle। আমি বলছি আসল ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা আমাদের অত্যন্ত নির্ভরতারে অবজ্ঞা কর—তোমরা আমাদের প্রতি যত্নসঞ্চিত ব্যবহার কর না বলেই আজকাল এইসব গোলমাল উঠছে—আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে ভয়ভীতি কথক্টিং সম্মান ও সমর ব্যবহার পেতুম তাহলে আমরা বেশ সম্মতচিত্তে কালবাণন করতুম—But the very small courtesy with which you nationally treat us hurts our selfrespect and we try to make up for it by striving to get a larger share in the administration, and by making ourselves thoroughly obnoxious to you. আমি বলছি অ্যাংলোইণ্ডির সমাজে তোমরা সচরাচর এমনভাবে আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা কর যে আমাদের প্রতি রক্ত হওয়া তোমাদের স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত হয়ে যায়। Evans এ কথা বুঝে মেনে নিলে, সে বলে এখন যে সব পিটলম্যান আসে তাদের অধিকাংশের কোন বংশবর্ণনামা নেই, তারা ভয়ভীতি কাকে বলে একেবারে জানে না ইত্যাদি। আজ সমস্ত দিন প্রায় চিঠি লিখতে গেল।

বুধবার [৩ সেপ্টেম্বর]। আমার Evansএর সঙ্গে পূর্বোক্ত বিষয়ে কথাবার্তা। Lord Riponএর Policyর দৃষ্টি—Lord Dufferinএর প্রশংসা, তফাৎ সম্বন্ধে আমাদের পেট্রিটসের ব্যবহার নিকাত্য নির্দোষ ও আশ্চর্য্য। মশটার সমর সূত্রের খালের দৃষ্টে এসে জাহাজ ধামূল। চমৎকার সংয়ের খেলা—কত রকম নীল এবং কত রকম হুসে—পাহাড়ের উপর রৌদ্র ছায়া এবং নীলবাস, বাসির তীব্রবেগ ঘন হুসে, ঘন নীল সমুদ্রের ধারে চমৎকার সেবাচ্ছে। খালের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিন জাহাজ অতি দীর্ঘ পথিতে চলতে চুপারে তরুণী বাসি—কেবল মাঝে২ এক একটা ছোট্ট কোটা বহুদূরবর্তিত পাহাড়গালায় বেঁটিত হয়ে বড় আশ্চর্য্যজনক সেবাচ্ছে। আজও সমস্ত দিন চিঠি লেখা। অনেক চাকিরে অর্ধচন্দ্র উঠল—চন্দ্রালোকে দুই তীর অংশই—ধূমু করচে—কাল অনেক রাত জেগেছি—কেবল বাড়ির ভয়ে প্রাণ টানে—আমার মত গৃহপোক্ত জীব পাওয়া যায় না।^{১০} রাত ১০টার সমর পোর্ট দিয়েছে পৌছন গেল—সেখানে করলা তোলাব বৃষ্টি। বিশেষ ক্রটি সমর নয়।

বৃহস্পতিবার [৪ সেপ্টেম্বর]। Mediterranean। এই আসলে ইয়ুরোপে পড়লুম—ঈশ্বর ঠাণ্ডা বাতাস দিলে। সমস্ত দিন Spectator প্রভৃতি কাগজ পড়েই কেটে গেল। Mediterranean চমৎকার নীল।

১০. তুলসী চিঠিগত ১, ৩ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র—“আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির সমর এখন জাহাজ আর সেই—এবার বাড়ি দিয়ে গির আর কোথাও নয় না।”

(৮ম পৃষ্ঠার আত্মবৃত্তিক) ১১— এমন নয় যে আমাদের কিছুই নেই, আমরা একেবারে বর্জ্য জাতি। এমন নয় যে বেহুনিবন্ধের মত আমাদের মাথার উপরে কেবল মৃত্তা আকাশ এবং পায়েব নীচে উদাস মল্লভূমি। আমরা একটি অত্যন্ত জীবী প্রাচীন নগরে বাস করি—এত প্রাচীন যে এর ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, মাহুবেষ হস্তলিপিত অরণচিহ্নগুলি শৈশবাল আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—সেই মন্তে ভ্রম হচ্ছে এ নগর যেন মানব ইতিহাসের অভীত, যেন প্রাচীন প্রকৃতির এক রাজধানী। মানবপূর্বসূর্যের যোগা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন স্রাবল অক্ষর এর সর্কাক্ষে বিভিন্ন আকারে লিখে রেখেছে—সহস্র বংশের বধা আপন অঙ্গচিহ্ন বেধে গেছে এবং সহস্র বসন্ত এর প্রত্যেক ত্রিভিছিত্রে আপন হাতাঘাতের তারিখ তির-হরিৎ অঙ্কে অঙ্কিত করে গেছে। একধিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, একধিক থেকে এসে অরণ্য বলা যায়। এর মধ্যে কেবল ছায়া এবং বিজ্ঞান, চিন্তা এবং বিবাহ বাস কর্তে পারে—এখানকার ত্রিভিন্নবৃত্ত অরণ্যমণ্ডলের মধ্যে, এখানকার বিভিন্নচক্রী মটল পাশাপ্রাশা ও রহস্তময় পুরাতন অষ্টালিকাভিত্তির মধ্যে সহস্র সহস্র ছায়ায় কাগমযী ও কাগকে ছায়ায়নী বলে ভ্রম হয়—এখানকার এই প্রাচীন মহাছায়াব মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মত নিম্নিরোগে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকাণ্ড এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি গবম্পথ অঙ্কিত বিবর্তিত হয়ে নানা অংকায়ের ছায়াবৃত্ত নির্মাণ করেছে, সেখানে ছেলেবেলায় সারাবির পেলা করে এবং বরষা মোকেরা মৃত্ত বেধে, গ্রন্থের স্বধ্যালোক ছিন্নপথে দেখানে প্রবেশ করে ছোট ছোট মানিকের মত দেখায়। প্রবল বড় মত শত সর্দীর পাশাপাশের মটলতার মধ্যে প্রতিহত হয়ে সেখানে এসে মৃত্ত মণ্ডলের মধ্যে মিলিয়ে যায়। এখানে জীবন বৃত্তা স্ব স্ব চূর্ণ আশা নৈরাশ্রের সীমাবিহ্ন মিলিয়ে এসেছে—অদৃষ্টবাহ এবং কণ্ঠকাত, বৈরাগ্য এবং সংসার-যাত্রা একসঙ্গে চলছে। এখানে কি তোমাদের মগংমুন্ডের সৈন্তশিবির স্থাপন করবার আশ্রয়—এখানকার জীবীভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের শূন্যলিত অগ্নিগর্ভ হ্রস্ব সৌধমৈত্বেয়ের কাগমারে নির্মাণের যোগ্য! তোমাদের প্রবল উচ্চের বেগে এর শিখিল ইষ্টকঙলিকে ভূমিস্যা করতে পার বটে—কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতি প্রাচীন শ্রান্ত জাতি কোথায় গিয়ে পড়াবে! এরা বহমিন বংশের পূর্বনির্মাণ করেনি—সেই এদের মগং পর্ক যে প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তবিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয়নি, কালক্রমে অনেক অবশ্যবৈসাদান্ত অনেক বংশবৃদ্ধি অনেক নতুন হুবিধে অহবিধার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সবকলিকে টেনে নিয়ে, নতুনকে এবং পুরাতনকে হুবিধেকে এবং অহবিধেকে সেই শিত্তামংপ্রতিষ্ঠিত একভিত্তির মধ্যে বন্ধু করা হয়েছে, সামান্য অহবিধের ব্যক্তিরে এরা কখনো স্পষ্টিতভাবে নতুন গৃহবৃত্তি, বা পুরাতন পুংহস্যার করেনি, যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিন্ন হয়েছে সেখানে বটের পাশা অথবা কালসঙ্কিত সুতিকাতরে ছায়া দান করেছে। এই মহা নগরায়ণা ভেঙ্গে গেলে একটি বৃহৎ প্রাচীন শ্রান্ত জাতি একেবারে পুহরীন—কেবল জুই নয়—একটি সহস্র বংশের প্রেতাছা এখানে যে চিরনিকৃত মাত্রায় গ্রহণ করেছিল সেও নিরাশ্র—তার আর কোন ইতিহাস নেই তার কল্পমৃত্যুর তারিখ নেই, সে কেবল এই প্রাচীন অবিবাসীদের তার গৃহের মধ্যে বহুকাল আপন প্রাণহীন প্রাণ বহন করে আসছে। তোমরা চঠাং এসে বলচ—ওঠ তোমরা ক্ষেপ ওঠ—এ সমস্ত ভেঙ্গেচুরে বুলে ফেল—ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক

১১ পাতৃলিপির ৮ম পৃষ্ঠার, অর্থাৎ এই সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা ১১ ছন্দের অস্বত্বিত্তি। পাতৃলিপিতে যে পর্যায়ে লিখিত আছে এখানেও সেইভাবেই মূলিত হইল।

পরিবর্তক হয়েছেন— এখন কর্মের মূল শব্দেছে, অমূলক চিন্তার সময় নেই। আমরা তাঁত হয়ে তোমাদের বলছি এবং আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি— ঠিক কথা— মানবের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে কর্ম আবশ্যক, কিন্তু এমন কর্মবান আর কোথায় আছে— বোধ, এইখানেই মানব ইতিহাসের প্রথম মূলে আধা বর্ককের মুহূর্ত হয়ে গেছে— এইখানে কত বাতালপত্র কত নীতিবর্ধের অক্লান্ত, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে, এই সময় ভ্রমমূলের মধ্যে অগ্রগমন করলে তার সহস্র চিহ্ন পাওয়া যাবে। অতএব আমাদের সমস্ত প্রয়াস আছে— কিছুই করার আবশ্যক নেই। তোমরা শুনে হাস, মনে করত অনেক দিন নিত্যানুভব থেকে “ছিল এবং আছে”র মতোকার প্রভেদ আমরা বুঝে গেছি— যথো যথো কিছু পরিবর্তন করিনি বলেই মনে করছি যা ছিল ঠিক তাই আছে। মনে করত এ একটা আলস্যের নির্লজ্জিতামার। কিন্তু আমরা যুগে যাই যদি আমাদের আসল কথাটা বুঝে বোঝ। আসল কথাটা হচ্ছে, আমরা কাজ করতে পারব না, কিন্তু তা বলে আমাদের অধিক লজ্জার বিষয় নেই— কেননা আমরা আমাদের কান্দ শব্দ করেছি, লজ্জাকাল আমাদের কান্দ হৃদয়ে গেছে। আমরা মানবসভ্যতার যানিকটা ভিত্তি পেঁথে বিজ্ঞান কর্তে বসেছি এখন তোমাদের পাশা, তোমরা কাজ কর। অবিশ্বাস কর যদি, অকর্মণ্য বলে যদি লজ্জা পাও, তবে আমরা বলব, তোমাদের ঐ তাঁত ঐতিহাসিক কোথাল দিয়ে ভাঙতকুঁই থেকে মূলগত ভিত্তি বিনষ্টের মুক্তিকার উদ্দেশ্যে বোধ মানবসভ্যতার ভিত্তিতে আমাদের হস্তচর্চ আছে কিনা! তোমরা যে নতুন কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখানে তার শেষ হয়নি এখানে তার সমস্ত সত্য মিথ্যা স্থির হয়নি— মানব অশ্রুতির বা চিরন্তন সমস্তা এখানে তার কোনটার মীমাংসা হয়নি— তোমরা অনেক জেনেছ অনেক শেখেছ, কিন্তু তবু শেখেছ কি? আমরা যে বিশ্বাসসারকে মারা বলে বলে আছি এবং তোমরা যে একে ক্রম সভ্য বলে খেটে মরত তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ? তোমরা যে বর্তমান সভ্যতাকে পরম জটিল করে প্রচণ্ড জীবিকাসংগ্রাম বাবিয়ে দিয়েছ এবং শেষ ফল কি তোমরা বেখেতে পাক? তোমরা যে অধিনিশ নতুন নতুন অত্যাচার বাবিয়ে করে ধবিক্তের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াক, স্বাধ্যক্ষনক পুত্রের বিজ্ঞান থেকে অবিজ্ঞান কর্মের উত্তরোত্তর টেনে নিয়ে থাক— কর্মকে সমস্ত জীবনের কর্তা করে প্রবল উগ্রাধিনায়ে বিশ্বাসের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, এমন কি প্রীতোকণেরও গৃহকর্ম থেকে বের করে দূর আমাদের মস্ততা নয় জীবনের বগলেক্সে টেনে নিয়ে থাক, তোমরা কি জেনেছ তোমরা কি করত তোমরা কি জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে থাকে? আমরা জানি আমরা কোথায় এসেছি আমরা যুগের মধ্যে অল্প অল্প এবং পাক হয়ে নিয়ে পরম্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিতানৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকট কর্তব্যসকল পালন করে থাকি। আমাদের বতাই হু হুশবুদ্ধি আছে দীর্ঘদিনে দুঃ ও নিকট সম্পর্কে আমাদের অতিথি অলুচর ও ভিক্ষুক নিলে ভাগ করে নিতে চিৎকারবাসন্তব লোক ক্যান্ডবন্তব যুগে কাটিয়ে দিতে, কেউ কাউকে ভ্যাগ করতে চায় না এবং জীবনকর্তার সত্যদার কেউ কাউকে ভ্যাগ করতে বাধ্য হয় না। এই সহস্র সহস্র বৎসরে ভারতবর্ষ জীবনের এই এক মহৎ আবিষ্কার করেছে যুগের স্বার্থ উপায় সন্তোষ— এবং সমস্ত সমাজনীতির দ্বারা ভারতের যুগে যুগে ও অস্তরে অস্তরে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। বোঁটা খুঁঝেছে সেটা পেয়েছে এবং সেটা দৃঢ়বদ্ধ করে দিয়েছে। তার আর কিছু করার নেই। সে বরক তার বিজ্ঞানকর্ম বলে তোমাদের উগ্রাধ জীবনউপদেষ্টা দেখে তোমাদের সভ্যতার সঙ্গততা সম্বন্ধে সংশয় অশ্রুত করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমরা

যখন একদিন কাজ বন্ধ করবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবে ? আমাদের মত এমন কোমল এমন লজ্জার পরিণতি লাভ করতে পারবে কি ? উদ্বেগ ভেদে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হই উত্তম দিন যেমন অবশেষে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে অলক্ষ্যে সজ্জার স্বভাবের মধ্যে অবসাদন করে সেই স্বকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি ? না, কল বেরকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাশ ও তাপ সহ্য করে এতদিন বেরকম সহসা কেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন স্বকথা খেয়ে যায় সেইরকম প্রবলভাবে একটা নিদারুণ অগ্ন্যবসাদ লাভ করতে পারে ? হাই হোক তোমরা এখন অপরিচিত সন্তানে অনাবিকৃত তটের সন্ধানে চলো। অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমাদের গৃহে আমরা থাকি এই কথাই ভাল !

কিন্তু সুখ বন্ধ হই কি করে ! যদি বাইরের কোন উৎসাহ না থাকে তা হলে ত কোন কথাই ছিল না—কিন্তু আমরা অনেকাংশে আমাদের এই নিষ্ঠুর নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছি—আমাদের ইটগুলি হুলে আমাদের গাছগুলো কেটে তারা আগুনোলের ঘর বানিয়ে চায়—বহু দূরে আমাদের ছেলের ঘরে যে অনেক গ্রানিট তুলে মিছি, পথের ছেলের বাগগুলি এলে তা কেটে নিচ্ছে। এখন বিশ্রাম থাকে কোথায় ? প্রাচীন হও আর প্রাচীন হও আর নিজের প্রতি বেরকম স্তোত্রবাক্যই প্রয়োগ করে—আর প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজেকে বতাই সত্য ও সমাজের কথ, আহ্বাস ত চাই, অগমান এবং দারিদ্র্য থেকে সন্তানদের রক্ষা করা ত চাই, যখন চারদিকে অসংখ্য বনের বেলা এবং নিষ্ঠুর জীবিকাসংগ্রাম তখন আশ্চর্যকর জন্তে সন্তোষ লাভ করা ত চাই। এ কথা ত বলে চলো না, আমরা প্রাচীন হয়েছি অতএব মরণ হলে দুঃখ নেই।

আমরা একটা কথা। সুখ বলে একটা মিনি কিছুই নেই—হৃদিকে একটি দুর্ভাগ্য বস্তুর মত সংগ্রহ করে একটি কোটের মধ্যে পুবে ট্যাঙ্কের মধ্যে ভাঁজে কেটে বসতে পারে না বাস্ হইবে সেল, আমার আর কিছু করার নেই। বিভিন্ন মানবপ্রকৃতির চর্চাই সুখ। জীবনের প্রবাহই সুখ। অত্যন্ত বত অধিক, জীবিকাসংগ্রাম বত দুঃখ, সন্তোষ বত জটিল, মানবমনের বিভিন্ন প্রকৃতির আলোড়ন ততই বেশি। সন্তোষ আর সুখ এক নয় সে কথা আমরা জানি। আমরা যখন বলি সুখের চেয়ে সন্তোষ ভাল তখনই স্বীকার করি সুখ ও সন্তোষ দুই অত্যন্ত পৃথক। কিন্তু সুখের চেয়ে সন্তোষ আমাদের প্রাণীকৃত মনে করি। কেবল দুর্ভাগ্যের জন্য সুখ নয়—সুখ বলশাখা, সুখ দুঃখশাখা। অস্তিত্বের যেমন প্রতি মুহূর্তে আঘাতগণকে বত করিয়া জীবন শেষ, মানসিক জীবনে সুখ সেই স্বকম আমাদের হার করে। যৌবনে এই হার যে স্বকম প্রবল, বার্দ্ধক্যে সে স্বকম নয়—কিন্তু তাই বলে দুঃখের বলতে পারে না যে তাপস্কাগই বর্ধার জীবন এবং সন্তোষই বর্ধার সুখ—এই পর্যন্ত বলতে পারে আমার পক্ষে আবশ্যক নেই। অতএব কোণে বলে দুঃখোপে সুখ দুঃখের প্রাণ স্বীকার করার কারণ দেখা যায় না।

কেবল বিচার্য বিষয় এই, এর একটা সীমা আছে কিনা। বতই প্রকৃতির উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ব্যতীত ততই তার কিয়ৎপরিমাণ চরিতার্থতাও একান্ত দুর্ভাগ্য হইবে উঠতে কিনা ? ততই জীবনের সফলতা লাভের জন্তে গুরুতর ক্ষমতার আবশ্যক হতে কিনা, এবং সে ক্ষমতা স্বভাবতই

অশেষকষ্টে অল্পতর ও হ্রোগাতর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইতে কিনা— এই স্বকমে উত্তরোত্তর দুঃখী লোকের সংখ্যা বাড়িতে কিনা, সমাজে স্ববিভাগের দত্ত বৈষম্য হয় ততই তার থেকে বিন্দু কিনা ? ভারতবর্ষে যেমন জ্ঞানমণ্ডল কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলে জ্ঞানের অনেক বিভাগেরই আরম্ভ যাহ হইবেছিল কিন্তু পরিণতি হয় নি, চতুর্দিকবর্তী বিপুল শ্রান্ত লোকের প্রোত এসে তাকে দ্রাবিত করে দিবেছিল তেমনি সৌভাগ্য ঘনি সমাজের এক অংশের মধ্যেই বদ্ধ হতে থাকে তাহলে ক্রমে দারিত্র্য-দুঃখের সংঘর্ষে তা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে কিনা ?

দ্বিতীয় কথা— Fittest-রাই survive করে, কিন্তু Fitness অনেক স্বকমেব আছে। কেউ বা কঠিন বলে বাঁচে কেউ বা কোমল বলে বাঁচে। কেউ বা উন্নত হয়ে বাঁচে, কেউ বা নত হয়ে বাঁচে। গাছ একরকম করে বাঁচে, লতা আর একরকম করে বাঁচে। আমরা যে মনে করছি বিরোধীশক্তির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচব, বাস্তবিক আমাদের সে যোগ্যতা আছে কি ? জাতির মধ্যে কি বৈচিত্র্য নেই ? শব্দদেরই কি টেকবার একরকম উপায় ? খুব সম্ভবতঃ সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা ছাড়া আমাদের আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। অন্তঃসেই আমরা যে দুঃশীলদের সমকক্ষ হবার আকাঙ্ক্ষা করি সেটা পোষণ করছি সে কি বাঁচবার পথে বাধি, না মরবার পথে বাধি ? আমরা যদি আমাদের বাস্তবিক বুদ্ধি কোমলতা বলা কবি তাহলেই কি প্রবলের কঠিনতা সহজে সহ্য করতে পারব না— আমরা যদি কঠিন হই তাহলেই কি কঠিনদেরই আঘাতে ভেঙে যাব না ?— কিন্তু প্রের উত্থাপন করা যুগ। প্রোতে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডী শিল্পী বহন স্বভাবতই আমাদের একমাত্র প্রবল শিকার হচ্ছে, দুর্বলদের প্রতিও বহন জীবনের প্রবলতার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে তখন বিজ্ঞ বিবেচনার কথা বলা বারম্বার—এবং কে জানে সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কিনা এবং কে জানে তবিলম্বে জাতীয় জীবন এবং বহির্ঘটনা পরস্পরে মিলে আপনাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপন করবে কিনা।

তরুণ [৫ সেপ্টেম্বর]। দিনটা লিখতে লিখতেই কেটে গেল। আজ আর তেজ পেতে পারা হল না। ঠাণ্ডা পড়ে আসছে। ক্যাবিনে শয়ন। আজ জাহাজের ডেকে stage বেধে একটা entertainment হবে তার উদ্দেশ্যে। Baldwin-এর দল অভিনয় করবে। প্রথমে amateur-দের কাণ্ড, কারো বা গায়োনা টিং টিং, কারো বা কীণ করে গান। তার পরে Mrs Baldwin প্রথমে পুঙ্খ masher দেখে তার পরে midshipman-এর বেশ ধরে বেশ comic গান গেয়েছিল এবং বেশ নেচেছিল। তার পর ব্যালে নাচ, নিম্রোর গান, বাজ, একটা ছোট প্রোগ্রাম প্রকৃতি বহির্বি কাণ্ড হয়েছিল। মাঝে Sailors' Home-এর অন্তে চাষা আচার্যও হল। সকলে খুব আনন্দে গিয়েছিল। আজ বিকেলে Crete দীপের ভীষণপূর্ত সেবা দিয়েছিল।

শনিবার [৬ সেপ্টেম্বর]। আজ ব্রেঙ্কাই, খেয়ে অবধি বাড়িতে চিঠি লিখি।^{১১} তন্মুখ ইতিমধ্যে একটা জলদস্ত-সেবা দিয়েছিল— গ্রীষ্মের তীব্র আমাদের দক্ষিণে সেবা দিয়েছে— লোম্বেনের টানাটানিতে একবার চিঠি রেখে উঠে গিয়ে সেবে এসু। এই সেই গ্রীস!— লিখতে লিখতে

একদমের ধীরে চেয়ে দেখি Ionian islands দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট পালা বাড়ি—আরো একটু এসে পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ধারে একটি বড় সহর, বাহুবের খেত মৌচাক সজান করে বান্দুখ বীণের নাম Zanthie সহরের নামও তাই। উপরে গিয়ে দেখি আদলা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সর্পিণ সমুদ্রপথে চলেছি—আকাশে মেঘ করে এসেছে। বিহ্বাং চমুকাতে, কড়ের সজাবনা। আমায়ের লোভালা ভেঁকের ঠানোয়া দুলে ফেরে। পর্কতের উপর ঘন মেঘ নেবে এসেচে—কেবল দুবে একটি পাহাড়ের উপর মেঘছিন্নকৃত অশ্মট সম্মালোক পড়েছে আর সবগুলো আসন্ন বটিকার ছায়ার আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটু প্রবল বাতাস এবং খুব বৃষ্টি আরম্ভ হল—ভাতেই বেটে গেল আর কড় এল না। কুম্ভালাগরে আকাশের অবস্থা অনেক সময়ে অনিশ্চিত। আদলা হেগনে দিয়ে এলুম এ জায়গা দিয়ে সজরচর বাহাজ আসে না। জায়গাটা নাকি জারি কোড়ো। রাস্তিবে ভিনাবে Woodroff ক্যাপ্টেনের Health প্রস্তাব ও সকলে মিলে তার গুণগান করলে। আর রাস্তিবে জিনিষপত্র রাখতে হবে, কাল ত্রিখিসি পৌছব।

রবিবার [৭ সেপ্টেম্বর]। সকালে ত্রিখিসি পৌছন গেল। দাগের তলায় এক বিদন গ্যার্ট। এক প্রকাণ্ড Omnibus—দুটি যোগা যোড়া। লোক ও মাল পরিপূর্ণ। আরো ২ চর। রাস্তা পাথরে বিধান। এক জায়গায় লোক পরিপূর্ণ—আজ হাট—বাণ বাহুচে—খুব বেন একটা তিল্ল হুমামের ব্যাণার আছে। বিবিধ বকমের ফলের বুড়ি—সারি ২ দুতো লাভানো দেখলুম। ঠেগনে এসে লোকের আমায়ের চিঠিগুলো এবং তার বাতুল একজন লোকের হাতে মিলে—কিন্তু সে ব্যক্তি যে ত্রিভিন্ত বাতুল লাগিয়ে পোষ্ট করবে আমায় বিশ্বাস হল না। অবশেষে একটা গাড়ি নিয়ে আবার বেহলুম। তাকখবে চিঠি দিয়ে বাচলুম। জ্যোৎস্নাকে “meet করবার জন্তে সড়কে” একটা এবং তারকবারুকে “একটা পৌছলবার টেলিগ্রাক করা গেল। দুই এক খোলা আড়ুর পর থেকে কিনে আবার ষ্টেনে ফিরলুম। এখন ত পুনরানু গাড়িতে চড়েছি। একটা যন্ত্র গাড়ি—ভাইনে ধাবে সারিসারি কতকগুলো বক্মলমোড়া বোড়া বোড়া মুখোমুখী ছোট seats—যাযার উপরে শোবার বন্দোবস্ত গইকানো বোম হয় রাস্তিবে টেনে দিয়ে বিছানা করে বেবে। গাড়িতেই জাবায় সেলুন। একটা রাস্তা নবাব দর আছে বোধ হয়—এত লোক মিলে হাত দুখ খোয়া নাওয়া নিয়ে বোধ হয় কিংগ দোল বাথবে। যা হোক ঠেগনে চড়ে বসে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে। মেঘ করে টিপ্টিং, বৃষ্টি হচ্ছে। আহা—কবে এলুম। প্রথমে দুই বিকে কেবল আড়ুরের ক্ষেত। তার পরে Olive বাগান। বাঘে দুবে পর্কত বন্ধিণে সমুদ্র মধ্যে কেবল অলিভ বন। ঝাঁকচোয়া গ্রহি ও ফটল বিশিষ্ট বলিভচিত গাছ—পাতাগুলো বেন উর্ডমুখ—খুব হয়ে বেন চাষ করা—আমায়ের দেশের যত জল নদ—সাক ২ পোতা—পাহাড়ে জায়গা—চবা জ্বির মধ্যে পাথরোত্ত্বুডি—এক এক জায়গায় পাছতলায় ভেড়া চবচে। মারে মারে সমুদ্রের ধারে এক একটি ছোট সহর আসচে—চর্কচুচা-মুহুতিত শাদা ধবধবে নগরটি সমুদ্রের নীল চিত্রপটে উপর চমৎকার বেধাচ্ছে। (ত্রিখিসিতে নাব্‌বার সময় Evans আমাকে দেখালে ইটালীর

১০ জাঙ্গিনেই ইজোৎসামাং খোয়াস, বর্হুয়ারী দেবীর পূন

১১ জাঙ্গিনাং গাঙ্গিতের পূন ও লোকেরা সাতা সত্যতা

১২ তারকবার গাঙ্গিত

পুলিশদ্বারা সৈনিকবশে ভলোয়াব নিয়ে বেড়াই। বসে এর থেকে বোক এখানকার পথেরট
কি বকম। এদের অনেক বকমের institutions আছে কিন্তু freedom নেই। আমরা গাড়ে
এগারোটাং বের ত্রিশি ছাডি।) এক একটা অলিভ, গাছ এমন বেকে খুঁকে গড়েচে যে পাথর উঠু
করেং তাকে ঠেকো দিয়ে বাধতে হয়েছে। শীত তেমন বেশি নয়। আমাদের সৌখের চেয়ে কম বেশ
হয় তবে শীত গ্রীষ্ম লম্বা তুলনা ভাবি শক্ত। গ্রাংই একটা না একটা সমুদ্রতীরের সহর। ঐ সামুদ্রের
সহরটা মস্ত মনে হচ্ছে।— দুধারে কেবল ফলের বন এবং আঙুরের ক্ষেত— মাঝে এক একটা পাথরের
বাড়ি। ছোটখাট সহর, শাখা শোখা বাত। ক্ষেতগুলো পাথরের টুকরো উঠু করে বেড়া বেড়ায়।
এখনো তাইনে সমুদ্র বেধা দাঙে— বানের পর্ত্ত গেছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাথর উঠু করে
গোলাঘরের মত করে বেধেছে বেধে হল। মাঝে মাঝে স্থপ— চক্রায়ে জল তোলে। খোলাং বেঙনী
আঙুর ফলে রয়েছে।— সমুদ্র আর বেধতে পাচ্চিনে তাইনে বাধে তত্বহীন অগার সহতল চবা যাঠ।
তাইনে খুব খুসিগন্তে পাহাড়ের নীল বেধা অবিচ্ছিন্ন অলিভের বন আঙুরের ক্ষেত আর বেধতিনে— চবা
নাটি, একং মায়গার দাস। দুবেং মাঠের মধ্যেং এক একটা শাখা বাড়ি। আবার আঙুর এবং অলিভ—
বানে ঠেংদুবে এক সহর। একং মায়গার কুটার চাব।— হুণাতের সময় হয়ে এল— ঠাণ্ডা হয়ে আসচে।
দুধারে চবা যাঠ, সমুদ্রি শূত্র— মক্চি বান দিগন্তে দুই পর্ত্তস্ত্রী।

আমাদের দুধারে অমি উচুচু তরঙ্গিত হয়ে এসেছে। দুবেং একটা নীল ব্রু বেধা দাঙে তার
একধারে একটি ঘোট সহর। আমি বসে বসে যে আঙুর বাড়ি তার গছ অনেকটা গোলাব জানেং মত।
আঙুরের খোলা কি চমৎকার বেধতে। বেলায়ে ঠেংনে একটি ইতাদীয়া হুতীকে বেধে আমার মনে
হল ইতালিয়ানীয়া এখানকার আঙুরের মত নিটোল জুগোল টস্টে, বৌবনের বসে বেন পরিপূর্ণ এবং
ঐ আঙুরেরই মত তাড়ের মুখের বং— খুব বেশি শাখা নয়। একটি ঘেয়ে বেধলুম গ্রাং আমাদেরই মত
কালো কিন্তু বেধতে মিষ্ট— এখানকার বেগনি আঙুরের মত। আবার সমুদ্র বেধা দিয়েছে— বোধ
হয় দাঙে ব্রু মনে করেছিলুম তা ব্রু নয় সমুদ্রের একটা বাহ। তাঁয়ে বালিখ উপর অপরাজিত স্তম্ভ
উঠে আচ্ছন্ন করে রেখেচে। আমাদের ঠিক নীচেই সমুদ্র— আমরা তার একটা উচু তটের উপর
বিয়ে চলেছি। মোটা চাব পাঁচ পালমোডা নৌকো জাহার উপর তোলা রয়েছে— ভাখা অমি চানু
হয়ে সমুদ্রে নিয়ে প্রবেশ করেছে— সে অমিটু চাব করা— দুটো ছেলে খেলা করচে। নীচেকার তীরপথ
বিয়ে গাধার উপর চড়ে সোক চলেছে। এক একটা গাধার উপর দুটো সোক। আমাদের বামিকে
পাহাড়। দূর্য্য অন্ত গেছে। এখনো সমুদ্রতীরে কতগুলো গুচ চরচে— কি থাকে তাহাই জানে, মাঝে
মাঝে শুকনো বড়কের মত বেধা দাঙে দাঙে— একটা বাহুর রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষেত্রে
উচ্ছ্বাসে ছুটেচে। এখানকার সমুদ্র তেমন নীল বেধাঙে না— খুটে বকমের। ডেউগুলো কেনি
কেনিই শা টিপে টিপে এগিয়ে আসচে।

হাত্রে টম্বের উপর চড়ে ত বেশ নিরাং যেওরা গেল। আম গোমবার (৮ সেপ্টেম্বর)। সকালে উঠে
বেধা গেল চাববিকে হৃদয় জামল— পরিগাটি বকম চাব করা, কুটার ক্ষেত— প্রোত্যেকের ক্ষেত বড় অলিভ
গাছিয়ে ঘেরা— তাই পাশাপাশি দুই ক্ষেতের দাক্ষানের ব্যবধানটুই বেশ হৃদয় দ্বাশাখের মত বেধাঙে।
কোখাও তিলদাঙ জল নেই। কাল যে বকম আঙুরের ক্ষেত বেধেছিলুম আজ সে বকম বেধটি নে—

রাশি নিয়ে সর্কার উপলব্ধি দিয়ে করে পড়তে। মাকে মাকে প্রায়ই একটাই জেলোয়ে গল্পের এনে গ্রাণ হাশিরে মিটে। মট্টেনিস্ টানেল এখনি আসবে— বোধ হয় দশ আটকে বসব। দুধারে Fir গাছ দেখা দিয়েছে। আমাদের ডান পাশে বাসি ও পাথরের দাঙ্গা প্রগত জলপথ। তাবি একধার দিয়ে জল বেয়ে আসচে— তার পরপারে দীর্ঘ Fir গাছের অরণ্য, তাবি পর থেকে পর্কত উঠেচে। এইবার টানেলে ঢুক্টি। ১ বাহুতে ১৮ মিনিট। ১ বেছে দশ মিনিটে বেরাশুম। ক্রান্ত। দক্ষিণে এক জলপ্রোত কেনিছে চলচে। কবাসী জাতির মত দ্রুত চটুল চকল উজ্জসিত হাতপ্রিয় কলজায়ী— কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বিষল এবং শিশুরভাব। মাগল নিয়ে বেশি উপভব করলেন না— একবার একজন এনে আমাদের বিজ্ঞাপ্য করে গেল মাতুল দেবার মত কিছু আছে কিনা। আমরা তামাকের কোটো দেখাশুম সে চলে গেল। ইটালিয়ান ডাকাতরা এইটুকু তামাকের জন্তে পাচ শিলিং এবং দুটো বাস প্রেক নিয়ে ৩১ ক্রান্ত নিয়েছে। এ জাতের মধ্যে যে ডাকাতের সংখ্যা বেশি হবে তার আর আশ্চর্য্য কি। সেই প্রোতটা এখনো আমাদের পাশ দিয়ে ছুটেছে তার দক্ষিণেই Fir অরণ্য নিয়ে পাহাড় উঠেছে— বেকে চুর কেনিবে ফুলে নেচে পাথরগুলোকে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে race দিয়েছে। এক মাথগাথ খুব সর্কার হয়ে এগেচে— তার দুধারে সারি সারি দীর্ঘ গাছ উঠেছে মাথগাথ ঠেকাঠেকি করে আছে। মাঝে সোহাষ শাকো। উপর থেকে স্বর্ণা মেবে তার সঙ্গে মিশেছে। ডান দিকে পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পার্শ্বাশ্রয় প্রোতের পাশ দিয়ে সমরেখার একে বেকে চলচে। একজন পরে আমাদের নির্যবিত্য সরঞ্জার সঙ্গে বিশেষ হল। সে আমাদের ষা দিক দিয়ে কোন্ এক অজ্ঞাত সর্কার পৈলপথ দিয়ে অগ্রহিত হল। ত্রামল তৃণাচ্ছন্ন পর্কতের মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন বেষাঙ্কিত শাখানুশূলা প্রকাশ করে নরভাবে ঠিকিরে রয়েছে কেবল মাঝে এক মাথগাথ খানিকটা করে Fir অরণ্যের ত্রামল আবরণ রয়েছে— ঠিক মনে হচ্ছে যেন একটা সৈত্য তার সংগ্রহ নথ দিয়ে ওর ত্রামল স্বচ্ছ ছিঁড়ে নিয়েচে, এবং সংগ্রহ বিদায়গরেখা রেখে দিয়ে গেছে। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বদিকনিী দুহুর্ন্তের জন্তে দেখা দিয়ে ষা দিকে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বায়ে একবার অগ্রহিত— যেন কবাসী ললনার মত কোতুকগ্রিয়া, বিবিধ বিলাস চাতুরী জানে। ঐ দুতিন শাখায় বিভক্ত হয়ে স্বহৃদ দক্ষিণে চলে গেল। আবার পর্কতের এক মাথগাথ মোড় কিরে ওর সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে জানে। সেই প্রত্যাপাথ বৈশুম।— ক্রান্তের গাড়ি ইটালির চেয়ে অনেক বেগে চলে— আবার দেখা দায় হয়ে এসেচে। স্বচ্ছ হতে হতে।

আবার সে বায়ে এসেচে। দক্ষিণে পর্কতগুলো একেবারে হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেচে। বিভিন্ন শস্তক্ষেত্র। মাঝে ক্ষেতের মধ্যে খড়ের দাঙ্গা— পাহাড়ের পায়ে বিরল সন্নিবিষ্ট বাড়ি। প্রোত এখনো ষা দিকে চলছে। সেই অলিভ এবং ক্রান্তকৃত অনেক কয়ে গেছে। বিভিন্ন শস্তক্ষেত্র— এবং স্বর্ষীয় Poplar প্রেদী। কুট্টা, তামাক, নানা শাকসবজি। মনে হয় কেবলি বাগানের প্রেদী। এই কট্টন পর্কতের মধ্যে মাহুদ বহুদিন থেকে বস হয়ে প্রকৃতিক বন করে তার উজ্জ্বলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ক্ষুধিগণের উপরে মাহুদের কত ধর ও ভালখঙ্গা প্রকাশ পায়। প্রকৃতিও তার প্রচুর প্রতিধান দিতে। এখানকার সৌন্দর্য্য যে আপনায় সেন্ধকে ভালবাসবে তার আর কিছু আশ্চর্য্য নেই। কত প্রেদ আপনায় সেন্ধকে তারা আপনায় করেছে— একটি বিখাও যেন অন্যভাবে ফেলে রাখেনি। আপন বাসস্থানকে কানন করে

তুলেচে—এর ক্ষেত্রে যদি গ্রাণ না বেবে ত কিসের ক্ষেত্রে বেবে। আবারের বেশ অধরে অন্যায়ের পড়ে লাগে—কোথাও মলমল হচ্ছে, কোথাও পাবাপন্যুণে কটিন হয়ে আছে—কত খবরও গুল পড়ে রয়েছে। আদ্যের কাছে আমাদের দেশের কোন মূল্য নেই।—চমৎকার ব্যাখ্যা। এ কেবলি বাগান পর্বতের মধ্যে নদীর ধারে ক্রুরের তীরে পশুপাখির উইলো। খেঁচত বাগান—সবত ছবির মত। এইবার বাবে পর্বতের পরভলে এক ক্রুর দেখা গেল। বিস্তীর্ণ চলচে। প্রকৃতি এবং মানুষের মিলে কেবল সাধায়ে এবং উৎসাহ করেচে।—সেই ক্রুর চলচে। গণ মাইল আয়ত। কিন্তু আর কি লিখব! কত অর্থনা, কত পর্বত, কত নদী, কত সহর।

আমাদের প্যারিসে নাচবার কথা হচ্ছে। কিন্তু প্যারিসে আমাদের ট্রেন বার না, এতটুকু পাপ দিয়ে চলে যায়। যে ট্রেন দিয়ে প্যারিসে যায় সেইখানে একটা শোভাল ট্রেন রাখবার ক্ষেত্রে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। একবার গোলা থাকে রাত এগারোটার সময় ট্রেন বন্ধলাতে হবে, একবার ত্রুটি একটা, একবার ছুটো, একবার ওর একবার লাগে চারটে। বাগড় চোগড় পরেই শুয়ে রইলুম। রাত ছুটোর সময় আগিরে গিলে। জিনিবশত্রু বেঁধে উঠে পড়লুম। বিধম ঠাণ্ড। দূরে একটা স্ট্রাটফোর্ড একটা গাড়ি ঠাড়িয়ে—কেবল একটা এলিন, একটা কাই, ক্রাল এবং একটা ব্রেক জান্ন—আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয় চম্চম। রাত তিনটোর সময় পূত্র স্ট্রাটফোর্ডে পৌছন গেল—সুস্তোখিত ছুটো একটা মনিয়ো আলো নিয়ে উপস্থিত—অনেক চাফাক করে কাটম্ হৌল এড়িয়ে গাড়িতে উঠলুম—তখন প্যারিসে ঘরভাঙ করে সবার হীপস্ট্রেই আগিরে দিয়ে বিজিত। আমরা Hotel Terminusএ হাজির হলুম—liftএ করে চতুর্থ তলায় শরনক্ষেপে প্রবেশ করা গেল। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বিদ্যাক্ষীপ কার্ণে টাউন্ড নর্গশোভিত নীলবর্ণ বহনিকাখচিত চিত্রিত-জিত্রি নিক্ত কক্ষ—বিহ্ব-পক্ষ-স্বকোমল শয্যা। জিনিবশত্রু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, একটা পুরের Overcoat নিয়ে এসেছি, চিন্তা করে দেখা গেল, সম্ভবতঃ বার কখন আমি রাক্তিতে নিয়েছিলুম তারই Overcoat—সে বেচারা বৃষ্টি, শীত-শীতিল, বাতে পশু অ্যাচ্ছেইতির পুলিগ অধাক—পুলিগের কার করে যদি তার পৃথিবীর উপরে অবস্থান করে থাকে তাহলে আর প্রাতঃকালে উঠে আমাদের চবির সবচেয়ে তার বড় ভাল opinion হবে না। সে এতক্ষণে কত swear কত curse করচে।

মলমলার [২ সেপ্টেম্বর]। লোকের পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না। জাতি গোল বাধিয়ে দিয়েচে। আমরা বিখ্যাস সেটা বেলগাড়ির বেকির নীচে রয়ে গেছে। সকালে আমরা তিন হুঁচি পমরকে বেরোলুম। প্যারিসের কি বর্ণনা করব! প্রকাণ্ড কাণ্ড। রাত্তা বাড়ি গাড়ি খোঁড়া মোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা ইত্যাদি। অনেক ঘুরেও এক বইয়ের মোকানে পৌঁছন দেখানে পোষ্টাকতক, বই কিনে এক খাবারের জায়গার যাওয়া গেল—হৃগজিত চিত্রিত বর্ণপ্রমত্তিত কটিকখচিত প্রকাণ্ড ঘরের একটি প্রান্তেবিলে আহারাদি করে এক গাড়ি নিয়ে ইক্সেল টাউয়ার সেখানে বেরোলুম—এক মত বৈভ্য তার সবার সৌহকমাল নিয়ে আমাশে রাখা ভুলে চার পা কাক করে গাড়িরে আছে। Liftএ করে প্রথমে আমাদের এক তলায় চড়িয়ে গিলে—চতুর্দিকে প্যারিস উল্লাসিত হয়ে গেল—কবে আমরা চতুর্থ তলায় উঠলুম—সমস্ত বিরাট প্যারিসের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে দিলুম—আশ্চর্য ব্যাখ্যা। টাউয়ারে চড়ে বাধি যদি আর

ছোটবোকে^{১০} তিনটে পোষ্টকার্ড^{১১} পাঠিয়ে দিলাম। দৃষ্টির সময় Hippodrome দেখতে গেলুম। তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। বাসি বাজছে। প্রকাণ্ড জায়গা। চারদিকে গ্যালারি উঠেছে। রোমান্ নাট্যশালায় মত মনে হয়। লোক বিশুপিসু করতে। নিবেন বশ হাজার লোক হয়েছিল—তবু এখনি season নয়। দুটো ঘেরে Tight পরে Barএর উপর যে কাণ্ড করলে সে আকর্ষ্য। তার পরে Jeanne d'arcবলে একটা Pantomime হল। প্রথমে একটা গ্রামের দৃশ্য কবৈছিল সেটা বেড়ে গেয়েছিল—তার পরে বিবেশী পৈত্র লুটপাট করতে এল—তার পরে Jeanne সৈন্যবাহী স্ত্রী সর্বশেষে তার চিত্রাশ্রয়। তার পরে দমস্ত ক্রাণেলের সৈন্ত এবং 'জিহ্ন গ্রামেশের স্তম্ভিধ্বংস ঘেয়েরা। ত্রিধর্ষ জ্ঞাপ হাতে বোকার চড়ে একটা মহাসমারোহ করে ঝাড়া। আগাগোড়া সমস্ত বাজনা এবং গান চলে। বেশ দৃষ্টিতে পারছিলাম—কয়ালী নর্থকলের মনটা কি রকম হচ্ছিল।

১০ পরী স্তম্ভিধ্বংসী প্রবী

১১ পরীকে লিখিত পোষ্টকার্ডটির অভিলিপি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন

১

শ্রীমদভিষেকের রাত্রি

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অগনবলন বিলাসবাসন চলনবলন আমোদ-উৎসব খেলাধুলা প্রকৃতি যে আমাদের বনন ও করুনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এগুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। কিন্তু কোনো দেশকালবদ্ধ নয়নাভীর বননকরুনা ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা প্রকৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়; জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্য্যের মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্চা বা আচরণও তাহাই, বরং এক বিপক্ষে চর্চা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তেলে। চর্চায় ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনের এমন কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ বননকরুনা বা ধ্যান-ধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ছুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনচর্য্যের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ বহুটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিতেই পরিচয়, এবং তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

যুক্তি

কিন্তু, প্রাচীন বাংলার এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ছুটাইয়া তুলিবার উপায়-তথ্যগত ইতিহাস-থলনাঃ নাই। সেই চলমান মানবগ্রন্থাঙ্গের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অতীত তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তন্মু, তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আনুমানিক সাহিত্যচরিত্রাঃ সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। বাখালমাস বাখ্যাপাখ্যায় মহাপ্রহারে ঐতিহাসিক উপভাস শব্দ ও ধর্মশাস, হবপ্রশাদ শাস্ত্রী মহাপ্রহারে বেণের মেঘে সে-চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিমর্শন। কিন্তু ঔপভাসিকের যে স্থিতি ঐতিহাসিকের তাহা নাই। কাম্বাই সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। দৈনন্দিন জীবনচর্য্যের বে-সব দিক ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাস বর্তমান, তন্মু সেই-সব দিক সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অবতারণা করিতেছি। কালক্রমাহুযায়ী দৃষ্টান্তের বলিবার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের নাই; আহারবিহাঃ বসনকূষণ খেলাধুলা আমোদ-উৎসব প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিজ্ঞিত তথ্য তন্মু বর্তমান। বিশেষ ভাবে এ-সব সংবাস বহন করিবার জন্য কোনো গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেন নাই; অতীত এ-ভাবে আমরা জানি না। এমন কাণ্ড বা কাহিনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূলসংবন্ধ এবং সংগ্রহ পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। শটটই, বে-সব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই গ্রন্থ পত্রব্যাপক, অর্থাৎ অত্র গ্রন্থকের আলোকে বহুটুকু উদ্ধৃতিত ততটুকুই।

উপাখ্যান

আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল আট্টিক ও ত্রিবিধ ভাষাতারী জাতি কোমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এখন সব পক্ষেই মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব পক্ষ ও পক্ষ-নির্মিত বস্তু আশ্রয় আমাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো রূপে বর্তমান। এই হিসাবে এই পক্ষগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাখ্যান এবং নির্ভরযোগ্য উপাখ্যানও বটে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাখ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু দুই-একটি বিবরণে ছাড়া এইসব উপাখ্যান কতটা বাস্তবোপেক্ষ সত্যে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাণ্যভাষ্যের কামদাস্ত্র আতীত গ্রন্থেও কিছু কিছু সংখ্য ইত্যদ্যত বিক্ষিপ্ত; শেবোক্ত গ্রন্থটির সংখ্য অপেক্ষাকৃত বিক্ষিপ্ততর, বিশেষভাবে বিলাসবাসন ও কামচর্চা সন্দেহ, এবং বাংলায় নাগবসন্তাতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রন্থেই জানা যায়। এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া শুভপূর্ব ও শুভপূর্বের বাংলায় দৈনন্দিন জীবনের কোনো ধরনের আর কোথাও দেখিতেছি না।

শুভপূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপূর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় আমাদের আহাৰ্য ও পরিচয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের যান, সাংসারিক আদর্শ সত্যে টুকরা-টুকরা ইত্যদ্যত বিক্ষিপ্ত সংখ্য একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব বেববেবীর মূর্তিগুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেবোক্ত উপাখ্যানসমূহে। বেববেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সবইই প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রাচারে নিয়মিত; সেইহেতু বেববেবীরের বেশদৃশ্য, অঙ্গকরণ, বেহদল্যা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টগোচর তাহা কতকটা আদর্শগত ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ বসনকল্পনা দ্বারা বস্তিত ও প্রভাবিত হওয়া অনস্বয় নয়। কিন্তু পাহাড়পুন্ডের অথবা মনামতীর বিহার-মন্দির-পাত্রেয় অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সত্যে একথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহার অভ্যস্ত সাধন্য ও বস্তুমতীর প্রতিফলিত; যে-সব দিক সত্যে অন্তর কোনো সংখ্যই প্রায় পাওয়া যায় না, লোকায়ত জীবনের সে-সব দিকের নানা ছোটবড় তথ্য একমাত্র ইহাদের মধ্যেই দীপ্যমান। ফলকগুলির লোকায়ত পিছাই সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের ইঙ্গিত আমাদের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়াছে। গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন ছন্দটি ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু ধরন বাংলার দ্বীপ লিপিমালায়ও পাওয়া যায়। আহাৰ্যবিহার বসনকল্পণ এবং গ্রাম্য ও নগর-জীবন সত্যে বিক্ষিপ্ত তথ্য ইহাদের মধ্যে হইতে আহরণ করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সে-সব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবি-কল্পনার, নানা আলাংকারিক অভ্যুজ্ঞিতে আচ্ছন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্ব্যন্তো বহু অভ্যস্ত এবং স্থপরিচিত ইতিপাসন যাত্র, হয়তো বর্ধা বাস্তবজীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবারেই নাই। বসনকল্পণ এবং সাধারণ সামান্যিক পরিবেশ সত্যে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা-প্রদান্য হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সে-সব তথ্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সত্যে কতটা প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন।

স্বাধীনতা নিষ্ঠারূপে এবং বিস্তৃত ব্যবহাৰ পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃতিক অধ্যয়ন-
সাহিত্যে। বাংলার সুবিদিত বৃত্তিসাহিত্য, কৃষ্ণকর্ম ও ক্রমবৈবর্তনপুৰাণ, চণ্ডীমিতমালা, বোদ্যাকোষ,
মহাকবিৰ্ণাস্ত-কৃত কিছু কিছু বিদ্যি য়োব, প্রাকৃতপৈনসবের কিছু কিছু স্নোব, রামস্বত্বিত ও শবনবৃত্তের
সত্য কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে থকা পড়িয়াছে।
কোনো মুস-বস্তু নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই; তবু এইসব
গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে যেটামুটি একটা ছবি ধরিতে পারা যায় তাহাও খুব কমই নয়।
সত্যতঃ সমস্ত গ্রন্থেরই বেশকাল যেটামুটি সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ ইহাদের অবিকার্যই বাংলাদেশে, এবং যখন
হইতে যখন-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে বৈশিষ্ট্য জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত
সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার বাঙ্গালীর স্বাধীনতায় নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা
নয়, তবে নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় তাহার বাঙ্গালীদেহের যে-সব স্মৃতি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন
তাহাতে নৈষধচরিত্রের বিবরণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা কোষ করিয়া বলা যায় না। বিবাহ
ও আহারবিহার সম্বন্ধে কিছু কিছু হীতি-নিয়ম, কোনো কোনো তথ্য যেন বাংলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে
প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। তাবত্তের অন্তর এ-সম্বন্ধে প্রচলন থাকিলেও শ্রীহর্ষ যে-ভাবে বর্ণনা দিতেছেন
তাহাতে তো মনে হয়, তিনি বাঙ্গালী হইন বা না হইন, এমন বেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে
এইসব হীতি আচার অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই বেশখণ্ড হইতেই
বাংলাদেশ।

2

বহাদুরী স্ববিধিত বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর আদর্শ ও মানীর সহজে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে কতি ও বসনার যে স্থান ঘোষণা, বহনকার যে স্থান ও ঠাট্টা পরিচয় বিস্তারিত, আশির্বাচন সংকল্প উৎসাহের মধ্যে কোণাও সে-পরিচয় বরা গড়ে নাই। এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পনা প্রদর্শিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সেকথা কোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অল্পপরিমিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সমস্ত সংসারই পর্বোক্ত এবং অন্তর্যমিত।

આણંદ વિહાર

ইতিহাসের উৎকাল হইতেই খাত বে-সেনের গ্রন্থ ও গ্রন্থান উৎপন্ন বস্তু, সে-সেনে গ্রন্থান পাসাই হইবে তাত, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ডাক-ডাক্ষণে এই অভ্যাস ও নঃতার অস্তিত্ব ভাবাতারী আশি-অষ্টোদীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উক্তকোটির লোক হইতে আশ্রয় করিয়া নিহতম কোটির লোক পর্ব্ব সুললৈই গ্রন্থান ভোজ্যবস্তু তাত, এবং 'হাঁড়িত জাত নাহি নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালী-জীবনের সবচেয়ে বড় ভ্রুৎ। তাত বাঁধার প্রক্রিয়ার আবর্তন্য ভো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য-গ্রন্থান নাই বলিলেই চলে। উক্তকোটির বিবাহভোজ্যে বে-সেন পরিবেশন করা হইত সে-সনের কিছু বিবরণ নৈমঘরিতে 'ময়রতীর বিবাহভোজ্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়। সপথ ধুমায়িত, তাত স্তম্ভসহযোগে ডাকন করাটাই ছিল বোধ হুই সাধারণ রীতি। প্রাকৃতিকঐশ্বর্য-গ্রন্থেও (চতুর্থ পত্বেই দেখাযেবি)

প্রাকৃত বাঙালীর আঁহাও দেখিতেছি কল্যাণাতায়, 'এগুয়া ভক্তা গাইক বিত্তা', সো-হুতলহকাৰে সকল গবহ ভাত। নৈবগচবিতেৰ বৰ্ণনা বিস্তৃততঃ : পৰিবেশিত আৰু হইতে ধুম উঠিতেছে, তাহাৰ প্ৰত্যেকটি কলা অভয়, একটি হইতে আৰ-একটি বিছিন্ন (বহুতৰে ভাত), সে-অৰ সুস্থিত হুহাদু ও শ্ৰমবৰ্ণ, সৰু এবং দৌৰচমৰ (১৯৬৮)। দুই ও অৱশ্যক পায়সও উচ্চকোটিৰ লোকসেৰ এবং সামান্যিক ভোজে অস্তিত্ব গ্ৰহণ তকা ছিল (১৯৭০)।

প্ৰাকৃত বাঙালীৰ খাদ্য

ভাত সাধাৰণত খাওৱা হইত শাক ও অল্পাত ব্যঞ্জন সহযোগে। বহিৰ্ভ এবং গ্ৰাম্য লোকসেৰ প্ৰধান উপাদানেই ছিল বোধ হয় শাক ও অল্পাত সমী তৰকাৰি। ভাল খাওৱাৰ কোনো উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎসৰ ভ্ৰম্যাসিৰ হুহাৰ তালিকাৰও ভালেৰ বা কোনো কলাইৰ উল্লেখ কোথাও নাই। নানা শাকৰ যথো নালিতা (পাট) শাকৰ উল্লেখ প্ৰাকৃতপুঁজলে দেখিতেছি। বসন্ত, এই প্ৰেৰে প্ৰাকৃত বাঙালীৰ খাদ্য-তালিকাটি উল্লেখযোগ্য :

ওপুৰাভৰ: বহুত পতা গাইক বিত্তা হুহ সখুলা

বোঁমি সন্ধা নালিত গন্ধা বিস্মই কাছা বটৌ পুৰবৰা

কল্যাণাতায় প্ৰথম ভাত, পাওৱা ঘি, ঘৌৱলা মাছৰে কোল এবং নালিতা শাক বে-স্ত্ৰী নিত্য পৰিবেশনপ্ৰৱিতে পায়স-ভাহাৰ বামী পুখুৰান, এ-সম্বন্ধে আৰু সম্বন্ধে কি! কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহতোজে, বৰদাঈয়া শাকলজীৰ তৰকাৰি পছন্দ কৰিতেন না।

বিবাহতোজ

দশমস্তীৰ বিবাহতোজে সূৰ্যবৰ্ণ পাত্ৰে ভাত-তৰকাৰি পৰিবেশন কৰা হইয়াছিল। বৰদাঈয়া ননে কৰিলেন ব্ৰুতি বা শাকৰ পৰিবেশন কৰা হইয়াছে; একটু বিৱস্তিৰ তাবই প্ৰকাশ কৰিলেন ঘেৰিগু, কস্তাপক্ষীয়েৰা বলিলেন, আগনাবেৰ শাক পৰিবেশন কৰা হয় নাই, পাত্ৰটিৰ বৰ সূৰ্য বলিয়াই অৱবাজন সূৰ্য বেগাইতেছে। এই বিবাহতোজে বে-সব ব্যঞ্জন পৰিবেশন কৰা হইয়াছিল তাহাতে যেনো ঘাইতেছে, ব্যঞ্জন তৰকাৰি প্ৰকৃতিৰ বাহন্য সেই দুপেও উচ্চকোটিৰ বাঙালী সমায়ে ঘৰেইই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেৰা সব খাইবা এখনকি পগনাও কৰিয়া উঠিতে পাৰিত না। এই ধৰনেৰ বৃহৎ ভোজে সামাজিক অশাস্ত্ৰেৰ কথা ই-এসিঙে বৰ্ণনা কৰিয়া গিয়াছেন। কবি শ্ৰীহৰেৰ কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাংলাদেশে তাহা অক্লান্ত পতিতে চলিতেছে। বে-সব ব্যঞ্জনবি এই বিবাহতোজে পৰিবেশিত হুইয়াছিল তাহা তালিকাণত কৰা ঘাইতে পায়; দই ও রাইসবিয়াৰ প্ৰস্তত বৈতৰ্ণ কিন্তু বেণ কালদুৰু কোনো ব্যঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকসেৰ মাথা ঝাঁকিতে এবং তাদু চাপড়াইতে হুইয়াছিল); হৰিণ, ছাপ এবং পক্ষী মাংসেৰ নানা বস্তুৰ ব্যঞ্জন; মাংসেৰ নয় কিন্তু পুৰ্ণত মাংসাশয় বিবিধ উপাদানদুৰু কোনো ব্যঞ্জন; মাছৰ ব্যঞ্জন এবং অল্পাত আৰো নানা প্ৰকাৰেৰ সুগন্ধি ও প্ৰচুৰ বস্তুদুৰু ব্যঞ্জনবি; নানা প্ৰকাৰেৰ সুমিষ্ট শিষ্টক এণ-বই ইত্যাদি। পানীৰ পৰিবেশিত হুইয়াছিল কশু হৰিষ্মিত সুগন্ধি জল। ভোজেৰ নয় বেগো হুইয়াছিল নানা বস্তুদুৰু

পানের বিশি। অবান্তর হইলেও একটি অল্পমানগত ভাষার উল্লেখ এখানে করা হইতে পারে। সমস্ত প্রণাল্য মহালাগবীর বেশগুলিতে এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে লোকায়ত স্তরে পান পরিবেশনের রীতি হইতেছে পান হুপারী এবং অন্ত্যস্ত মনসা পুখক পুখক ভাবে সাজাইয়া বেণ্যা। পূজা-পরিবেশও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কোমলমাজের রীতিও তাহাই। পান বিশি স্বদিয়া পরিবেশন করা বোধ হয় পরবর্তী আর্থ-ভারতীয় রীতি এবং উক্ত-কটি লোকস্বরে ক্রমশ সেই রীতিই প্রবর্তিত হয়। বোধ পান ও মোহার যেখিত্তি পানের সঙ্গে মনসা হিলাবে কপূর ব্যবহার করা হইত।

যদি পানস খীর প্রস্তুতি দুইভাষা নানাশ্রমকারের নামের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে পাইতেছি। এগুলি চিরকালই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভবনবস্ত্রের প্রাচুর্য্যপ্রকরণ-প্রবে নানাশ্রমকারের দুইপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবিনিবেশ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাভাগত কারণে।

, মৎস্ত ও মাংস আহাৰ

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষ ভাবে শবর পুন্নিম প্রস্তুতি শিকারজীবী লোকস্বের মধ্যে এবং সমাধের অভিজাত করে। জাগমাংসও বহল প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোনো কোনো প্রান্তে ও লোকস্বরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কোমে, বোধ হয় শুকনা মাংস বাওয়া প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবনবস্ত্র কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুকনা মাংস বাওয়া অল্পমানন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিয়াছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরানিমই হোক, বাঙালীর বাজার প্রক্রিয়া যে ছিল অটল এবং নানা উপাধানবহুল তাহা নৈবদ্যভিত্তির ভোজের বিবরণেই স্থাপ্ত।

যদিবহল, নবনদী-বালবিলবহল, প্রণাল্য-সভ্যতা-প্রভাবিত এবং আদি-অষ্টোদীয়মূল বাংলায় মৎস্ত অত্যন্ত প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু সন্দেহ নহে। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্ববঙ্গ প্রভিয়ার দেশ ও বীপপুঞ্জ ও প্রণাল্যসাগরীয় বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের আহাৰতালিকার সিকে জাকাইলেই বুঝা যায়, বাংলাদেশ এই হিসাবে কোন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই এই তালিকার ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্তপ্রীতি আর্থসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না; অবজার সূক্ষ্মাই বহু স্থাপ্ত। মাংসের প্রতিও বাঙালীর বিরাগ কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু আর্থ-ভারতে ছিল; বিশেষভাবে ঐতিপূর্ব ঘর-পুখক শতক হইতেই মাংসের জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের তো বটেই, একটা নৈতিক আশঙ্কি ক্রমশ লানা বাখিত্তিছিল এবং আর্থ-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরানিম আহাৰের প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। *বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, চিরায়ত এবং বহু অন্ত্যস্ত প্রাণের বিরুদ্ধে তাহা যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই। বাংলার অত্যন্ত প্রথম ও প্রধান শক্তিকার তত্ত্বভবের স্থাবর দৃষ্টিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালীর এই অভ্যাগ সর্বদা করিয়াছেন। বহু-গাভগা-বাদ-ছাপনের প্রস্তুতি প্রাচীন শক্তিকারের ইত্যাদত উদ্ধার করিয়া ভবনের বলিতেছেন, ইহারেই নিবেদ্যাকা তো জু চতুর্দশি তিথি বা এই ধবনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে প্রাধোম, কাছেই বাছ বা মাংস বাওয়া কোনো মোহ স্পর্শে না। বস্তুত মাংস ও মৎস্ত আহাৰ

বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও পত্নীবাগ্য যে, এই সম্বন্ধে ছাড়া ভবনবের আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলায় অন্ততম শতিকাৰ ত্রিযাচাৰ্ণও তাহাই কথিতাছেন ; বিষ্ণুগাণ হইতে দুইটি য়োক উদ্ধাৰ কথিতা তিনি ঈশ্বাইতে চেষ্টা কথিতাছেন যে, কথেকটি পৰিবহন ছাড়া আর কোনো যিনেই মন্ত বা মাস আহার পঠিত কাৰ কিছু নহা। বৃহত্তম পুণাণের মতে য়োহিত, শব্দ (পুঁটি বা শব্দী মাছ), স্কুল (সোল) এবং পেতবর্ষ ও ঐশ্বৰ্য্য অন্তত মন্ত ব্রাহ্মণের তন্ম। প্রাণীম ও উদ্ভিদ তৈল বা চৰিৰ তালিকা যিত্তে গিৰা জীমুতবাহন ইলিস(ইলিস বা ইলু)মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহল বাবদাযের কথা বলিযাছেন। মনে হয়, ষাণিকার যিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ বাঙালীর অন্ততম প্রিৰ খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রযোজনে ব্যবহৃত হইত। সব মাছ কিছু ব্রাহ্মণের তন্ম ছিল না ; যে-সব মাছ গর্তে কাগার বাস করে, বাহাযের মূখ ও মাথা শাণের মত (বেমন, বাণমাছ), কথাকৃতি বাহাযের চেহাৰা, বাহাযের ঐশ নাই সে-সব মাছ ব্রাহ্মণের শকে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পা ও শুকনা মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ঈশ্বৰ্য্য-প্রের লেখক সর্বানব" বলিতেছেন, বহালমণের লোকেরা সিহলী বা শুকনা মাছ বাইতে ভালবাসিত (যন্ত বহালবজ্ঞাঃখাঃ শ্রীতিঃ)। এখনও তো তাহাই। শামুক, কাকড়া, য়োগ, শারঙ্গ-বক, ঈশ, মাড়াই শব্দী, উট, গোক, শূকর প্রকৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণা শ্রুতিগানিত সমাজে। তবে, সকেং নাই, নিমত্তর সমাজত্বের এবং আদিবাসী কৌমের লোকের মধা আদিকার মতই শামুক কাকড়া য়োগ প্রকৃতির মাংস, নানাপ্রকারের ঐশ ছাড়া মাছ,পৰ্ণাকৃতি বাণমাছ, গর্তকাথাবাসী নানাপ্রকারের অহলীন মন্ত, নানাপ্রকারের শব্দীমাংস সমস্তই তন্ম ছিল। শব্দম প্রাণীযের মধা শোবা শব্দক সমাজ এবং কল্প শাওদার শুব বাধানিযে কাহাৰো শকে কিছু ছিল না, একথা ভবনব নিজেই বলিতেছেন তাহার প্রায়কিত্তপ্রকরণ-প্রের। বাঙালীর মন্তশ্রুতির গঠিত গাহাচপুৰ এবং ময়নাতীর পোড়াযাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায় ; মাছ-কোটা এবং ব্রুতিতে তথিতা মাছ হাটে লইযা যাওয়ায় দুটি অতিবাগ্যব চিত্র কথেকটি ফলকেই উৎকীৰ্ণ। শব্দ পুৰ্ব্ব হরিণ শিকার কথিতা কাখে কেলিযা বাড়ি লইযা যাইতেছে শে-চিহ্নও বিদ্যমান। শব্দ পুশিৰ নিযাৰ জাতীয় ব্যাখযের প্রধান ব্রুতিই তো ছিল হরিণ ও অন্তত শতশব্দী শিকার। হরিণ-শিকারের শুব শব্দব বর্ণনা আছে একাধিক চৰ্ম্মশ্রুতে। একটি শ্রুতে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত জাত শব্দ হরিণের যে বর্ণনা আছে অবান্তর হইলেও তাহা উদ্ধাযের লোভ সংবরণ করা কঠিন।

হরিণশিকার ও হরিণমাংস আহার

সেব ন শূপই হরিণা শিযই ন পাশী।

হরিণা হকীর যিমর না শাশী।

হকিশী যোলম শুব হালিা তো।

এ যন ছাড়ি য়োব জায়ে।

তরুযতে হকিয়ার শুর ন হানসই।

শূবহ কই দুই যিমই ন পশিযই।

(অর) হরিণ তুল য়োব না, অল বায না; হরিণ যানে না হকীর টিকনা। হকিশী (যাশিড) যলে, শোব হরিণ, এ-যন ছাড়িযা মাছ হইল (শিগি) বাও। জীযগতিতে বাযমান হকিণের শুর শোবা বায না; শূবহ কলেন, কলেন জায়ে একথা প্রযেণ করে না।

জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইষিও আছে কুহুসুই আর একটি স্মৃতিতে।
তবৎসংস্কৃত সাহসনীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইষিও আছে একটি চর্চাপ্রতিভে। কালু নাম বলিতেছেন,

ভরিজা ভরমণি দিব করি মাছ ধরাই।

মাছ বেশী তখন ধরিয়া।

পকতবারত কিম বেড়ান।

বাঘ মাছ কামি মাগমাগ।

তরকারি

বেঙ্গল উদ্ভিদ তরকারি আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন বেগুন লাউ কুমড়া তিলে কাঁচকল কচু (কম) প্রভৃতি, আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক জাভাভারী জনগোষ্ঠীর দান। এ-সব তরকারি বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাৎকালের দিন হইতে এই অল্পবান ঐতিহাসিক নয়। পরবর্তী কালে, বিপেয়ভাবে যথাযুগে, পশুশিকারের চেতায় এবং অস্ত্রাস্ত্র নানাশস্ত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু, আবারের গাভের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। নানাগ্রকারের শাক বাগদার অস্ত্রাস্ত্র ও বাঙালীয় সুপ্রাচীন।

জল

কলের মধ্যে কলা জাল আয় কাঁঠাল নারিকেল ও ইন্দুর উল্লেখই পাইতেছি বারিবার। আয় ও কাঁঠালের উল্লেখ ভো লিখিয়ামায়ায় সুপ্রচুর। কলা আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক জাভাভারী লোকদের দান; প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে কলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা বিবাহ মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অল্পটানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যোক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দুর হস আকিকার মত তখনও পানীর হিগাবে সমাদৃত ছিল; ইন্দুর জল দিয়া একপ্রকার স্তম্ভ (এবং বোধ হয় শর্তসাপেক্ষে আতীয় একপ্রকার 'বগ' ভিনিও) প্রস্তুত হইত। যেমতের মৃতন স্তম্ভের গন্ধে আঘোষিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা পঙ্কজকর্ণাশ্রুত-গ্রন্থের একটি স্তোকে দীপ্যমান। তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্চাপ্রতিভিতে।

কালবিবেক ও স্তম্ভভার্য-গ্রন্থে আশ্বিনমাসে কোলাগবর্ণপূর্ণিমাযাত্রায় আতীতবান্ধবের চিপিটক বা চিড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানাগ্রকারের সম্বন্ধে পবিত্র করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত বিনিময় কাটিত পাণ্য খেলায়। খই-মুড়ি (লাজ) বাগদার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল; খই বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খই-বর্ণনের বর্ণনা এবং লাজদোষের অল্পটানে।

পানীয়

দুধ, নারিকেলের জল, ইন্দুর, ভালবস ছাড়া মঙ্গলভার্য নানাগ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলার সুপ্রচলিত ছিল। শুধু হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার পৌড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বভারতব্যাপী। ভাত পয় শুক মধু ইচ্ ও ভালবস প্রভৃতি গাছাইয়া নানাগ্রকারের মত প্রস্তুত হইত। ভবসেব-

ভট্ট ঠাহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার যজ্ঞ-পানীয়েষ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও জিহ্নেতর সূক্তের পক্ষেই যজ্ঞপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সোকে ঠাহার এই স্থিতি-নির্ধারণ ঋতট। মানিয়া চলিত, বলা কঠিন। বৃহদ্রথপু্রাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্বর্ষ যজ্ঞ যজ্ঞ যন্ত্র ও যাস উপাচারে এবং নববলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিবপূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজা পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য। হইলেও শক্তিপূজায় এইসব উপাচার ও নববলি নিষিদ্ধ ছিল না, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোনো পূজারই তেমন নিষেধ কিছু ছিল না। চর্বাঙ্গীতির একাবিক শ্রীতিতে যেভাবে শৌণ্ডিকালয় বা শুড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, যেন হয়, বৌদ্ধ শিদ্ধার্থের ত্রিতর যজ্ঞপান পূর্ব পহিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া শৌণ্ডিক বা শুড়ির স্ত্রী যজ্ঞ বিষ্ণু করিতেন, এবং ক্রোড়ার্য্য সেইখানে বসিয়াই তাহা পান করিতেন। শুড়িখানার ব্যবহার বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন স্বাক্ষর। থাকিত, এবং যজ্ঞাভিলাষীরা সেই চিহ্ন দেখিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন। একজাতীয় গাছের লব বাকল (অন্ত মতে, শিকড়) শুকাইয়া শুড়ী করিয়া তাহা দ্বারা মল ঢোলাই করা হইত। বেলের খোলা করিয়া যজ্ঞ-পানের উল্লেখ আছে সহস্রিকর্ণাসুত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে; চর্বাঙ্গীতিতে দেখিতেছি, যজ্ঞ ঢালা হইত যজ্ঞার যজ্ঞার। বিষ্ণুস্মরণ বলিতেছেন,

এক সে শুড়িবি ছুই করে সাধন।

ঈশ্বর বাহুসম বাসনী বাহন।...

লক্ষী দুর্গায়ত তিক দেখি।

আঁখিল পরাহক অগ্নে বহিমা।

জটিলি যন্ত্রির সেন পদায়া।

পাইটেল পরাহক মাছি নিসার।

এক সে শুড়ী লক্ষী লগে।

ভল্ল বিলম্বা খির করি চাল।

এক শুড়ী লক্ষী ছুই করে সাধন (একে), সে চিহ্ন বাহন দ্বারা বাহনী দেখা যাবে। শুড়ির অর্থাৎ তিক (যেহেতু দুর্গারই; সেই তিক দেখিয়া ব্রাহ্মক সিন্ধেই চলিয়া আসে।) যেহেতু যজ্ঞার সব ঢালা হইয়াছে; ব্রাহ্মক যে ঘরে স্থাপিত তাহার আর সন্ধ্যাপন কিছু নাই (যেহেতু বেণার এখনই বিস্তার)। লব বাকল একটা যজ্ঞার সব ঢালা হইয়া উঠে—বিস্মা সাব্যসন করিতেছেন, লব বাকল বিলম্বা খির করিয়া বাহনী চাল।

প্রাচীন বাঙালী কি ভাল বাইত না?

প্রাচীন বাঙালীর বাস্তবতালিকার জালের উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বাংলা আশ্রয় ও শুড়িয়ার দত ভাল আশ্রয় ব্যবহৃত হয়—এ ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে—সমাজের সকল অংশেই—তাহার পূর্ব যজ্ঞাঙ্গই এই ভিন প্রদেশে লক্ষ্য। পূর্বেও তাহাই ছিল; বোধ হয় উপাধন আরও কম ছিল। পূর্ব-বিশিষ্ট এশিয়াটিক প্রণালীবহাঙ্গণের যেন ও ঐশ্বর্য্যগণিতে আশ্রয় জালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। সেইজন্য জালের

চাপও নাই। বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও কক্সবাজারে, উক্তকোটি দোকতবে বহু ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও আদিম বাজনারি খাওয়ার পর সর্বশেষে ভাল পাওয়ার রীতি প্রচলিত। আর, নিম্নকোটি স্তরে বাংলার সর্বত্রই আজও অনেক ভাল ব্যবহারই করেন না। প্রাচীনকালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। আর স্নাত মন্ত্রভোজীর প্রক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল কম। বসন্ত, জালের চাপ ও ভাল খাওয়ার রীতিটা বোধহয় আর্থ-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে।

এ-তথ্য অবসীকার যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মন্ত্রভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের কঠি ও বসনার খুব প্রচুর ও ঐতিহ্য ছিল না, আজও নয়। তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে শিবকল লইয়া পথহীন রাস্তা ও বনভূমিতে ঘূরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহাদের অশান্ত সূখান্ত খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সম্ভব নাই যে, সেই বাহিবাদী কৌশলমাতার মন্ত্র ও পিতার-নাগ ভক্ষণ, সদস্যময়িক সাধারণ বাঙালীর উদ্ভিদ-বাজনারি, এবং তাহাদের আদিম বহনপ্রণালী ভিন্নপ্রদেশী দৈনন্দিন আচার্যের নিগামিত কঠি ও বসনার অপ্রত্যয় উল্লেখ করিয়াছিল। সে অপ্রত্যয় আজও বিদ্যমান।

শিকার ও অস্বাভাবিক শারীর-ক্রিয়া

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতির প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা হুগুয়া। আর, অস্বাভাবিক ও ক্ষেত্র শব্দ, পুলিশ, চণ্ডাল, বাঘ প্রভৃতি অস্বাভাবিক কোমল শিকারই ছিল প্রধান উপকরণ ও বিহার দুইই। ইহাদের কিছু কিছু শিকারচির পাহাড়পূর্ব ও ময়নামতীর কলকগুলিতে দেখা যায়। এই কলকগুলিতেই দেখিতেছি, কৃত্তী বা যমজুৎ এবং নানা প্রকারের হুগুয়া শারীর-ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির দোকতের অপ্রত্যয় বিহার। শব্দসূত্রে নারীদের অলঙ্কার এবং উদ্ভিদচর্যার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া।

গৃহকীড়া

ঘাত বা পাখাখেলা এবং ধাবাখেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাখাখেলাটা হে। বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। ধাবাখেলার প্রচলন যে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চর্চাসীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা') 'মন্ত্রী' 'পল্লব' এবং 'ধড়', এই চারি গুটি, খেলাব 'দান' এবং ছকের চৌকি কোঠার বা ঘরের উল্লেক এমন লক্ষ্যভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, মনম-একারণ শতকের আগেই এই খেলা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কাহু-পাখা বলিতেছেন—

কক্য শিহাতি খেলব নন্দন।

সদ্যক-বোহে' ক্রিডেল ভবন।

কীট হুয়া খােলি যে ঠাকুর।

উল্লিখি উর্দে' থাক খিলতু খিলতু।

পহিলে' তেজিয়া বড়িয়া দাখি।

পল্লবের' তেজিয়া পাকলি খােলি।

বড়িএ' ঠাকুর পহিবিধি।

অন্য কথিয়া ভবন দিত।

ভাই কালু, অদ্যে ভাল দান গ্রহণ'।

চলইগি কোঠা ভবিষ্যৎ'।

ভক্তদ্বয় গিফ্টিবু নবদল (হাথ) বেশি, দলভরমানে ভবন ভিত্তিলাই। দুই বই হইল, ঠাঁহুরক (হাস্যকৌ) বিদ্যা; উপকারী উপদেশে কালুর নিকটে ভিত্তিলাই। এখানে বড়িা ভুড়িা বহিরাগ (অর্থঃ, এখানেই হইল ভক্তের গাথ) ; ভক্তদ্বয় কলর (হাথী) ভুড়িা পাতককক খায়েল কহিলাই। বড়াক্তে বিদ্যা ঠাঁহুরক (হাস্যকৌ) এতিবিদ্য কহিলাই (ট্রেকালিলা) : অল কহিলা ভবন ভিত্তিলাই। কালু বলে, দান আদি ভালই বিই, তাইগি কোঠা ভবিষ্যৎ নই।

নিরকোটি ক্তরে এবং নারীতের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, ধর্ম, ভূটি বা সুউৎসেলা বাধ্যত্বী বোলদ্বয় দলপটিল আড়াইঘর প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অল্পবানে কিছু মাত্র বাধা নাই। সামাজিক জনতত্ত্বের অল্পসম্মানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-বঙ্গিণ এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরবর্ত্ত দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌশলসম্মানের একেবারে বৌলিক সহকীড়া।

সর্বানন্দের চীকাসর্বধ-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 'অত্' বা 'অত' অর্থাৎ বাজি বাবিয়া তখনকার যিনের লোকেরা খুঁয়া খেলিতেও অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বাজি বাবিয়া ভেড়া ও সুবগিও লাড়াই খেলিত ও খেলাইত।

সমতটেশ্বর শ্রীমার-ব্রাতের কৈলাস-লিপিতে বলা হইয়াছে, সমস্ত হুতী ও অশকীড়ায় নিমুক্ত থাকার কুলে শ্রীমারদের যে ছিল পৌনসমুদ্র এবং সুবর্ণন (পঞ্চভূষণ-সমস্ত-পীড়ন-ক্রোধোচিত্রনয় বসিতভহুবিভাগ-রম্যদর্শন)। রাজ-পরিবারে এবং অভিজাতবর্ণের পুরুষদের মধ্যে হুতী ও অশকীড়া সুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই।

নৃত্যশাস্ত্রবাস্ত ও অভিনয়

নৃত্যশাস্ত্রবাস্তের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর। বাবচরিত পবনদত্ত প্রভৃতি-কাব্যে, নানা লিপিতে, সহস্রিকর্ণাবৃত্তের প্রকীর্ণ স্লোকে, চর্যাপ্তিতে ও বোধোক্তাবের নানা আয়ুধ্য নানাস্থানে নৃত্যশাস্ত্রবাস্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, উচ্চ ও নিরকোটি উভয় তরেই এই দুই বিভাগ ও ব্যঙ্গনের সমাবর ছিল যথেষ্ট। বায়বাধ্য ও বেবদ্যাদেশের সকলকেই নৃত্যশাস্ত্রবাস্তশাস্ত্রী হইতে হইত। তাঁহারা যে নানা কলাদিপুণ্য ছিলেন, একবার ইদিত সেন-লিপিতে এবং পবনদত্তেও আছে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, সুওবর্নের কাটিকের হাশিবে যে নৃত্যশাস্ত্র হইত তাহা ভরতের নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী, এবং এই নৃত্যশাস্ত্রমুদ্র ভরত স্বয়ং ভরতায়মোদিত নৃত্যশাস্ত্রশাস্ত্রে স্থপণিত ছিলেন পাহাড়পুর ও মহানভীত পোড়ামাটির কলকগুলিতে এবং অসংখ্য খাতব ও প্রত্নবস্তুতে নানা ভাষিতে নৃত্যশাস্ত্র পুস্তক ও নারীর প্রতিকৃতি সুপ্রচুর। বৃহদ্রত ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পুণ্ডক বর্ণিত্যাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সম্বন্ধে নিরতর ক্তরে। এখনও বাঙ্গালীসম্মানের নিরতরে এক ধরনের গায়ক-গায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, গান গায়িা এবং নাচিরাই ঐহারা কীটিকানির্বাধ করেন ; ইহাবাই বোধ হয় উপযোক্ত পুণ্য দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চকোটির কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর ক্তি গ্রহণ করিতেন। ময়দেব-গৃহিণী গঙ্গাবতী প্রাক্ষিবাধ-কীটনে কুলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়পুর ও মহানভীত কলকগুলিতে, কোনো কোনো প্রত্নবস্তুতে নানা প্রকারের

বান্ধবদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে; যেমন, কাশর করতাল ঢাক বীণা বাঁশি নৃত্য প্রভৃতি। সাময়িকিতে যেহেতু, বহুব্রীতে বিশেষ এক ধরনের নৃত্য (নৃত্য) ব্যাপ্ত প্রচলিত ছিল; বাংলার অন্তর বোধ হয় অল্প প্রকারের নৃত্যের প্রচলন ছিল। সঙ্কল্পকর্ণনৃত্যের একটি স্নোকে আছে, 'তুসীবীণার উল্লেখ। কিন্তু সর্বাঙ্গের বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চণ্ডীমিত্তিতে— কঠ ও বহু সংস্কৃত উভয়েই, নানাপ্রকার বান্ধবদের এবং বোধ হয় স্ত্রীতান্ত্রিকেরও। নিরন্তরীণ নটনীদের কথা আগেই বলিয়াছি। চণ্ডীমিত্তিতে যেহেতু, ভোবীরা সাধারণত খুব নৃত্যশীলগায়িকা হইতেন—

এক সে পদ্ম প্রাপ্তী পাতুলী।

ওই চণ্ডীমাঝে চোখী বাপুলী।

একটি পদ্ম, ভোবী প্রাপ্তী পাতুলী; তাহাতে চণ্ডীমাঝে চোখী।

লাউ-এর খোলা আর বাঁশের তঁতি বা বঁতে তরী (তার) লাগাইয়া বীণাজাতীয় এক প্রকার বহু ইঁহাৎ প্রস্তুত করিতেন, আর পান পানিরা গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—

দুই লাউ সনি লগেলি তরী।

অনহা বাঁশী একি কিম্বত অবতুলী।

বাঁশী অলো সনি বেসব বীণ।

অন ভাতিলাসি বিলাসি কণা।...

নাচনি বাঁশি নামনি বেরী

নুতনাটক বিলাসি হৌ।

পদ লাউ-এ পদী গাঙ্গিল তরী, অনাহত বঁতে— পদ্ম এক করিয়া বিলাস অবতুলী। ওলো সনি, বেসব-বীণা বাঁশীতে; পেন, তরীলাসি কি লকল বাঁশীতে;... বান্ধবীরা নাচিতেছে, বেরী গাঙ্গিতেছে— এইভাবে নুতনাটক প্রস্তুত হয়।

নুতনাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন। নৃত্য এবং স্ত্রীতন্ত্রের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাংলার প্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের দ্বিতর দ্বিধাই বোধ হয় কোনো বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে নুতনের বীর-কাহিনীকে) রূপমান করা হইত।

অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে যে, নৃত্যশীলগায়িকা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ভোবী ও অন্যান্য তপাধ্বিত নীচজাতীয় রক্ষীদের সামাজিক নীতিবদ্ধন কিছুটা চকল ও শিথিল হইত, এবং সেই হেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চজাতির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। স্ত্রীরা ছাত্রা ভাতি ও প্রেমীসংস্কারমুক্ত সহঅধীন ও কাশালিকদের যোগের লক্ষ্মী হইতেও কোনো বাধা তাহাদের বা বোয়ীদের কাহারও হইত না।

কইদি হালো ভোবী ভোবেরী ভাতি বাণী।

*অনু হুগিৎসন মাঝে কাপালী।...

কেহো কেহো ভোবেরী বিলাসি বোলই।

বিলাসি মোঝ ভোবেরী কঠ ন ফেলই।

ভাতি গায় গু ভাতিগায়ী।

ভোবীত আঙ্গিলি বাঁশি দ্বিলাসী।

ওলো ভোবী, কিত্তি (নাগর) ভোবী ভাতি: ভোবী (এক) অনু হুগিৎসন, (আত) অনু কাপালী; কেহ কেহ ভোবেরী

কল বিদ্যা (ডায়ালেক্টিক্স), (কিছু শিক্ষক যাকে কল বইতে থাকে না। কাল, বাহ, তুমি কামরাসী, চোখের চেয়ে বেশি ফিলালী (আম) কেবল নাই।

সৌকারত দশমে এবং দ্যাবাজিক ও ধর্মগত উৎসবাহুর্জান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে মুদ্রাস্থিতের প্রধান সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চর্চাপ্রতিষ্ঠা একটি শিল্পে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অর্থ হুন্সর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাগাবয়োগ উল্লেখ আছে। কালপাস বলিতেছেন,

ভববিবরণে পদ্য দায়না।
দশপদ্য বেশি করওকদালা।
কল কল হুন্সি সাহ উল্লিখিত।
কাল চোখী বিবাহে চলিয়া।
চোখী বিবাহীয়া অহাটিত দায়।
ভটুককে কিল আদিত্ত দায়।

ভব ও-বিবাহ হইল পটহ দায়ন; দশপদ্য দুই করওক দায়না। ভব ও হুন্সি পদ উল্লিখিত করিয়া কাল, চলিল চোখীকে বিবাহ করিতে। চোখীকে বিবাহ করিয়া কল বাইলাব, কিল যৌতুকে (পাত) করিলাব অহুদ্যবাহ (ধর্মগত, নীচ) হাতের চোখীকে বিবাহ করিয়া ভাত কল বেশ খাটে, কিল কল যৌতুক পাতলা বিবাহে, তাহাতেই কতি বেশ সব পূর্ণ হইল বিবাহে, এই ভাও।

বিবাহযৌতুক

ভবনকার দিনে বাংলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরণক যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের লোভে নীচতুল চাইতে কলপ্রাংগেও হুন্স অগতি ছিল না, অস্ত্রান্ত সংবাদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ ইচ্ছিতটিও এই শিল্পে বিস্তারিত।

বাস্তবাহুদ—সৌবাহ

সাধারণ লোকেরা হুন্সপথে দশপদ্য এবং দশপথে ভেলা বা ভিলা এবং নৌকাযোগেই বাতায়াত করিত। ভেলা, ভিলা-ভিলা-ভেলা, প্রত্যেকটি শব্দই অস্ত্রিক্‌ চাখার দান; এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নৌকার ব্যবহার, নৌকাম্ব, নৌঘাট, নৌবাগিচা, নৌবওক প্রভৃতির কথা ব্যাবসা-বাগিচা প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালীস্বীকৃতির ঘনিষ্ঠ আন্তিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্চাপ্রতিষ্ঠাতে। রূপকহলে নৌকা, নৌকার দাল, গুণ, কেতু দাল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা চাক, খুঁটি, কাঁচি, পেঁউতি, পাস প্রভৃতি এমন দশমভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই বানটির সঙ্গে বাঙালীর ভবনের একটি গভীর যোগ, ছিল। নৌকার খোদ-গায়াপাদের ইচ্ছিতও আছে। পানের দালত আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী) বা বোড়িতে। খোদ-গায়াপাদের কাম অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত নারীরাও করিতেন। চর্চাপ্রতিষ্ঠা একটি শিল্পে যেভাবেই পাটনীর কাজটি করিতেছেন জনৈক। চোখী—

বরা ওউনা দায়েরে অহি দায়।
কাল যুঁজী দায়নী পোষা দায়না পাত কদায়।

বাহরু হোখী বাহরো চোখী বাটত ভটল উম্মার।
সহকক পশিশরু হাইব পুর জিন উম্মার।
পাক কেতু হাল গড়ক বাহর পিঠত কচ্চী বাখী।
নন্দা বোশে' শিকর পাশী ন পইশই দ্যাকী।...
কচ্চী ন সেই খাজী ন সেই প্রকরু পার কচ্চই।
জো মর চড়িল বাহরো ন হাই কুলে কুলে মুলই।

নন্দা আর বহরুর সাথে বহিরেই বোকা, বাতক কঙ্গ হোখী তাহাতে অনেক চুবিয়া চুবিয়া লালার পার করিতেছে।
সহর গো হোখী, বাহিলা চম, পচখই ফেরি হইল বাহিরেই; সহকক পাশিশরু হাইব জিনপুহ। পিঠটি বাট পড়িতকহে পচব, পিঠে
ফারি ধাঁধ, সেউজিত হল সেত, হল যেন সবিত্তে অনেক না করিতে পারে। কচ্চিও লর না, কচ্চাব করে পারে;
বাহরো মর চড়িল, বোকা বাওরু জামিল না, তাহারো শুধু কুলে কুলে খুসিয়া কিহিল।

সহবপাদের একটি গীতে আছে,

কাম বাহড়ি বাখি ন কেরু মাপ।
সহকক-বন্দা বর পতিমাম।
গীম শির করি বরময়ে হাই।
আব উপায়ে পার ন হাই।
বোবাহী বোকা টামল জপে।
যেসি যেন সহরে মাট ন আশে'।
বাটত কাম বাট বি হলম।
জব উয়েলো' লর বি বোলিমা।
কুল গাই বর মোহে উম্মাম।
লর কচ্চই বমশে দ্যাম।

কাম (হেই চহে) বোকা, বাটি বন হেইল তাহার) গীত; সহকক বচনে হাল বর। ভিত্ত শির করিয়া বোকা বর; অত
উপায়ে পারে বাওরু বার না। বোবাহী বোকা টামে জপে; সহরে যিরা যিসিত হও, অত (পথে) হাইও লা। পচব (আহে)
জব, বলবান বহর; জব উয়েলো (ভরকো) সবই টামল। কুল বহিরা বহরপ্রাতে উম্মাই। বার; লর হল, বরমশে যিরা অনেক
করে।

অন্য কথলপার বলিতেছেন—

খুটী উপাড়ী খেলিলা কাখি।
বাহরু কামলি সহকক গুখি।
মামর চড়বিলে চটবিল চাহম।
কেতু আমলি হৈকি বাহরক পারম।

খুটী (পোকা) উপাড়িয়া কাখি খুসিয়া হাত; যে কামলি (দুর্-বালার) বাখি অল্পভি বিবদবুরবের আতক অনেক কামল
বা কামলট। সহকককে কিজাসা করিয়া বোকা বাহিলা চম। লর চড়িলা (মাকদমীকে আমির) চাখিবিক চাখিলা বেশ; গীত না
বাখিলে কে বাহিরে পারে ?

নব-নবী-খাল-বিলের বাংলাদেশে বোকা ও নবীকে কেজ কহিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ-রূপক
গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

তখনই যখন নদীর বেগে বারী।

ছলানে তিখিল মাথে ব'বাহী।

তবনৌ নদীর, নদীর বেগে বহিলা চলে; দুই ভীমে কান, মাথে ঠাই নাই।

এ-ছবি তো একাত্তই বাংলায় নন্দনদীতীর— দুই ভীম পলিমাটির কানায় তরা; আর নদীর
পড়ায় পড়ায় বেগ, লেগে তো পশা-পশা-মেঘনা-লৌহিত্যের। সর্বশাসনের একটি গীতে আছে,

যাহ বহিন তো বাস-বিখলা।

সহর কই বাপা উলুবাট কইনা।

(পেগে) বায়ে হকিনে অনেক বাস-বিখল; সহর বলেন, সোনা পথ বহিলা চল (বর্ধাং, বাস-বিখলের সঙ্গে হুফিয়া পড়িও
না, সোনা চলিল যাক)।

এই ছবিও তো একাত্তই বাংলাবেশের। এত বাস-বিখলই বা আর কোথায়! শান্তিপালের
একটি গীতে আছে,

কুলে কুলে বা হোইয়ে দুটা উলুবাট লগার।

বাস তিন একবার ৭ কুলে রাজপথ তক্তার।

মাঝা বোহঁ সনুয়ারে আর ৭ বুজিলা বাহা।

আগে নাথ ৭ ভেল্ল বীসই ভক্তি ৭ পুন্ডলি বাহা।

স্বপাশান্তর টহ ৭ বীসই ভক্তি ৭ বাসলি জারে।

এম পট বহাশিদি দিকই উলুবাট আভারে।

বাম্বাশিগে গো বাটা ভাতী শাকি ফুলবেই পুতেশিট।

বাট ৭ ভবা বড়ভক্তি ৭ হোই আদি বুজিল বাট আইট।

হে মূঢ়, কুলে কুলে খুঁজিা কিহিও না; লগারের (বাগধানে) হরিমায়ে সহর পথ। সন্মুখে পড়িলা আছে যে সন্মুখ,
জাহার আর যদি না ফুল যায়, বই যদি না পাওয়া যায়, সন্মুখে যদি কোথো বোঁকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অজিত পথিক
বাহারা ওহাবের দিকট হইতে পথের কিনা জানিয়া লও। পুত্র আভারে যদি পথের টিকানা না বেলে, ভুলু জাহির পথে আগাইল
যাওয়া উচিত নয়। সোনা সহর পথ বহিলা পেলেই দিলিবে মইমহাশিদি। খেলা করিতে করিতে বাস ও বকিন পথ ছাড়িলা
(মোকপথে) চলিতে হইবে। এই সহরপথে বাট-কোণ কিছু নাই, বাধাবির কিছু নাই; কোণ খুঁজিা এই পথে চলি যায়।

গোধান

‘স্বপনপথে গ্রাম হইতে নূরে গ্রামান্তরে বা নগরে বাইবার সোকারত ঘান ছিল গো-রথ বা গোকর
পাড়ি। মহিষের গাড়ির উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈঋতচরিতের শাস্ত্র যদি গ্রামাণিক হয় তাহা
হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙ্গালী প্রাচীন কালে মহিষের ঘনি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।

হস্তী ও অশ্বধান

গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণিতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও পশ্চিমাত্তের রাজাদের চতুর্দশবার্ষিক যব ছিল।
অশ্ববাহিত ঘান উক্তকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সম্ভব করিবার কারণ নাই। গ্রীক ঐতি-
হাসিকেরা বলিতেছেন, দুই পশ্চিমাত্তের গৈরবসের মধ্যে প্রধান বসই ছিল হস্তীবল। অশ্বাঘা লিপিতেও
হস্তী-সৈন্তের উল্লেখ অশ্রুত। অশ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতে হস্তী অস্ত্রতম প্রধান বাহন বহিরাও
পূণ্য হইত। এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাংলাবেশে ও কাশ্মীরে, হাতী বরা ও হাতীর চিকিৎসা

ইত্যাদি লব্ধে একটা বিশেষ শাস্ত্ৰই পড়িয়া উঠিয়াছিল। হুৱপ্ৰশাস শাস্ত্ৰী মহাশয় তেনে বলেন, হতী-কুৰূৰ্বেৰ বাংলাৰ অন্ততম প্ৰধান পৌৰৱ। ৰাম-ৰামৰূ, সামন্ত-মহাসামন্তৰা, বড় বড় কৃষাধিকাৰীক, হাতীতে চড়িয়াও হাতায়াত কৰিতেন, লম্বেই নাই। চৰ্ণাশ্ৰিত্তি ও বোহাকোনে হাতীৰ কলক আশ্ৰয় অনেকগুলি শীতে স্থান পাইয়াছে এবং কলকগুলি এখন, যেন হয়, এই প্ৰাণীটিৰ সৰু বাঙালীৰ প্ৰাণেৰ গভীৰ পৰিচয় ছিল। খেপা পাতিয়া আৱিকাব বিনে বেমন কৰিয়া হাতী বহা হয় তখনও তেমন কৰিয়াই হাতী এবং হাতীশিত্ত (কবত) বহা হইত। বস্ত্ৰ হাতী শুণ্ণ কৰিয়া বাধিয়া রাখা হইত। চৰ্ণাশ্ৰিত্তিতে কাৰু পাশেৰ একটা শীত আছে,

এং কাৰ সূত বাখোড় মোড়িট।

বিবিহ বিহাণক ধামল মোড়িট।

কাৰু বিলম্ব আশৰ বাতা।

লহৰ মিলিগন পাইনি বিহিহা।

কিন্তু বস্ত্ৰ হাতী কোনো বাধাবন্ধনই বানিত না, সমস্ত শিকল ছুটি তাত্ৰিহা ছিঁড়িয়া পহুৱনে লিহা প্ৰবেশ কৰিত। পাগলা হাতীৰ বৰ্ণনা মহীধৰশাস্ত্ৰেৰ একটা গানেও আছে,

হাতেল গীম ধএখা ধাই।

বিহুৱৰ লম্বৰ দুৰ্গে পোদই।

পাশ পূৰ বেণি তোড়িহা শিকল মোড়িহা বজাৰীল।

লম্ব টাকলি লাগিৰ চিত্ত শইতি বিহাশ।

আখাৰ হত চিত্তলম্বৰ বাহিত হইতেহে; বিহুৱৰ লম্বৰ লহৰ ছিহু খোলাইহা ঘাইতেহে। পাশ ও পূৰা উঠয়েই শিকল ছিঁড়িয়া এবং লম্বৰ বাতা হাতীয়া কব-শিকল বিহা পোঁহিয়া সে একোৱে লাগ হইয়াহে।

উত্তৰ ও পূৰ্ব-বাংলাৰ পাৰ্বত্য নদীৰ তীৰে হাতীয়া খুৰিয়া বেড়াইত বখেচ্ছভাবে। লহৰপাশ বলিতেছেন,

হুট চিত্তলম্বৰ কল এং বিলম্ব ১ পূহ।

লহৰ গিহা পাইল পিহাট তিহা তত্ৰ বসট সইহ।

চিত্ত লহৰকল হুট কহ; এ-বিহৰ আৰ কোবো বিলম্ব জিজ্ঞাসা কৰিও না। লহৰবিহৰ বহীলম সে পান কলক, তাহাৰ ভটে বইয়াহ সে বাস কলক।

হাতী ধৰিবার আগে সাৱিগান গাহিয়া হাতীৰ মনকে বশ কৰিতে হইত। বীণাশাস্ত্ৰেৰ একটা গানে আছে,

আদি কালি বেণি লাগি মুখিয়া।

লম্বলম্ব লম্বল সাধি ভণি আ।

গোকৰ পাড়িৰ চেহাৰা এখনও বেঙ্গল প্ৰাচীনকালেও তাহাই ছিল; বাংলা ও ভাৰতবৰ্ষেৰ প্ৰাচীন প্ৰস্তৰ ও কংকলকই তাহাৰ প্ৰমাণ। বহুযাত্ৰাৰও গোকৰ পাড়ি ব্যবহাৰ কৰা হইত, চৰ্ণাশ্ৰিত্তিৰ একটা শীতে এইকণ ইঙ্গিত আছে। পাহাড়পূৰেৰ একটা কংকলকে হুগলিত অৰেৰ একটা চিত্ৰ আছে; এই ধৰনেৰ সজ্জিত অৰে চড়িয়াই সংপতিসম্পাৰ লোকৰা হাতায়াত কৰিতেন।

পালকিৰ ব্যবহাৰও ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেশবদেৱেৰ ইমিৰ্পূৰ-লিপিহে দেখিতেছি, একই প্ৰজ্ঞাৰতাবে হতীৰত্ৰনিৰ্মিত বাহৰওহুত পালকিৰ উল্লেখ। বজালমেৰ নাগি ওহাৰ শৰদেৰ তাললক্ষ্মীদিগকে বহন কৰিয়া লইহা আশিয়াছিলেন, এই ধৰনেৰ পালকি চড়াইহা।

অন্নবাড়ি

রুমচরিত ও পবনদূতে বাতাবতী ও বিষয়পুত্রের বর্ণনা এবং বাণপদ রামপাল মহাশয়
সেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের কল্যাণবশেষ হইতে মনে হয় পশ্চিম নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরি ছত্র গৃহ
হর্ষে বাস করিতেন; হাঙ্গলপ্রাদেও তৈরি হইত ইটকাঠেই। কিন্তু এইসব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি
কিছু ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রামে ইটকাঠের বাড়ি বড় একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না;
কোনো গ্রাম-বর্ণনাতোই সেজন্য কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। দ্বিতীয় নিয়কোটের লোকেরা ত বটেই,
এমনকি সপার মহন্ত-কুটুম-গৃহস্থগণও সাধারণত মাটি বড় বাস কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বাস
করিতেন; সুখলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, ঢাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি সুনিষা তৈরি হইত বেড়া,
আর খুঁটি হইতে বাঁশের বা কাঠের। চর্চাশীতিতে বাঁশের চাঁচারি বিহা বেড়া বাঁধিবার কথা আছে
(চাহিনাশে ছাইলা যে বিহা চকালী)। মাটির বেওয়ালও ছিল; রাতাকলে শু উত্তর-বঙ্গে মাটির বেওয়াল;
পূর্বাঞ্চলে চাঁচারি বেড়া। প্রস্তর ও সুখলকের চিত্র এবং পাতুলিশি-চিত্র হইতে মনে হয়, আক্ষিকার
মতন শুধনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধলুকাকৃতি বা ছই তিন অথবা শিরানিতাকৃতির ঢাল বা
ছাইনি তৈরি হইত। একান্ত পটীষ গৃহ ও সবাঙ্গ-অনিচ্ছা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সত্বিকর্ণানুত-
প্রাচীর একটি মোক এই ধরনের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে; 'প্রচুর শরদি' প্রাচী এবং যুটিবহুল
বাংলাদেশে বর্ষার দ্বিতীয় গৃহঘরের জীর্ণগৃহের দুর্গশার এমন বস্তুনিষ্ঠর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। কবি
বাব ছবি আঁকিয়াছেন,

সমং কাঠে পল্লভূম্যুপস্থানং সক্ষমঃ।

গল্পস্মারিবহুকাবীর্ষীঃ ধীর্গঃ সূহঃ যমঃ।

কাঠের খুঁটি বাড়িরে, মাটি বেওয়াল বলিয়া পড়িতেছে। ঢালের বড় উকিলা বাইরে, কেঁচোর সম্মুখে বিস্তৃত ঘাট
ঘাট আবার জীর্ণ গৃহ আকর্ষ।

নব-নবী-বাংল-বিধানের বাংলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া বাইতে আক্ষিকার মত শুধনও
সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই; এবং এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ও ছিল
প্রাচীন কাল হইতেই। চর্চাশীতির একটি শ্রুতি বলা হইয়াছে, পায়গামী লোক যাহাতে নির্ভরে পায়গাম
করিতে পারে সেজন্য চাটলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিড়িয়া
সাঁকোর পাট মোড়া সেওরা হইত এবং টাঁদিয়াহা ইটাকে লজ্জা করা হইত,

বাবলর্ষ চাটল সাকর গয়।

পায়গামী মোখ বিতর ভয়।

কাটিল মোহতর পাট মোড়িল।

অন্য বিড় টাটা বিগায়ে কোরিখ।

ভৈল্লসপত্র

সূত্রের আদ্যবাক্যের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্চাশীতি রামচরিত পবনদূত প্রভৃতি
কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর ও সুখলকে দেখিতেছি। সদুচ্চ, বিতবান্ লোকেরা সোনা

ও রূপায় তৈরি খালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাণী সাধারণ বৃহৎস্বেয়া কাশার এবং পুরিত্র লোকেরা সাধারণতঃ ঘাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার নানা-প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও বহুবার এইরূপে বস্তুপত্রের ভাঙা টুকুড়া প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর ও 'মরনারহী'র বৃহৎস্বেয়া এবং নানা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঘাটির খেলনা, কলসী, বাট, নানা আকৃতির কলসী, বাট, পান ও ভোজনপাত্র, ঘাটির জালা, মোটা, মোহাট, বীণাখাট, বড়া, মলচৌকী, পুস্তকাখাট প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সব তৈজসপত্রের বহল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা হস্ত-বস্তুসমূহের সন্ধান হুক এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচন্দ্রিতে উল্লিখিত আছে। এ-সব তৈজসপত্র সন্ধান লোকের আদত ছিল, সন্দেহ নাই। তব্বাক-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষ্যসেনের দামোদরসেনা সেনা ও রূপায় ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের ইদিশপুং লিপিতে দোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

কান্দীর গোড়ার বিদ্যার্থী

কান্দীর কবি কেবলমাত্র তাঁহার মনোমগ্ন-গ্রন্থ কান্দীর-প্রবাসী গোড়ার বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন একটু সবিচারে তাহার উল্লেখ করিতেছি। মন-একমুখ শতকে প্রচুর গোড়ার বিদ্যার্থী কান্দীর বাইতেন বিদ্যালয়ের ভিতর। কেবলমাত্র বলিতেছেন, ইহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রুঢ় এবং অমার্জিত। ইহারা ছিলেন অভ্যস্ত ছুঁংবাণী; ইহাদের বেহ কীং, ককালবাক্য সার; এবং একটু দাড়া লাগিলেই তাড়িয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কা সকলেই ইহাদের নিকট হইতে ঘুরে ঘুরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাদ-বাসনের পরই কান্দীরের জল-হাওয়ার ইহারা বেশ বেশ ও শক্তিশাল্য হইয়া উঠিতেন। 'ওকা' ও 'ধতি' উভয়ই বহিঃ ছিল ইহাদের পক্ষে অভ্যস্ত কঠিন কৰ্ম; তবু, পাতলপত্র, তর্ক, বীমা-সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই (বোধ হয় কান্দীর মানবও বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ট শুদ্ধ ও মার্জিত ছিল না; ইহাই সম্ভবতঃ কেবলমাত্র বক্তৃতির কারণ)। কেবলমাত্র আরও বলিতেছেন, গোড়ার বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে গুণ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের বর্ণিত মাথাটি এতটুকু দেখিলে মোহাম! হাঁটবার সময় তাঁহার মনোমগ্নী ছুঁংবাণী শব্দ শব্দ, শব্দ শব্দ; মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার হৃদয় হৃদয়ন্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার কীং কঠিনে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে স্বর্ণ আশা করিবার ভ্রম কিছুকাল এবং অভ্যস্ত পরোক্ষ লোকেরা তাঁহার ভাবাবেশ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাজে। ককালবাক্য ও বেহ বক্তৃতা-শ্রুতি তাঁহাকে দেখা যেন বানরটি। তাঁহার-সুই কর্ণভিকার তিন-তিনটি করিয়া স্বর্ণ-কর্ণকুণ্ডল, হাতে ধতি; সেখান মনে হয় যেন সাক্ষ্য কুণ্ডল। বহুবার অজ্ঞাতেই তিনি ঘোরে কিন্তু হইয়া উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই কিন্তু হইয়া হুঁসিয়াপাতে নিজের সহ-অধ্যাপিকের শেট চিহ্নিত দিতেও তিনি ঘিণাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় যেন ঠকুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্তাক্য করেন।

বননকুবণ বিলাসব্যসন

দ্বীপেণে বাঙালী বিভাগীর বননকুবণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাভাষ্যের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থের এবং গ্রন্থবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইসব সাফ্য হইতে বননকুবণের মোটামুটি একটা ছবি পাড় করা যেনো কঠিন নয়।

পরিচালনভঙ্গি

পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতে সেলাই-করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিবকালে ছিল না ; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরাণীতি। সেলাই-করা জামা বা পাত্ৰাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানি করা হইয়াছিল ; কিন্তু অখোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজরাতি মারাঠীরা বৃত্তি পরিভ্যাগ করিয়া চিলা বা চুড়িয়ার পা'জামা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের অখোবাস যেমন বৃত্তি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি। বৃত্তি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিবেশ, তবে একটু সংগতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভিন্ন বেগ ছিল উত্তরবাসস্থলে আর এক বৎ সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার ; থায়া ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীষ, নারীদের ক্ষেত্রে গুড়না। গুড়নাই প্রয়োজনমত অবগুণ্ঠনের কাৰ্য্য করিত। বহিঃ ও সাধারণ ভদ্র পুংস্ব নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাকল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমরা যেমন গায়ের কজি পর্বত হুলাইয়া কৌচা বিয়া কাপড় পরি, প্রাচীন কালের বাঙালী তাহা করিতেন না। তখনকার বৃত্তি মৈথো ও গ্রন্থে অনেক ছোট ছিল ; হাঁটুর নীচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্বতই ছিল কাপড়ের গ্রন্থ। বৃত্তির মাঝখানটা কোমরে झড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্বিকে কজ বা কাছা। ট্রিক নাতিব নীচেই দুই-তিন প্যাচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টিকে কোমরে ঝাটকানো ; কটিবন্ধের পাঁচটি ট্রিক নাতিব নীচেই দুল্যবান। কেহ কেহ বৃত্তির একটি প্রান্ত পেছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অত্র প্রান্তটি ঝাড় করিয়া সম্মুখ দিকে কৌচার মত হুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরনও প্রায় একই বস্তু, তবে শাড়ি বৃত্তির মত এত ঝাটো নয়, গায়ের কজি পর্বত হুলানো, এবং বনন-প্রান্ত পশ্চাদ্বিকে টানিয়া ফল্গে হুলায়িতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালী নারীরা বেতাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাচ দিয়া অখোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুসৃত, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া সেই আবৃত্ত করিতেন না ; তাঁদের উত্তরবাসস্থান অনাবৃত্ত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, 'বোধ হয় সংগতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্ত্রের এবং নব্বয়ে—হুতো কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আশ্রয় ও সংস্কৃতির প্রেরণায়— কেহ কেহ উত্তরী বা গুড়নার সাহায্যে উত্তরবাসের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা অনুবৃণপকে বন্ধ করিতেন ঢোলি বা অনুপট্টের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই করা 'বতিপু' জাতীয় এক প্রকার জামায় সাহায্যে অনুনিয় ও বাহ-উল'পর্বত বেহাং ঢাকিয়া রাখিতেন। সম্ভব নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি স্ত্রেরই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সম্বন্ধে উত্তরবাস ও তাহার শাড়ি এবং

পূর্ববৈব মুক্তি প্রকৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে—সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সাক্ষ্যে এ-তথ্য স্থিষ্ট—
নানা প্রকার লতাগাছা, ফুল এবং জ্যামিতির নকশাখাতা মুদ্রিত হইত। এই ধরনের নকশা-মুদ্রিত বস্তুর
সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয় ঐকটীর সুগম-মষ্টম শতক হইতে, এবং শিল্প সৌন্দর্য্য ও উন্নয়ন ছিল
গোড়াব নিকৈ এই বস্ত-ব্যবসায়ের প্রথম কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের মস্ত্রও ক্রমশ তাহা ছুটাইয়া পড়ে।
এই নকশা-মুদ্রিত বস্তুর ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরান-মধ্য-এশিয়ার ঘনিষ্ঠ নিহ ও অলংকরণগত সম্বন্ধের
ইতিহাস লুকাইয়া আছে। কিন্তু সে-কথা এক্ষেত্রে অবাস্তব। বাহাই হটক, নারীদেব দেহের উত্তরাধা অসাব্যত
স্বাধার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বরন্ত, সমগ্র প্রাচীন আবি মণ্ট্রেলী-
পলিনেশীয়-বেলানেশীয় নরপাঞ্জির মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিহম। বলিচৌপ এবং প্রগাও মহাসাগরীর
অস্ত্রায় কয়েকটি বীণে সেই অস্ত্রাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

সভাসমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল।
সীমুতবাহন ধর্ম্মভাগ-গ্রন্থে সভাসমিতির ক্ষত পৃথক পোষাকের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিভেদ
পায়ের ককি পর্বন্ত বিলম্বিত ঔটনীট পা'জামা; দেহের উত্তরাধা কাবের উপর বিরা মূল্যইয়া দিতে
একটি বীষ ওড়না; নৃত্যের গভিতে ওড়নার প্রান্ত উচ্চিৎ লীলাহিত ভিহিতে। সস্ত্রাঙ্গী-তপবীয়া এবং
একান্ত হস্তিলম্বাধ শ্রমিকেরা পরিভেদ নকোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিভেদ উক পর্বন্ত লম্বিত
খাটো ঔট পা'জামা, সাধারণ মল্লবরাও বোধ হয় কখনো কখনো এই ধরনের পোষাক পরিভেদ;
অন্তত পাহাড়পুর্বের ফলকচিত্রের সাক্ষ্য তাহাই। শিল্পের পরিধেয় ছিল হয় ইহা পর্বন্ত লম্বিত মুদ্রি
নাহর ঔট পা'জামা, আর কটিভলে মল্লানো খটি; তাহাদের কঠে মূল্যমান এক বা একাধিক পাটা বা
পথক-লম্বিত পুত্রহার।

কেন্দ্রবিভাগ

আজিকার মত প্রাচীন কালেও বাঙ্গালীর মস্ত্রকাবল কিছু ছিল না। নানা তৌশলে সুবিস্ত্র
কেন্দ্রই ছিল তাহাদের শিরোভূষণ। পূর্ববৈবাও লম্বা বাব্‌টীর মতন চুল বাধিতেন; কৃকিত খোকার
খোকার তাহা কাবের উপর মূলিত; কাহারও কাহারও আবার উপরে একটি পাগড়ানো মূলি; কপালের
উপর মূল্যমান কৃকিত কেন্দ্রায় বস্ত্রওধ্যবা কিতার মতন কবিয়া বাঁধা। নারীদেরও লম্বমান কেন্দ্রগুচ্ছ
যাভের উপর খোপা কবিয়া বাঁধা; কাহারও কাহারও বা মাধার পশ্চাৎকৈ এলানো। সস্ত্রাঙ্গী-তপবীরের
লম্বা মট। দুই বাপে মাধার উপরে মল্লানো। শিল্পের চুল ভিনটি 'কাবলক'গুচ্ছ মাধার উপরে বাঁধা।

পাদুকা

মহানামতি ও পাহাড়পুর্বের কৃকলক-সাক্ষ্যে যনে হয়, যোধ্যাও পাদুকা ব্যবহার করিতেন;
প্রবরী স্বাধবানেবাও করিতেন; এবং সে-পাদুকা চামড়ার দ্বারা তৈরী হইত এমনভাবে বাহাতে পায়ের
ককি পর্বন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাবিতম্ব সেই মূল্য ছিল কিতাবিহীন। সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো
চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, বধিও কর্ম্মজ্ঞান-পশ্চতি ও শিল্পমিত-গ্রন্থে পূর্ববৈবের পক্ষে কাঠ এবং
চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেই ইকিত বর্তমান। সপতিসম্পর লোকবৈব মধ্যেও কাঠ-পাদুকার চলন পুহ

বেশি দ্বিধ। বাণেশ লাট্রি এক ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। সু ও প্রান্তর কলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে দ্বিধা ব্যবহারের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট; লাট্রিও সাক্ষ্য স্বল্প হইলেও বিদ্যমান। প্রহরী, হারবানু, ময়বীবেয়া সকলেই স্বীয় বাণেশ লাট্রি ব্যবহার করিতেন।

প্রসাধন

সবদা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ্ এবং সীমন্তে সিঁড়রের বেণা; পায়ে পরিতেন লাকারল, অলক্তক, ট্রোটে সিঁড়র; দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের শুঁড়া ও চন্দনশব্দ, নুগনাকি, জাফরান প্রভৃতি। বাৎসরিক বলিতেছেন, দৌড়ীর পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বেধ হয় বুঝতীরে মনোরঞ্জনের মন্ত্র। নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কি না, এ-বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে না। তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদর-বেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে। প্রসাধনক্রিয়ার কর্তৃক ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলি-লিপিতে, এবং কং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নাগরনগালের ভাগলপুর-লিপিতে। ট্রোটে লাকারল (অলক্তক) এবং খোঁপায় ফুল শুঁঝিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাপ-প্রসাধনের অঙ্গ, এ-কথা সমসাময়িক বাঙালী কবি সাক্ষ্যদ্বারা বলিয়াছেন। বিধবা হইবার সন্ধ্যা সন্ধ্যা সীমন্তের সিঁড়র বাইত সুচিয়া, এ-কথাও ইঙ্গিত পাইতেছি বেধপালের নালন্দা-লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে বঙ্গালসেনের অতুতসাপথ-প্রহে, গোবর্দনচাৰ্যের নিয়োক্ত রোকে—

যখনকাজোবুতা: চিত্র কলাপত মুকুমানত।

সিঁড়রিত সীমন্তসেনে চলয়: বিবীবেব।

নারীরা গলায় ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথায় খোঁপায় ফুল শুঁজিতেন, এ-সাক্ষ্য দিতেছে নাগরনগালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইবিলপুর-লিপি। নাগরনগালের ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বদন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লম্বায় আনতনয়না নারী কথঞ্চিৎ লম্বা নিবারণ করিতেছেন তাঁহার গলায় ফুলের মালাঘারা বন্ধ চাকিয়া। বলা বাহুল্য, এ-চিত্র নাগরনগালের উক্তকোটি দ্বারের। বিশ্বতপসেনের সাহিত্যপরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে যেন হয়, এই সমালম্বনের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা, প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা নীষিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত শোভিত হইয়া আনন্দ ও উজ্জ্বলতার প্রতিভা হইয়া বিরাজ করিতেন। বন্ধুদ্বন্দ্বের কর্তৃক ও নুগনাকি হস্তাঙ্গ সন্ধ্যায় পাওয়া যায় বিভূষণসেনের সেওগাড়া-প্রশংসিতে। রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহোদায় এবং রাজকীয় মধ্যমাসপাথ নাগর-পরিবারের নারীরা বেশকিছু প্রসাধন অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরায়ণের আদর্শই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সন্ধ্যাক্ত বিবরণ হইতে তো তাহাই যেন হয়। রাজবহিবাঁহা তো তারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগরনগারে রাজপরিবারের আদর্শটাই সাধারণত সঞ্চারিত হয়। নগরবাদিনী বহুবিসাদিনীদের বেশকিছুর একটি দৃশ্যও ছবি পাওয়া যায় সত্বিকর্ণাচরিত্তর অজাতন্যায় জৈনক কবির এই প্রোক্তিতে—

বাগ্য হৃদয় বহুবি কুন্দোঃ তাকরী চান্দন মীৎ

মাল্যপর্কঃ প্রবতি মলৈপর্কভৈলোঃ শিবওঃ ।

অর্পেকেনে নবশিকলানির্মলঃ তালপত্রঃ

বেগঃ কোথঃ ন হুয়তি মনো বহুবাগ্যমবান্ধ ।

যেহে হৃদয়মন, কুন্দযন্তে হৃদয় অস্তর (ভাগ্য) ; পঙ্কটভলসিক মল কেন্থাম বাগ্য উপরে শিবও বা চুড়ার মত করিঃ
বাগ্য ভাষাতে আখ্যায় কুলের মালা লড়ায়ে ; কানে নবশিকলার মত নির্বল তালপত্রের কর্ণভরণ — বহুবাগ্যমবান্ধের এই
বেগ কাহার ঐ মন হাল করে !

চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণকূষণের কথা শবনদূত-সচরিতা বোদীও বলিয়াছেন ;
'হৃদয় হৃদয়ে' মৃতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণভরণ হইবার দাবি
করিয়া থাকে—

[হৃদয় হৃদয়ে] স্রোতঃস্রবণ-পদীঃ কুনিবেদ্যমানবাঃ

তালিপত্রঃ নবশিকলাকোমলঃ হুয়তি ।

স্রোতঃস্রবণ তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীনপদবাণীনের প্রস্তাবনের
কর্ণা দিতে গিয়া শুধু গৌড়-রবীন্দ্র বেল-প্রস্তাবনের বর্ণনাই করিয়াছেন ; বোধ হয় ইহাট্ট ছিল মানদ গ ।

মাহাত্মিকম্ব হুতাপিত হুতাহারঃ

শীঘ্রকুণ্ডলিচন্দ্র হুটমাহুতঃ

দুর্বারকাও হুতিম্বকম্বকোমলঃ

মৌড়াকম্বাচ্চ চিত্রমে চকান্ত বেগঃ ।

মহা আর্দ্রকম্ব, দলার হুতার হার, শীঘ্র পর্ক আনত শিত্রাবল, অদ্বৈত হারহুল, অদ্বৈত-মহাধন, অদ্বৈত
'দুর্বারকাও হুতি', অর্থাৎ দুর্বারকের মত হার — ইহাই হুতিয়ের মৌড়াকম্বের বেল ।

অগ্নি ও পল্লী বাসিনী

একদিকে নগরবাসিনীদের চিত্র, অন্যদিকে ময়ল পড়াবস্ত্রের পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে ।
পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেগকূষ চালচালন পছন্দ করিত না । কবি
গোবর্ধনচাঁদও বলিতেছেন,

কল্যাণে নিমেষেই চরনৌ পরিহর সখি বিলিন্দাশয়্যাতার ।

ইহ চাকিলীতি পটীপতিঃ কটাক্ষেনপি গুহরতি ।

সখি, লোভা পা কেমিল চল, মামরাচার সব হাড় । একই কটাক্ষপাত করিলেও এখানে পটীপতি (স্বাধপতি) চাকিলী বলিয়া
বুঝে নেবে ।

পল্লী-কুন্দবীনের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র—

ভালে কলনকিন্দুকিন্দুরিগণশী মুখামাহুতো

মৌড়াকীম্ব দলটুকেনিদকলোক্তনত কর্ণভিবিঃ

বিলিঙিলপদব্যাভিব্যবসিঙ কটাক্ষমিঃ

পাটাদি কল্লরভাষাশবনকূর্ণতি বেলঃপ্রঃ ।

কপালে কালসের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণশী পাখা পড়কালসের মামা, কানে কচি মৌড়াকুলের কর্ণভরণ, বিলিঙ-কল
কবরীতে ভিলপদে— অবাধ (অর্থাৎ পল্লীবাসী) বহুবার এই বেল কটাক্ষই পবিকরের গতি মদ্য করিয়া আসে ।

পাখাঘন পল্লী ও নগরবাসী পবিত্র পুঙ্খ ঘেরেবা পুঙ্খকর্মাদি ভেদে। কবিতেনই, ঘাটে-ঘাটেও গুহাঘেরে
খাটিতে' হইত সংসারজীবন নির্বাহের ক্ষত, হাটবাজারেও ঘাইতে হইত, সপথ কৈন্যবেলা কবিত্তে
হইত, আধাশ্রম শ্রমীপুঙ্খকর্মপরিচয়নের পরিচর্যাও করিতে হইত। এইরূপ কর্মব্যস্ত ঘেরেঘেরে একটি
পুঙ্খর বস্ত্রধর 'কাখানর চির অঁকিরাছেন কবি পশুণ। গুহাঘাটে একবস্ত্র পরিহিতা দে-কথাও শরণের
এই লোকটিতে জানা যায়। অস্ত্রর অস্ত্র প্রসঙ্গে এই লোকটি উদ্ধার কবিবাছি; এখানে শুধু একটি
মর্মহীতবাহ্য ব্যখিলায়।

এই যে হাটের কক্ষ খেপ করিয়া বাইজ ছুটিয়া চলিয়াছে গোঁসামবান, জাহাজের নুড়ী সন্ধ্যাকুরের বত (অশ্রুপূর্ণ)।
 চক বাইজ চলিবার ভর ভাষাবের কক্ষ হইতে বহাগল অমির হইয়া পড়িবারে বারানাম, আর তাহাই বারানাম কারান।
 স্মৃতিয়া গিজে চলিতেছে। কক্ষ গায়ে সেই সন্ধ্যাবেলা ঘাটে কক্ষে বাহির হইয়া বিজায়ে, এখন তাহার বত করিয়া
 আদিবার সবার—এই কক্ষ-ভাটিয়া বেতেরা লাকাইয়া লাকাইয়া ছুটিয়া পথ মাংকল করিয়া আনিতেছে, আর যত হইয়া
 হাটে কৈলাসের লম্বা পাড়ল চলিতেছে।

বিষয়সেনের বেগপাড়া-প্রশস্তিতে নানা প্রকার কৌমবস্ত্রের একটু ইমিত আছে; হস্তার বিশ্রাঙ্গদের আদমদ্বি-লিপিতে পড়িতেছি, বরপ্রতিপত্তি অত্যন্ত বস্ত্রের কথা। হুম্ব কার্পাস ও বেণম-বস্ত্রের কথা ত্রয়োদশশতাব্দীতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা কিছু আশ্চর্যও নয়। বাংলাদেশে যে নানাপ্রকার হুম্ব বস্ত্রের অল্প ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে হুইয়াত ছিল, একথা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক পেরিপ্লাস-এর হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক মুসেয়ান (নবম শতক), ভিনিসির মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক ফা-হুয়ান (পঞ্চম শতক) পর্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুর ছিল। চতুর্দশ শতকে জীরদ্বিত্ব বা তিরহতবাসী বিশেষধর্য্যার্থ জ্যোতিষীর নানাপ্রকারের পট্টবস্ত্রের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ-উত্তরব পূর্বাঙ্গের গাংগার লক্ষীবিলাস দায়বাসিনী এবং বিলুপ্ত পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র; কারণ ইহার পরই জ্যোতিষীর বলিতেছেন নিরূপণ বঙ্গাল বস্ত্রের কথা। কিন্তু 'কৌব' বা 'কৌবের', 'হুম্ব' বা 'গম্বো' বস্ত্র, অলংকৃত পট্টবস্ত্র বা কার্পাসবস্ত্র বাহাই হউক, সামান্য দরিদ্র লোকের এ-সব বস্ত্র পরিবার ব্যবহারে ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগ্যে ক্ষুটিত মোটা নিরূপণ কার্পাসবস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ। অন্তত কবি বার এবং আরও একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর দায়িত্বের যে ছবি আমাদের অল্প দায়িত্ব গিয়াছেন, তাহার অল্পতম প্রধান উপকরণ 'ক্ষুটিত' জীর্ণ বস্ত্র। এই দুইটি লোকই সজ্জিকর্ণায়িত হইতে এই প্রেরণই অন্তত অল্প প্রদমে উদ্ধার করিয়াছি; বাহ্যভরে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ দায়িত্ব যাইতেছি মাত্র। হুম্ব কার্পাসবস্ত্র শুধু বেয়েবাই বোধ হয় পরিভাষিত; অনেক নিজেবাই যে সে কাপড়ের দূতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, যিনেবভাবে যিনেব ব্রাহ্মণদুহেব নারীক, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাচন্দ্রের নিয়োক্ত ব্রাহ্মপ্রশস্তি লোকটিতে—

कार्पासादि अष्टमिडिका विरचनादिज्ञानाः

সেবা: স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, শ্রম, পরিবহন, কৃষি।

सुधर्मावतारः पद्मिनीकृतिः सुधर्मावतारविधानोः

मीकानुसिद्धादीनांमन्त्राः नववि ।

যে-সব দরিদ্র মোড়িরবিশেষ কটকহত দুষ্টির প্রাণ কাপাসবীজের দ্বারা আর্জী ছিল, (যে দ্বারাও), এবং 'তোষার' কৃপার সেবাদায়ী সৌভাগ্যবীর বিতর্কী প্রাচ্যে দুষ্টিবের সীতাহুত দ্বিহাযের দৃশ্যসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

অলংকরণ

সদ্যামরিক সাহিত্য ও প্রবন্ধের দ্বারা হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী ও পুরুষ এখন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন দ্বারা উঠার ক্ষেত্রেই এক। কর্ণভূষণ ও কর্ণদ্বারী অসুখীয়ক কর্ণহবে বলয় কেয়র মেখলা ইত্যাদি নরনারী নিবিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাশ্চিত হারের কথা, মহানীলরক্তাক্ষমালায় কথা, বিজয়নগরের নৈহাটি-নিপিতে পাইতেছি এবং বেগমশাহা-প্রশস্তিতেই ভ্রমিতছি, রাজবাড়ির কুতোব স্ত্রীরা ও নাকি হার কর্ণদ্বারী মালা মল এবং স্বর্ণবলয় ইত্যাদি পরিতেন, দুল্যাবান পাখরের তৈরি ফুল ইত্যাদি ও ব্যবহার করিতেন। শঙ্খাশ্চিত হার পরিতেন রাজ-পরিবারের মেয়েরা (নৈহাটি-নিপিত)। বামচরিতে গল্প দায়, হীরাশ্চিত নানা অক্ষর অলংকার এবং রত্নশ্চিত গুহুয়েব কথা, মুক্তা দরকত নীলকান্তমণি হুই প্রভৃতি হুয়াদি ব্যবহারের কথা। আর সোনা ও তামার পর্না তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এইসব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মণ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থের নাপালের বাহিরে; বড়োদের শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণচরণ, এক ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সম্বলিত থাকিত হইত। বেগমশাহা-প্রশস্তিতে কুবী উপাশ্চিত-ধর বলিতেছেন, গরীবানী নির্ধন ব্রাহ্মণবস্ত্রীরা দ্বারা কৃপার নগরে আদিয়া বহুবিস্তবশালিনী হইলেও তাঁহার মুক্তা ও কাপাসবীজ, দরকত ও শাকশাভার, তপা ও লাউফুল, রত্ন ও পাকা চালিমের বীকে, সোনা ও সুন্দর ফুল পার্শ্বকা যে কি তাহা জানিতেন না!

উচ্চকোটিভরে বিবাহোপলক্ষে কস্তাকে কিতাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত, তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈবধ্যচিত। প্রমত্ত উৎসবসম্মার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথমেই ফুলাচার অঙ্গুলায়ে সখা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মলমণ্ডিত গাহিতে গাহিতে কস্তাকে স্নান করাইতেন এবং গবে ত্রস্ত পট্টবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলায় তিলক, সোনার টিপ, কাজল আঁকিয়া মিলেন চোখে, কর্ণদ্বারে পরাইলেন দুইটি মণিভূষণ, তাঁঁটে আশুতা, কর্ণে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে পঞ্চ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আশুতা। বিবাহের দ্ব্যঙ্গিকাক্ষুতানে মস্তান্ত্র অঙ্গপুত্রিকায়া স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেনোক্ত বৃত্তান্ত কার্ণতলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-যানে আগমনা ঈশ্বা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়েরা। শিল্পীরা নান্যগ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরি ফুলে নগরের পঞ্চ-খাট সাজাইতেন, বাড়ির বেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নান্যগ্রকার ব্যস্তের মধ্যে বশি বীণা করতাল বদন ছিল প্রধান। বরযাত্রাকালে নগরীর নারীরা বরকে বৈধবায় স্বস্ত্র দ্ব্যঙ্গবস্ত্রের পাশে আদিয়া গাঁড়াইতেন। মদলাহুতান উপলক্ষে গৃহতোষণের দুইপাশে কদমীতল্ল রোপণ করা হইত; বাসর ঘরে (কৌতুকস্থলে) আঁকিয়ার মতন তখনও ছবি, কবিতা চুপি দেওয়া এবং আঁড়িপাতা হইত (সুকৌতুকপারমপাত, পুরবিভূতি: সম্বল স্বস্ত্রোক্ততমীকিতুততঃ। অস্বাত, সম্বলকতল্লমিত্রতা: অমিত্রিত: বত, খলু মিত্রানুদ্যনা।); এবং বরকস্তার পাঁচছড়াও বীণা হইত। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজের পরিবেশন করিতেন পুত্রনারীরা এবং তাঁহাদের সহীরা বরযাত্রীরা। নানা

প্রকারে ঠাট্টা-বসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না : সে-সব ঠাট্টা ও বসিকতা মাষিকার দিনে খুব মাজিত বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। পুণ্যভারতীও নানাপ্রকারে বরষাভীষের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আত্মও যেমন করা হয়। নল-সমরস্রীয় বিবাহবর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরষাভীষা বিবাহবাজিতে চার-পাঁচ দিন বাস করিতেন। সেই কয়েকদিনও বরষাভীষা বাবুশ্বরী বা বাবুস্বাম্যেবের সম্বলিত করিতে কুটাম্বোষ করিতেন না ! বস্তুত, সৌবীন উদ্ভবের খুবকয়েব বসো বাবুস্বাম্যেব বোষ হয় খুব বোষের বলিয়া গণ্য হইত না।

বসন-কৃষ্ণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুকুয়াটুকুয়া বসব নানা দিক হইতে পাওয়া যায়। ভগতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আত্মমাত্রিক চতুর্থ শতক) বলিতেছেন, “গৌড়ীনাথলকপ্রায়ঃ সশিখাপাণবৈবিকম্”—অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথার সজ্জিত বেশ, এবং তাঁহাদের চুলের বেষ্ট্র শেষাংশ থাকিত শিখার মত দ্রুত। রাজেশ্বর (নবম-দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে অল-বস-হস্ত-ত্রয়-পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ (বেশ) বর্ণনা উপলক্ষ্যে গৌড়-নারীর বেষ্ট্রের (বেষের) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একই আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

সেহবর্ণ

প্রাচীন বাঙালীর সেহবর্ণ বিস্তর ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভগত-নাট্যেয় নিয়োক্ত শ্লোকটি হইতে—

নকাল বসনাসেন গলব্য বালিকায়ঃ

আলো পোয়াঃ ক্ষত্বা উত্তরাঃ যে সিতাশিশু।

পাকাল্যঃ পুসেনাল ভবা চ্চোষাঃসাপ্তাঃ

অলবকলিয়াত ভাবা কাংথঃ বর্ণিতঃ।

(বোটাঃকঃ) নক-বসন-গলব্য-বালিক প্রভৃতি যে-সব (পাত্রশাস্ত্রী) উক্তর দেশবাসী তাহাদের সেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত পোষ : পকাল পুসেন উক্ত বর্ণ এবং অল-বস-ভলিকাবাসীর বর্ণ করিতে হইবে ভাব।

রাজেশ্বরও বলিতেছেন, “ভক্ত পৌরভ্যানাং (প্রাচ্যবাসীদের) ভাবো বর্ণি, দাক্ষিণাত্যানাং কৃকঃ, পাক্যাত্যানাং পাকুঃ, উর্বাচ্যানাং পৌরঃ, মধ্যবেত্যানাং কৃকঃ, ভাবো পৌরক।” পৌরাকনাসেয় সেহও যে ভাববর্ণ, রাজেশ্বরের এই উক্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি ; অন্তর্যও তিনি বলিতেছেন,

ভাববেসুপৌরীনাং স্তম্ভাঃসম্ভাঃ।

চরীকৃত্য বসুঃ পৌন্দর্যমো কৃত্য কতি।

এইসব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌড়বাসীদের তথা প্রাচ্যবাসীদের সেহবর্ণ সাধারণত ছিল ভাব, তবে রাজেশ্বরিয়া এবং অন্তর্য অভিজাত পরিবারের নবনারীদের সেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত পৌর, তাহাও রাজেশ্বরের বলিয়াছেন, “বিশেষত পূর্ববেশে রাজপুত্র্যাবাসীনাং পৌরঃ পাকুর্বা বর্ণি”।

ভারতীয় সংগীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা'

ঐক্যভিত্তিক সঙ্গীত

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাধনাগত যোগ বহু কালের। ভগবৎপ্রদে, ভক্তিতে, চিত্তশিখে, স্বাস্থ্যশিখে, জ্যোতিষ-চিকিৎসাশিখাত্রে, কাব্য-সাহিত্যে, সামাজিক উৎসবাদিতে, কোথায় সেই যোগ দেখা যায় নাই? কাব্য-সাহিত্যে সামাজিক উৎসবাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় সংগীতের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের সাধনাগত যোগ কম নহে। আর-সব ক্ষেত্রে যাহা বিদ্যা শুধু সংগীতের ক্ষেত্রে দেখিলেও দেখা যায় উভয়ের সাধনাগত যোগ বিশ্বব্যাপী।

অতি-পুরাতন কাল হইতেই ভারতে সংগীতের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। ফলে যুগে যুগে দেখা যায় সেই সাধনার নব নব লীলা ও রূপ।

আকাশে সব গ্রহ-নক্ষত্র এই পৃথিবী হইতে যেন ঘষ যেন একই তলে অবস্থিত। কিন্তু তাহা তো সত্য নহে। অতিদূরত্ববিশিষ্ট তাহারের পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আদ্যমুহুর্তে পাবি না। এখন আমরা যাহাকে প্রাচীন সংস্কৃতবীতি বলি তাহাতেও নানাব্যুৎপত্ত প্রচুর প্রভেদ আছে। সেই সুদূর অতীতেও এক যুগের সংগীতের সঙ্গে অন্য যুগের সংগীতের অনেক প্রভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়াছে। পরে আবার কোনো নবতর সংস্কৃতধারা আসিয়াছে, তখন প্রাচীন নানা ধর্মের সংস্কৃত নিজেদের কণ্ঠা বিটাইয়া সকলে এক হইয়া সেই নূতন ধারাকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিয়াছে এবং গীতিমত হুঁচু করিয়াছে। এইরূপ চতুরতা শুধু রাজনীতিগোলাবেরই একচেটিয়া নহে।

ভারতীয় সংস্কৃতি কোনো বিশেষ একটিমাত্র ধর্মের সাধনার কলস পড়িয়া ধরে নাই। এই সংস্কৃতির মধ্যে আর্য-আর্যের বৈদিক-অবৈদিক কাহার সাধনা নাই? ভারও পারস্যের শক-হুন-শবনাদির সাধনাও ইহাতে প্রকৃত পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে।

আর্য-সাধনার প্রাচীনতম ভাণ্ডার হইল বেদ। সেই বেদও কিছু একই কালের বা একই ধর্মের বস্তু নহে। বেদ-বেদে বিরোধও সে-যুগে কম দেখা যায় নাই। বেদের মধ্যে অধেষ্যকেই মোটামুটি প্রাচীনতম বলা যায়। সামবেদ ও সামগান তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত নূতন। এই সামবেদকেও একদিন অধেষ্য সহিতে গায়ে নাই। সামবেদ গান অধেষ্যের কানে পেচক-পূগাল-হুঁহু-গাথার ডাকের মতই যেন হইত।

সামগান অনেকটা সেকালের লোকসংগীতের মত ছিল। তাহাতে বহু-বহু স্থগিত করিয়াও লৌকিক 'হুঁ-হুঁ-হুঁ' প্রকৃতি হুঁহু টান বেগু হইত। অতঃপর আবেগ প্রকাশ করিতেই লোকপ্রচলিত এইসব বীর্ষ হুঁহু টান দিবার রীতি প্রবর্তিত হয়। তাই অধেষ্যগণ সেই সামগানকে কখনও বলিতেন তাহা শুনিতে কান্নার মত, কখনও বলিতেন কোনো বাস্তব হুঁহু টান, কখনও বলিতেন পূগাল-হুঁহু-পেচক-গাথার চিৎকারের মত। মোট কথা, অতিশয় পুষ্টিগত উপস্থিত হইলে যেমন গান খানাইয়া দিতে হয় তেমনই সামগান শুনিতে তাঁহারা অধেষ্য গান একেবারে খানাইয়া

দিতেন। আপত্য খর্ব্বপ্ত্রে আশ্রয় সেইসব ইতিহাস বেধিতে পাই। কথাকা আবও পরিচায় করিয়া দিয়াছেন আপত্যের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা আচার্য হরবত তাঁহার "উচ্ছল" ব্যাখ্যায়। কাছেই এখনকার দিনের মার্গদর্শিতের শুভাশ্রয়। স্বাভাবিকভাবে গান বহন বৈধ ধারণ করিতে পারেন না, তখন বিশিষ্ট হইবার কিছুই নাই। যুগে যুগে এই ইতিহাসই চলিয়া আসিতেছে।

একদিন বৈদিক যুগেরও অকলন হইল। অগ্নি-বরুণ-ইন্দ্রাদি দেবতার স্থানে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজা আসিতে লাগিল। প্রাচীনপন্থী কথিয়া তখন বাধা দিলেন। প্রাচীন বৈদিক যামযজ্ঞ নক্ষত্রের মত হাফায়া চলিতে লাগিল। জৈন বৈষ্ণব প্রভৃতি ভাগবতেরা সংগীতেও নৃতন গানের স্রষ্টি প্রবর্তিত করিলেন। বেদপন্থী রাজারা তাহাতে বাধা দিলেন। অজ্ঞানকে বলা হইল এই বে, নারী ও পুত্রগণ এই নৃতন গান গাহিতে পারেন কিন্তু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ভাগবতগান গাহিলে তাঁহাদের প্রাণন ও বা নির্বাসনও হইবে। পুরাণে এইসব কথা চমৎকার ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভবে তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। কাছেই স্বাভাবিকভাবে অপর্যবে যে এখন প্রাণন ও বা নির্বাসন ঘটে না তাহাই পরম সৌভাগ্য।

যাহা হউক এই ভাগবত-সংগীতের প্রবর্তকগণ যথোপযুক্ত নারদ, মতঙ্গ, ভরত, দত্তিল প্রভৃতি মুনিসের নাম পাই। এই মুনিসের মধ্যেও পরস্পরে সব সময়ে যে ঐক্য ছিল তাহাও নহে। এইসব মুনিসের রচিত সংগীতশাস্ত্রও সব মূল্য হয় নাই। তাহাতেও সেখি কেমন কল্পিত লোকপ্রচলিত রীতিতে পুণ্ডরিক সব যোগ আভিরাচরিত্য নব নব বহু বিভিন্ন রাগরাগিণী সৃষ্ট হইতেছে। কাছেই নাকলকও গান শিখিতে গিয়া নারী ও পুত্রদের কাছে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। নব নব স্বরসুন্দর এই অপর্যবে তনু এই যুগেরই নহে। প্রাচীনকালেও সংগীতের নৃতন ধারা পুণ্ডরিক বালমণ্ডলা দিয়া নৃতন নৃতন রাগরাগিণী সৃষ্টি করে, আর পুরাতনের বল দারুণ হইয়া গঠন।

কিন্তু এই ভাগবত মুনিসেরও যুগ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিষ্ঠা পাইবার পরে মুনিসের মধ্যেও নানা মতভেদ দেখা দিল। এখনকার দিনেও রাষ্ট্রনীতিতে দেখা যায় কোনো একটা দল নক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তখন নানা দল দেখা দেয়। তখনকার দিনেও দেখা যায় সংগীতে ভাগবত-মত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা মতভাব চলিল।

এখন একজন মুনী নাই যাহার সঙ্গে অস্ত্রের মতভেদ ন। আছে।

নারী মুনিত বস্তু ম তিরস্।

এই মুনিসের যুগও তো তিরস্কারী নহে। আবার বাহিরের সব প্রভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনই আচার্য্যগণ আসিল। আচার্য্যগণের প্রাচীনতম সংগীতশাস্ত্ররচয়িতার নাম পাই শাস্ত্রসেব। ১২১০ হইতে ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁহার অপর্যবে সংগীতরসরস রচনা করেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যই আশ্রয় ভারতীয় সংগীতকলার প্রথম মূলস্রোত প্রভাবের ধর্য্য পাই। সংগীতরসরসে তুর্য্য-গৌড় ও তুর্য্য-তোড়ী স্বরসের নাম দেখে। হরতৌ এই তুর্য্যপ্রভাব লইয়াই এই নবীন আচার্য্যগণের প্রবর্তন হইয়াছিল।

বৈদিক ভাগবতযুগ বিদায় হইল। তনু এই আচার্য্যগণেও পুণ্ডরিক যাহা ছিল তাহা লইয়াই মার্গদর্শিত কলীন হইয়া বসিয়া বহিল। তখনও গানে এই সেপে কনকালী গাটে এবং চক্ৰপুট চাচপুট প্রভৃতি তালোই চলিতেছিল।

ভাষার ইতিহাসে বেণা দ্বার সংস্কৃতির আওতাধীন বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বহুভাষ্য, নিম্নতর ছিল। মুসলমান বাসনারাই এইসব লোকভাষাকে তুলিয়া গরিলেন। সংস্কৃতিও, ঐক্য তাই ঘটিল। বেণব দেশে দ্বার পণ্ডিতদের বহুভাষ্য অবজ্ঞাত ছিল তাহাকেই উৎসাহ দিয়া মুসলমান ভাষা প্রচলিত হইয়া প্রভৃতি নব নব সংস্কৃতকলায়িত প্রবর্তন করিলেন। তন্মূ তখনও কনকাকী ঠাট ও পুণ্ডিত নব তানই চণিতে লাগিল। ছুই শত বৎসর পূর্বে মুসলমান ওত্থাবেরা তাহাও বহুভাষ্য ছিলেন। কনকাকী ঠাট পেল, বেলাওল ঠাটে ওত্থাবী গাহিবাব রীতি প্রবর্তিত হইল। সেই রীতি এখন পর্যন্ত বিদ্যার দ্বার নাই। তাহা হইক, ভারতীয় সংস্কৃতিশাস্ত্রে মুসলমানদের সাধনার কথা এখন বেণা হাউক।

একটা কথাতে বড়ই বিষয় লাগে। সংস্কৃতকলা মুসলমানশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। অথচ বহু বহু ওত্থাবেরা তো প্রাচীনকালেই মুসলমান। মুসলমানশাস্ত্রে তাহাই বাহুক তীর্থে তো সংস্কৃত মুখই প্রচলিত। আজমীর বৈদ্যকীর্ণ চিত্রীয় বর্ণা হইল ভারতে মুসলমানদের সর্বপ্রকার তীর্থ। সেখানে মূল ভাষাও প্রথমে প্রথমে নববত বাজে। ভিত্তরে প্রত্যেক পবিত্র স্থানে গায়কগাহিকারা গায়ীদের পুণ্যার্থ সংস্কৃত করেন ও গায়ীরা তাহাও মন্ত রীতিমত শিক্ষা নেন।

ভারতে পুণ্ডিত ভাষাও ছিল বীরী। মুসলমানেরা তাহাও বহু অবলম্বন করিয়াছেন। সেভার, ববাব, বহুভাষ্য, বহুভাষ্য প্রভৃতি অপর দ্বার ভাষাও মুসলমানেরাই ভারতে প্রবর্তিত করেন। কবিতা দ্বারের দ্বারের প্রবর্তন অপর সানাই ও নববত বাজে। এই সানাইর পূর্ব-রূপ ছিল পুণ্ডি সাধাধিগ। তাহাও পবিত্র এখনও আমাদের আশেপাশে মেলে। কিন্তু কবিতা প্রভৃতি স্থানের সানাইর এই বহু তানসেরা পবিত্রদের প্রভাব। নববতের বাহুও মুসলমানদের বহুভাষ্য। নাক্ষত্রিক বহু পং সন্যাস্ত আকবরের প্রবর্তিত। এখনকার পাণ্ডুরাও ঐক্য পুণ্ডিত ভারতীয় ভাষার পবিত্র পাই ন। ইহাতে মুসলমান ভাষার অনেকখানি হারত আছে। তবলা তো মুসলমানদেরই দ্বার।

গাহিবাব সমস্ত ওত্থাবেরা যে সাধনাদিগের মূল বহুভাষ্য শোনার তাহাও নাম 'নায়কী'। ইহা সেইসব দ্বারের সাধন রূপ। তাহাও উদার কলাভাষ্য বেণব আশ্রয় করেন সেইসব নব নব পবিত্রকলাভাষ্য তো ওত্থাবী। ইহাকেই বলে 'গায়কী'। ইহা মুসলমানী রীতি। এখন তো 'গায়কী' না হইলে শুধু 'নায়কী' গান কাহাও অনশ্রুত হয়না। অথচ ইহা ভারতের প্রাচীন রীতি নহে।

ভারতে অমীর মুসলমান পূর্বকার মুসলমান ভাষার কথা বলা কঠিন। দ্বার ও তাহাও প্রভাব সংস্কৃতকলাকে 'ভূমক-ভাষ্য' ও 'ভূমক-কৌল' বেণা দ্বার। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে অমীর মুসলমান জয়। নবী বেণব সাধনগায়িনী হইয়া পথে পথে নব নব গাথা সংগ্রহ করিয়া স্বীকৃত হইতে হইতে চলে তেমনি ভারতের সংস্কৃত স্বীকৃতগায়ার মন্ত নব নব মুগের নব নব দেশের নানাবিধ বৈচিত্র্য লইয়া দিনে দিনে নূতন ও বিচিত্র হইয়াই চিরদিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মুসলমান-সাধনার সঙ্গে বেণবের পথে তাহাও আর বৈচিত্র্যের মন্ত বহিল না। তাহাও পথে বহু নূতন নূতন পত্রি হইয়া চলিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাক-মুসলমানযুগের শুদ্ধ রূপ এখন পাওরাই কঠিন। কবিতাকী সংস্কৃতি এখনও ইহার কিছু পবিত্র মেলে। এখনকার সব সংস্কৃত বহুভাষ্যময় এবং সাধনবহুভাষ্য। ইহাও এখনকার মার্গসংস্কৃত। পুণ্ডিত মার্গসংস্কৃত এখন অচল। চন্দ্রপুট চান্দপুট তাল প্রভৃতির কথাও এখন বিস্তৃত। এইসব প্রবর্তনা বেণব মুসলমান ভাষার, অমীর মুসলমান ওত্থাবের একজন মুখ

পথপ্রদর্শক। প্রাচীনকালের কনকাকী ঠাট এখন অচল। এখন চলে মূলম্যানদের প্রবর্তিত বেলাএলী ঠাট।

‘ইমন’ গায়ত্রিসমীপ রাগ। অমীর খুসরু ইহাকে ভারতীয় রূপ দিয়া আমাদের বেশে প্রবর্তিত করেন। এগন ইমন-কল্যাণের মত, ইমন-পুঁড়িয়া ইমন-কুশালী ইমন-বেলাএলী ইমন-বেহাগ ইমন-কিঁকিট ও ইমনী ইত্যাদি রাগ কলাবতদের মধ্যে চলে। বাহার আলাইয়া সুরক্ষমা শাস্তিসিহি সুহানা অতানা গোহিনী সহ্য হুখরই বিন্দুক মাক এই কয়টি রাগ মূলম্যানদের কাছেই পাওয়া। ইহারও পরে খুব অল্পদিন পূর্বে আবদা ইহারের কাছে গিলু কিকোটা প্রকৃতি রাগ পাইয়াছি। অথচ এইসব রাগের অনেকগুলি এখন সংস্কৃত ধ্যানও রচিত হইয়া গিয়াছে।^১ বাবাগোবিন্দসংস্কৃতপারে দেখা যায় এইসব নূতন রাগও শিবপ্রোক্ত। যথা সুরমহা বিজ্ঞান (পৃ ১৮০), বাহাদুর চৌড়ী (পৃ ১২০), জোনপুরী চৌড়ী (পৃ ১৩৬), কাকী চৌড়ী (পৃ ২০১) হুসেনী কানডা (পৃ ২৪১) হিজেল (পৃ ২৪৪) ইত্যাদি মূলম্যানী হইলেও এইসব রাগকে আবদা শিবপ্রোক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি এবং সংস্কৃতে তাহারের ধ্যানও রচনা করিয়াছি।

মিঞাসাধক মিঞামল্লার তো তানসেনের সহই। কলাবতদের মতে ‘শান্ত সাধক, নও নট, বাবো মল্লার, ভেবো চৌড়ী, আঠার কানডা’—ক্রমে এই ভাবেই গড়িয়া উঠিল।

বাজাইবার শব্দভিতেও দেখা যায় চিত্রে তেতালার সেতারের মসিতখানী গং। মসিত খা তানসেনেরই বংশধর।

কিরোমত সাধবা বা পশ্চো প্রকৃতি তামও মূলম্যানী।

ভারতীয় গৌড়া সংস্কৃত-মাচারিরাও এইসব অভিনয় বস্ত স্বীকার করিয়াছেন।

অমীর খুসরু পূর্বপুরুষেরা বিবেশ হইতে আসিলেও ইহার ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করেন। অমীর খুসরু হইলেন দিল্লীর মুকী স্তম্ভ নিম্নাউকীন উলিয়ার শিত্ত। তিনি একাধারে ভক্ত কবি ও কলাবত। তিনি প্রাচীন বহু দীর্ঘ তালের স্থলে কণ্ঠালী দ্বারা প্রকৃতি আট-মাত্রার ও ছয়-মাত্রার তাল প্রবর্তন করেন। খুসরু তুর্কী-স্বাধবীর মত ভারতীয় সব তাল ও বিভাও সাধবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একজনের সঙ্গে একটি কথাবার্তা এসেছে তিনি বলিয়াছেন “আমি তুর্ক হইলেও ভারতীয়। হিন্দী (ভারতীয়) ভাষাতেই তোমাকে আমি জবাব দিতে পারি। আরবভাষা ও আরব-বেশের বর্ণনাতেই আমি আমার রচনার সবটুকু দ্বারা চালিয়া দিতে পারি না। বস্তুত আমি ভারতেরই কবি। হিন্দীতে এর কবিলে আমি হিন্দীতেই উত্তর দিতে প্রস্তুত।”^২ ভারতের সত্য নারী খেবানে খেজার গতিয় সহইতা সেখানে প্রেমের যন্তে তিনি মুক্ত।^৩ কবিত্বের সেই প্রেমের স্বরূপ তিনি করিয়াছেন।

প্রাচীন আচার্যের মতে যে উনিশটি বস্ত খুসরু প্রবর্তন করেন তাহার মধ্যে শাস্তিসিহী ইমন জিল্লত সুরক্ষমা কিরোমত কোল তরাশা কউমাল সাহানা হুহিল প্রকৃতির নাম পাই।^৪

পারভ্রমণেও খুসরু কবিতার বহু সম্মান ছিল। বহু কবি তাহার অল্পসংখ্য করিয়াছেন।

^১ H. M. Mirza, pp. 227-228

^২ ২ p 186

^৩ ২ p 228

কলাবতরূপে তিনি ভারতীয় লোকসংস্কৃতিকে একই অঙ্গলবলয় করিয়া স্থলতান হলেন ও মূলতান আলান্টিকানের সময়ে (১২০৮-১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) রূপের পোড়াগন্ধ করেন। এসময়ে তিনিই সেতায়ের প্রবর্তক। বিবিজয়ী গোশাল নামকও মূলককে পরাজিত করিতে পারেন নাই। এইদ্রব্য দেখিয়াই এখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিচার্য কৈবাহ খাঁ ও পণ্ডিত-ওকোরাম উভয়েই বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা বল।

সংস্কৃতিবিষয়ে খৃস্ট-রচিত কোনো পুস্তক মেলে না। অরীষ খৃস্টের পত্রাবলী (*Insha-i-Amir Khushru*) নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহা আসলে বহু পরবর্তী কালের লেখা। শাহজহানের রাজত্বকালে দক্ষিণ-ভারতের অরীনাবাদ হইতে মুনসী আবদুল বাকী তাহা রচনা করেন। অন্ততম প্রাচীন লেখকের লেখা হইতে খৃস্ট ও তাঁহার সাধনার কথা জানিতে হয়। এট সময় হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে মুসলমানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বহু পারদী গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে।

খৃস্টের পরে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে *Kanz-ul-Tuhul* (উপহাযকোণ, উপহারের ভাণ্ডার) গ্রন্থ রচিত হয়।

১৪১৮ সালে পারদী ভাষায় 'রাগদা-এ-হিন্দ' সংগৃহীত হয়। ইহাতে বর্ণন্য সব রূপ স্থান পাইয়াছে।

১৫৬০ সালে লেখা তানসেন-রচিত সংস্কৃতিসার ও রাগকলা গ্রন্থ পাওয়া যায়। তানসেন পূর্বে হিন্দু হইলেও মুসলমান গুরু যৌসের শিষ্য হন এবং বিবাহপূর্বে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সংস্কৃতিই তাহাতে স্তুতিমন্ত হইয়াছে।

১৫৮৩ সালে আকবরের রাজত্বকালে কবি আলি 'সাধবনাল কবলা' গ্রন্থ লেখেন। তাহার এক অংশ রাগমালা। শিবের গ্রন্থদ্বয়ে রাগপরিচয়ের ক্ষুদ্র রাগমালা গৃহীত হইয়াছে। আগনাষের ধর্মগ্রন্থে শিখেরা আরও মুসলমান ভক্তের রচনাকে স্থান দিয়াছেন।

আইন-ই-আকবরী আকবরের প্রবর্তনায় আবুল ফজলের লেখা অশুভ গ্রন্থ। ইহার তৃতীয় খণ্ড সংস্কৃতিসার বিষয়ে। তাহাতে বাইপ প্রতি ছয় রাগ ও তাহারই রাগিণীর স্বরূপ বিচার আছে। সার্ব ও বেশী এই রীতিসংগতেরই পরিচয় তাহাতে দেওয়া আছে। দক্ষিণ-ভারতীয় গণ্যের কথাও আইন-ই-আকবরী উল্লেখ করিয়াছেন।

শৈবী রীতির কথা বলিতে গিয়া রূপসংস্কৃতির উৎপত্তি বিষয়ে আইন-ই-আকবরী বলেন—
মুহসেন অর্থাৎ গোয়ালিদ্বয় প্রবেশে যে লোক-সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল সংস্কৃতির পরমবঙ্গ রাধা মানসিংহ ভোমের তাহা খুব ভালো লাগিল। তখন পণ্ডিতরা সেই স্কৃতি উপেক্ষা করিতেন। কিন্তু রাধা মানসিংহ তাহাকে বহাভী নামক বকশু, বজ্র ও চন্দ্র সহায়তার এমন করিয়া সমাদৃত ও উত্তীর্ণ করিলেন যে কেহ আর তাহাকে তখন অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না। রাধা ভোমের ও তাঁহার পুত্র বিক্রমাসিত্যের স্তুতির পর বকশু কালিকার রাধা কীর্তিসিংহের দ্বারা আশ্রয় লন। লেখান হইতে তিনি গুজরাটের স্থলতান সাহাবুরের দ্বারা বান (১৫২৮-১৫৩৬) ও রূপ নাম ঢালাইতে থাকেন।

১৫৪৫ সালে বাঘা হমাযুন মাচু নগর দখল করিয়া এখন বহু লোকের প্রাণবন্তের আত্মা হেন তখন তাঁহারই মধ্যে বকশুও ছিলেন। সকলে সম্মতের বলিলেন, "জাহাপনা, ইহাকে বধ করিবেন না।

এত বড় গাথক এখন এই সাধা ভারতে নাই।" বকসুর গানে বাষণা মুক্ত হইয়া তাহাকে রামপরিষ্কার খেলাত দিয়া বকসুরে বয়বাবের অঙ্কন করিয়া লইলেন। দরবারের প্রচুর প্রাশন ও ভাঁকসুরকেও কলাসবরী বকসুরে তৃপ্তি চাইল না। তিনি সকল বৈভব এমনকি আশন প্রাপ্তও তৃপ্ত করিয়া আহার ভক্ষ্যাদিতে কলাসবরী মূলতানের কাছে পলাইয়া গেলেন। এইরূপ কলাসবরী ও শ্রীতি দেখিয়া মূলতান নিরতিশয় শ্রীভিলাস করিলেন। কলাসবরী অর্থগণের কাছে সেবাকে প্রাপ্যবোধের চেয়ে গুরুতর দুর্গতি মনে করেন।

গোপালনাথক হকিমভারতের কলাবত। গোপালনাথক মূলক প্রকৃতির অল্পদরণ করিয়া পুরসেন প্রদেশের সেই সব সংগীতকে কলাবত বকসুরে বহনীয় করিয়া তুলিলেন। এই কাষে বৈজ্ঞা বাওরা, কুচ, গভরী, মোহর, মরহ, ভগদান, চুটী, মলু প্রকৃতি কলাসবরীও সাধনা করিয়াছেন। এমন করিয়াই প্রথম সংগীত সৃষ্ট হইল। রাঙ্গা মান তোমরই এই প্রদেশের চারি ডুকের রূপ দিলেন।

বেসব বুর লইয়া তাঁহার প্রথমে এই কাষে হাত দিলেন তাহা হইল পুরবী, দানজী, রামকলী, কুরাই (বাসনাহ ইহার নাম সেন বুরই), সুহা, বেশকাল ও দেশাধ। এইসব লোকপ্রিয় বুর বিদ্যাই প্রথমকে সেই হইতে নার্সগীতের আসনে ইহার উঠাইলেন।

আকবরের সময়ে পেশাবার নটনদীপের বহু জেগী ছিল। জাতিয়া শাফারী বীরপাথা গান করিত। কঠালেয়া দিল্লী ও মৌনপুরী বীতিতে পাহিত। স্ববকিরা পুরুষেরা পাহিত, স্ত্রমরী মেয়েরা সাথে সাথে নাচিত। আইন-ই-মাকবরী বলেন, "আগে তাহার 'কিরক' গান করিত, এখন এইসব নটনদীয়া প্রথম গায়। কারণ প্রথম লোকপ্রিয় বেশি গান। আকবরের দরবারে ভারতীয় ইয়াগী তুমারী গান হয়। কান্দারী পুরুষ ও নারী গুণীও আছে। সন্তাহের সাত দিন সাতটি মণ্ডলী পালাকমে সংগীত করেন।"

আকবরের দরবারে সর্বাংগকা বড় কলাবত ছিলেন তানসেন। তাঁহার ও তাঁহার কান্দারীয়েই পবে ভারতে সংগীতকলাকে জীবন্ত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে না বলিলে চলে না। বহুসনের মধ্যে তানসেনের নাম করা চলে না। তানসেন রবাবে সিদ্ধহৃত ছিলেন। মজারের মধ্যে গাছায় বিশাইয়া তানসেন বিশালমজার সৃষ্টি করেন। ইহা ছাড়া যাহার দরবারী-কানাকা দরবারী-টোকা প্রকৃতি তানসেনেরই সৃষ্টি।

আকবরের সময়ে প্রধান ছত্রিশ জন গাথক ও বাধক গুণীদের মধ্যে একত্রিশ জন গুণীই মূলদান, পাচ জন মাত্র হিন্দু। আকবরের সময়ে ভারতীয় সংগীতের অতিশয় বহনীয় রূপ। আইন-ই-মাকবরী প্রকৃতি প্রায়ে সেই রূপের সংগীতকলা ও কলাসবরীর উত্তম পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে ছত্রিশ জন কলাসবরীর প্রত্যেকের নাম ও পরিচয় দেওয়া আছে।

তুসুক ও ইকবালনামা প্রায়েও দেখা যায় জাহাঙ্গীরের সময়ে ছত্রিশ জন গুণী না হইলেও বহু কলাবত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরদান পরদীপ হুত্বম মলু হুমজান প্রখ্যাত। শাহজাহানের সময়ে ছিলেন কবি-গাথক জগদাধ। বাসনাহ ইহাকে 'কবি রায়' উপাধি দেন। তাহা ছাড়া বীরদ খাঁ, লাল খাঁ প্রকৃতি ছিলেন। বাসনাহ শ্রীত হইয়া জগদাধ ও বীরদকে তুলাসেও ওজন করিয়া সবতুলা মৌগা কলাসবরীর বিস্তরণ করেন।

বাদশাহ ঔরংজেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে স্মৃতিস্তম্ভকে নাকি তিনি নিষিদ্ধ করেন, এইতথ্যই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঔরংজেবের দরবারে প্রিয় কবি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় আলম গজিত। তিনি ভারতীয় রসগান্ধে প্রবীণ, দ্বিমুখিতে শিখিতেন। বাদশাহের পৌত্র আজিমুশ্শান ঢাকার শাসনকর্তা হইয়া যান। তিনি বাদশাহের কাছে আলম প্রবাসভীবনের হুখ হুখ করিতে সহচররূপে কবি আলমকে চাহেন। আলম তাঁহার প্রণয়িনীকে ছাড়িয়া এতদূর গেলেন না। তখন আজিমুশ্শান কবি কাসিমাসকে চাহিলেন। কলামত কাসিমাস ত্রিবেণীকে ছাড়িতে বাদশাহ চাহিলেন না। অগত্যা কৃষ্ণ কবিকে লইয়াই আজিমুশ্শান ঢাকা গেলেন। তাই ‘কৃষ্ণ-সতসই’ ঢাকা শহরে সমাপ্ত হয়। ‘সতসই’র সমাপ্তি-বাক্যে লেখা আছে।

এইসব আলোচনা করিলে দেখা যায় ঔরংজেবের দ্বিমুখী কবিতা ভালোবাসিতেন। কলামতদের কৃপায় জানা যায় ঔরংজেবের দরবারে বড় বড় গায়কও ছিলেন। প্রত্যেক বৎসর তাঁহার জন্মদিনে ও অভিব্যেকদিনে নূতন নূতন ধরণে খেলা প্রভৃতি গান রচিত হইত। তাঁহারে বচিত সেইসব গান এখনো স্মরিত আছে এবং তাঁহারে প্রাণে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া মুহুরিতও হইয়াছে। সেইসব গানের স্মরণও ওতসেবা বলা কহিয়াছেন। রাগ চৌতালিতে রচিত এইরূপ একটি গান যেখি—

অকবর হুত জাইগীর তাকে শাহজাহা

তাকো হুত ঔরংজেব জয়ো হৈ জুর গব। ইত্যাদি

চৌতালী প্রভৃতি কয়েকটি রাগ বোধ হয় ঔরংজেবের প্রিয় ছিল। তাই ইহার পরের বৎসর উৎসবেও চৌতালী-তালিতে রচিত হয় এই গান—

শাহ ঔরংজেব খ্রীতম। ইত্যাদি

পাছার রাগে তাঁহার জন্ম রচিত তিনটি গান পাইয়াছি। আশাবতী রাগেও তিনটি গান পাই। ইহা ছাড়া আড়া-চৌতালে আশাবতী রাগে গান আছে—

প্যায়ে ঔরংজেব সো তুহী কোন দূই জোহী।

ধানতী চৌতালে গান আছে—

শাহ ঔরংজেব দীক রহে।

মালতী সুরদাসের আছে—

শাহ ঔরংজেব—

লীনহী গলেহী লগার কিন্‌হী নিহাল।

ঐরাগ চৌতালে পাই—

শাহ ঔরংজেব বহত ভলে হো।

তখনকার সব বিখ্যাত গায়কেরা উৎসবদিনে দরবারে ঔরংজেবের কাছে এইসব গান গাহিয়া প্রচুর পাকিতোষিক পাইয়াছেন। তাই বৎসরের পর বৎসর নব নব রাগে ও তালে নূতন নূতন গান রচিত ও গীত হইয়াছে। এই লাক্য তো উপেক্ষীয় নহে। প্রাণ দিবার ক্ষত কে গান গাহিতে চায়?

ঔরংজেব অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন। চরিত্রগত নীতির শৈথিল্য তিনি সহিতে পারিতেন

না। পায়ল ও কলাবস্ত্রের মধ্যে নীতিগত শৈথিল্যে হততা। তিনি কষ্ট হইয়া থাকিবেন; তাই তাঁহাদের পক্ষে তিনি নিষিদ্ধ করিয়া থাকিবেন।

আইন-ই-আকবরীর নয় ইব্রাহিম খান সাহেব সংগীত বিষয়ে 'নবরস' রচনা করেন। অল্পই এই গ্রন্থে বিস্তার প্রদান করেন। সপ্তম শতাব্দীতে লেখা এই গ্রন্থের অল্পই-রচিত তুমিলাও পাওয়া যায়।

পাহলবীভাষ্যের (১৬২৮-১৬৪৮ খ্রি) উৎসাহে বহু সঙ্গীত গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। আবার তাহার মধ্যে বাছাই-করা হাছাবে গ্রন্থ 'সহস্ররস' নামে পায়লীতে লেখা হয়। ইহাদের রাগ-রাগিনীর নাম ও লক্ষণাদি সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী-উল-সলত নামে সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ পায়লী ভাষায় রচিত হয়।

ফকীরউল্লা-রচিত রাগবর্ণন বিখ্যাত গ্রন্থ। নাম সংকৃত হইলেও গ্রন্থখানি পায়লীতে লেখা। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইহার রচনাকাল। পরলোকগত দোলানা দিল্লীউল্লীর মতে ইহা ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে লেখা। বুহার গ্রন্থমালা রচয়িতার মতে ইহা ১৬৬৫ সালে রচিত। ফকীরউল্লাহ আসল নাম সৈফউদ্দীন মহম্মদ। ইনি দারানিকোহের অল্পবর্তী ও অল্পরাস্তা ছিলেন। তাই ঔরংজেব ইহাকে সরকারী চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া গোয়ালিরবে বন্দী রাখেন। সংগীতে ও রাগশাস্ত্রে ফকীরউল্লাহ পটীর অধিবাস ছিল। তাই তিনি তখন বসিয়া বসিয়া গোয়ালিরবে প্রাপ্ত মালমশলা লইয়া রাগবর্ণন লেখেন। এই গ্রন্থে সংগীতের ঐক্যবাহী লক্ষণ, স্বর-প্রতি-রাগ বিবেক, রাগোচিত কাল, ভারতীয় সংগীতের পূর্ণাঙ্গের এবং ও পরিচয় প্রকৃতি আছে। গানের সোপানবিচারও ইহাতে আছে। ইহা একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশদভাবে লেখা ভারতীয় সংগীতগ্রন্থ। সেই দুসে সকলেরই ইহা মাননীয় হইয়াছিল। সেকালের প্রসিদ্ধ কবি নাসিরখানী বলেন, "অপ্তে আলিয়া হুদি ফকীরউল্লাহ রচনা না পাইতাম তবে এই অপ্তে আলিয়ার কোন অর্থ ই ছিল না।"

তাহার পরই অতি বিখ্যাত গ্রন্থ তুহকতুল হিন্দ। ইহার রচয়িতা মির্জা খাঁ ইবনু ফকরুদ্দীন মহম্মদ। ১৬৮৫ সালের পূর্বেই আশ্রয় শাহের উৎসাহে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে এই বিরাট বিধিকোষখানি তিনি রচনা করেন। আশ্রয় শাহ ছিলেন ঔরংজেবের পুত্র। বিহারী সতসইর এক সংস্করণ তাহার সম্পাদিত। তাহারই উৎসাহে শেখকবি 'হুমায়ুন' 'গেমচন্দ্রিকা' প্রকৃতি বৈকুণ্ঠ রসগ্রন্থ লেখেন। তুহকতুল হিন্দ গ্রন্থে মির্জা খাঁ সংগীতগ্রন্থ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াছেন, ইহাতে সোমেশ্বর হুস্বান কলিনাথ ভরত প্রকৃতির মতের আলোচনা আছে। সংগীতের স্বরী ও প্রটা, স্বর, রাগ, তাল ভালো করিয়া আলোচিত হইয়াছে। এইসব কাষে তিনি সংস্কৃত গণিতের ও সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রের বর্ণনা সহায়তা হইয়াছেন। ২২ জতি, ২১ সুর্দনা, রাগমাতি, পাঞ্চকষের গুণ-যোগ, কৃষ্ণসংগীত (chorus), গ্রন্থ-বেলাল-টপ্পা বরটৈ (পূর্ব-ভারতীয়), কোল, তিলানা প্রকৃতির আলোচনা তিনি করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ ও কলাবস্ত্রের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বর্ণনা আবার সংগীতশাস্ত্রের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভাষাও ও তাহার গ্রন্থে এই পুঙ্খবহু কথা লিখিয়াছেন। ভারতীয় সংগীতের কথা আনিতে হইলে এই গ্রন্থে সবাই উপকৃত হইবেন।

প্রলম্বক্ৰমে উল্লেখ করিতে চাই, আমার পরলোকগত ছাত্র ও বন্ধু মোলানা জিয়াউদ্দীন মির্জা ঐ এই বিরাট প্রচেষ্টা ব্রহ্মভার্য্য ব্যাকরণ ও অভিধানখণ্ড সম্পাদন করিয়া পরলোকগমন করেন। দ্ব্যবতীর্থ সংগীতশাস্ত্রের বহু কাষ কষাৎ আকাঙ্ক্ষা জিয়াউদ্দীনের ছিল। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাহা সফল হয় নাই। তুহফুতুল হিন্দু ভারতীয় সংগীতের, বৈকল্প বসনাস্থেব, ব্রহ্মভাষ্য পার্বত্যেব। সংগীত তাহার অন্ততম বিষয়।

ইহা ছাড়া ভারতীয় সংগীত বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থ আছে। যথা, নিরজা বোশান জমিবেব সংগীত পাবিখাতের পাবনী অহুয়াব (১৭২৯ খ্রিঃ)। উমুল-ই-গিনা পাবনীতে লেখা সংগীতশাস্ত্র হইলেও ইহা হিন্দু রাগচাসের রচিত। দিলাল-ই-মুলীকীও পাবনীতে লেখা একখানি সংগীতশাস্ত্র। দিলাল-বহ-ই-শুচ-এমুলীকীও তাই। *Ilham-ud-darab* (আদমপ্রকাশ) গ্রন্থে রাগরাগিনীকীর লক্ষণ ও তাহাদের কালবিচার আলোচনা হইয়াছে।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের বিষয়ে আরও বহু পাবনী গ্রন্থ আছে। এই প্রসঙ্গে কত আর নাম করা যায়; ১৮১৩ সালে পাটনার মহম্মদ বেজা *Nagmat-ul-Asafi* গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে ছয় প্রকরণ ও বহু অধ্যায়। স্বপনাম্যাহুসাথে তিনি নৃতন করিয়া ভারতীয় সংগীতের বর্ণীকরণ করেন। বহু গণিত ও ভণ্ডীয় সঙ্গে আলোচনার ফলে তাঁহার এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল।

পূর্বে কলাবত্তেরা গাহিতেন কনকাবী ঠাটে। মহম্মদ হেজাজ নত অহুসাথে চারিবিধের অবস্থা দেখিয়া তখন হইতে বেলাওল ঠাটেই গাহিবার রীতি প্রবর্তিত হয়। কলাবত্তদের মধ্যে এখন তাহাই সারা ভারতে চলিতেছে। কান্দীর বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রী সলামত আলী খাঁর উপদেশ অহুসাথেই ১৮৩৪ সালে *Captain Willard* ভারতীয় সংগীত বিষয়ে যাহা কিছু তাঁহার দিবিবার ছিল তাহা লিখিয়াছেন।*

কান্দীতে সলামত আলী যে সংগীতগবিস্তল রচনা করেন পরে তাহাতে আসিয়া যোগ দেন তানসেনবংশীয় আলী মুহম্মদ খাঁ বা বড়হু মিঞা। বড়হু মিঞার তাই নিদ্রার আলী খাঁ আগে হইতেই কান্দীতে ছিলেন। ক্রপদী অগ্নাবব্দুও কান্দীতে ছিলেন। তাঁহার যোগেই কান্দীতে ক্রপদী অগ্নোর চক্রবর্তী, বীণকার মহেশ্রবানু, কলাবত্ত চিত্তাবনি বাপুলী ও ভৈরব বাগ্গেদৌ প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

এইসব ভণ্ডী গুরুদেব নামে ভূমিগত প্রণামেই তাঁহাদের জ্বরেব ভক্তি জানাইতেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোনো প্রভেদ ছিল না।

সম্ভাষ্য বিচার না করিয়া এইরূপ গুরুভক্তির কথা বুকাইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। রাজপুতানার বীর কবিগণ সাধারণত অত্যন্ত গবিত। ইহা সবেও তাঁহারা গুরু হইলে আচার্য্য মুসলমানের চরণেও অকুলনীয় ভক্তি জানাইয়াছেন।

বীরদলাবতার মহাকবি 'দুর্ধমজ ১৩৪ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার রচিত 'বংশভাষ্য' গ্রন্থে তাঁহার গুরু মুহম্মদের নামে লিখিয়াছেন, "সন্তোষদাম্প-আল্লার গদগব পুজক মুহম্মদ নামে গবিতচিত আমার মুসলমান অধ্যাপককে প্রণাম করি।"

সন্তোষাদি ভগ্নৈঃ পূৰ্ণং পুষ্টিভাৰ্য্যাপদমহম্ ।

ইতে বহুদ্ব্যতিথ্যং দাব্যভ্যাগকং যমঃ । পৃ ১৪

ঐহ্যেব সংস্টিতপ্তক বীণাবাদনতরজ্ঞ রাগভাগবিচক্ণ মুদলমান গুরুকেও তিনি ভক্তি করিতে
জোলে নাই। 'বংশভ্যক্তরে' তিনি শিবিয়াছেন—

বীণাবাদনতরজ্ঞ রাগভাগবিচক্ণম্ ।

শিক্টিতঃ পায়কায় বন্যায় বননঃ পোহপি যোহতাম্ । পৃ ১৬

তানসেনের পরিবারে অর্থাৎ বংশে ও শিষ্যশরম্ভায় তো হিন্দু-মুসলমান বলিয়া গুরুশিষ্যের
নথো কোনো ইতর-বিশেষ কবাই চলে না। এক এই তানসেন-পরিবারের আলোচনা করিলেই দেখা যায়
ভারতীয় সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মূলসাধনা বরাবর কিতাবে চলিয়া আসিতেছে।*

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে নানা জনে করেছেন। এই সকল আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের উল্লেখ বৈধাৎ পাওয়া যায়। কেবল চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব-বিচারের ক্ষতই যে এইদিকের আলোচনা দরকার তা নয়, তাঁর শেষ সৃষ্টি বংশবের সাহিত্য ও তাঁর মনের গতি বোঝাবার ক্ষত তাঁর ছবির বিশেষ মূল্য আছে; আমাদের মনে হয় কবি-রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিত্ররচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন, যে জগতের সম্ভাব্য বিষয় ইতিপূর্বে তিনি হারাতে এমন তীব্রভাবে অহুত্ব করেন নি।

ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন world-of gesture, যার কাছে রবীন্দ্রনাথের মতে world of meaning সামান্য। তাঁর শেষজীবনের রচনা 'রক্তকরবী' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা এই world of gestureকে অঙ্গসঙ্গ করে চলেছে।

একথা সকলেই জানেন যে, সাহিত্য প্রকাশ করে, তাত্ত্বিক বস্তু বিচারের সংঘাতে, বাক্য ও অর্থ এখানে তার সহায়। কিন্তু, ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ধরকার তার বৈহস্ত্য, যা শেষ ভাবকে ভঙ্গি এবং সেই ভঙ্গিকেই অঙ্গসঙ্গ বা আঙ্গুর করে আমরা পুনরায় উত্তীর্ণ হই ভাবের জগতে। শিল্পের গতি ভিন্নমুখী, আগে ভঙ্গি তার পরে ভাব তার পরে অর্থ। শিল্পের আধারের মনে দাগ ফেলে শব্দকে, কিন্তু তার ভাবগ্রহণে, তার অর্থ-উপলব্ধিতে বিলম্ব হয়। সাহিত্যে ভাব বোধবার এবং অর্থ মানবার পরেও তার দাগ মনে স্থায়ী হয় না, যদি না তা ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়। হুইই এক, কিন্তু হুইইএর গতি বিশপীতমুখী।

কাজেই world of gestureএর ধারণা কবিমাত্রেরই থাকবে। ছবি আঁকবার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের সে ধারণা ছিল, তা না হলে 'হে বিরাট নদী' তিনি লিখতে পারতেন না। তবুও, সে-জানা আর সেই world of gestureকে একান্ত নিবিড়ভাবে অহুত্ব করার মধ্যে পার্থক্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে এই উপলব্ধির নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু চিত্ররচনার মধ্যে দিয়ে তিনি যে এই উপলব্ধি বিশেষভাবে দৃঢ়করণ করেছিলেন একথা মনে করবার কারণ আছে, এবং সেইজন্যই চিত্রের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথের কাছে কবি-রবীন্দ্রনাথ যে কণী সে বিষয়ে সম্বন্ধের বিশেষ অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ধরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই খাঁচার কন্যার মতো রবীন্দ্রনাথ কর্ম ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে ইত্যাদি নানা বিষয়ে দৃঢ়-কিছু আলোচনা করেছেন তাঁরা কোনো বিষয়টিই তাঁর কবি-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি দর্শন দর্শনের কথা বলেছেন, তখন সে কথা হুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণতার সাহায্যে প্রমাণ করবার চেষ্টার নিষেধ উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন-মাত্র; দার্শনিক-

রবীন্দ্রনাথের মূলা আনাথের কাছে সম্পূর্ণ বদলে বাবে যদি আমরা কবি-রবীন্দ্রনাথকে একেবারে উচ্চ ক'রে তাঁর ণাশ্চর্য্যিকতার বিচার করি। তাঁর ছবির সম্বন্ধে ঠিক একই কথা; ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি তাঁর কবি-জীবনকে আর-একবার নূতন করে উপলব্ধি করলেন এবং এই উপলব্ধির ফলে তাঁর সাহিত্যচরিত্রের ভঙ্গি বদলে গেল এবং পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'বদাকা'র কাল পৰ্ব্বত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকৃতি ও মাহুয় মিলেছে হরগৌরীর মত। ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে পাণ্ডা দার প্রকৃতি হলেন ভূষ বা বেহু, আর মাহুয় সেই বেহুইর আবেগের প্রতীক। প্রকৃতির বেহুসৌন্দর্য ও মাহুয়ের আবেগ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। অর্থাৎ, প্রকৃতি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন কবির বর্ণিত। অতীতকালে কবি তাঁর বেহুর সীমা অতিক্রম করে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। কবির এই আনন্দময়তার দ্বারা 'মাহুয়' স্তম্ভিত। এসেছে, কবি বিম্বিত হয়েছেন প্রকৃতির আনন্দময়তার অসীম ক্ষমতা বেধে, তখন তিনি তাঁকে বন্দনা করেছেন আনন্দের প্রতীকরূপে— নিজেকে তিনি ক্ষুণ্ণ করে দেখেছেন, অথচ প্রকৃতির বৃক মাহুয়ের সে একটি আসন নির্দিষ্ট করা আছে সে সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাঁর মনে জাগে নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এটি অবশ্য একটি বিক দায়।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা গেল, এবং ১৯৩০ থেকে তাঁর ভিষাধানকাল পৰ্ব্বত এই পরিবর্তিত পথেই তাঁর কাব্যের গতি প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার মূচনাকাল ১৯২০ থেকে ১৯৩০।^১ তাঁর কাব্যের নূতন মূণ এবং তাঁর চিত্রবচনার কাল এক। কিন্তু সে আন্দোলনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অনেকেই এখন জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির আবিষ্কার তাঁর রচনার খাতার কাটাফুটির মধ্যে থেকে ছেগেছে। লেখার অগ্রয়োজনীয় বাস্তব-কথা অংশগুলিকে সংযুক্ত করে, প্রয়োজনীয় অংশকে আলাদা করে দেবার চেষ্টা ছাড়া, প্রথম দিকের খাতার পাতার যে নকশা দেখা যায় তাঁর অস্ত্র কোনো সার্থকতা ছিল না। এগুলির জন্ম প্রয়োজনের মধ্যে, এগুলির গতি বাস্তবিক পতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর পরে রবীন্দ্রনাথের লেখার খাতার একটু ভিন্ন রকমের নকশা দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এগুলির জন্ম প্রয়োজনের মধ্যেই, তবু প্রয়োজনের পরেও এগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট পতি দেবার চেষ্টা দেখা যায়। লেখার অগ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে কেন্দ্র করে নানা দিকে নানা গতিতে বেখার জাল তৈরি হয়েছে— এখানে একবার চেষ্টা লেখার অগ্রয়োজনীয় কাটা অংশগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে ফেলা।

এই চেষ্টার ফলে কতকগুলি আকার (form) ধরা পড়েছে তাঁর বেখার জালে। সে আকারে কোনো সাদৃশ্যত্ব নেই, শুধু আকারের ভঙ্গি আছে এবং সেই ভঙ্গি আকারের নির্ভর নয়, বরং বেখাঙ্কনের আশ্রিত। এই জাতীয় নকশার খেঁচ উদাহরণ তাঁর কোন পাতুলিগিতে প্রথম পাওয়া যাবে তা বলতে না পারলেও 'পূর্ববী'র পাতুলিগির নকশা যে এই বিক দিয়ে একটা চরম পরিণতকায় পৌঁছেছে, সে বিষয়ে সম্বন্ধ নেই।

১ রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মত ছবি এঁকেছিলেন, 'দ্বিগুণে' বার উল্লেখ দেয়া দায়, সে ছবির আন্দোলন এখানে অনাসঙ্গিক। এখানে আন্দোলনের দিন ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর ছবির ভবিষ্যৎকাল।

সাহিত্য বা শিল্পের আলোচনার আদ্যমুহুর্তেই কথ্যকথার উল্লেখ পাই। ছন্দ রসশব্দীর গ্রন্থবরণ। কিন্তু এই ছন্দকে কোনো আশ্রয় ছাড়া অস্বত্ব করা কঠিন। ছন্দের abstractরূপ বহুদূর পক্ষ, যেমন কবীর abstractরূপ কল্পনা করা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দ কবিতার গানে ব্যবহার করতেন অস্বত্ব সেই ছন্দের মূল রূপকে তিনি মনে ধরাছোঁয়ার মধ্যে শেলেম। এ এক অজাবদীর্ঘ ব্যাখ্যা। অর্ধ নৈই অথচ তার প্রাপণজিহ্বা অজাব নৈই; তাই নৈই অথচ ভিত্তিতে এই বেধার বচনা প্রাপণবত।

যাযা রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছুক তাঁদের এই বেধাছন্দের ছবিগুলি বিশেষভাবে সেবা দরকার, কারণ তাঁর ছবির গড়নের মূল উপাদান তিনি পেয়েছেন এই নকশাগুলি থেকে। বেধাবিজ্ঞানের মধ্যে যে কতকগুলি আকার অপরিসংখ্য কারণে প্রকাশিত হয়েছিল, একসময়ে রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে স্বতন্ত্র ক'রে নিলেন। ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এই রূপগুলি প্রকাশ পেল আবে। একই স্থিতিশীল (static) হয়ে। রবীন্দ্রনাথের ছবির এই প্রথম পর্ব। এগুলি কোনো বাধা কারণে হয় নি, এগুলির উৎপত্তি নিছক গড়নের আকারের থেকে। ফার্মান সমালোচকেরা এইগুলিকেই রবীন্দ্রনাথের সত্যাকারের স্থিতিকার বলে বীকার করেছিলেন।

পূর্বে বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের রচিত বেধার আলো যে গড়ন(form)গুলি ধরা দিয়েছিল সেগুলির সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। যখন তিনি এই গড়নগুলিকে স্বতন্ত্র ক'রে বেধবার চেষ্টা করলেন তখন থেকেই ধীরে ধীরে তার মধ্যে বেধা মিল সাদৃশ্যপূর্ণ। এই সময়ে তার বিচিত্র গঠন নানা ভিত্তিতে আত্মীয় আত্মীয় করে, ভবিষ্যৎ মধ্যে আদ্য। আভাস পাই সাদৃশ্যের, কিন্তু গঠনে কোনো সাদৃশ্য বৈধব্য থাকে এবং যখন থাকে তখন তা বিশেষ অঙ্গসজ্জা ও বিরোধ করে আবিষ্কার করতে হয়। এই বন্ধনের একটি ছবি ত্রিগ্রন্থবোধের সেনের 'ছন্দোক্ত রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের বলাটে মুদ্রিত হয়েছে। হাতের তালিটি ঢেকে মিলে ধরা পড়ে এটা মাছের কি মূল কি অঙ্গ কিছু অথবা কিছুই নয়। আরো-একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে যে, এই তালির সাদৃশ্য বাহ্যিক মিলে যে গড়নটি বেধিয়ে আসে তা ইমারতের মত স্থিতিশীল। রবীন্দ্রনাথের ছবির স্থিতিশীলতা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে বেধা মিল ইমারতের ভাবি জ্যামিতিক গড়ন নিয়ে। সাদৃশ্য এখানে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তা অস্বত্বভাবে প্রকাশিত। এখানেও ভিত্তিতেই সাদৃশ্য প্রকাশিত কিন্তু স্বতন্ত্র গড়নও নিজের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে; অস্বত্ব ভিত্তি রচিত হয়েছে যার পরিচয় কোনো প্রাথমিকের বিবরণে নৈই কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেখানে বর্তমান—অন্তিমাকৃত রূপকে সে সত্য করে সামনে উপস্থিত করে। ১৯০০ সালের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষরকমের রচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার ছবিগুলি দেখতে দেখতে কেউ যদি 'রক্তকবীর' কথা স্বপ্ন করেন তাহলে তিনি এই দুইএর মধ্যে আত্মবিল লক্ষ্য করবেন।

কেউ কেউ মনে করেন 'রাঙ্গা' নাটকের রাঙ্গা এবং 'রক্তকবীর' রাঙ্গা একই রকম। মিল হচ্ছেতো কিছু আছে, কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। কেউ যদি কালির আঁচড়ে আঁকা একটা ছবি দেখে পাখর কেটে মুদ্রিত গড়নে তাহলে মিল হচ্ছেতো দুইএর মধ্যে কোথাও থাকবে কিন্তু তঁকায় হবে আসমান-মদিন। এই রকম তথ্য 'রক্তকবীর'তে ও 'রাঙ্গা'তে।

'রক্তকবীর'র রাঙ্গাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ কথ্যবা কিছু

নেই; যেমন অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মাথানে এসে মূর্তি বেশি না, কিন্তু জ্বালি মাথানে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ। 'রক্তকবরী'র রাজা প্রকাশ পেয়েছে ভাব ভাষা বা তার অর্থের দ্বারা নয়—বলবার ভঙ্গি বলবার ভঙ্গি হাতের মুঠোর মত জন্ত নিয়ে রক্তকবরীর রাজা রূপের মগতে জীবন্ত। 'রাজা' নাটকের রাজা ভাষার নীহারিকার মধ্যে ভাবের আভাসে শুধু তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়—আকারে-ইচ্ছিতে নিজেকে প্রকাশ করে না।

'রক্তকবরী'র ভাবকে আকার দেবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই সময়ে যে একটা দিক-বলন করেছে তা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে 'যোগাযোগে' এবং পরিণতি লাভ করেছে 'শেখের কবিতা'র। ভাবগদ্য 'ছেলেবেলা'র বেধা দিল এই ভাষার চিত্রময় রূপ। 'ছেলেবেলা'র ভাষার গাঁথুনি অসাধারণ কিন্তু তাতে ছন্দোবেগ ও ছন্দোবৈচিত্র্য কমিয়েছে তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। 'রক্তকবরী'র কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিত্রিভাষা প্রকাশ পেয়েছে প্রধানত গদ্যের আশ্রয়ে। কিন্তু তার এই পদ্যরচনা 'গল্পগুচ্ছ' বা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের গদ্য নয়, তাঁর দৃষ্টি ও শ্রুত্ব্যের বিবরণ আলোচনার গদ্য নয়। এখনকার এই গদ্য পাথরে-পীণা ইমারতের মত—ভাব এখানে আপাতদৃষ্টিতে বেধতেই পাণ্ডা হয়ে না—বাক্যের গাঁথুনি দিয়ে চারদিক থেকে ভাবকে বেন হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরবার চেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই যুগে আর-একখানি বইএর উল্লেখ করছি। 'যোগাযোগ' উপভাষাটি 'গোষ্ঠা' বা 'ধরবাইয়ের' মত নয়। ছবির সঙ্গে ভাবার্থের যে তফাৎ 'যোগাযোগে'র সঙ্গে 'ধরবাইয়ের' ও 'গোষ্ঠা'র সেই তফাৎ। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সকল চিত্রা, সকল সন্যাস, সকল উপলব্ধি ছন্দেই আশ্রয়ে তার গতিবেগ পেয়েছে। যেখানেই কোনো বস্তু মূলভাবে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে সেইখানেই তিনি নানা অলংকারে, নানা বাক্যের কংকারে সেই বস্তুর মূল্যবোধ আঘাতের কুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেমন, 'স্থিতি পাষণ্ড'এর বর্ণনা অসাধারণ অতুলনীয় কিন্তু তা কেবলই আহাষের বস্ত্র বেধায়, বস্ত্র কোনোটাই ধরাচ্ছে দ্বার মধ্যে আসে না; বিরাট অষ্টাদিক, অগাধী পর্বতের বড়, দ্বিতীয় অগাধীর বেশদানের মত সজ্জিত রূপ—কিন্তুই ধরতে পারি না। একেই বোধ হয় গতিতত্ত্ব বলেন যোগ্যসিদ্ধির মত।

মাই হোক, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ গল্পকে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন কল্পনেন কেন সে বিষয়ে কোনোদুশ্কা হওয়া সম্ভব। চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কবি-রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলেই আমাদের মনে হয়।

বিচিত্রবর্ণাঙ্কিত রসময় এবং বহুকবিশিষ্ট অষ্টাদিকায় যে প্রভেদ, কবিতার ভাষা ও গদ্যের ভাষার সেই প্রভেদ। বস্তুর সত্যকে ইমারতের মত করে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথ গদ্যের দিকে তুঁকেছিলেন; কিংবা উদ্বেগপাথনের মধ্যে তাঁকে গদ্যের বাঁধন এবং গদ্যের যে সত্যবনা তার অসুস্থজ্ঞান করতে হয়েছিল। 'রক্তকবরী'র পর 'যোগাযোগে' আরও পাই যেমন ইমারতি বাহার তেমনি গঠনের কাট্রি। 'শেখের কবিতা' কিন্তু ইমারত নয়, এ হল তাম্রমহলের আলিঙ্গন; স্থাপত্যের অলংকার, কিন্তু স্থাপত্য নয়। আবার, 'স্থিতি পাষণ্ড'এর বর্ণনায় ভাষার সঙ্গে ও এম তুলনা চলে না।

'রক্তকবরী'র কার্দ (১৯২৪) থেকে 'শেখের কবিতা' (১৯২৮) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষার ভাবে চিত্রায় বা পরিবর্তন দেখা যায় তার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর কবিতার রূপকারের মত গঠনপ্রিয়

হ'য়ে উঠেছে। এই গঠনশ্রিয়তার প্রথম ইঙ্গিত তিনি যেথৈ পেছেন তাঁর ছবিতে এবং সেই ছবির প্রথম আবেগ শেষ হয়েছে 'বোণাযোগ' রচনাকালের (১৯২১০) মধ্যে। 'শেখের কবিতা' রচনার সময় তাঁর চিত্রের দিক-পরিবর্তন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের মনের গতি যে অর্থের চেয়ে ভাবের দিকে, ভাবের চেয়ে রূপের দিকে, গতির চেয়ে স্থিতির দিকে হুঁকৈছিল তার পরিচয় আরো পাওয়া যায় তাঁর পুরাতন নাটকের সংশোধিত সংস্করণ পড়লে।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্যকাব্য 'পুনর্ভ' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবর্তন আর শেষে সীমার এসে পৌঁছয়। এর পরে চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ ভাবের চেয়ে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছেন বেশি। বর্ষে যেবার তাঁর ছবি সৃষ্টি হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, বে-সময়ে তাঁর চিত্র অলংকারে ভূষিত হতে চলেছে, সে-সময়ে তাঁর কাব্য নিরলংকার হয়ে আসছে।

শ্রীমুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'ছন্দোপক রবীন্দ্রনাথ' পুথকে গল্যছন্দে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "অতিনিরূপিত ছন্দোবদ্ধবিহীন কবিতা ও অতিনিরূপিত ভগ্নবেধাধীন চিত্রশিল্প রচনায় তিনি যে একই সময়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেটা বেহাৎ আশ্চর্যকর নয়।"—আশ্চর্যকর তো নয়ই, যা তিনি করতে চেয়েছিলেন তার ইঙ্গিত তিনি শেষেছিলেন তাঁরই রচিত ছবির অগৎ থেকে। এই ছবির অগৎ থেকে তিনি world of gesture আবিষ্কার করলেন এবং বেথলেন অর্থহীন না হলেও গঠন-রূপ মাত্রই নিঃক্ষেপে ব্যক্ত করতে পারছে। অর্থের আশ্রয় নিয়ে যেমন ভাব ব্যক্ত করা যায়, তেমনি গঠন-রূপ তত্ত্ব ভাব দিয়ে ভাবের অগতে নিয়ে যেতে পারে— ছবির ক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটি পেলেন এবং তাহার সেই উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর শেষকীর্তনের বহু রচনা এই প্রবাদই দেয়।

'রক্তকরবী'র পরে 'পুনর্ভ' কাব্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এমন ভাব এমন ভঙ্গি পাই যা ট্রিক পারফর্ম বজায় রেখে চলেছে বলে প্রমাণ করা শক্ত। 'শিশুতীরে'

যাত কত হল ?

উত্তর যেলে না।

কেননা অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের পোনোকাঁথা'র ঘোঁষে, পথ অজানা,

পথের শেষ কোথায় খোলা নেই। —পুনর্ভ

প্রকৃতি এই প্রথম নিরুত্তর হইলেন কবির প্রাণে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কাছ থেকে তাঁর সকল প্রসেইরই সীমাশূন্য পেয়েছেন। এবার যখন উত্তর পেলেন তখন তিনি বুঝলেন যে, বহুদূরকে একদিন তিনি 'ওগো মা ক্ষমারী' বলে সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল ক্ষমারী মাতাই নন, তার অস্তিত্বও আছে। তাই সেই মহাধীরবতী বীরভোগ্যা পৃথিবীকে প্রশ্নই নিবেদন করেছেন কোনো আশা কোনো প্রত্যাশা না রেখে। বলেছেন—

অস্বপূর্ণা তুমি স্বপ্নবতী, অরবিক্তা তুমি জীবাণু।

একদিকে আগকথান্নভাবের ভোমার শব্দক্ষেত্র,

সেখানে এসয় প্রভাতসূর্য প্রতিদিন দূছে নেহ নিশিরবিবু

কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

অন্তগামী সূর্য ভ্রামলমণ্ডলিকোলে দেখে যায় অবশিত এই যান্ত্র—

“আমি আনন্ডিত” । —পত্রপুট (১২০৬), ৩

‘শিশুভীষ্ম’ ও পর ‘শত্রুপুটে’র “আমি আনন্ডিত প্রণতি” দেখলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ কোন্ পথে অগ্রসর হইলেন ।

‘পূর্ববী’ (১২২৪) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বজীবনের ইতিহাসের পূর্ণচ্ছব টেনেছেন ; তাৎপর্য শুক হইছে তাঁর নূতন জীবনের অলুপঙ্কান । কবি-রবীন্দ্রনাথের এই অলুপঙ্কানের পথে সহায় হইয়েছিলেন চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ— এই আবার বক্তব্য ।

পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রচিত্রের পরিণতি খটেছে ১২৩০এর মধ্যে । তাৎপর্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর ছবি নানা সাদৃশ্যবৃত্ত হইছে অর্থাৎ অর্ধবৃত্ত করে ভগ্নকে ছবিরগ্রাহী করবার চেষ্টা চলেছে— বর্ণের বৈচিত্র্য ও মৌল্য বেড়েছে, অর্থাৎ তাঁর সেই প্রথমদিকের আকস্মিকভাবে-পাওয়া ভগ্নগুলিকে নানাভাবে তিনি সাজিয়ে চলেছেন ।

এই সঙ্গে তুলনীর তাঁর কাব্য ও কাব্যের ভাষা । কবিতা হয়ে এসেছে নির্যাতন তাপসের মত, একদিকে যেমন তাঁর উদাসীনতা অন্তরিকে কিছুই তার কাছে তুচ্ছ নয় । অতিসাধারণের সঙ্গে অতি-নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছাই এই সময়ের কাব্যে প্রকাশিত হইয়েছে । এখন রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিমূর্ত্তের ‘প্রতিটি চিত্রা প্রয়োজনীয় নয়, প্রতিটি মুহূর্ত্ত স্পর্শ করাই তাঁর প্রয়োজন—

অন্তঃপ্রাণ মাঘের বৌরে অকারণে ছবি এলো চোখে

জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল বাহা অনতিগোচর ।

—আরোগ্য (১২৪১), ৪

এখন থেকে তিনি ভগ্নমণ্ডলকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাইছিলেন এবং বতই তিনি তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেতে চেষ্টা করেছেন ততই অগ্র অগেয়ে । এই বিজ্ঞান ‘জগদ্বিনে’ (১২৪১) গ্রন্থের ছবিতে ছবিতে পাওয়া যাবে ।

বে প্রাণের তরঙ্গ তাঁর কাব্যে ছন্দের সোলা দিয়েছিল সেই প্রাণের তরঙ্গই আন বাধা—

প্রাণের হস্ত-ঢাকা

তরঙ্গের বহনিকা-‘শব্দে

চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,

এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—

সম্পূর্ণ যে আমি

রয়েছে গোপনে অগোচর ।

নব নব জগদ্বিনে

যে রেখা পড়িছে আঁকা— শিল্পীর তুলির টানে টানে

ফোটে নি তাহার হাতের ছবির চরম পরিচয় ।

শুধু কবি অহতব,

জগদ্বিনিকে অব্যক্তের বিরাট প্রাবন

বেটন করিয়া আছে দিবসযাত্রিরে । জগদ্বিনে, ২

১৮

এ যেমন একটা দিক, তাঁর পরবর্তী সাহিত্যের তেমনি অন্য একটা দিক আছে— সাক্ষাৎ পরিচয়ের আনন্দ। কি, কেন, কোথায় কোনো প্রশ্ন সেখানে নেই—

নিবিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আদ্যা মাঠে বাটে

— মহাশবের টিনের ছায়ে,

শাকসবজির কুচি চূপড়িতে,

আঁটিখা খড়্গে,

হাড়িমালসার স্পর্শে,

নতুন শুড়ের কলসীর গায়ে

সোনার কাঠি ছুঁয়ে মিল

মহানন্দ পাছেব ফুলের মজরীতে। —পত্রপুট, ৫

সোনার রোষের বহু বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রয়েছে— অগ্নিবীণার সৌন্দর্য, কিন্তু এই বর্ণনা তির্যক্‌রয়ে। সকালের এই রোষ কোথা থেকে এসে, কে পাঠালে এ বকম কোনো ভাব নেই, তবু কৃত্রিতে কলসীতে ফুলের মজরীতে রোষ যে পড়েছে এ সত্য যেন ছবি হয়ে ভেগে থাকে, এ ভোলা চলে না। বিল্যাপ্তি নন্দন-শাস্ত্রবিদ্যা একটাই বোণ হয় objectivism বলবেন। কিন্তু এই সংজ্ঞার সবটা ধরা ধাবে না, কারণ ‘মুদ্রা’ এ পৃথিবীর বা কিছু তিনি তাঁর নতুন প্রেরণার বেগছিনেন প্রত্যেকটিকে আপন সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে পাচ্ছেন, বস্তু ও ঘটনা এখানে তাঁকে ইচ্ছিতে চালিত করেছে অর্ধশূন্য ভাবাধীন এক জগতে। এক সময় তাঁর কাব্যে বেশি ছন্দ থেকে ভাব, ভাব থেকে অর্থ— কিন্তু যে কালের কথা বলছি সেকালের কাব্য রূপ থেকে রূপের ভিত্তিতে ভেগেছে— যে ভক্তি অবস্থির এক অল্পকৃত্রিতে পৌঁছে যায়।

যে সময় তাঁর কাব্য এতদিন অর্থকে এড়িয়ে চলেছে বাবে বাবে, সে সময়ে তাঁর ছবি নানা অর্থে ভরে উঠেছে। পূর্বে বলেছি যে, ‘পুনর্ভ’ থেকে এই পরিবর্তনের সূত্র। এই সময়ের ছবি কিন্তু ক্রমশ ভাব-বাক্য হয়ে উঠেছে। নানা প্রকৃতির নানা মুখভাব নিয়ে নরনারী তাঁর চিত্রে বেধা দিয়েছে। এতই পাশে পাশে বেশি নানা বর্ণের প্রাকৃতিক বৃত্ত, নানা বয়েসের ছল আর পাখি। যখন এইসব চিত্র আঁকছেন তিনি তখন তিনি ১৯৩০ শেরিয়ে এগেছেন, গম্যকবিতার প্রথম পর্ব শেষ হতে চলেছে। এই আলোচনার শুরুতে ‘হরকরবী’ ইত্যাদি তৎকালীন কাব্যের সঙ্গে সমকালীন ছবির তুলনা করেছি এবং সংঘাতের চেষ্টা করেছি দু’এর অন্বনিহিত মিল। শেষবিকের এই ভাবব্যঞ্জক ছবিগুলির সঙ্গে সমকালীন কাব্যের তুলনা করলে বেশি উভয়ের পার্থক্য কতটা।

একদিন যেমন কবি-রবীন্দ্রনাথ চিত্রের দ্বারা আবিষ্কৃত world of gesture-এর মধ্যে নিয়ে এলেন কাব্যকে, তাকে এমন রূপ মিলে না প্রায় হাতের ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, রূপের সঙ্গে রূপের পরিচয় নিতে নিতে কবি যখন চলেছেন, তখন চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করছেন চিত্রের অর্থও অব্যাহীন গড়নকে ভাবের ব্যক্তা নিয়ে পরিচয়ের জগতে নিয়ে আসতে। এই, চেষ্টার রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালের শক্তিক ঠাণ্ডাতে চেয়েছেন; মায়াব খেলা কড়ি কোমল ও মানসীর নরনারীরা ফিরে এসেছে ব্যাক্যের অলংকার ছেড়ে বর্ণের অলংকারে। তাঁর পদা, বলের ধারে পাভাবেরা কুটির, ঘরের ‘গরে হুয়ে-

গড়া নিম্নের আধা, এইসব ছবি, যা ছিল কাব্যের গটকুমি, সেইগুলিই বেধা দিবেছে সেদিনের সেই স্মৃতি নিয়ে।

১৯৩০ এর মধ্যে স্ববীজনাথের চিত্রের বিবর্তন একটা সীমায় এসে পৌঁছেছে আর তাঁর জ্ঞান্য চলছে নূতন বিবর্তনের পথে। সে বিবর্তন তাঁর সাহিত্যকে লেখায় নিয়ে গেছে সে আলোচনা করেছে। সাহিত্য এখন চলছে বস্তুর ইঙ্গিত অহুসরণ করে, ছবি তখন চলছে স্মৃতির অগুণ্ডে, অতীতের দিকে। তাই মনে হয়, যে ছবি তাঁকে প্রথমে একটি নূতন সত্য দিয়েছিল, যা তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন— কাব্যে সেই সত্য দ্বিতীয় প্রকাশিত হয়েছে, ছবির ক্ষেত্রে অহুসরণ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত ছবি হয়ে উঠেছে তাঁর অবলম্বনবিমোহনের বস্তু; যা তিনি পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন ভাবে ভাষায় একধীন তাঁর সাহিত্যে, সেইসব ভাব ও ভাবনাকে বস্তুর অলংকার তিনি দিয়েছেন কিন্তু কোনো নতুন আবেগ কোনো তাঁর উদ্দেশ্যকে আগাতে তিনি চান নি। প্রথমজীবনের কাব্যে যেমন ব্যাংলাংকার সকল অতাব পূরণ করেছে এবং সকল দুর্বলতা ঢেকেছে শেষজীবনের ছবিতে বর্ণের স্থান সেই স্বকম।

কবি-স্ববীজনাথ ও শিল্পী-স্ববীজনাথের সম্বন্ধটা আবার মনে পড়ি তবে প্রতিভাত হইবে তাই পথিচর বেধার ক্ষেত্র স্বলম্ব। এ আলোচনা অব্যক্ত সম্পূর্ণ নয়। তার কাব্যে বিভিন্নদৃষ্টী তাঁর প্রতিভা— তাঁরই যচিত চিত্রের জটিল বেধাখালের মত জীবনের নানা দিকে তা প্রসারিত। আরও বড় বাধা তাঁর প্রতিভার ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ গতি। যদিও তাঁর প্রতিভার গতি দীর্ঘ, তাঁর পর্যবেক্ষণ কিন্তু দৃঢ় ও হ্রসিন্ধিত। কখনই কোনো-একটা সীমাংসায় নিশ্চর করে পৌঁছানো কঠিন। হুতম্বাং সে হুতম্বাং চোঁচর প্রবৃত্ত হইনি। বার্মা স্ববীজনাথসাহিত্য গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁরা আবার এই আলোচনাকে আবার মনের দিগ্ভাসা বলে গ্রহণ করবেন।

ত্রিবিদ্যাবিহারী মুখোপাধ্যায়

শাঙ্খিনিকেতনে স্ববীজনাথের (৮ অক্টো ১৯৩০) গতি



স্ববীজনাথ 'কল্ক'র অঙ্কিত

'হ্রস্বোক্ত স্ববীজনাথের' বলাটে ব্যবহৃত। স্টাফ দর্শনান সত্য পৃ ৫৫



ফকিরমোহন সেনাপতি

১৮৪৫—১৯১৮

ভারতীয় সাহিত্য

ককীরমোহন সেনাপতি : ওড়িয়া সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি

উপন্যাসের সৃষ্টি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশেষ লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রাচীনেরা সম্ভবত সাহিত্যের "সাদাচ্ছা" রাখিয়া গান নাই, "সাহিত্যসম্রাট" কথাটি বহুমুখের বিষয়ে যেমন খাটে, বিজ্ঞাপতি-চিন্তাধারের বিষয়ে তেমন মানায় না। কাব্য নটক উপন্যাস— এই তিন ধর্ম সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হয়, সাহিত্যগ্রন্থ সমালোচনাগ্রন্থ ছোটগল্প প্রভৃতি ধর্ম ইহাদের উপাঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, তবে প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে কাব্যের বে সন্ধান ছিল, বর্তমান যুগে তাহার বানিবট্টা, কেহ কেহ বলিধেন অনেকটা, উপন্যাসের প্রাণ। প্রবেশভেদে উপন্যাসের আকার ও প্রকারের ভেদ হইয়াছে। বহুমুখের এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশকেও পথ দেখাইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র, গুজরাতে ও ত্রিবিড় প্রদেশগুলিতে লোকের জাহার অল্পবর্তী হইয়াছে। তিনি আর এমন শুধু বাংলায় নহেন, সমগ্র ভারতের উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা, আধি-উপন্যাসিক, একথা অত্যুক্তি নহে। উড়িষ্যার ককীরমোহন বহুমুখের দরদারিক এবং আমোদেও তিনি দরদারিক— তাহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, বহুমুখের প্রথম সূত্রের উপন্যাসগুলির রচনাকালে; আর তাহার শেষ-প্রকাশিত রচনার তারিখ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ, যখন বাংলার সঙ্কল্পের আবির্ভাবে সাহিত্যে নবচেতনার লক্ষণ হইতেছে।

বর্তমান যুগের ওড়িয়া সাহিত্যে মুখ্যত তিনজননের সৃষ্টি বলিয়া মনে করা হয়— বাণানাথ, মধুসূদন, ককীরমোহন। ইহার মধ্যে বাণানাথ বিশেষ করিয়া কাব্য-রচনা, মধুসূদন বিশেষ করিয়া ছোট ছোট কবিতা ও গল্পগ্রন্থ-রচনা, ককীরমোহন অল্পবর্তী সাহিত্য ও উপন্যাস-রচনা পাবদর্শী হন। বাণানাথের পূর্বপুত্র বকীর ছিলেন, মধুসূদনের মহারথী; উভয়ে ইংরেজি শিক্ষার শিক্ষিত ও সরকারি শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কর্মচারী ছিলেন। তিনজননের মধ্যে শুধু পরিচয় নয়, আত্মকথার আন্তরিক সৌহার্দ্যও ছিল। সাহিত্যিকদের বন্ধুত্ববন্ধনের লক্ষ্যে বাহাদুরের অহুয়ান, তাহার ইহাদের ভাবদানধার অনেক ঐক্যবন্ধনের পরিচয় পাইবেন। এই তিনজনকে আশ্রয় করিয়া ছুটিখা উড়িষ্যায় বর্তমান যুগের ওড়িয়া সাহিত্য। আর তাহার লেখক ও পাঠকের অভাব নাই, বর্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ চর্চায় আয়োজন হইয়াছে, হৃদয় অতীত সময়ে তাহার গবেষণা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার আরও যে এই জরী হইতে, তাহা এ-প্রসঙ্গে সর্বাঙ্গে সংঘী।

ককীরমোহন অল্প প্রবেশ উপন্যাস-রচনা প্রবৃত্ত হন নাই। 'পূর্বে বলিয়াছি, তাহার প্রথম-প্রকাশিত রচনার তারিখ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ; সে রচনা ঐশ্বর্য্য বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রণীত কীজনচরিতের অল্পবর্তী। তাহার পূর্বে তিনি কটনাবল জীবনব্যাক্য অবকাশে বিদ্যালয়ের, পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তক ও হামার, চারি পর্ব মহাত্মার ও সমগ্র ঐশ্বর্য্যগবদ্বীতার পদ্মাহবাহ রচনা করেন। এইভাবে তাহার ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত অতিবাহিত হয়। এতদূর বৎসরের সাহিত্য-স্রবন প্রায় অল্পবর্তী-সাহিত্য লইয়াই কাটিয়াছিল। পরবর্তী কালে বিল হরিবংশ ও উপনিষদেরও তিনি পদ্মাহবাহ করেন; তাহার ছানোপা উপনিষদের অল্পবর্তী প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, বহুবার দুই বৎসর পূর্বে। ইহা ভিন্ন

ঐহাব রঙ কবিতার সংগ্রহ ‘অবলম্ব-বালসে’ অথবা ‘উপহাব’ দেখালে যদিও কখনো চিত্র-বিশেষের সার্থক হইয়াছিল। তৎপূর্ব কালের কবিতা লইয়া তিনি ললিতবস্ত্র ও কয়েকটি বাণী পুস্তকের সহায়তায় বোধোত্তমতা কাব্য রচনা করেন। ওজন করিলে বা পৃষ্ঠা গণিলে কাব্যাহ্বাবের পরিমাণ বেশি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্রয় এতদূর ঐহাব মুখ্যকর্ম বলিয়া বনে কবি না, আশ্রয় বনে কবি ঐহাব প্রদান কর, ওজস্বিতা উপভোগ রচনা। ঐহাব ‘হু নাগ আঁঠু শুঁঠ’ প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে, ‘মাদু’ ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে, ‘লক্ষ্মী’ ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে, ‘প্রায়শ্চিত্ত’ ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে। এই চারিটির বিষয়ে সাদাক্ষর কিছু বলিয়া ককীরবোধনের পরিচয় দিব। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমের মাত্র পাঁচ বৎসরের ছোট, কিন্তু এখন উপভোগে লিপিতে আরও করিলেন, তখন পঞ্চাশের উপর বয়স হইয়া গিয়াছে, কেশব বঙ্কিম কেহই তখন ইচ্ছাপূর্ণ নাই। চারিটি উপভোগের ভিন্নটি ককীরবোধন লেখেন সত্তর বৎসর বয়সের পরে— ইহাও লক্ষ্য কবিবার মত।

‘হু নাগ আঁঠু শুঁঠ’—‘নাগ’ ও ‘শুঁঠ’ জমির পরিমাণ। ইহা গ্রাম্য জমিদার রায়চন্দ্র মহারায়ের বাসভিট, পূর্বে সবে সর্বস্বত্বাধারের কল চিত্রও বটে। পবিত্র বাহিরা ও তাহার স্ত্রী সারিয়ার সখ ছিল শুধু এইটুকু জমি; রায়চন্দ্র কেমন করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে তাহারের হাত হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সর্বস্ব হারাইয়া বাহিরা কেমন করিয়া পাগল হইয়া গেল, সারিয়ার প্রাণ হারাইল, ইহা তাহারই দরদর কাহিনী। কিন্তু পাশের জমি হয় নাই— রায়চন্দ্র ও তাহার সখীরা শান্তির হাত এড়াইতে পারেন নাই, পাশের ফল ইহাঝরনে সেহে বনে সর্বস্ব হুগিতে হয়, লোক ইহা শিকা হিবার সোত সাফলাইতে পারেন নাই। এই উপভোগে গ্রাম্য পরিবেশ অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পাশের ও প্রলোভনের বশে মাদুরের বন কেমন করিয়া লাভ্য বের তাহা লেখক দেখাইয়াছেন, ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের মত পুশি ও আদালতের বিচারবিভাগে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ডিকেন্সের মতই কলপনের বিস্তারিত কল্পিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। জমিদারের স্ত্রী সান্ত্বনীর ব্রহ্মসূত্র পড়িলে স্বীকার করিতে হয় যে লেখকের কলমের জোর আছে। গ্রাম্যসুত্রবর্ণনার কৃতিত্ব ছাড়া এই গ্রাম্য উপভোগে ককীরবোধন যে তাহা অবলম্বন করিলেন তাহা জোহালো, তাহা অতিবাত্রায় সংকটবর্ষে তা নহেই, তাহাতে বরং আধুনিকতায় আশ্রয় আছে; বেলব কথা গ্রামের লোকেরা ব্যবহার করে এবং হৃদতো শিক্ষিতদের চেয়ে স্পষ্টভাবে যেহে ও অল্পতর করে বলিয়াই প্রমাণ করে, ককীরবোধন সেইসব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই উপভোগের বাহ্যে বৎসর পরে ঐহাব দ্বিতীয় উপভোগ ‘মাদু’ প্রকাশিত হয়। এই ষাণ্ম বর্ষ কিতাবে কাটিল, জানি না। ইহাও গার্হস্থ্য উপভোগ, সমাজের চিত্র। নরহরি তাগিনের, তাহার মাতুল ‘মাদু’— নটবর দাস— হইলেন উপভোগের শত্রুতান, ‘villain’। কিন্তু উপভোগ ছড়িয়া আছে নরহরির মা টামখনি। বঙ্কিম কাহিন্য (কটের উপভোগেও যেমন আছে) ককীরবোধন নাহে নাহে পরিচ্ছেদ আরও কবিবার পূর্বে সংকট মোকের এক-আধ টুকরা বসাইয়া গিয়াছেন। যেমন, টামখনির বদলকুতার প্রথমে গিয়াছেন বহুভাষার স্রোত— ‘বাস্তব্য বহুভাষা হইয়া: স-সুটমু-কটরা...’ এখানেও সেই পেশকার, নৃসিংহ, পরিচয়িতা চিত্রা, প্রকৃতির চরিত্র চিত্রণে ককীরবোধনের বর্ণনাপঞ্জি পরিচয় যোগে, রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট। বর্ণনাবিধানের ঐহাব ‘মাদু’ হইতে কটক-জোলে নটবর দাসের প্রায়শ্চিত্ত আরও কবি উক্ত বহি—

কটক রেলখানা মধ্যরে গোটাএ হাষত ঘব— কোঠা ঘরটা নিহাত বড় বা সান হুহে—
মধ্যস্তমি। কাহ উপরে ওড়িকাঠর হাতে লক্ষ্য তলসু চাবিগটে আঠগোটা গোলাল্লার তথা—
সাবুতাবার বাহানু গবাক বোলাবাএ। এহি কণা বাটে তা মাকিক আসুখ ও পবন থর নবাহ
আদিবাএ। গোটাএ বড় ঘর— কাঁউলি কবাট লগা। কবাট কাঠ পটাভিড়া হুহে, নোটা নোটা লুহা
লুটিন লুহা বতা মধ্যরে গলাবাই প্রস্তত। মোটা লুহা শিল্লিলে দুই কবাট ছলা বাই— গোটাএ বড়
শিতল তাল্লা পড়িছি। গোটাএ মায় বীণবে বিজি বিজি হোই আসুখ অসুবিবাক চিত্তরর হাল
বাহার মোক শকারে সেবিবার অহবিধা হএনারি। বাহার ভগৎ সঁকে ঘরর মধ্যভাগ সম্পূর্ণরূপে
সম্পূর্ণরূপে— একাবেলকে নিম্বত। [৩৩ পরিচ্ছেদ] [গোটাএ—একটা ; সান—ছোট ; পট—বিক,
হাতে—এক হাত, বিজি বিজি—মিটি মিটি।]

তৃতীয় উপগ্রাস লছবা, পার্শ্ব উপগ্রাস নহে, ঐতিহাসিক। রামশঙ্কর মায় ইহার পূর্বে
ওড়িয়া 'বিবাসিনী' উপগ্রাস লিখিয়াছিলেন, স্তব্ধাঃ লছবা ওড়িয়ায় প্রথম ঐতিহাসিক উপগ্রাস নহে—
সেনিক বিদ্যা রামশঙ্কর মায়ের উপগ্রাস ওড়িয়ায় প্রথম উপগ্রাস। 'বিবাসিনী' ৩১ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ
মারাত্মা আঘলের কাহিনী। ককীরবোবনের তুলনায় বহিমচন্দ্রের উপগ্রাসের সহিত ইহার সাপেক্ষ
বেশি। লছবা পশ্চিমাকলের বেয়ে, স্বামী ও পিতামাতার সঙ্গে পুত্রীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল,
পথে মারাত্মা দস্যবের হাতে পড়ে, হুহে লকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। লছবা নিজে একদিকে পলায়,
স্বামী একদিকে দায়, লছবার বাপনা দস্যবের আক্রমণে মারা পড়েন। অসহায় লছবা নিশটে রাইবখিয়া
পড়ে আশ্রয় লয়, দুর্গাবিগতির স্ত্রী তাহাকে নিজের কস্তারূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু বেগে তখন যোগতর
অশান্তি, ধন জন মান বর্গীয়া কিছুই নিবাণর নহে, বর্গীয়া গড়ও আক্রমণ করে। দুর্গাবিগতি
তাহার সঙ্গে হুহে প্রাণ হারান, তাহার স্ত্রী স্বামীর চিত্তার প্রাণ বিসর্জন দেন। বেচারি লছব
পানওয়ারির সঙ্গে বর্গীসের শিবিরে যোগাধেরা করে—উদ্বেত, প্রতিশোধ। এদিকে লছবার স্বামী
কটনাক্রমে নবাব আলিবর্দী খান অল্পপ্রভাজন হইয়া মারাত্মা দস্যবের উপর চড়াও হন। পিতামাতার
বৃত্তার ভ্রম উভয়েই উদ্বেত ছিল, ভাঙ্কর পণ্ডিতকে নিহত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। প্রতিশোধ
গ্রহণ করা হইল, কিন্তু ছত্রবেগে ভ্রম উভয়ে উভয়ে চিনিতে পারিলেন না। তা বা হুইক, প্রতিশোধের
শেষে উভয়েই তিরণবে গয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, পিতামাতার স্তম্ভের উদ্বেত। মনমানে বধন
ময়োভাবের সময় পূর্বপুরুষের নাম করিতে হইল তখন কঠোর উভয়ে উভয়ে চিনিতে পারিলেন—
ইহাই হইল "অপূর্ব মিলন"। উৎকল সাহিত্য-নাটক ওড়িয়ায় বিশিষ্ট নাসিক পত্রিকায় বধন ইহা
ব্যাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন ইহার এই নামই ছিল।

তাঁহার প্রারম্ভিক ১১১৫ সালে প্রকাশিত, ২৫ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ইহার বিষয়বস্তু দুই
পরিবারের কলহ ; প্রণয়বেতাব ভেটা সবেও মিলন হইল না, কলহই থাকিয়া গেল, উভয় পরিবারেরই
সর্বনাশ। সাময়িক বৈকল্যের পটভূমিতে বিজ্ঞানবাহু বহাশাস্ত্রের একমাত্র পুস্তকোপনিষদ ; শিকার ভ্রম
পোষিকাক্রমকে কটকে রাখিতে হইল। তাহার পরিচর্যা করিবার ভ্রম পরিবারের পুরাতন ভৃত্য তো
ধাকিলই, কিন্তু সেখানকা করিবার ভ্রম পড়িল স্বয়ংস্বের উপর। স্বয়ংস্ব সাক্ষ্যাতর বাসাবস্থায়

অন্য নৃপতি। গোবিন্দচন্দ্রের মাতা সাত্তানীর আশ্রয়ে মাতৃসেবে পালিত। বিবোধী পরিবারের কর্তা সামন্তসংকর্ষণ মহাপ্রতি, তিনি বিশপ্তীক। তাঁহার একমাত্র কন্যা ইন্দ্রীশী, কাব্যরচনার পটু বলিয়া নাম আছে। ১০ বার তিনি গোবিন্দচন্দ্রের পরিচর্য্য লগ্ণায় ইচ্ছা হইল, বহুবাহুবীর চোঁটার সমলমতি গোবিন্দচন্দ্রের এই পরিচর্য্যের পরিপত্তি ঘটিল প্রেমে। স্বরানন্দের চক্রচক্র, শিতা বৈকুণ্ঠরূপের অজ্ঞান, ইন্দ্রমতীর সহিত কুমার গোবিন্দচন্দ্রের শুভসমিধ হইল। গোবিন্দচন্দ্র বিখ্যাত এক পত্র পাইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া স্বতঃস্ফূর্তে গমন করিলেন এবং মধ্যমারে যখন পোশনে স্বতঃস্ফূর্তে উপস্থিত হইয়া একেবারে অস্বস্তিগ্রস্ত, পৌছিলেন, তখন স্বতঃস্ফূর্তে কৃত্যাদি হঠাৎ অপরিসীম লোক দেখিয়া এবং অস্ত্রশূন্যতার চীৎকার শুনিয়া চোর সন্দেহে তাঁহাকে নির্মমভাবে গ্রহণ করিল। পুরাতন ভৃত্যের সতর্কতাও ও সময় শুভকার গোবিন্দচন্দ্র প্রাণে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু পরিবার দুইটি হইল সর্ব্বনাশ।

ককীন্দোহনের সেবার মধ্যে পাকাতা শিকা ও সত্যতার প্রতি অগ্রসর দৃষ্টি আছে। তিনি নবা সত্যতার প্রতি অস্বস্তিক নহেন। অশিক্ষিত প্রভুচক্র গ্রাম্যবাদক তাঁহার প্রভাব পাত্ত। সেইতা নাপিতের ছেলে, গোবিন্দচন্দ্রের হস্ত তামিল কয়ই হইল তাহার কাজ, কিন্তু শহুরে সমানন্দের চক্রান্তে গোবিন্দচন্দ্রের ব্যাপার দেখিয়া তাহার আশ্রয় গুচুয়। ককীন্দোহনের ভাবের শুভন :

এবং কটকর হালচাল দেখি সেইতা ত কালা হোই গলাপি। কথা বণ ? বহায্যাক
“সেণা—টকা ভাবিলয়ে ন বিধাক দিনে দিনে নগরায় সউবা। কিনা হোই পাক ন থিলা, হঠাৎ
এতগুড়াএ টকা কাহে” অইলা ? সেহিনে যেহিদি, বড় সান্ত বিড়াএ মোট বাহুখিলে, মোতে যেহি
চক্কল চাছি পকাইলে। বড় সান্ততর টিক লেখাপড়া হিলাবক্তিতার বোলি গোটাএ কেহি হিন নথাএ,
এএ টকা কটকিহু বাতব নাহি। হিসাব নাহি, কিতাব নাহি, পচবা গুচবা নাহি, মোকানিগুড়াক
যে যেতে টকা কহি বচাই সেউছতি, কটকিমা-বেপারি তল পটাএ বামানখি চকাউবিবে।

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[গুড়িঘাতে দুইটি ‘ন’ আছে, একটি ল সাধারণ, অন্যটি মূর্ধ্ব, অর্থাৎ ‘ক’ এর কাছাকাছি আসে। চক্কল, বাংলা ‘চকলের’ বস উচ্চারণ করিলে চলিলে না। রমোনখি চক্কল, অর্থাৎ পুখা বেগুয়া। পচবাগুচবা—জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ।]

বলিয়াছি, বাক্য অল্পক্ষেপে পরিচ্ছেদ সর্বত্র ককীন্দোহনের পরিচয় সংক্ষিপ্ত। সত্যবত অল্প-
বাহুর শিকার তাঁহার রচনা এই শুধু অর্থন করিয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তে ইহা সমবিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে,
এক অল্পক্ষেপে সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদও ইহাতে আছে। নাটকীয় বস্তুতোক্তির বস একটি তদ্বি বেন আপনা
হইতে আসিয়া যায়। যেমন, স্বরানন্দের আশ্রয়ভাগ—

বাঃ! কিমিতিকা গোটাএ কিবির বাহায কপি! হুঁ বিভাযবহু সাকরে ন গলি বোলি
গোবিন্দ বনরে চুপ করিখাড়া। যাকীবলোচনহুঁ কহিলি— শুহুদি, উষ্যাক লোকযানে আহুহুদি,
আন্তমানহুঁ এঁঠারে ন যেহিলে সমলপুয় উআসহুঁ বাই বাই গোলমাল লগাইবে। সেমানক কথারে
পড়ি গোবিন্দর মন বপলি বাই পাবে। তেভেবেলে তরি গোটাএ অল্পবহু কথা হোই পড়ির।

মুঁ বেধে কটকটে রহিয়া'র, প্রোবিশ পুরী হাইছি বোলি কহি সেমানহু অটকাই বধিবি কিয়া সত্বেবে ধরি পুরী বাহারি বিবি। এবি মধ্যরে মানলা ক্ষতে হোইবিব।— পকবিশে পরিচ্ছেদ

* মূল পরিচ্ছেদ ইংরাজী ভাষায়— ইহাতে dramatic monologue-এর ভাব একটা আদিয়া যায়, তাহার ভঙ্গ ও বানিকট্য ইংরাজী মধ্যে আছে।

এইভাবে কথাবার্তার সহজ ভাষিতে ফকীরমোহন পদ্য করিয়াছেন। তাই উপন্যাসের বিপর্যস্ত সম্বন্ধেই মনে চলে।

ফকীরমোহনের ভাষার নমুনা উপরে দিয়াছি। তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে তাহার মধ্যে নূতনের আর্দ্রতা, যদিও 'নিউজনের' ভাষায় যে একটা 'পালিশ' থাকে, তাহার ভাষায় সে বস্তু পাওয়া যাইবে না। লোকের সংস্কৃত হইতে দূরত্বের যে ভাষায় কথা বলে তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে তো তাহার খেঁচা জানই ছিল— অহুয়া ছিল তাহার নিত্যকর্ম; তবু তাহার ভাষায় মধ্যে কোথাও আচ্ছন্নতা নাই, কোথাও শব্দের ছটাও নাই। 'সত্যাবাদী' পত্রিকার জৈনক লেখক তাহার রচনাইশদী সম্বন্ধে অতি সখীসখী মন্তব্য করেন—

লোকসাধারণক ভাষায় কবি উপন্যাস লেখিছনি। অথচ কচির অভাব নাই, গদ্যনা অছি অথচ প্রাচ্যতা নাই।

ভাষার এই শক্তি তাহার কোথা হইতে আসিল! সেপের মাটির সঙ্গে তাহার সত্যকায় যোগ ছিল বলিয়া।

দৌরবের আরম্ভে তিনি ধর্মাত্মের গ্রহণের কথা বিশেষ করিয়া ভাবেন। এক সময় এমনও হইয়াছিল যে ঈশ্বরগ্রহণের ব্যবস্থা ঠিকঠাক, ফকীরমোহন ভাবিতেছেন, বাস্তবিকই তো প্রতি-প্রাণে এমতবেদ্য, নবিতা-বিশিষ্টে কত বেদ্যতা, কেমন করিয়া এতসব পূজা করা যাইবে? পূজা করিয়াই বা লাভ কি হইবে? ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহার বন্ধু বাণানাথ দাস ও তিনি উভয়ে ঈশ্বর গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু বাণানাথ পিছাইয়া পড়িলেন; সমস্ত ব্যবস্থার ওলটপালট হইয়া গেল। চম্পক-পটিন বংশের বয়সে নিরাকারের জৈনক বাঙালি কোরান প্রসঙ্গকর্মের চাইতেই উৎসাহে ফকীরমোহন আত্মীয় গ্রহণ করিলেন। উপনিষদের অহুয়া বা হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা তাহার পরিণতী হয় নাই, বরং তাহার উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া এই ধর্মীকতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে তাহার একান্ততাও আছে।

ফকীরমোহনের উপন্যাস বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আরও-একটা কথা বলিতে চাই, তাহা না হইলে সবটা বলা হইবে না। আমাদের দেশে জীবনী লেখা বা আত্মকথা বলা সাহিত্যে বড়-একটা ছিল না, বাংলাদেশে তো চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালেই প্রথম প্রামাণিক জীবনকথা রচিত হইতে লাগিল। ইংরেজিসাহিত্যের সম্পর্কে আসিয়া বাংলা ও বঙ্গভাষা তাহার জীবনী ও আত্মকথা রচনার ধ্রু পড়িয়া গেল। ফকীরবাবু আত্মজীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। বহুসংখ্যক জাতি-ভাষায় ইংরাজী ভাষায়— বাংলাভাষায় ইংরাজী অহুয়া করিলে বাংলায় সম্পূর্ণ বাস্তবিক, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনচরিত পাশে ইংরাজী নিম্নে রাখা যাইবে— এরূপ মনে করি। এই আত্মকথার বাইরেও পরিচ্ছেদে লেখক তাহার বাংলাকাল হইতে খবির অবস্থা পর্যন্ত সবই বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে

কেওমুক্ত, জোমড়া, মীলসিঁরি, ডেকানাণ, নগপায়া, পাল-মহা প্রভৃতি সামন্তরাজ্যে তাঁহার চাকুরি-জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণও আছে যথেষ্ট, আবার শিশুকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বন্ধিত্বী যুগের অনেকখানি মিল আছে। দেখিয়া বাঙালি পাঠক হুনি হইবেন বুঝি। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় কেনন ছিল, বালেগরের অবস্থা কিরূপ ছিল, ইহার চেয়ে আর সহস্র স্থলও স্পষ্টভাবে কে বলিতে পারে? সেই বৎসরে ককীরমোহনের হাতে খড়ি হয়।

চাটশালীয়ে পচারঞ্জ সম্বন্ধে মোহর গ্রামে ২৩ বৎসর ঘোঁইবিলা। সহস্র যথার্থ প্রত্যেক বড় গ্রামের, গ্রাম দান বিলে, ছুই তিনিটি গ্রামের গোটিএ চাটশালী বিলা। বহুল লোকমানস যবে স্বতন্ত্রতপে মনে মনে অবধান বিলে। গ্রামের বাউরী, কওরা অশ্লীল আন্তির শিলাবানে মধ্য উচ্চ জাতীর শিলামানকটাক কিছি দূরে বসি চাহালীয়ে পাঠ পড়ুখিলে।

সে সময়ের কটক জিলা, বিশেষতঃ কটকজিলায় ঝংকড় প্রগণার অবধানবানে বালেগর জিলাকু আহুখিলে। চৈত্রমাসটা অবধান আবহানীর সময়। বেশকুবার অবধান-কর্মগ্রাণী বোলি চিহ্না পড়ি।— তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেপের ছবি কি চমৎকারভাবে লেখার মধ্যে ধরা দিয়াছে! লেখকের সেপের প্রতি প্রতি আছে এবং সেপের নড়ীর সঙ্গে যোগ আছে। আবার আনকাল ‘গণসংযোগ’ নাম দিয়া যে স্বপ্ন সন্ধানে বেড়াই, ককীরমোহনের জীবনের গতি তাঁহার সঙ্গে তাহা সহজলভ্য করিয়া তুলিয়াছিল, সেপের জীবনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

এই যোগ ছিল বলিয়াই তিনি পাক্কাতা শিক্ষাকে দুই শ্রীতির চক্রে ঘেঁষিতে পারেন নাই। এ শিক্ষা যে মানুষকে পরিবারের স্বচ্ছন্দে-প্রতি উৎসাহিত করে, তাহাকে আন্তর্দর্শন করিয়া তোলে, শাস্তির পরিবর্তে অপান্তিধ, কতবোয় স্থানে নিবিষ্টবস্তুর প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি করে— তিনি তাই ‘প্রায়শ্চিত্ত’ স্থানার গোবিন্দচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নব্যশিক্ষাবিদম্বাষের পাক্কাতা সংস্কৃতি অদ্বতাবে একপের অশচেষ্টাকে ব্যাক করিয়াছেন। মুচু গ্রান মুক মুখের ভাষা তিনিই যোগাইয়া দিয়াছেন, ‘প্রায়শ্চিত্ত’ সহিত ও ‘মামু’তে স্বল্পজাতিবী সঙ্কীর্ণা ঠানমণির মুখে কথা ছুটাইয়াছেন, তাহা গ্রহণের আনন্দ, আনন্দ ও গুনি, কিন্তু বাহ্যের মুখে কথা যোগাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের মন তো সবই বুদ্ধিতে পারিবে ও সমাস করিবে।

সেপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়াই আচ্ছন্ন বেলকালের ব্যবধান ছাড়াইয়া ককীরমোহনকে আনন্দের অত্যন্ত আনন্দের লোক বলিয়া মনে হয়। জিশ বৎসরেরও বেশি হইতে চলিল, তাঁহার বাণী নীরব হইয়াছে; আর এই জিশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের ভাষা ঋত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। তবিশি ককীরমোহনের ভাষাও পুরাতন হয় নাই, চিত্রলেখও অশ্লীল হয় নাই। ‘দুর্গতনয়’, ‘মহাযোদহ’, পাক্কাতাবাহে সর্বস্ব প্রত্যাহিত নব্যশিক্ষিতের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা কালমাহাত্ম্যে বলিন তো হয়ই নাই, হয়তো পূর্বাপেক্ষা তাহার বর্ণ উজ্জল হইয়াছে।

ঐশ্বরকান্ত সেন

গ্রন্থপরিচয়

বাস্তবিক রামায়ণ—সাম্বাদ্যবাদ। শ্রীমদ্ভগবতের বহু কঠক অন্তর্ভুক্ত। এম. সি. সরকার
আও সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ রোড, কলিকাতা। মূল্য সাত পয়সা টাকা।

রামচরিতমাল্য—তুলসীদাসরচিত রামায়ণ। শ্রীমদীশ্বরদাস দাসগুপ্ত কঠক অন্তর্ভুক্ত। খাদি
প্রতিষ্ঠান, ১৪ কলেজ রোড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ছয় টাকা।

সুধম্পাদি নির্দোষা সধরাণি হুবোদলা।

নমস্তস্মৈ কৃত্য বেন রম্য-রামায়ণী কথা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামায়ণের স্থান কোথায় এবং ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে তার
বিশিষ্ট প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে হলে এদেশের অশ্রুত মহাশয় মহাভারতের সঙ্গে তার
তুলনা করতে হয়। কিন্তু তৎপূর্বে এই দুই মহাশয়ের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।
এই প্রসঙ্গে বরীন্দ্রনাথ বলেছেন, “রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না,
তাহা। ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়, কারণ সেদৃশ ইতিহাস সমগ্রবিশেষকে অবলম্বন
করিয়া থাকে—রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অল্প ইতিহাস কালে কালে
কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের বাহা সাধনা, বাহা
আরাধনা, বাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যরচনার মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে
বিরাজমান।” কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দুই মহাশয়ে ভারতবর্ষের একই রূপ প্রকাশ
পায় নি, একটি আদ্য-একটির পুনরুক্তিমান্য নয়। ভারতবর্ষ এই দুই গ্রন্থকে বিভাজ্যে গ্রহণ করেছে, কোন
গ্রন্থে ভারতবর্ষ তার কোন আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা বিচার করে দেখবার বিষয়।

বস্তুত ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতকে স্বতন্ত্র একইভাবে গ্রহণ করে নি। মহাভারত
আমাদের জাতীয় চিন্তে কোন আন্দোলন সঞ্চিত আছে তা অতি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে, একটি
সামান্য প্রবাসবাক্যে: “বাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।” বাক্যটির তাৎপর্ষ্য এই যে, ভারতবর্ষ
সমগ্রভাবেই মহাভারত গ্রন্থে ধরা দিয়েছে; একমাত্র মহাভারতকে জানলেই সমগ্র ভারতবর্ষকে
জানা হয়। এই প্রবাসবাক্যটি যে নিরর্থক নয় তাও প্রমাণ পাই বরীন্দ্রনাথের উক্তি—

“ত্রেণে বে-বিজা, বে-মনমারা, বে-ইতিহাসকথা হুয়ে হুয়ে বিকসিত ছিল, এমন কি, দিগন্তের
কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, একদলকে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরন্তর আশ্রয়
কেন্দ্র ছিল সমস্ত দেশের মনে।...এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অসংখ্য সাধনা, একটি সমগ্র গুটি ছিল। এই
উদ্যোগের সহিত্যকে শক্তিবর্তী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীকৃত করেছিল তার স্মৃতি প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত
নাথটিতেই। মহাভারতের মধ্য সঙ্কলিত ধারা ধ্যানে দেখেছিলেন মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত।
সেই ভঙ্গিটি একই কালে ভৌগোলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে।”

—বিদ্যাবিনোদস্বামীর ভূমিকা, ‘দিক্কা’

বসন্ত মহাত্ম্যত হচ্ছে সর্বাধীন ভারতীয় সংস্কৃতির জাগর বা বিবাহোৎসব, স্বাধীনতার জাগর। ভারতবর্ষের "সর্বোচ্চ বিশ্ববিপ্লব"। এই বিশ্ববিপ্লবের তিথী যে পাথ না ভারতবর্ষ তার কাছে অজানা থেকে যায়। মহাত্ম্যতের মধ্যে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিক সংকলন ও বিজ্ঞান কর্মবার যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভারতবর্ষ তাকেই নাম দিয়েছে 'হ্যাস'। এই সংকলন ও বিজ্ঞান-প্রতিভা বা 'হ্যাস'কেই চতুর্বেশ, অষ্টাদশশতাব্দী মহাত্ম্যত ও অষ্টাদশ মহাপুত্রের সংকলনকর্তা বা রচয়িতা বলে ভারতবর্ষ কল্পনা করেছে। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহাকাব্য সংকলনে একই বিশেষ শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাত্ম্যতের স্থান হচ্ছে বেশ ও পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহের নথ্যরূপে। তাই মহাত্ম্যতকে যেমন পঞ্চ বৈশ্ব বলে অভিহিত করা হয়, তেমনি তাকে আদিপুত্র বলেও বর্ণনা করা যায়। মহাত্ম্যত আসলে একটি সাংস্কৃতিক মহাকাব্য বলেই তার বহু-বর্ণনাও কোনো বিরতা নেই। মহাত্ম্যতেই দেখা যায়, এই গ্রন্থ বৈশ্ব ইতিহাস আখ্যান ইতিহাস সাহিত্য পুথি কাব্য ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এই নামগুলির কোনোটাই নির্বাক নয়; কেননা এই সমস্তেরই লক্ষ্য মহাত্ম্যতে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। এটাই এ-জাতীয় সংকলনগ্রন্থের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা। মহাত্ম্যত মূলত একটা সংকলনগ্রন্থ ছিল কি না এবং এর আসল রূপ কি ছিল তার বিপর্যয় বিচার আমাদের পক্ষে নিশ্চয়শূন্য। তবে শুধু এইটুকু বলা উচিত যে, পণ্ডিতদের মতে মহাত্ম্যত মূলত ছিল একটি ইতিহাস এবং তখন তার কলমেরও ছিল খুবই বহুশব্দস্বরূপ। মহাত্ম্যতেই আছে, "অন্যভাবেইতিহাসোহং প্রোক্তব্যো বিজ্ঞপ্তিহুগ"। তার স্নেহ-সংখ্যাও ছিল অল্প কয়েক হাজার মাত্র। ক্রমে তাতে উপাখ্যান ভাবগোচনা প্রকৃতি হুগ হতে হতে তার আদর্শ বাড়তে থাকে। বর্তমানে মহাত্ম্যতের 'স্নেহ-সংখ্যা' এক লক্ষেরও বেশি। বসন্ত মহাত্ম্যত যেমন কোনো এক-ব্যক্তির রচনা নয়, তেমনি কোনো এক-কালেরও নয়। এই মহাগ্রন্থের আখ্যান-উপদেশাদি ভারতবর্ষের বিপুল জনতার মধ্যে পরিচালিত হয়ে বিস্তারিত ছিল। ভারতের সংকলন-প্রতিভা এগুলিকে কালে কালে সংগ্রহ করে একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে। এইভাবেই ভারত-সাহিত্যের উৎপত্তি। মহাত্ম্যত হ্যাস-কর্তৃক কবিতা ও প্রবন্ধের 'কর্তৃক' (হুগ বা না-হুগ) লিখিত হয়, এই কাহিনীর মধ্যেই মহাত্ম্যতের উৎপত্তির বর্ণনা ইতিহাস লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, এই বিপুলায়তন গ্রন্থ করতে মহাত্ম্যতের কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। তাই এই সাহিত্য-সংগ্রহে কোনো এক-দৃষ্টিও নয়, বহু-দৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়। এর কাহিনীতে উপদেশে সমাজবর্ণনার ও আদর্শগত বৈচিত্র্যে কালগত বিভিন্নতার প্রকাশ আরও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। পণ্ডিতদের মতে মহাত্ম্যতের প্রথম পৃষ্ঠা হয় সূর্য্যবতী ঈশ্বরী শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে এবং তার সমাপ্তি পৃষ্ঠে ঈশ্বরী শতকের শতকের কাছাকাছি সময়ে। এই সাহিত্যিক সংগ্রহের ভারতবর্ষের 'মহা-ইতিহাস' সমগ্রভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে মহাত্ম্যতে। এই ইতিহাসের আলোতে না দেখলে বর্তমান ভারতকেও বর্ণনা করা যায় না। কেননা আধুনিক ভারত এখনও মহাত্ম্যতের দৃষ্টির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে স্বাধীনতার একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"ভারতবর্ষের মন কে নিজেই অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো একাত্মে প্রবর্তিত করে নাই, তাহা

স্বীকার করিতে পারি না। সে শব্দ দুই, কিন্তু তাহার প্রত্যয় সামান্য নহে; তাহা মূলভাষ্যে গোড়ার নহে কিন্তু তাহা আত্ম পদার্থ আদ্যাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বম্ম যে বৈশিষ্ট্যহীন সামান্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অগ্রত্যক যোগদ্বারা রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভাষ্য এবং বর্তমান শতাব্দীর ভাষ্যত নাম। বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে ন্যূনতম যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই যোগই ভাষ্যতবর্ণের পক্ষে সর্বশেষাঙ্গ সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভাষ্যতবর্ণের অর্থ ইতিহাস।”

—দ্বন্দ্বিত, ‘ভাষ্যতবর্ণ’

সামান্যকে কিন্তু যেম পূরণ সংহিতা ধর্মপাত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করবার রীতি নাই। এটি ব্যঙ্গকবিতা এবং গণেশনিষিদ্ধও নয়। ভাষ্যতবর্ণ সামান্যকে যে বিপুল ব্যাসমণ্ডলের বহির্ভাগে স্থাপন করেছে এটা নিরর্থক নয়। সামান্য যে ব্যাসমণ্ডলিতার অন্তর্ভুক্ত নয়, এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বস্তুত সামান্য একজন ব্যক্তিগণের রচনা বলেই স্বীকৃত। সে রচনার প্রকৃতি সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কেননা বাস্তবিক হলেন ভারতবর্ষের আদিকবি এবং সামান্য আদিকাব্য একথা সর্বস্বীকৃত। সামান্যের পূর্বে এসে কবি ছিল না একথা মানা যায় না। গণেশের বহু অংশে (যেমন উদাহরণস্বরূপ) চরম কবিত্বের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু গণেশের মূলগতিকে কখনও কবিতা বলে বর্ণনা করা হয় না, বৈদিক কবিতাও ঠিক কবিশর্পাধিকৃত বলে গণ্য নয়। উপনিষদগুলিতেও মূল মূল কবিত্ব উল্লেখ্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাও সচেতন কাব্যরচনা বলে স্বীকৃত নয়। মহাভারতের অনেক অংশ সম্ভবত সামান্যের পূর্ববর্তী এবং তাতেও সত্যি উন্নয়নের কাব্য আছে। কিন্তু ব্যাসকে কখনও কবি আদ্যন যেওয়া হয় নি এবং মহাভারতকেও ঠিক কাব্য বলে বর্ণনা করা যায় না। সামান্যই যে আদিকাব্য তার অন্ত প্রায়শই এই যে, এর প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে কতকগুলি সর্গে। এই সর্গবিভাগই কাব্যের মূল লক্ষণ; কবির রচনাপ্রতিভার যে স্বর্গী তারই নাম সর্গ। সামান্যের পূর্ববর্তী সাহিত্যে এই সর্গবিভাগ দেখা যায় না। যেমন গণেশের বিভাগ হচ্ছে মণ্ডল এবং মণ্ডল বিভক্ত হয়েছে স্তোকে; মহাভারতের পর্বগুলির যে বিভাগ তার নাম অধ্যায়।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মহাভারত এবং সামান্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্য। অথচ আদ্যবর্ণের বিষয় হুই যে, ভাষ্যতবর্ণ চিরকালই ব্যাস-বাস্তবিক এবং সামান্য-মহাভারতকে এক-স্বার্থভুক্ত বলেই গণ্য করেছে। বিশেষ মনীষীরাও এ-দিককে বিনা বিচার ভাষ্যতবর্ণের মূল মহাকাব্য বা এপিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কোনো নিগূঢ় ঐক্য বাচ্চ বিভক্ততা সত্ত্বেও এই দুই মহাগ্রন্থকে সমদর্শনীয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই অসদ্বিত্তি ঐক্যের সন্ধান পেলেই এসে বৈশিষ্ট্যও পতিত হতে উঠবে। পূর্বেই বলেছি মহাভারত ছিল মূলত ইতিহাস, তার পরে ক্রমশ তাতে পূরণ ও ধর্মশাস্ত্রাদির লক্ষণ আরোপিত হয়। সামান্য কখনও ধর্মার্থত ইতিহাস বলে স্বীকার্য নয়। অথচ “সামান্য-মহাভারত ভাষ্যতবর্ণের চিরকালের ইতিহাস”, স্বীকৃতনাথের এই উক্তি যে একান্ত সত্য তাও স্বীকার করা যায় না। কোন্ অর্থে সামান্য-মহাভারতকে ভাষ্যতবর্ণের চিরকালের ইতিহাস বলা যায় তা বিচার করবার পূর্বে যেটা স্বীকার সাধারণ অর্থে এই দুই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি।

কৃষ্ণাওরের বিবাস ও কৃষ্ণকেন্দ্রের দুই ঘটনাবলিই ঐতিহাসিক সত্য কি না তার কোনো প্রমাণ নেই। সত্যবত সত্য নয়। তবে শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে অর্জন কৃত পরীক্ষিত জনসমাজ প্রকৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পৌরাণিক সত্যে কিছুই জানা যায় না। তবে মহাত্মার উক্ত ঐতিহাসিকতা কোথায়? তারতবর্ষের উৎকালীন সমাজ-বিবর্তনের চিত্র, আশ্রয়ের বিচিত্রতা ও সংস্কার, নবীশব্দজনন প্রকৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেক পরিচয় পেতে হলে মহাত্মার উক্ত আশ্রয় নিতে হবে। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে কবির সমকালীন সমাজের চিত্র বৈষ্ণব পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মহাত্মার সেক্ষেত্রে হয় নি। তারতবর্ষে যুগে যুগে বৈষ্ণব আখ্যান-উপাখ্যান-উপদেশাদি প্রচলিত হয়েছিল মহাত্মার সেক্ষেত্রে সচেতনভাবেই সংকলন করে রাখা হয়েছে। তাই এটি উৎকালীন তারতবর্ষের চিত্র ও চরিত্রের মত ঐতিহাসিকতার মর্যাদা পেয়েছে।

রামায়ণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ কবিকল্পনার স্রষ্টা, উৎকালপ্রচলিত কাহিনী ও জনপ্রিয় কল্পনা করার কোনো অতিপ্রায় এই প্রায় ঘটনার মূলে নেই। বরং কবি সচেতনভাবেই প্রচলিত কাহিনীকে কাব্যকল্পের প্রয়োজন অনুসারে কৃপাকল্পিত করে নিয়েছেন। যে কাহিনীকে অবলম্বন করে রামায়ণকাব্য রচিত সে কাহিনীটি অবশ্য কবিকল্পনা নয়। সে কাহিনীটি যে জনমধ্যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ এই যে, মহাত্মার উক্ত সংকলিত উপাখ্যানসমূহের মধ্যে রামোপাখ্যান অন্যতম। বোধ পাশ্চাত্যেরাও রাম-কাহিনী পাওয়া যায়। এদিক কাহিনীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। যে রামকাহিনী তারতবর্ষের নীচা অভিক্রম করে বর্ষাশ্রম বসিগোপেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাও কতকগুলি গুরুতর বিষয়েই রামায়ণ থেকে পৃথক। এই কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য ছিল কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্নরহারা জনক অবশ্য ঐতিহাসিক, কিন্তু জনক-হুহিতা নীতা ঐতিহাসিক নয়। রাম-লক্ষ্মণ প্রকৃতি প্রধান প্রধান পাত্রদেরও অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। এদিক কারণে (গতিভেদে) মনে করেন রামায়ণ-কাহিনীর মূলে সত্যবত বাস্তবঘটনামূলক কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এমনকি অনেকেই মনে করেন যে, রামায়ণ-কাহিনী হচ্ছে মূলত কল্পকল্পক। রবীন্দ্রনাথও এই কল্পকল্পকতার বিশ্বাস করতেন। নানা উপলক্ষ্যেই তিনি এ বিষয়ের আত্মকুলো মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর 'তারতবর্ষের ঐতিহাসিক হারা' নামক প্রবন্ধ এবং 'রক্তকবচী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ) প্রস্তাবনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণের কল্পকল্পের একই পরিচয় দেওয়া থাকে। এই কবিতাটি কেন্দ্রবিন্দুই আছেন নীতা। নীতা মানে যে হলদেবা একথা সর্বজনবিদিত। জনক রাজার হলদেবা তাঁর উৎপত্তি এবং তাঁর পাতালপ্রবেশ-কাহিনীর ধারাও নীতার স্বতন্ত্রা সমর্থিত হয়। রামের নবদ্বারদলজ্ঞান বর্ণের দ্বারা বোঝা যায় রাম বস্ত্রত কুবিরাজপত্নজ্ঞান সম্বন্ধিতারই নামান্তর। পুরাণোক্ত অগ্নি দুই রামের স্বতন্ত্রতা তাই বলেই মনে হয়। হলদেবা নামকে নীতাপত্তি দ্বারা থেকে অভিন্ন মনে করা অসম্ভব নয়। তৃতীয় রাম হচ্ছেন বেংকালপুত্র এবং তিনি মাতৃহত্যা, এই কাহিনীর মধ্যে মল্লকুমির উৎসাহকে বিনষ্ট করে স্রাবণতা স্রষ্টার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলেই বোধ হয়। এই প্রমাণে মনে রাখা উচিত নীতাপত্তি নামকেও প্যাশ্চাৎ অহল্যা (অর্থাৎ হলদালনার অযোগ্য কঠিন) কুবির উদ্ধারকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যা'র প্রতি কবিতার (১৯২০) নিম্নোক্ত অংশটি স্বরূপ—

স্বীকৃত-উৎসাহ

ছুটি সহস্রপথে মকমিলকরণে
সহস্র আকারে, উত্তীর্ণ সে পুঙ্খ হয়ে
তোমার পায়ণ বেধি, করিতে নিশাচর
অধ্বন্য-অভিলাষ তব ।

—অহল্যার প্রতি, 'মানসী'

যাহ যাহে বসন্তকাল : আশ লক্ষণ যাহে কল্যাণের লক্ষণ, এককথায় লক্ষ্যবস্তা । এই লক্ষণকে সীতা ও হান্নের সহস্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে এটা খুবই স্মারকবিশিষ্ট । যেখানে সীতা দেখানোই তার এক দিকে সৌন্দর্য ও অপর দিকে লক্ষণ । এই গেল রামায়ণের রূপকারের এক দিক । তার আর-এক দিকে আছে স্বর্ণলতার কথা । স্বর্ণলতা বলেন, "স্বর্ণলতা যে নিঃস্বর্ণ তা নিয়ে আশ কত কথাই উঠেছে । বস্ত্রত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা ভাবেই স্বর্ণলতার পরিচয় পাওয়া যায় । কবিত্বক যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিচিতি স্বর্ণলতার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । কারণ সে স্বর্ণলতা যদি বসন্ত-সোনারটেই বিশেষ-একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে সেখানের আশ্রমে তবু না হয়ে তা আরও উজ্জল হয়ে উঠত । এই স্বর্ণ ঐশ্বর্যের বন, কৃষ্ণলক্ষণ নয় । লক্ষ্যবস্তুর বিশুদ্ধ ঐশ্বর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাই তার বন মাথা ও বিশ হাতের বর্ণনায় । স্নেহভাষ্যের বহন-গ্রহী বহুগ্রামী রাবণ বহুবিশ্রাম্যধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ-ঘরে শুল্কিত করে তাদের ঘরো কাক-আবার করত ।" এই বিশুদ্ধ ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারীর নাম রাবণ । আশ রাবণ যাহে হচ্ছে সবকারিতা, আত্মনাদকারিতা । রামায়ণেই আছে—

স্বর্নায়োক্তঃ চৈতন্ রাবিতঃ ভয়মাগতম্ ।
তন্মহাৎ রাবণো নাম নান্য রাজান্ তবিত্তমি ।
দেবতা যাতুবা দক্ষা যে চান্তে অগতীতলে ।
এবং স্বাভিযাত্তি রাবণ লোকরাবণম্ ।

—উত্তরকাণ্ড ১৬:৩৭-৩৮

অর্থঃ—হে রাজান্, (তোমার ভ্রাতৃ) এই লোকের তীক্ষ্ণ ও বহুবৃত্ত হয়েছে, অতএব তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে । দেবতা যাতুবা বক্ষ এবং অগতের অস্ত সকলে লোকরাবণ (অনন্তরূপে আত্মনাদ-কারিতা) তোমাকে রাবণ বলেই অভিহিত করবে ।

স্বর্নায়োক্তঃ অর্থঃ কথাই আছে—

↑ স্বর্নায়োক্তঃ লোকান্ বৎ তন্মহাৎ রাবণ উচ্যতে ।
স্বর্নায়োক্তঃ কামবলো দেবানাম্ ভয়মাগতম্ ॥

—বনপর্ব ২৭:৪০

অর্থঃ—স্বর্নায়োক্তঃ স্বর্নায়োক্তঃ বহু উৎপাদন করেছিলেন । তিনি সমস্ত লোককেই (ভয়ে) বহু (আত্মনাদ) করিয়েছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় রাবণ ।

এই রাবণ নামের সার্বকর্তাও আরও স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি যে, তাঁর পুত্র ছিলেন যেমননা
এবং তাঁরই সুহৃদের বিতরণ।

এই বিজ্ঞানিক প্রচেষ্টার উৎস হচ্ছে স্বর্ষ বা ধন (এই ধনের সোতেই আকৃষ্ট করে
স্বর্ষবিচারী যে ভবিষ্যদ্বাণীকে বিপন্ন করে তুলেছিল তার ইচ্ছিত হয়েছে মাহারবী স্বর্ষগণের সোতে সূত
সীতাহরণের কাহিনীর মধ্যে। যে স্বর্ষগণটি সীতাকে সূত ও দাম-লম্বনকে (স্বর্ষাৎ ভবিষ্যৎ পোতা ও
লম্বনকে) বিপন্ন করেছিল তার দ্বার্থ নাম হচ্ছে মাহার স্বর্ষাৎ মাহাচিকা। স্বর্ষবিচারীকর মূহ দাহন
কিভাবে স্বর্ষবিচারী স্বাক্ষরের কবলে পড়ে পোতাঙ্গলবহীন হয়, তার পরিচয় শুধু দ্রোণাঙ্গের কাহিনীতে
নয় বর্তমান যুগেও আমরা নিতাই বোঝতে পারছি।)

রামায়ণের এই রূপকর্ষ বড়ই সূক্তসংগত হোক না কেন, কাব্য-হিসাবে এটা কখনোই
রামায়ণের মূল্য লক্ষ্য নয়। রামায়ণকে রূপককাব্য-হিসাবে গ্রহণ করলে তার আসল কথাটাই
অজ্ঞাত থেকে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তাও যাবে অসুস্থ
হবে। রামায়ণের আসল সার্বকর্তা হচ্ছে তার মানবিকতাব্য, তথা তার কাব্যরস। মাদ্রবের প্রে-
গ্রেম স্বর্ষ-সংঘাত বিরহ-মিলন স্বপ্ন-দুঃখ প্রকৃতিই কাব্যখানির আসল উপলব্ধি। এই মানবিকতার
তলেই রামায়ণ চিরকালের মত ভারতবর্ষের চিত্রের মূহ করে নিয়েছিল এবং পরবর্তী কোনো কাব্যই
ভারতবর্ষের এই আদিকাব্যকে এই গুণে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

এদিক থেকেও রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের তুলনা করা দরকার। এক হিসাবে বলতে
পেরে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতেই মানবচিরন্তনতার প্রকাশবৈচিত্র্য বেশি, তাতে স্বাক্ষরাণি অ-মাহবের
যেই হান আছে তা অতি সামান্যই। শকাব্দে রামায়ণে স্বাক্ষর বানবাহি কে অতি প্রাধান্য পেয়েছে
তাতে অনেকের মতে এই কাব্যের মানবিক রস অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু অত্যধিক থেকে
বিচার করলে দেখা যাবে রামায়ণের চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের চিত্রকে যেমন গভীরভাবে স্পর্শ করেছে
মহাভারতের চরিত্রগুলি তা পারে নি। সুবিষ্টির ধর্মদাম বটেন, কিন্তু তাঁর স্বাক্ষর আদর্শ নয়; রামদামাই
আদর্শস্বাক্ষর। স্বাক্ষর বানলম্বনের পোতাঙ্গ রামসীতার দাম্পত্য যে আদর্শ মান-অধিকার করে
আছে, মহাভারতের মূল্য চরিত্রগুলিতে তার তুলনা নেই। রামের শিষ্টভক্তি লক্ষণের আভ্যন্তরীণ
সীতার পতিভক্তি ভারতবর্ষের জাতীয় মনকে যে আদর্শের দিকে প্রেরণা দেয় মহাভারতের চরিত্র
তা দেয় না। বর্ত্ত পল্লপাণ্ডবের কোনো চরিত্রই আদর্শরূপে অস্বপ্নবর্ষী বলে স্বীকৃত নয়। একমাত্র
অর্জুনের বীর্য অনেকাংশে আদর্শ বলে গণ্য হয়, কিন্তু তাও রামের বীর্যের চেয়ে বেশি নয়।
বর্ত্ত একটু ভবে যেমনেই বোকা যাবে ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রগঠনে মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের
প্রত্যক্ষ প্রভাবই বেশি।

মহাভারত ভারতবর্ষে প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ মূলপং প্রকাশিত
ও প্রত্যাবিত হয়েছে। মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় মন ও মনের ইতিহাসকে গাণন করেছে;
কিন্তু রামায়ণ নিজে ইতিহাস না হয়েও আমাদের ইতিহাসকে মূলে মূলে গঠন করেছে, রূপ দিয়েছে।
কলে ভারতবর্ষ রামায়ণের আদর্শে কলে কলে গঠিত হয়ে রামায়ণকে ইতিহাসই করে তুলেছে।
মহাভারতের দ্বারা রামায়ণ ভারতবর্ষের প্রতিফলন ঘটে নি, কিন্তু রামায়ণই ভারতবর্ষের মনে প্রতিফলিত

হয়েছে। এইভাবেই এই আদিকাব্যখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তাই ভবীপ্রনাথ এটিকে আমাদের ভিত্তিকালের ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের জাতীয় মনের উপরে রামায়ণের এই যে প্রভাব, তার পরিচয় রয়েছে আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও। মহাভারতের মূল কাহিনীকে অঙ্গুলগণ বা অবলম্বন করে খুব কম কাব্যই রচিত হয়েছে, যা হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এবং তার প্রভাবও বেশি নয়। শকাস্ত্রের দামারণ যে কতভাবে অমুক্ত অন্তর ও অন্বিত হয়েছে তার ইয়রা নেই। ঈশটীয় প্রথম শতকেই বেশি মহাকবি অম্বোধ্য রামায়ণের আদর্শে রচনা করেন ‘বৃহৎসহিত’ কাব্য। এই কাব্যখানিকে যদি বৃহৎসহ নামে অভিহিত করা যায় তাহলেই এর বৃহৎসহ বর্ণার্থভাবে প্রকাশ পায়। তার পরবর্তী কবিরা রামায়ণকে আদর্শমাত্ররূপে স্বীকার না করে প্রত্যক্ষভাবেই রামকাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য-নাটকাদি রচনা করেন। এ ধরনের রামকাব্যের দ্বারা ভারতীয় সাহিত্য যুগে যুগেই অলংকৃত হয়েছে।

এই প্রশ্নকে মনে রাখা উচিত যে, রামায়ণই যে যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপমান করেছে তা নয়, ভারতীয় চিন্তা ও কালে কালে নিজেও প্রগতিশীলভাবে রামায়ণকে নব নব রূপে গড়ে নিয়েছে। এইভাবে রামায়ণের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিত্তগত ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। রামকাব্যের এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের অস্ত্রের ইতিহাসের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, সব বিবর্তনের দ্বারা এই বিবর্তনের মধ্যেও একটি ঐক্য অপরিসীমভাবে নিত্যবিরামমান আছে। এই যুগ ঐক্যবাহী ভারতবর্ষের মতীতের সঙ্গে তার বর্তমানকে অচ্ছেদ্যরূপে বেঁধে রেখেছে। এইরূপেই রামায়ণ কাব্যখানি ভারতবর্ষের দ্বার্ষ্য ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তপাগত ইতিহাস নয়, সত্যগত ইতিহাস। নিছক ভ্রম্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব কখনও এমন গভীর হতে পারত না। কেননা তখন হলে বাইরের জিনিষ, জাতির অন্তরায়কে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই এবং আপনাতঃ কালের সীমাকে অতিক্রম করে নিজাকালকে সে অধিকার করতে পারে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ নায়ক ভবিষ্যৎ বান্দ্রীক কবিকে সন্মোদন করে বলেছেন—

সেই লতা, যা গড়িয়ে তুমি—

অট্টা যা তা সব লতা নহে। কবি, তব মনোভূমি
রাবের অনবদ্যান, অমোঘ্যের চেয়ে লতা কেনো।

—ভাষা ও ছন্দ, ‘কাহিনী’

এই লতার দ্বারা যুগে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিক্রিয়ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পূর্নগলিতা পকার প্রোক্তের মতোই ভারতীয় চিত্তভূমিকে চিত্তবাসল করে রেখেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক-একটি যুগের দ্বার্ষ্য পরিচয় পেতে হলে তৎকালীন রামকাব্যের আশ্রয় নেওয়া অন্ত্যাবতক। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় আমাদের ইতিহাসের অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ যুগ শুণ্ডবাহুবলকালের দ্বার্ষ্য ভগতি কালিদাসের যুগংগকাব্যে যেভাবে আদর্শপ্রকাশ করেছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যখন প্রামাণিক ভাষাসমূহের অভাবের ফলে তখনও রামকাহিনীর

আত্মবিশ্বাস কিছুমাত্র কীর্ণ হয় নি। বাংলা রামায়ণের কথা শ্রবণ করলেই একবার তাঁৎপর বোঝা যায়। সংস্কৃতসাহিত্যের আদিকবি যেমন বাস্কীকি, বাংলার আদিকবিও তেমনই কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী চর্যাপদগুলিকে কাব্য না বলে কণ্ঠবেষের রচনাগুলির ভাষা গুরুশব্দায়ুক্ত বলে গণ্য করাই সমীচীন। বাংলাসাহিত্যের আদিকাব্য যে রামকাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হইল সেটা যেমন বিশ্বব্রহ্মের বিষয় নয়, তেমনই স্থানের বিষয়ও বটে। কৃত্তিবাসের পূর্বেও যে বাংলাদেশে রামায়ণচর্চা ছিল তার প্রমাণ অভিনন্দ (সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম শতক) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর (একারণ-রামায়ণ শতক) রামচরিত কাব্যম্বয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন আদি ব্যাঙ্গ্যাকাব্য, অভিনন্দের রামচরিতও সম্ভবত তেমনই বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতকাব্য। বা হোক, তাৎপর্য বিষয় এই যে, বাংলাদেশে কৃত্তিবাস বা অন্তর্কবিই কোনো একখানি রামায়ণ দ্বিগুণ থাকতে পারে নি। হুগে হুগে বাংলাদেশে কত রামায়ণ যে রচিত হয়েছে তার হিসাব কেওরা করেন। যতগুলি মহাভারত আর পর্বেও পাওয়া গেছে, বাংলা রামায়ণের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, যে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে সব বাংলা রামায়ণের শিরে স্থান দেওয়া হয় সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণও একা কৃত্তিবাসেরই রচিত নয়। কৃত্তিবাসের সঙ্গে সমগ্র বাংলায় জাতীয় চিত্তই এই মহাকাব্যরচনার যোগ দিয়েছে। ফলে এই-এক হুগের আশ্রয় ও কতি অল্পাংশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আগুন ধুগে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করেছে। কলে আত্মকাল আদরা কে-রামায়ণখানি পাই তা বর্ধার্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণমাত্র নয়, সেটা হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের জাতীয় মহাকাব্য। বাংলার জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যে এই রামায়ণের স্থান কতখানি সেকথা আমাদের বিচার নয়।

শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যই রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তানিল (কথ্য-রামায়ণ), কানাকী (পদ্মা রামায়ণ) প্রভৃতি ভাবিড়ী সাহিত্যও অল্পপন্থ্যেই রামচরিত্রকে প্রভাভূতি অর্পণ করেছে। এই প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে তুলসীদাসের রামচরিত-বানসই যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই রামায়ণখানি অমহিমার অতি অনায়াসেই প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গৌরবান্বিত করেছে। বসন্ত তুলসীদাসী রামায়ণের স্থান শুধু ভারতীয় নয়, বিশ্বসাহিত্যেই স্থানিষ্ঠ হয়ে আছে।

"The most celebrated name in Hindi literature is undoubtedly that of Tulsidas, whose Hindi Ramayana has had great and deserved fame not only in India but throughout the whole world."

—F. E. Keay

ভারতীয় কবিসমাজে তুলসীদাসের আসন যে বাস্কীকি ও কালিদাসের পাশেই সে বিষয়ে দ্বিধা থাকতে পারে না। তুলসী-রামায়ণের ছুই দিক, এক তাহ কাব্যসৌন্দর্য আর-এক তাহ নৈতিক সম্ভার। নিছক কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে রামচরিতবানসকে নিঃসংশয়েই বাস্কীকি-রামায়ণ ও যদুবংশের যোগা উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা যায়। নৈতিক প্রভাবের বিচারে রামচরিতবানসকে যদুবংশের উপরেই স্থান দিতে হয়। বসন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় নৈতিক চরিত্রগঠনে রামচরিতবানস যে শক্তি

দেখিয়েছে, এক ভগবৎপীতা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। সীতার সঙ্গেও তুলনা হয় কি না দশেহ। কেননা, সীতার প্রভাব মূলত তরুণ, সংকল্প-শক্তিগণমাঝেই সর্ব প্রভাব সীমাবদ্ধ। তুলসী রামায়ণের আকর্ষণশক্তি প্রত্যেক অবর্ণগত, তা অতি সহজেই ব্যাপকভাবে বিপুল জনতাকেও প্রভাবিত করে। এই কারণে পাক্ষাত্য মনীষীরা এই রামায়ণকে উত্তরভারতের বাইবেল বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা Keay সাহেব বলেন—

Amongst all classes of the Hindu community in North India. with the exception of a few Sanskrit pandits, it is today everywhere appreciated and venerated whether by rich or poor, old or young, learned or unlearned, and it has sometimes been called the Bible of the Hindu people of North India.

সুবিখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত জর্জ গ্রীস্মার্ন সাহেবের মতও উৎকৃষ্টযোগ্য—

Pandits may speak of Vedas and the Upanishads, and a few may even study them, others may say that their beliefs are represented by the Puranas; but for the great majority of the people of Hindustan, learned and unlearned, the Ramayana of Tulsidas is the only standard of moral conduct.

(রামায়ণের যে নৈতিক বর্ণনা, তার প্রধান কারণ রামচরিত্রের মহত্ত্ব। রামায়ণের সূচনাতেই দেখি বাস্তবিক ন্যায় তথ্যিক জিজ্ঞাসা করছেন, পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছেন যিনি

চারিভেদে চ কো বৃত্ত: সর্বভূতেষু কো হিত:।

বিদ্বান্ কঃ স্বঃ সমর্থঃ কষ্টকরা প্রিয়দর্শনঃ।

আশ্চর্যান্ কো বিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোহনন্দকঃ।

কত্র বিস্তৃতি দেবাক জাতবোদত সংস্থে।

অত্রগম্য রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ভূত করছি—

“কহু যোরে বীর্ষ কার কথারে করে না অভিক্রম,

কাহার চরিত্র যেবি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে হৃদয় কাহ্নি নাগিকোর অশ্রুবেব মতো,

মহৈশ্বর্যে আছে নহ, মহাঈশ্বরে কে হয় নি নত,

সম্মখে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,

কে গেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাকার অধিক,

কে লয়েছে নিম্ন শিরে রাজতালে সুকুটের সব

সবিনয়ে সঙ্গীদবে বদ্যমাঝে হুঃখ মহত্তম,

কহ যোবে সর্বশী, যে বেবদি, তাঁর পুণ্য নাম।”

* নারক কছিলো বীরে, “অযোধ্যার রত্নশক্তি হাম।”

“রামায়ণ এই নবচন্দ্রস্বরূপই কথা, বেবতায় কথা নহে। রামায়ণে বেবতা নিক্ষেপে বর্ষ করিয়া যাত্রা করেন নাই, যাত্রাই নিষেধ ভণে বেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।”—রামায়ণ, ‘প্রাচীন সাহিত্য’

তাই বাঙ্গালির এই উক্তি—

“বেবতায় স্তবগীতে বেবেয়ে মানব করি আনে,

তুলিব বেবতা করি যাত্রায়ে যেরে ছন্দে গানে।”

বহুত বাঙ্গালিক রামচন্দ্রকে বেবযর্থবোয় প্রতিলিখিত করেছিলেন বলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ রামকে নববেবতায় পুণ্য অর্থা দিয়েছিল। তাই প্রমাণ আছে রামায়ণগ্রন্থেই। বাঙ্গালিক ঠায় মূল রামায়ণে (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ সর্গ) রামকে যাত্রীবরণেই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নবচন্দ্রের বেবযর্থবোয় মূঢ় হয়ে পরবর্তী কালের কোনো কবি রামায়ণে যে হুই কাণ্ড (আবি ও উত্তর) বোঝনা করেন তাতে রামচন্দ্র প্রত্যেকত বেবতা বলেই স্বীকৃত হয়েছেন। অন্তঃসার ভারতবর্ষের সমগ্র রামসাহিত্যেই ঠাকে বেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বহুবেশে-ঠাকে বলা-হয়েছে “রামাভিধানো হরিঃ।” কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাম বিকৃত অবতার বলেই বর্ণিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের এই বেবয সবচেয়ে পরিচুত হয়েছে তুলসী-রামায়ণে। অথচ ঠাকে মানবযর্থবোয় অতীত ও সাধারণ মানুষের আদর্শবিহীনত করে রাখা হয় নি। এইমতই তুলসী-রামায়ণের নৈতিক প্রভাব ভারতীয় সমাজকে এমনভাবে উন্নীত করতে পেরেছে। এই নৈতিক গৌরবেই রামায়ণ ভারতবর্ষের চিত্রে এমন অনন্ত-সাধারণ মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বাঙ্গালির অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই এই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আদিকালেই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে—

বাবৎ স্বাতন্ত্র্য প্রিয়ঃ সখিতন্ম মহীতলে।

ভাবদ্ রামায়ণকথা লোকেশু প্রচলিত্তি।

এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছিল তখনই যখন রামায়ণ ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিল, যখন এই কাব্যখানি দেশের চিত্তকৃমিতে জাহ্নবী-বিষাচলের মতোই চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিল। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থিতা ব্যাক্তোনেল তাই বলেছেন—

No product of Sanskrit literature has enjoyed a greater popularity in India down to the present day than the Ramayana. Above all, it inspired the greatest poet of medieval Hindustan, Tulsidas, to compose in Hindi his version of the epic entitled *Ram-Charit-Manas*, which, with its ideal standard of virtue and purity, is a kind of Bible to a hundred millions of the people of Northern India.

রামায়ণের এই নীতিসম্পদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো সাহিত্যেরই তুলনা হয় না। ভারতীয় সাহিত্যের যে দুটি নবচন্দ্র রামায়ণের জাতীয় চরিত্রের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সে দুটি হল রাম এবং কৃষ্ণ। এই দুই চরিত্রের প্রভাব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু তিনজন মনসী ব্যক্তির অন্তিমত উল্লেখ করেই নিবৃত্ত হব। হিন্দীসাহিত্যের ঐতিহাসিক Kcayসাহেবের মত এই—

One most commendable feature of the Ramayana is its pure and lofty moral tone, in which it compares very favourably with the literature put forth by some of the devotees of Krishna. —*Hindi Literature* (1920) p. 53

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রামকথ্য গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন—

In the Rama cultus Sita is a dutiful and loving wife and is benignant towards the devotees of her husband....There is no amorous suggestion in her story as in that of Radha, and consequently the moral influence of Ramaism is more wholesome....The Rama cultus represents a saner and purer form of Hindu religious thought than Radha-Krishnaism.

—*Vaishnavism* (1913) p. 87

রবীন্দ্রনাথও অল্পবেই অমৃতগ অভিব্যক্ত প্রকাশ করেছেন আরও বিবরণ্যেই—

“একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুদূর পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আনন্দের বেগে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুংসব এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নারক-নারিকার সমস্ত নানাতরঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসঙ্গ সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বদ্বন্দ্বী মহাবাহুর খাড়া পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় পৌরুষভূক্তি এবং হরগৌরীর কথায় স্ত্রীভূক্তি চর্চা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রভুতির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত তত্ত্ব ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আখ্যায়িকার বেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরঙ্গের স্রোত, উন্নত এবং বিস্তৃত; তাহা যেমন কঠোরপন্থীর তেমনই স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণকথার একধিকে কর্তব্যের দৃষ্ট কঠিন অপরধিকে ভাবের অপরিণীত স্বাধূর্য, একর সম্মিলিত। তাড়াতাড়ি দাম্পত্য, সৌম্যত্ব, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাব্যাসনা প্রভৃতি বহুদূর পর্যন্ত প্রকার উন্নত জগতের জীবনকে আছে তাহার স্রোত আদর্শ পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার জঘন্যতাকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা গলে গলে সমস্ত কবিবার কঠোর দান প্রচারিত। সর্বভোক্তাবে হাতছাড় নাহয় কবিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো বেগে কোনো সাহিত্যের নাই। বাংলাদেশের দার্শনিক সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। বাল্যে বাহ্যিক দৃষ্টান্তের ও কর্মক্ষেত্রে নরবেত্তার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উন্নত।”

—গ্রামসাহিত্য (১৯২৬), ‘লোকসাহিত্য’

এর চেয়ে বিবরণ্যে আমাদের মহত্ব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। রামায়ণ-প্রচারিত এই সর্বদ্বন্দ্বী মহাবাহুর ও ধর্মপ্রেরণার আদর্শ যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী-প্রাণিত বাংলাদেশে বণোচিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে গিয়েছেন। জীবের বিবরণ, সেই আক্ষেপের কারণ দূর করবার একটা সুযোগ আর উপস্থিত হয়েছে। ন্যাস্ত্রীকির মূল রামায়ণ এক তুলসীদাসের বিদ্যুৎ রামায়ণ, অর্থাৎ রামচরিতকথার মূল উৎস এবং তার স্রোত পরিপন্থি, এই দুয়েই দশক বাঙালির সাক্ষ্য পরিচয়ের পথ হুগম করে নিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ দাম্পত্যের দৃষ্ট এবং

ঈশ্বর সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। রামশেখরবাবু মূল সংকৃত রামায়ণকে কতকটা সংক্লিপ্ত আকারে সরল বাংলায় অণুবাদ করেছেন। অথচ প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে রামায়ণের শব্দগিরি অংশগুলির পাঠও উদ্ভূত করেছেন। এই বিশেষ গ্রন্থাঙ্গী অবলম্বনের ফলে রামায়ণ-অনুবাদী সাধারণ পাঠকের তে কত উপকার হ'ল তা বলে শেষ করা যায় না। তাতে বরং চোঁচ মূল রামায়ণের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের প্রায় সর্বাঙ্গীণ পরিচয়লাভই সহজসাধ্য হয়েছে। বিস্তৃত রামায়ণ-কাহিনীর অব্যবহ্য অংশ বর্জিত হয়েছে, তাই মূল সংকৃত রামায়ণকে স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থের মূল সংকৃত পাঠ দিয়ে বইখানিকে আরও আরও ও মূল্য সাধারণের আগ্রহ ও ক্ষমতার বাইরে স্থাপন করা হয় নি। অথচ ঠিক যেনো কতগুলির মূল আনবার আগ্রহ অনেকের মনেই যেখা দিতে পারে সেগুলির মূল দিতে দুইই হুবিষেচনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সতীশবাবুর তুলসী-রামায়ণকে বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অলংকার বলে বর্ণনা করলে অত্যাধিক হবে না। তাতে মূল দ্বিতী পাঠসহ তার সরল স্বন্দর বাংলা অণুবাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বর্ণের এই অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এতদিন দ্বিতী-অনন্তিক বাঙালী পাঠকের কাছে অনবিগম ছিল। পাশ্চাত্য সে সব সর্বতোভাবেই হ্রাস হয়েছে। দ্বিতী পাঠকে বলাকরে মুগ্ধ করার কলে লিপির ব্যাঘাত নেই। এই ব্রহ্ম বইখানিকে অতি অল্পমূল্যে সাধারণের মধ্যে বহুলভাবে প্রচারাই যে সতীশবাবুর উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই উদ্দেশ্য যে সর্বতোভাবেই সিদ্ধ হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, এই ব্রহ্ম দ্বিতী রামায়ণটির প্রথম সংস্করণ বাতাই দুই বৎসরের মধ্যেই নিশ্চেষ্ট হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হ'ল গ্রন্থখানি বাঙালি পাঠকের কাছে কত উপযোগী হয়েছে।

রামশেখরবাবু তাঁর রামায়ণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও লিখেছেন। ভূমিকাটি সুস্থ, কিন্তু এই প্রশংসার মধ্যেও তিনি অনেক চিন্তনীয় বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাতেও সমগ্র বইটির প্রতি প্রথম থেকেই একটি আগ্রহ জন্মে। স্বাভাবিক থাকতে জীর্ণ করার পক্ষে যথোচিত সূচনা যে প্রয়োজন, এই ভূমিকাটির দ্বারা সমগ্র গ্রন্থখানিকে আদৃত করার পক্ষে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

সতীশবাবুর হুবিস্তৃত ভূমিকার দ্বারা শুধু সূচনা উদ্দেশ্যের প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় নি। এই ব্রহ্ম ভূমিকার দ্বারা সমগ্র তুলসী-রামায়ণকে যথোচিতভাবে উপলব্ধিই সহায়তা হয়েছে। এই গ্রন্থ ও তার রচয়িতা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই ভূমিকার নিবন্ধ হয়েছে। এই রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। কলে এই ভূমিকাটিকেও গ্রন্থখানির একটি প্রধান অংশ বলে স্বীকার করতে হবে। এই ভূমিকাটিকে আরও করে নিয়ে বইখানি গড়তে শুরু করলে আর কোথাও অনবিগমতার ভয় থাকে না। এটা এই ব্রহ্ম গ্রন্থের পাঠকের পক্ষে কম লাভ নহ'ল।

এই ছুটি গ্রন্থের দ্বারা একটিকে চিরন্তন ভারতবর্ষের সন্তোষ অংশ দিকে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত বিশাল জাতীয় চিত্রের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যকে যুক্ত করা হ'ল। বাংলাদেশের পক্ষে এর চেয়ে বড় লাভ কিছুই হতে পারে না। এই গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করে অণুবাদকর শুধু সাহিত্যসমাজেরই নয়, পরন্তু সমগ্র বাঙালিজন্যই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কেননা তাঁরা দুটি গ্রন্থদ্বারা অণুবাদ করেন নি, বরং ভারতবর্ষের আদর্শ ও সংস্করণকে বাঙালিকে অণুবাদ করে গুনিয়েছেন।

ঔপ্রবোধচন্দ্র সেন

কৃষ্ণচৈতন্যপাদম ব্যাস কৃত মহাত্মারত্ন—সারাহবাস। শ্রীমদ্ভগবতঃ বহু কণ্ঠক অনূজিত।
এব. দি. শব্দকার অ্যাও সঙ্গ নিমিটেত, ১৭ কলেজ কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য নয় টাকা।

মহাত্মারত্নের সমাজ : শ্রীমদ্রম তত্ত্বাচার্য শাস্ত্রী মন্ততীর্থ। বিশ্বভারতী, ৭ বরিন
চাট্‌জো স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য নয় টাকা।

জগতের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সব সাহিত্যই যে মহত্ববিশেষের
দ্বারা রচিত হইয়াছে তাহা নহে; কতগুলি সাহিত্য আছে যেগুলি একটা বিশেষ হুগ, বিশেষ বৈশি-
ষ্ট্য-আপন-আপনিই যেন রচিত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ জিনিস দুর্বল এবং বিষয়কর।
এইজন্য একটি বিশেষরূপ সাহিত্য-স্বষ্টী ভাবতবর্ষের ‘মহাত্মারত্ন’। এ-জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে রচিত হওয়া
অশোকা উপন্যাস হওয়া কথাটাই অধিক প্রযোজ্য। বুদ্ধদেব-জগদ্ব্যাসের দ্বারা সমগ্র একটা দেশ,
সমগ্র একটা জাতির মুখ-ছবিই ইহারা যেন জীবনের কলমে মত কলিতা উঠিয়াছে। কোনো বিরাট
প্রতিভা একটা বিরাট হৃদয়বাসী এই জাতীয় জীবনের কলমে যেন একটি ভাঙায়ে আহরণ করিয়া
আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। ইহা তাই মহাশয় জাতীয়-সম্পদ। এখানে ব্রহ্মসংসারের জীবন পাইয়াছি,
ধর্ম পাইয়াছি, নীতি পাইয়াছি, রাজনীতি সমাজনীতি সবই পাইয়াছি; আর এই সবের ভিতর দিয়া
পাইয়াছি কতকগুলি হইতে হিমালয় পর্যন্ত একটি বিরাট ভূভাগের উপরে আবর্তিত একটা জটিল
জাতীয় জীবনের পূর্ণতম পরিচয়।

এই গ্রন্থে আধুনিক কালের একটা কথা যেন গড়িতেছে—গণসাহিত্য। কথাটা লইয়া অনেক
জানিয়াছি, কিন্তু তববিচারের দ্বারা উহার অর্থ যে কি গিয়া গাড়ার শাট দিয়া করিতে পারি নাই।
মুগ্ধকলিটা ঠেক কথাটির ব্যাসবাক্য; লইয়া। গণসাহিত্যের ব্যাসবাক্য কি? গণ-দ্বারা রচিত সাহিত্য,
না, গণের জন্য রচিত সাহিত্য, না, গণকে অবলম্বন করিয়া রচিত সাহিত্য? সর্বোপরি আবার প্রশ্ন থাকিয়া
যায়, গণ কাহাকে বলিব? এসকল কথা লইয়া বিভ্রম তর্কও অনেক করা বাইতে পারে, বিভ্রম সিদ্ধান্তও
অনেক গ্রহণ করা বাইতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলিকে বিশেষ-কোনো সাহিত্য-স্বষ্টীর উপরে
প্রয়োগ করিয়া সংজ্ঞার সার্বজনীন উপলব্ধি করা কঠিন যেন হইয়াছে। কিন্তু তর্ক ছাড়িয়া সহজবুদ্ধিতে
সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথাটি প্রয়োজ্যতার কথা জানিয়া যেন হইয়াছে গণসাহিত্য বল্য বাইতে পারে
ভারতবর্ষের বাসায়-মহাত্মারত্নকে— বাহার ভিতর দিয়া একটা বিশেষ হুগের একটা বিশেষ জাতির পরিচয়
প্রকাশ পাইয়াছে সর্বোপেক্ষা অধিক। বিপুল মহাত্মারত্নকে তাই নিশিবেছ করিয়াছেন গণেশ— যিনি
অনপণের সহিত নিগূঢ়ভাবে হুগ থাকিয়াই লাভ করিয়াছিলেন তাহার বাহা কিছু ঈশ্বর। মহাত্মারত্ন-
রচনার ভিতরে যে ব্যাসদেব ও গণেশের স্বেদসাদনার প্রয়োজন হইয়াছিল একখাটির তাৎপর্য পটীক।

আধুনিক হুগে আমরা জাতীয় সম্পদের দুইটি রূপ দেখিতে পাই। এক রূপে সে তাহার অভিজাত
বিভিন্ন স্বর্ণকান্তি লইয়া বিভিন্ন রাজভাণ্ডারে বর্তমান; যবে-বাড়িরে, হাটে-বাজারে, আশিস-আম্বালতে
তাহাদিগকে লইয়া নিত্য কারবার চলে না; তাহাদিগকে লইয়া কাছ-কারবার বড় বড় রাজপুত্রদের
শেষবিশেষের সহিত আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সদাশর্বসা কালে লাগাইবার ক্ষম
তাধারের ছোটবড় বিভিন্ন ভণ্ডারের খটকা; সেই বিভিন্ন ভণ্ডারের তাহার সমগ্রবিশেষের আনাচে-

কানাচে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রতিদিনের আর্থিক জীবনকে চান্দ্র বাধিয়াছে। আশাশেখর প্রাচীন জাতীয় সম্পদ মহোত্তমভেদেও আশ্রয় এই জাতীয় দুইটি রূপ দেখিতে পাই; এক রূপে বিস্তৃত বেবতাব্যায় পণ্ডিত-গ্রন্থসীল কঙ্কর যুক্ত হইয়া তাহা বড় বড় পুস্তকাগারে বিরাট করিতেছে, বিস্তার স্বাক্ষরকরণেই তাহা লইয়া কাজ-কারবার। জনসাধারণের নিত্য জীবনের সহচররূপে সে নানা রূপান্তরে ভিতর দিয়া ছোটবড় অগণ্য রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই রূপেই এখন পর্যন্ত জাতীয় জীবনের সে একটা সক্রিয় সম্পদ।

মহাজারতগ্রন্থের সহিত বাঙালি জাতির ঘনিষ্ঠ যোগস্বাগনের দ্বন্দ্ব বহনিত হইতে বহু চেষ্টা চলিয়াছে। কবি মধুসূদনের ভাব্য বলিতে গেলে—

চতুর্দ-মটাঙ্গালে আছিল যেমতি
আহুবি, ভারতরস কবি যৈশ্যদন,
ঢালিয়া সংস্কৃতভূষে বাণিশা তেমতি,
তুকার আহুল বন্ধ করিত যোমন।

এই তুকা নিধারণ করিবার দ্বন্দ্ব সমগ্র, কবীন্দ্র শরমেধর, শ্রীকর নন্দী, বিজয়-পণ্ডিত প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় অনেক কবি চেষ্টা করিয়া দিয়াছেন। ইহাযের ভিতরে কাম্বীদাস দাসের দ্বানই সব-প্রধান। কাম্বীদাস দাস প্রকৃতির মহাভারত মূল মহাভারতের অল্পব্যয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও আসলে কিছু ইহা মূল মহাভারতের অল্পব্যয় নহে, ইহা বাঙালির নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব ছন্দ, নিজস্ব ভাবে মহাভারতকে নুতন করিয়া গ্রহণ। কেবলমাত্র পণ্ডিতপণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র জাতির জনগণের সিকি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিলে মনে হয়, ইহার ব্যবহারিক ফল ভালোই হইয়াছে। মহাভারতের যদ্যদ্ব্যয়ন এবং প্রভাব বাংলাদেশের কানাচে-কানাচে এই শব্দার ভিতর দিয়াই সহজ হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র এবং সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবার নুতন করিয়া দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই রূপে জাতিকে নিজেই বসিয়া হইতে নড়াইবার দ্বন্দ্ব থাকেও আসিয়াছিল প্রবল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবার বাসনা ও সফলও হইয়া উঠিয়াছিল প্রবল। পুণ্যলোক কালীগ্রন্থ সিংহমহাশয় তাই মূল মহাভারতখানিকে প্রাচীন গুহে বাংলায় অল্পব্যয় করিয়া মিলেন। এ কাজ সহজ তো নহেই, ইহার দ্বন্দ্ব যে অনন্তসাধারণ প্রতিভা, প্রকৃত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন ছিল, লেখক ইহার সব বিধেই অসিকারী ও সামর্থ্যবান ছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরিয়া সংস্কৃতানুজিত বাঙালির পক্ষে ব্যাপকভাবে মহাভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগস্বাগর অবলম্বন ছিলেন কালীগ্রন্থ সিংহ।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলা-সম্প্রদায় প্রাচীনতা এবং আত্মিকার বাংলা-সম্প্রদায় প্রাচীনতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা এক নহে। সত্য কথা বলিতে কালীগ্রন্থের পদ্ধতিটি ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে একটি প্রাচীনপন্থী হইয়া পড়িয়াছে, আমরা মনে মনে তাই ইহার একটি পরিবর্তন আশা করিতেছিলাম। প্রতাপস্বয় রাজেন্দ্রের বহু মহাশয় পার্থক্যমূল্যবান এই আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় মনে মনে অস্বস্তি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি স্বামাশয় ও মহাভারতের একটি নুতন রূপোগব্যাসী অল্পব্যয় আমাদের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে রূপোগব্যাসী কথাটি আমি দুইটি

অর্থ ব্যবহার করিরাছি। প্রথমত, ভাষা এবং বাক্যরীতির প্রাচুর্যের ভিত্তি দিয়ে তিনি গ্রন্থানিকে সুগোপন্যে করিবার সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সমগ্র মহাভারতের আক্ষিপ্ত অঙ্গবাহ না করিয়া মহাভারতের সারাহুবার করিয়াছেন। এই সারাহুবারের কলে গ্রন্থপানি অনেকাংশে সহজ ও হইয়াছে, সংক্ষিপ্তও হইয়াছে। এই দুইটি ক্রিনিসেবাই প্রয়োজন ছিল। মূল মহাভারত শুধু উপাখ্যানবহুল গ্রন্থ নহে, তথ্য এবং তত্ত্ব-বহুল গ্রন্থ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তথ্যের এই অল্পত্বতা এবং নিস্তার সর্বত্র অপরিহার্য নহে। তথ্যের দিক হইতেও যেথা যায়, মহাভারতে কথাগ্রন্থকে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত ও নহে, সুশাচ্য ও নহে। লেখক তাই এই জাতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে অনেকটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছেন। গ্রন্থের ক্রমিকারই এ বিষয়ে অঙ্গবাহকের মত অতি স্মৃতি—“এই পুস্তক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অঙ্গবাহ। এতে মূল গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের বা মহোদয়ক নহে সেইসকল অংশ সংক্ষেপে সেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বর্ণনালিকা, দৃষ্টবিররণের বাহুল্য, রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও নৃশিবিরক প্রদর্শন, দেবতাদের ত্রুটি এবং পুনরুত্থার বিষয়। মূলবিশেষে নিত্য নীরস অংশ পরিচ্যুত হয়েছে। এই সারাহুবারের উদ্দেশ্য—মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য ধ্যাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র মহাভারতকে উপভাসের দ্বারা সুশাচ্য করা।”

আমরা যে মূল বাস করি তাহা সব দিক হইতেই একটা ব্যস্ততার মূল। একে বাসনমূল অংশের এই কলিমূলের শেষপ্রান্তে আমাদের অঙ্গুলি অত্যন্ত, তাহাতে আমাদের স্বীনসংগ্রামের তীব্রতা উত্তেজিত হইতে পারে। ইহার ভিতরে একান্ত বিশেষ কোনো প্রয়োজন না পড়িলে লক্ষ্যের মধ্যভারতের অঙ্গবাহ পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেই হয় না। স্তব্ধ মহাভারতকে বর্তমান যুগের বাঙালির নিকটে গ্রন্থযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহার ভিতরে এই সংক্ষিপ্ততার সুগাহগতা একান্তই প্রয়োজন ছিল।

এই সমগ্র এবং সংক্ষিপ্ত করিবার কাজটি পাঠকের নিকটে যতখানি সুখগ্রন্থ হইয়াছে লেখকের পক্ষে বোধ হয় ততখানি সুখগ্রন্থ হয় নাই। প্রথমত, মহাভারতকে সাধারণ পাঠকের নিকটে সুশাচ্য করিতে হইবে, অথচ তাহার গাঢ় এবং মহিমা সূত্র করিলে চলিবে না। এই কারণে লেখকের দুইটি স্বল্পবোধের প্রয়োজন হইয়াছে। একটি মহাভারতের বিপুলতা এবং আকর্ষণ নহে, তাহার ধর্মার্থ মহিমা কে অস্তরে অস্তরে অঙ্গভব করা; অপরটি আমাদের আধুনিক চলিত ভাষাকে সেই মহিমার প্রকাশযোগ্য বান করা। দ্বিতীয়ত, এই বহুলাংশের বর্ণন এবং স্থানবিশেষের সংক্ষেপণের ভিত্তিতে সর্বত্র একটা নিপুণ নির্বাচনবোধকে ও জাগ্রত রাখিতে হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত কলেবরের ভিত্তি দ্বিধা দ্বিধাতে একটা সমগ্রতার আশ্বাস পাওয়া যায় যে কিভাবে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। মূল মহাভারতের অংশবিশেষের সহিত ঠাহারের মূল বর্ণিত পরিচয় নাই, ঠাহার অঙ্গবাহকালে লেখক কোথায় যে কি ঘটনাটি করিয়াছেন, কোথায় অনেকখানি কথাকে লেখক নিজের মতন করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিধিতে পানিবের বলিয়া মনে হয় না। এক-আধটি মূলে অবশ্য আমাদের মনে হইয়াছে, যেন একটু অল্প বয়স হইলে ভালো হইত। যেমন ভগবদ্গীতার যেখানে সংক্ষিপ্ততার বেওয়া হইয়াছে সেখানে আমাদের মনে হইয়াছে, বিশ্বতপস্বীর কথা আবার একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া বয়স গীতার যেটা খসল কথা, অর্থাৎ

‘কর্মদয়ায়’, সে সম্বন্ধে আর-একটু স্পষ্ট আভাস থাকিলে বোধ হয় ভালো হইত। মহাত্মারতের খুব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হানে লেখক দুই-একটি মূলের স্নোকে উদ্ভব করিয়া তাঁহার সাধাসুখাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মহাত্মারত সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনাগ্রন্থের বড় অভাব। এখনও কি এ বিষয়ে বিশেষী গণিতগণের বিশেষী তাহার লিখিত গ্রন্থাদি পড়িয়াই আনানিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? কিছু দিন পূর্বে বিশ্বভারতী ক্ষুদ্র প্রকাশিত শ্রীমত স্বপ্নময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয় লিখিত ‘মহাত্মারতের সমাধি’ গ্রন্থখানি আনানিগকে স্বস্তি এবং আনন্দ উভয়ই দান করিয়াছে। বৃন্দাকাষের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় লিখিত এই গ্রন্থখানি মহাত্মারত-সম্বন্ধিত তথ্যের একটি বিরাট ভাণ্ডার। বহু প্রভা পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রমের ফলে এ-স্মার্তীয় গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়। লেখক তাঁহার আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে ভাগ করিয়াছেন। বিবাহ-গ্রন্থাই সমগ্রবন্ধনের একটি মূলীকৃত বস্তু, এইজন্যই প্রথম খণ্ডে মহাত্মারতের মূলের বিবাহ-গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিবাহ-গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াই নানাবিধ সংস্কার, তৎকালীন নারীজীবন, সমাজে তাহার স্থান, চতুর্দশাব্যবস্থা, চতুর্দশাব্যবস্থা প্রকৃতি বহু আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, এই খণ্ডে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, বৃত্তিব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প, আহাৰ ও আহাৰ্য, পরিচ্ছন্ন ও প্রদাপন, পারিবারিক ব্যবস্থা, প্রকীর্ত্তি ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ইহার ভিতরে তৎকালীন ধর্মের আদর্শ, সত্যের আদর্শ, সেবতার ধাৰ্ম্মা, উপাসনা, আত্মিক ও কৃত্যাক্রান্ত, শব্দার্থ ও অশব্দার্থ, শ্রদ্ধ ও তর্পণবিধি, স্বাক্ষর, বুদ্ধ, ধার্ম্ম্য, প্রাথমিকতাবিধি প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে তৎকালীন বিবিধ শাস্ত্র, শিল্পকলা, বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানির এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই বোঝা যায়, শাস্ত্রীমহাশয়ের মহাত্মারতের মূলের সমগ্র স্মার্তীয়-জীবনের ধার্ম্ম্য বৃত্তিবার জন্য কেবল তথ্য সমাবেশের প্রয়োজন তাহার কিছুই বাকি নাই। বাংলায় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের পাণ্ডীকার তিনি এইসব বিষয়ে মূল মহাত্মারতের বহু স্নোকে ও স্নোকার্ধেও উদ্ভব করিয়া দিয়াছেন, অথবা অধ্যায় ও স্নোকে উদ্ভব করিয়া দিয়াছেন। ফলে, এ বিষয়ে সত্য্যগ্রন্থটিতে ব্যক্তিমাত্রই মূল দেখিয়া তাঁহার সকল সংশয় দূর করিয়া লইতে পারেন। এ কারণে সন্তুষ্ট পরিশ্রম যেহেতু করিয়া প্রকাশিত শাস্ত্রীমহাশয়ের তাহা করিয়া রাখিয়াছেন; অন্যথাসে বা অন্যভাবে কোতুল নিবৃত্তি করিবার কাজটি যাহা পাঠকের জন্য বাকি হইল।

অন্য গ্রন্থের উপকরণগ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার না থাকিলেও এই গ্রন্থের উপকরণের পরিবেশন সম্বন্ধে আনানিগের সাধাত্ত কিছু বক্তব্য আছে। আলোচ্য বিষয়ের বিভাগ সম্বন্ধে দু’একটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ‘চতুর্দশাব্যবস্থা’র আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ধর্মের আলোচনার ভিতরে শ্রেণীভুক্ত হইলে বোধ হয় আরও ভালো হইত। তেমনি আবার দ্বিতীয় খণ্ডের ‘দায়বিশাগ’ সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথম খণ্ডে স্থান পাইলেও বাকি হইত। মহাত্মারতের ‘স্বাক্ষর’ একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বহিয়াছে; লেখকও এ বিষয়ে সাধারণ স্বাক্ষরধর্মের আলোচনা না করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে স্বাক্ষরধর্মের মোটামুটি সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়টি একটি বক্তব্য খণ্ডে আলোচিত হইলে বিষয়ের সর্বগা হইতো অধিকতর স্বকিত হইত।

শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার গ্রন্থেও তথ্যগুলিকে তাঁহার নিজস্ব মতামতের ভেতরে খাটা কোথাও সন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সংশয়ের পরিচয়, পাঠকের পক্ষে ইহা একটা বিশেষ লাভ। পদে পদে অশয়ের মন্তব্যাদির দ্বারা কটকটিত হইবার পরিবর্তে পাঠক এখানে তাঁহার স্বাধীন দৃষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে পারেন এবং নিজের মতামত নিজে স্থির করিয়া লইবার সুযোগ পান।

মহাভারতের সমাজ সম্বন্ধে এই বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করিলে গোটা কয়েক কথা বহুই মনে উপস্থিত হয়। তাহা হইতেছে তখনকার দিনের সমাজজীবনের একটা স্বাধীন প্রবাহ এবং তাহার সঙ্গে তাহার প্রাণশক্তির বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে। যে লোক হুহু সবল, তাহার সেহে বিবিধ রোগের বীজগু প্রবেশ করিতে পারে, তিতব হইতে ব্রণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, বাহিরের আঘাতে বহু ক্ষত লভ্য হইতে পারে; কিন্তু যেখানে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য বহিরাগ্রে সেখানে এইসবকেই সেহ তাহার আপন জৈবিক ধর্ম দ্বাৰা করিয়া শুণু আত্মরক্ষা নহ, আত্মরক্ষাতিও করিতে পারে। কিন্তু নির্বীৰ্য্য হইলে সে বীজগু আশ্রয় করে, সেই তাহার সহজ প্রবাহকে ব্যাহত করিয়া গভীর অমনশ সাধন করিতে পারে, যে-কোনো ক্ষত ব্রণ বা ক্ষত তাহার পক্ষে প্রাণলংঘনী হইয়া ওঠে। সমাজসেই সম্বন্ধেও একই কথা। মহাভারতের যুগে সমাজব্যবস্থার বিধিনিষেধও অসম্ভাব ছিল না, আবার সমাজজীবনে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর অমনগতন-ত্রটিও অভাব ছিল না। কিন্তু অদ্বৈত জীবনীশক্তি ছিল— সে সমাজ তাই ঈশ্বর কাচের পাত্রের দ্বারা যে-কোনো আঘাতে কেবলই ভাঙিয়া ছোঁচিয়া হইয়া পাইতে চায় নাই। তখন চাতুর্ভাব্যবস্থা চতুঃপ্রাশম-ব্যবস্থা সবই ছিল; কিন্তু ক্রিয়ের পক্ষে সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভে কোথাও কোনো বাধা নাই; বিধাতাপুৰুষ দ্বয়ের সঙ্গসঙ্গেই অশরিত নীধ জাতি-পরিচয়ের লেবেল ঝাঁটিয়া দিতে ন। যে ব্যবস্থার উপরে সমাজের বনিয়াদ নির্ভর করে সেই বিবাহব্যবস্থার ভিতরেও সমাজের অনেক অবিধি, ব্যক্তিচার, অনেক গাণ শোষণ করিয়া লইবার শক্তি ছিল। শুণু শাসন, শুণু প্রাণভিত্তির কঠোরতার দ্বারা একটা বিরাট সমাজজীবনকে বেশি দিন টিকাইয়া রাখা চলে না। কেবল শিক্ষা-বিচারের সাহায্যে, কেবল ছাঁটিয়া দূবে সরাইয়া সমাজের বিভক্তিশাধন হয় না। যে বিত্তজি প্রাণশক্তিকে বহিত হইতে কেবল চারিদিক হইতে বাধা দেয়, বন্ধন ও শুষ্কতার ভিতর দিয়া সে আনিবে সমাজের দুহা। আলোচ্য ‘মহাভারতের সমাজ’ গ্রন্থখানি পড়িলে বেশ বোকা যায়, সমাজজীবন একটা সচল বস্তু, সে তাহার সমস্ত অঙ্গ দিয়াই চলিয়াছে, শক্ত কাঠের স্ক্রোবের ভিতরে ঠাসিয়া পুঁথিরা নিম্নেই সে কেবলই গুপ্ত করিয়া রাখিতে চায় নাই। তিতব বা বাহির হইতে আঘাত আদিলে জীবন্ত সমাজ শুণু খোঁস দৃষ্টি করিয়া আত্মসংরক্ষণ এবং আত্মরক্ষাকালেই দ্বাৰাই আত্মরক্ষা করিতে চাহে না, দুঃস্বপ্নরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিতরেই সে আত্মরক্ষার সুযোগ খোঁজে।

শ্রীশশীকৃষ্ণ দাসগুপ্ত

স্বরলিপি

গোলাপ কুল কুটিরে আছে
 মধুপ হোথা বাস্‌ নে,
 ফুলের মধু কুটিতে গিরে
 ঝাঁটার ঘা বাস্‌ নে ।
 হেথায় বেলা হোথায় চাঁপা
 শেকালি হোথা কুটিরে—
 ওদের কাছে মনের ব্যথা
 বস্‌ রে মুখ কুটিরে ।
 জমর কহে, “হেথায় বেলা,
 হোথায় আছে নলিনী,
 ওদের কাছে বলিব নাকো
 আঞ্জিও বাহা বলি নি ।
 মরমে বাহা গোপন আছে
 গোলাপে তাহা বলিব,
 বলিতে যদি অলিতে হয়
 ঝাঁটারই ঘারে অলিব ।”

कथा ७ अथ ॥ यथोक्तानां त्रैलोक्य

ବରାଜିନି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ଦେବୀ

পা	পা	-১	যা	যা	যা	যা	যা	যা
প	ক	প	ক	টি	বে	আ	হে	

যা	না	যা	না	যা - না
হু	ন	হো	খা	হা - খা

পদ্য	বা	হা	খা	গা	দা	না	বদ্য	I
কঃ	সে	হু	লু	টি	স্তে	রি	বেঃ	

ଅକ୍ଷର ଲେଖା

ବ୍ୟବହୃତି

ଂନା ନା -ଂ ନା -ମନା -ନା II
କା ଡା ବ୍ ବା ... ନ୍ ନେ ଂ

ଂନା ନା ନା ଂନା
ହେ ବା ହୋ ଖା

ନା ନା ଂନା ଂନା ନା
ହେ ବା ନି ହୋ ବା ଂନା: -
ହେ

ନା ନା ମନା I
ବ ବା ଖା..

ନା ନା ମନା ନା ଂନା II
ହେ ବ୍ ବା .. ଂ

ନା -ଂନା ନା ନା ନା ମନା
ହୋ ବ୍ ବା ହେ ନ ନି.

ମନା ନା -ଂ ନା ନା ନା
ଡ଼. ହେ ବ୍ ବା ହେ ନା ନା ମନା I
ବ ନା କୋ.

ଂନା . ଂନା ଂନା ନା ମନା ନା ଂନା I
ଆ ବି ଡ଼ ବା ହା.. ନି ନି .

ଂନା ଂନା ନା ଂନା -ଂ ନା ନା I
ହ ବ ମୋ ନ୍ ବା ହେ

পা লো	পাঁ পে	বা ভা	পা হা	পাঁ পা:	বা ব
পাঁ লি	পা তে	পা ব	পা হি	পাঁ লি	পা-পা-হা হে
পাঁ টা	পা টা	পা হই	পা হা	পাঁ হে	পা-পা-হা হে

জ্ঞানগোষ্ঠী

বিশিষ্ট: "এতদুল কে কোটালে"। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪৬

অন্তঃ

অন্তঃ

পূর্বা ২৫৩	পূর্বা ৫	পাঁ ব	পা হি	-১ I •	পাঁ ব	পা হি	-১ I •
---------------	-------------	----------	----------	-------------	----------	----------	-------------

বিশ্ভারতী পত্রিকা

কাৰ্ত্তিক - পৌষ ১৩৫৬



বিষয়শূচী

কবিতাগুচ্ছ

কবিতা

পালকি-বেহাঙ্গার গান

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

একাকী

একাত্তে

মৃত পথ

দুঃশাক্তানী গান

বাসন্তী ইন্ডিয়ান

চারণ

গানের গান

শ্রেয়গাথা

হুজুৰাবাদ-নগরে সন্ধ্যা

কুলাবনের বাশরিয়া

'পরের দাবী' ও 'বোড়ো'

সংগীতিনী নাইট্‌

সংগীতিনী নাইট্‌র কবিপ্রতিভা

সংগীতিনী-স্বরণে

রক্তকবরী

গান ও গায়কি

গ্রন্থবিচার

দেশে বিদেশে

কড়কাষার বিনগুনি। ছাড়াযিছিল।

শৃঙ্খলকংকার। ঘোঁরা কাটক

দেশ কাল পাঠ। জীহ্নকাঠি।

ঘনাত্তিকে। ব্যক্তিগত

স্বদেশি

স্বদেশীগ্রন্থ

সংগীতিনী নাইট্‌

সংগীত

স্বদেশীগ্রন্থ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় সেনগুপ্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় সেন

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

ঐশ্বরীকৃত্যায় দত্ত

বীজ, গাছ ও ফুল

শ্রোব নার্সারিতেই ভাল

কয়েকটি বাছাই সস্তা বীজ সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে

প্রতি আউন্সের মূল্য :—বাঁধাকপি মোব মোরী ২১০, বাঁধাকপি একট্টা আলি একপ্রেস ২১০, বাঁধাকপি মাইটেনহেড ডামহেড ২১০, ফুলকপি আলি ও লেট সোবল ২২, ফুলকপি মোব বেটার ৪২, ডিনাকপি ২১০, বলকপি ১১০, হীট লাল গোল ১১০, (প্রতি পাউণ্ড ১৮২), শালগম ১২০, (প্রতি পাউণ্ড ১২২), পেটল ১১৮০, মূল্য বোয়াই ১২২ লাল ৪০ (প্রতি পাউণ্ড ৬২), মূল্য লাল গোল ১২, টম্যাটো শারবেকসন ২৪০, পেচাজ বোয়াই ৫০, (প্রতি পাউণ্ড ১০২), গাজর আমেরিকান ১৮০ (প্রতি পাউণ্ড ১০০), ফ্রেক বীন ৮০ (প্রতি পাউণ্ড ১১০), সিলেটী ১১০, বেগুন আমেরিকান ২২, নটর আমেরিকান ৮০, (প্রতি পাউণ্ড ১১০), নরডনী উৎকট ফুল বীজ (একশত বকম) প্রতি পাউন্ড ১০, শশা (নীতের) ৪২।

- দৈন্য সস্তা বীজ

প্রতি আউন্সের মূল্য :—বেগুন ১২, লম্বা ২২, উচ্ছে ১০, কবলা ১২, কাছড় ছুটি ১০, হুমড়া ছিট ১০, খবম্বা ৪০, বেঁটো-বিলগছ-তিগা ১২, চিচিরা ১১০, বিস্মা ১০, ডেঁসল ১৮০, তরমুস ১০, খুঁচুল ১০, অন্নভিন ১১০, কুড়া ১০, লাউ ১০, শশা ৪০, ছোয়াস ২২, গালম ৮০, শাকখালু ১০, নটেপাক ৪০, ভেঁকোটাটা ১০, পুইশাক ১০, লৌ ৪০, বিস্মা ১২ পাউন্ড ২২।

অবিখ্যাত চারা ও কলম

আমাদের নিরীক্ষিত প্রতি তরনের মূল্য :—আম ১৫২, লিচু ১৫২, লেবু ১০২, কম্বালেবু ১০২, কলা ১০২, পেঁপেটা ৮২, আমরুল ৮২, নারিকেল ১৫২, গোলাপফল ৪২, কাঁঠাল ৪২, কম্বেল ২১০, জলপাই ৮২, তালিম ৮২, আঁড়ি বিলাতি ৪২, সপেটা ১০২, ফুল ১০২, লকেট ১০২, বাতাবীলেবু ১০২, চাঁপা ৪২, বাগনোজিগা ২৪২, জবা ১০২, বঙ্গ ১০২, শামগাছ ৮২, কোটন ৮২, কাউগাছ ৮২, লতানে ফুলগাছ ১০২, হুগাবি ৪২, হুগদি ও বড় জাতীয় গোলাপের কলম ১০২।

কৃষিকাজী পত্রিকার সম্পাদক ও শ্রোব নার্সারীর অধ্যক্ষিকারী

শ্রীঅমরনাথ রায়, এক, আর, এইচ, এন্ড (লন্ডন) প্রাইভেট

কয়েকগনি উৎকট কৃষি-পুস্তক

- | | | |
|-----------------|----|----------------------|
| ১। বাংলার সস্তা | ৩. | ৫। সরল পোলটী-পালন |
| ২। চাষীর কলম | ৩. | ৬। সরল সারের ব্যবহার |
| ৩। অগ্ৰণ্য কলকর | ৩. | ৭। মাছের চাষ |
| ৪। সুন্দোভান | ৩. | ৮। পশু চাষের চাষ |

কাটালগেব ওর নিরলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—



হাওড়া ষ্টেশনেও দোকান আছে।



বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫৬

কবিতাগুচ্ছ

সরোজিনী মাইত্ৰ

পালকি-বেহারার গান

মোরা মন্দ মৃদু মন্দ তাঁরে
বাহিয়া ঘাই চলে,
সে যে গানের হৃৎকোষে লেগে যেন
ফুলের মতো দোলে ।
সে যে পাখির মতো ছুঁয়ে চলে
রোজের ফেনা-পরে
সে যে স্বপন-দেখা অধর হতে
হাসির মতো করে ।
মোরা হৃৎকের তালে চরণ ফেলে
ধাই গো মোরা গাই,
যেন মালার মাঝে মোতির মতো
তাহারে বাহি ভাই ।
মোরা মন্দ মৃদু মন্দ তাঁরে
বাহিয়া ঘাই চলে,
সে যে গানের হিমবিন্দু-পরে
তারার মতো দোলে ।
সে যে বস্ত্রাশুখে উন্মিড়ালে
রশ্মিসম ফুটে,
সে যে বধুর নত নন্দন হতে
অঙ্কসম টুটে ।

মোরা। মন্দ মৃৎ মন্দ মৃৎ
ধাই গো মোরা গাই
যেন মালার মাকে মোতির মতো
তাহারে বাহি ডাই।

Palanquin-Bearers : অহুবাধক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বনকর্ণন, ১০২ ১০১২

✓ জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার
জ্যোতি তব উষার কিরণে ;
পাপিয়ার কলখনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে।
জাগরণে স্বপ্নসম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্রসম নিশীথে উদ্ভাস ;
আর্জ কর, স্নিহ কর মৃগনাভিসম,
মুক্ত কর রাগিণীর প্রাণ।
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে কল্পণায় ;
বল তুমি, 'হৃদি অবগুষ্ঠনের মাঝে,
এ-রূপ দেখাতে নারি হয়।'
তুষা আর ভূপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান—
অর্ধহীন এ অবগুষ্ঠন ?
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
এ কি গো সমবলীলা তোমার-আমার ?
কমা দাও, মাগি পরিহার ;
মরমেরো মর্ম বাহা ডাই তুমি মোর,
জীবনের জীবন আমার।

Humayun to Zobeida : অহুবাধক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
জীবনদিন, ১০১০

একাকী ✓

একা-একা খুঁজে ফিরি, ওগো প্রেম, পুন্পিত বনানী,
সুখের সে অলি-গলি, নিভোজঙ্গল, চির-পুরাতন,
দাড়িহুগুচ্ছের মত পল-নয় কোমল প্রভাত,
রাজির প্রচুর গাঢ় দীপ্ত শাস্ত ফলের কানন ।

একা-একা চেউ ভাঙি, ওগো প্রেম, জীবনের নদী—
পরিচিত জলধারে আবর্তের পরিবর্ত নানা,
আশায় বিশাল সিঁদু, কামনার বর নিৰ্ঝরিত,
চন্দ্র-ইন্দ্রজাল-মুছ আলোকিত স্বপ্নের মোহানা ।

সব্বের বাতাস নাই, নাই কোথা সাস্থনার তারা,
মধুর ঠিকানা তব কে বা দেবে, কোথা আছ স্থির ;
নির্ধারিত কোন ক্ষণে, হৃদয়ের না উদ্বেল অক্ষর,
দেখা পাব তোমার সুখের সেই অন্তর মন্দির ?

Alone : স্বহৃদয়ক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একান্তে

হে জগদ, চলো বাই যেথা বাজে আহ্বান সন্ধ্যার —
দূরে বহুদূরে এই বিজ্ঞান ভীষণ ভিড় থেকে,
প্রান্তরে কান্তারে যেথা জাদু নিয়ে নামে অন্ধকার
দীপ্যমান মেঘ হতে স্বর্ণস্রোতা তটিনীরে ঢেকে ।

বহুর জটলা থেকে ব্যথা-কোলাহল হতে দূরে
যেখানে বিজ্ঞান আছে, শাস্তি আছে সংঘাত-সীমায়,
রাজির প্রশান্তি যেথা পূর্ণ হয় আগামীর সুরে
জীবনসংগীতে যেথা মৌন বতি ভরে মুহূর্তায় ।

ঐগল প্রহরী যেথা চলো সেই গিরির চক্রে,
তালের ছায়াতে শুয়ে সেখানে হয়তো ঘাবে শোনা

হয়তো বা হোয়া বাবে ঘুমন্ত ঘাসের কণ্ঠস্বরে
কোনো স্বপ্ন — স্বপ্নের তারার রহস্য দিয়ে বোনা ।

হয়তো বা অনন্তের রূপস্পর্শ পাবো ছু নয়নে
যার ছায়াভলে সারা জীবনের সংকোচ-সুহৃৎ,
আলোক-বচিৎ পল বেয়ে প্রভাতের উদ্যানে
ছাতিময় দলে যার ঈশ্বরের পূজা নিবেদন ।

Solitude : অসুখাবস্থায় প্রকাশিত দর্শন

মৃত স্বপ্ন

আবার ফিরিয়া এলে কি আমার অসুখসন্ধান-তরে
লক্ষ বর্ষ পরে, হে স্বপ্ন মোর ।
সমাধি তোমার দিয়াছিহু ভীম তলহীন গহ্বরে,
কে ভাঙিল তব গভীর সে ঘুমঘোর ?
ছিলে নিমিত্ত অন্ধকারায় লক্ষ বর্ষ ধরি,
কার আশ্রানে জাগিলে আবার সুশ্রুতি পরিহরি,
কে পাঠাল তোরে সন্ধানে মম সমুদ্র উত্তরি,
কে ভাঙিল ঘুমঘোর ?
আজি অসময়ে কেন কিরে এলে, হে মৃত স্বপ্ন মোর ?

তোরণদ্বারাে সাজানো আমার পত্রমালা শত
নির্মম করে ছিন্ন করিবি কি রে ?
প্রাসাদশীর্ষে নির্ভয়স্থখে প্রেমগুণনরত
দ্রুত করিবি কপোতদম্পতিরে ?
অশ্রুচি করিবে মৃত তব হিম-অশ্রুপিপারশনে
মোর পূজারীর বিমল উত্তরীয়,
স্তম্ভ করিবে অকারণ তব শোকগাথা-আলাপনে
মোর আনন্দ-উৎসব রমণীয় ?

লক্ষ বর্ষ হল অবসান বেদিন সন্মোপনে
ভগ্নস্থলয়ে রাখিছ তুমারে তুমারের আবরণে
অহ সে কারা তাজি কেন এলে আজি মন অঙ্গনে ?
কে তাজিল ঘুমঘোর ?
অন্তুটি কোরো না এ দেবদেউলে, হে মৃত স্বপ্ন মোর !

My Dead Dream : অহুবারক শ্রীঅর্ধকুমার সেন

ঘুমপাড়ানী গান

মশলা-বনের আমেজ নিয়ে
কত ধানের ক্ষেত পেরিয়ে
পশুদিগির শুবাসটুকু মেখে,
শিশিরকণার ঝিক্‌ঝিকানি—
ছোট্ট মিঠে স্বপনখানি
এনেছি দূর পরীর দেশের থেকে ।

ঝোকনমনি, ঘুমোও এবার,
দীপ ছেলেছে জোনাকি তার,
কাঁকে কাঁকে নাচছে নিমের গাছে ।
আফিমহুলের পেয়ালা হেঁকে
চোরাই ক'রে আঁচল ঢেকে
এনেছি এই স্বপন তোমার কাছে ।

ঘুমোও আমায় বিদায় দিয়ে,
লক্ষ তারা ঝিল্মলিয়ে
তোমায় ঘিরে আলছে হু চোখ মেলে ।
আদর ক'রে শুইয়ে ঘুমে
সোনার জাহ্নব নয়ন হুমে
স্বপন-মধু দিলেম তাতে ঢেলে ।

Cradle-Song : অহুবারক শ্রীজ্ঞানী বাবু
শান্তিনিকেতন পাঠ্যভবনের ছাত্রী

বাসন্তী ইন্দ্রজাল

গিরির গহন গুহায় মৃত্যু-শীতল শিলার তলে
সমাধি রচিয়া প্রাণের আমার কহিছু অক্ষরফলে,
'আশাহীন ওরে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব, ঘুমায়ো অশেষ কাল—
মায়াবী কাকুন চৈত্র যেদিন নূতন ইন্দ্রজাল
বনে উপবনে বিখারিবে, পিক কুহরিবে কুহতান,
জাগিয়ো না আর, বন্ধে নিয়ো না নিশিড বেদনাবাণ !'

বসন্ত এল : কিংককে আর অশোকে রক্তশিখা
কলোমলি উঠে, উবাসজ্যায় সোনার-লিখন-লিখা
লঘু মেঘমালা, মুহু মুহু পিক-কুহরিত বনবাস—
সমাধিশয়নে চমকিয়া জাগি প্রাণ কহে, 'মধুমাস
ঐ এল বৃষ্টি, এল, গায়ে কার লাগে যে সুরভি ধাস !'

The Magic of Spring : অম্বাব্যক শ্রীকানাই শাস্ত্র

চারণ

উতলা বাতাস ডাকে আমাদের, দ্রুতপদে ছুটে যাই
বনে বনাভে দূর পথে পথে মিলায় প্রতিধ্বনি
বাঁশরির সুরে গান গেয়ে চলি কণ্ঠে সুর মিলাই
সারা ছুনিয়ায় ঘর আমাদের, সবারে আপন গনি ।

গান গেয়ে চলি হারানো দিনের, হারা-নগরীর গান,
দূর অভীডের স্মরণীদের রূপযৌবনস্মৃতি,
হৃদয় যুগের অসিদ্ধতা, রাজমুকুটের মান,
সুখব্যথাভরা সরল জীবন— মধুর করুণ স্মৃতি ।

কোন আশা মোরা করি আহরণ, কোন সে স্বপন বুনি ?
উতলা বাতাস বেধা ডাকে, মোরা দ্রুতপদে ছুটে যাই ।
ধরা নীহি দিই, প্রেম-আরামের মন্ত্রণা মাহি শুনি
উতলা বাতাসে জীবনমন্ত্র— পথ চলি, গান গাই !

Wandering Singers : অম্বাব্যক শ্রীযেজনাথ মৃণোপাধ্যায়

গাঁয়ের গান

মধুমুখী কষ্টা আমার, কোথায় চলে যাও ?
 কেন তোমার মণিমানিক বাতাসে ছড়াও ?
 মা খাওয়ায় সোনার ফসল, ছেড়ে যাবে তারে ?
 ভাঙবে কি বুক, বর হয়ে যে আসছে ঘোড়সওয়ারে ?

মা গো আমার, আজকে আমি গহন বনে চলি,
 চাঁপাগাছের ডালে বেথায় ফোটে চাঁপার কলি,
 কোকিল-ডাকা নদীর চরে পদ্ম ফুলুলায়,
 শোন মা সেখা পরীরা সব ডাকে যে আমায় ।

মধুমুখী কষ্টা শোনো, ছনিয়া সুখের পুর
 বরণ দোলন গান আর আয়েল চন্দনে ভুরভুর !
 বিয়ের বজ্র বুনছে তোমার বাসন্তী রূপালি,
 বিয়ের গিঠে বানাই, তুমি কোথায় যাবে চলি ?

বধুবরণ, খোকন-দোলন গানে ছুখের রেশ
 আজ রোদ্দুর হাসে, হাওয়া কাল মরণে শেষ ।
 অনেক মিঠে বন-ঝরনার ধারে বনের গান,
 পরীরা ওই ডাকে মা গো, দুইতে নারে প্রাণ ।

Village-Song : অহুবাহক শ্রীপ্রমোদ মিত্র

প্রেমগাথা

মেয়ে : বাঁশির ডাকে নাগিনীসম বঁকে
 তোমার করণুটের মাঝে চলেছে হিয়া মম,
 যেখানে নিশা-বাসু রেখেছে ঢেকে দ্রবিত সম
 হৃদীর তার কানন-বেদী শিরীষ-ছাওয়া কন্ত,
 নানা রঙিন ফলের পাকা গুচ্ছ মাথা থেকে
 সিঁদুর ফুলে ভিড় করেছে শুকসারীরা যত ।

ছেলে : গোলাপদলে অন্তরীণ সৌরভে বৃষ্টি বা
 হৃদয় তব বকে যম প্রেয়সী ! সম্রত,
 মালার মতো, মণির মতো, পারাবতের মতো
 অশোকশাখে বাঁধে যে নীড় দিনাস্তের পাটে ।
 নাস্ত রহ প্রিয়া । এখনো পাতে নি দেখ দিবা
 সোনালি তার উষাশিবির গজদন্ত মাঠে ।

Indian Love-Song : শ্রীবিষ্ণু দে

হল্লুয়াবাদ-নগরে সন্ধ্যা

আকাশে ঐ ছাখো না ফুটফুট পায়রা-গলা,
 এখানে মুকো-ছিটে, ওখানে আগুন-জলা ।
 নগরের মিহিছারের মুখে ঠিক হাতির দাঁতের
 মতো ঐ নদীর বাঁকা ঝিকঝিক মিশলো রাতে ।
 মিনারেট ভাসলো ছায়ায়, আকাশে উঠলো আজান,
 নগরের প্রাচীর-পরে শান্তির গুত্র নিশান ।
 জানালার জাকরি-ফাঁকে কত-যে রূপের রেখা
 দেখা যায়, যায় কি না যায়, বিলাসের ঘোমটা-ঢাকা ।
 হাতিরা অলস পায়ে বেঁকে যায় গলির মোড়ে,
 রূপোলি ঘণ্টা বাজে রূপোলি সন্ধ্যা ভ'রে ।
 শোনো ঐ চার মিনারে নামে রাত ঘোড়ার খুরে,
 টাং ডাল দিয়ে যায় করতাল কোথায় ঘুরে ।
 নগরের পুলের উপর স্বপ্নের পাখি চ'ড়ে
 • আগে রাত রানীর মতো, প্রাসাদে, গরিব-ঘরে ।

Nightfall in the City of Hyderabad : অহবাক বুড়সেন বহু

ব্রন্দাবনের বীশ্বরিয়্যা ✓

কদম্বের তলে তুমি ও-বীশি বাজালে কেন
 যে-বীশির নাই তুলনাও,
 শাপিত মধুর সুরে তন্ত্রাময় এ-কদম্ব
 কেন কতটুকু এ'কে যাও ?
 হে মোহন বীশ্বরিয়্যা, ও সুরের স্রোতে ভেসে
 হয়ে যাব অসীমে উধাও ?

গৃহহীন বাযাবর মুক্ত বিহঙ্গের মত
 ইচ্ছা করে নিকরদেশে ধাই ;
 মায়া মোহ মমতার ধারিব না কোনো ধার
 মানিব না বাধার বালাই,
 বীশির কুহক-ডাকে ইশারায় সাড়া দিয়ে
 দিকে দিকে ছুটিব সদাই ।

হোক না সে ইস্তালায় পারিজাত-কুঞ্জে ভরা
 সুরধুনীধারায় মুগ্ধ,
 অন্ধকার যমপুরী হয় যদি হোক না সে
 বিবাদের ছায়ায় নিধর,
 যেখানে মধুর বীশি বাজিবে মোহন সুরে
 ছুটে যাব সেখানে সৰ্ব্ব ।

সীমাহীন আকাশের স্ফুৰ্ত্তীর পাতালের
 কোনো ভয়ে নহি আমি ভীত ;
 সমর নাগাল আজও পায় নি যে স্নহুরের,
 যে চূৰ্ণম আলোকরহিত,
 সে নীরব বিতীৰ্ণিকা তুচ্ছ করি' প্রাণ চায়
 পান করি সুরের অমৃত ।

The Flute-Player of Brindaban : অহুবাদক ব্রীহস্পতি দাস

ব্রীহস্পতি ও সত্যেন্দ্রনাথ - কৃত অহুবাদ গুণে অত্যন্ত প্রচলিত । ব্রীহস্পতি কৃত অহুবাদ-দশক 'ব্রীহস্পতি' কবিতা

‘পথের দাবী’ ও ‘ষোড়শী’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্যটক চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীবর্

তোমার পথের দাবী পড়া গেল করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থ্যাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অগ্রসর করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা গোপনের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হনীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিশেষ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ করা করবেন এই জোড়ের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌকব নেই। আমি মানাবেশে ঘুরে এসে—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই যেখানে একমাত্র ইংরেজ পূর্ববর্তী ছাড়া যমেশ্বী বা বিদেশী প্রজার থাকো বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো পূর্ববর্তীই এতটা ঐর্ষ্যের সঙ্গে সম্মত হয় না। নিজেদের জোরে নয় পরজ্ঞ সেই পূর্বের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজ্য সম্মত দেখে আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌকরের বিরুদ্ধমাত্র—তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে পারের জোব, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের শান্তিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থ্যাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, যুগে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দাবীই সেই পূজার অঙ্গুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় কথা। অত্ৰ কোনো প্রচা বা প্রতীচা বিদেশী রাজ্যের দাবী এটি হত না। আমরা রাজ্য হলে যে হতই না সে আঘাতের বহিলাবে ও ভারতীয় রাজত্বের বহিধ ব্যবহারে প্রত্যাহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শান্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রমাণশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে দেখানে এখনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা মায়াবে নিরাপদে থাকতে পারেনা এই কথাটা নিঃসন্দেহ মেনেই ঘটেচে। তুনি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রত্যাব স্বল্প ও অপদায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পছলে যে কথা লিখবে তার প্রচা নিরত চলতেই থাকবে—দেশ ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাহ নেই—অশ্লিষ্টত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আশ্রয় কীরে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রচাবের অব্যবহিত আছে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোকা যেত যে সাহিত্য তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিপর অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তির আঘাত করলে তার

প্রতিভা সইবার ক্ষেত্রে প্রকৃত থাকতে হবে এই কারণেই সেই আঘাতের মূলা— আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করলে সেই আঘাতের মূলা একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি ২৭ মার্চ ১৯৩৩

তোমারি

শ্রীযুক্তনাথ ঠাকুর

‘পথের দাবী’ গল্পের লিখিত পরবর্ত্তের পর : “পথের দাবী বইতে যখন যখন লিখাযুক্ত লিখি যদি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ এই হইবে পুঁথিবীর লোকের হৃদয় পায়ে যে পড়বে কি বইতে সাহিত্যের প্রতি প্রতিবাদ করবে। অন্য বই আমার সত্যিকার হইবে না, ইহাও সে পাইব না, তবু কখনো লোকের হৃদয় পাবে। হৃদয় বই লিখে আসি।”—সেই অনুবোধের উত্তরে লিখিত।

২

কল্যাণীয়ে,

তোমার বোড়শী পেরেছি।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার বই নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে, চোটা স্বতন্ত্র, কেননা নাটক সাহিত্যের একটা প্রেরণ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইই এখন সত্যভাবে যেলে তখন উজ্জ্বলিবে খাঁটি হয়— আমার বিশ্বাস তোমার কলম ত্রিকভাবে চললে এই ক্রমের সঙ্গে ভাব যিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা, তোমার লেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকসমাজে লম্বা তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিতরের লোকের অভিজ্ঞতাকে না তুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড়ো সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দৃষ্টব্য, সেইটির সঙ্গে পরিচয় বলা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায়— কাছের লোকের কলরব এখন বেলাল হয়ে সর্গীয় পরিবেশে তাকে অবলম্বন করে, তখন সে বর্ধন হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

বোড়শীতে তুমি উপস্থিতকালকে দৃষ্টি করতে চেয়েছ, এবং তার দায়ও পেরেছ। কিন্তু নিজেই শক্তির সৌরভকে হারা করেছ। যে বোড়শীকে একেই সে এখনকার কালের কর্মসময়, মনস্ফা জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এইরকম ভাবেই ভৈরবী হতে পারেনা,— কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার শক্তি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজগড়া চোখের মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আশাভর পাড়ারগের সত্যকার ভৈরবী আশ্রয়প্রাপ্ত করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। স্বষ্টিকর্ত্তারূপে তোমার কর্ত্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকজনকে আধুনিক কালের চলতি সেক্টিমেট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।* আমি আমার কথা তুমি রাখ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে প্রজ্ঞা আছে বলেই আমি সরলমনে আমার অভিমত তোমাকে জানানু। নইলে কোনো দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি

সামান্য প্রয়োজনে তোমার তপোভক্ত করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাখ আদায় করে খুশি থাকতে পারো— কিন্তু সকলকালের জন্য কি বেছে ধাবে? প্রতি
৪ ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমাদের
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

আমি জ্ববে পড়ে আছি তুমি তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসসু। তব হযেছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিব্রত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্রয় হইবে।

সোড়াতোটেই একটা কথা বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি— সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অল্প অনেক বিষয়েই এক এক ধূপের বর্ধমানের চোপ বর্ধমানেই নিশেষ হয়ে যায়, রাস্তা সাহায্যও তাহি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্রমতা হাদের আছে বর্ধমানের কোনো প্রসোভন এসে তাহদের তপোভক্ত না করে এই আদায় একান্তমানে ইচ্ছা করি। বর্ধমান কালের মন জোপাবার জন্যে বায়না নিয়ে যায় বর্তমানকে এসেছে তাহদের সংখ্যার সীমা নেই— তারা প্রচুর পরিমাণেই নগ্ন বিদায় পেয়ে থাকে— মাসিকে সামান্যতক সত্যমিতিতে তারা আসর সংগরম করে বসে। তাহদের বায়োহারির আসর বাসে বাহারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা যেও তবে তোমাদের আস্ত থাকে। তুমি লিখে “উপস্থিত কালটাও যে একটা মত ব্যাপার।” সেইখানেই বসন্ত সে মত যেখানে অল্পপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্ধমান কালের একটা বৃহৎ অংশ আছে ছোট ক্ষণস্থায়ীস্বর— মোটের উপর তাহদের ক্রমতা কম নয়, তাহদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর,— আধুনিক ভিক্ষাকাপির ধূপে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারম্বরে ক্রমাস করে থাকে। এই ক্রমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিঘ্ন সমস্ত। এ সমস্ত আসরকার কালে এত কঠিন ছিল না। হাল আদায়ের স্ফুটনীয়, সমাজনীতি, অর্থনীতিও প্রচলিত বুলি শব্দের মুখে মুখে খেলি জনিত প্রতিজনিত হচ্ছে। সেই শব্দের হল এই সমস্ত বুলিই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্য উদ্বৃত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই মতকে এই কথায় বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়, তোমাদের খাচার পাখী না হলে তোমাদের দানাদারি আমার ভাণ্ডো না ছুটে গেলে কিংবা আমার খাচর বৃহৎ কালে বৃহৎ বেশে। দাণ্ডারের আদায়ের উপস্থিতকাল দাণ্ডারকে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল— কিন্তু সে যে চেক সেই করেছিল আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যান করা চলে না? অল্প মরমুনসিংহের পাখা কাবা লোক-সাহিত্য— আদ্যও তার মেঘা উত্তীর্ণ হয়নি। তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের জাবায় লেখা। দাণ্ডারের মেঘ অল্পপ্রাসের অগভীর কল্পিতমতায় সত্য ছিল না— মরমুনসিংহের পাখায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের দুখবোচক বুলিগুলো সেই দাণ্ডারের মেঘ অল্পপ্রাসের আদায় ছুড়েচে— এখা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করতে। এরা কচুগিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই তোপ করতে বসে। আমি তোমার যে সব পত্র পড়েছি তাতে তুমি অতি অনাদ্যে চিরকালের সত্যকে সৃষ্টি দিয়েচ—

দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের মধ্যে নিজেব দাপ্তা বেগে বিতে পাবেনি। তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে হুয়ে ছিলে। তোমার এখনকার সেবা পড়তে আমার ভয় হও পাছে চোখে পড়ে যে তোমার কলমেই উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের ঘন্টা ভব করে থাকে। সে এত বড়ো লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে পার্স্পেক্টিভের কথা বলেছি সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পরিগ্রাহকের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে লক্ষ্য ঘটনা স্থাপিত তার ভাষার চরিত্রে ব্যবহারে বর্ণনাও পরিমাপ-সামঞ্জস্য বক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি বা কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে লক্ষ্য করে বলতে তাহলে ভাষার ঘটনায় সন্তরঙ্কম হত। মূল কথাটা বলায় থাকত কিন্তু এই তপটা থাকত না। আট্টে বিঘরের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো। আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ে। তোমার নিজের দৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে— যদি সেটাকে তক্ষা করে থাকো তাহলে বলবায় কথা কিছু নেই— যদি জনসাধারণের দৃষ্টিতে তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতার আছি। যদি কোনোদিন সেবা হয় মোকাবিলার আলোচনা হতে পারবে। ইতি

১১ মার্চ, ১৯২৮

স্বাধীনতাযোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষর

স্বাধীনতাযোদ্ধা ‘হুবেশপাখীর ভাষারি’র খসড়ার প্রথম কিত্তি গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যা হইতে পরবর্তী কিত্তিজলি প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

সরোজিনী নাইডু

সরোজিনী নাইডুর কবিত্রাতিভা

সরোজিনী নাইডুর কবিত্রাতি এসেছিল আকস্মিকভাবে; কোনো বীৰ্য প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই ব্যাতির পূর্ণ উৎসর্গে সৃষ্টি করে নি। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ *The Golden Threshold* লন্ডনে হাইন্সম্যান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর তুমিকা লিখে বেন ইংলওয়ের তখনকার একজন লঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা সমালোচক ও সাহিত্যিক আর্থার সাইমন্স। সরোজিনীর বয়স তখন ছাশিশ। এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভবতঃ ইংলও ও ভারতে সরোজিনীর কবিত্রাতি একেবারে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়। এর পরে তাঁর আরো দু'খানি কবিতাসংকলন ঐ একই প্রকাশক কর্তৃক প্রচারিত হয়। বিখ্যাত সমালোচক স্যার এডমণ্ড গল্-এর তুমিকা-মূলিত হয়ে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Bird of Time* প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। এবং তাঁর তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থ *The Broken Wing* প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এই দুটি বইও যথেষ্ট প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছিল। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত *The Golden Threshold*-এর পাঁচটি সংস্করণ হয়। *The Bird of Time*-এরও ১৯২০ পর্যন্ত পাঁচটি সংস্করণ হয়; এর মধ্যে দুটি সংস্করণের প্রকাশকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। এই থেকে স্পষ্টেই অনুমান করা যায় এই বইখানি কাব্যোন্মাদী জনসাধারণের কাছে কতটা সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু *The Broken Wing* ভারতে এবং ইংলও সমালোচক-বহলে প্রশংসা অর্জন করলেও অল্প দু'খানি বইয়ের মত জনপ্রিয়তা লাভ করে নি বলেই বোধ হয়। প্রথম প্রকাশের পর এর আর কোনো সংস্করণ হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। এর প্রধান কারণ নিম্নরূপ লেখিকার জীবনে পান্ডীত্ব ও বংশোদ্ভূতগণের আবির্ভাব এবং এই বইয়ের কয়েকটি কবিতায় এই নতুন ভাবাবেগের অস্বাভাবিক প্রকাশ। শুধু কাব্যরচনার মধ্যেই সরোজিনীর স্বাভাবিকতার আবেগ নিবেশিত হয় নি। ১৯১৫ সালে পান্ডীত্ব স্বতন্ত্র আফ্রিকা থেকে তাঁর ফিনিজ শুল নিয়ে ভারতে আসেন, তখন থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সরোজিনীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়। ইম্পিরিয়ালিস্ট ইংলওয়ের পাঠকসমাজ সরোজিনীচরিত্রের এই নতুন উদ্বেগকে গ্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করে নি।

কিন্তু তা হলেও কবিহিসাবে সরোজিনীর সমাদর যে অল্পত ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কবে নি তাঁর প্রশংসা ঐ বৎসর তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ। ১৯০৫ সাল থেকে এই অল্প বৎসর তাঁর কবিত্রাতির উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে বোঝা যায় না। বরং এই ভেবে আশ্চর্য লাগে যে, কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা সত্ত্বেও এই হল একদিন অব্যাহত ছিল, বিশেষতঃ ইংলওয়ের মত দেশে, যেখানে প্রতি আট-দশ বছর অল্প সাহিত্যিক আবেগোন্মাদ বয়স হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইংরেজ কবিরই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বিচলিত হয়েছিল। তাছাড়া সাহিত্যিক লগতে দুটি স্ববীৰ্য ঘটনা ঘটে; ১৮৮১, ১৯১০ সালে ইংরেজি 'স্মিটারলি'র এবং ১৯১৭ সালে টি. এস. এলিয়ারের প্রণয় কবিতা *The Love Song of J Alfred Prufrock* এর প্রকাশ। তবু যে পাঠকচিত্ত থেকে সরোজিনী হানচুড়ত হন নি, সেটাই তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটা নিঃসংশয় প্রশংসা।

কিন্তু তাৎপর্য এল লুপ-বলেন্দর গালা। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে টি. এম. এলিফট এবং নৃত্যনাট্যী ইয়েইস্‌এর প্রভাবে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের মোড় গেল কিংবদন্তি। শুধু ইংরেজি নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রধান সাহিত্যেই এল নতুন চিন্তা নতুন ব্যঙ্গনার তাগিদ। এইই যথোপযথ্য সরোজিনীর কবিতাগুলি লোকচিত্তের জীবন্ত ভগ্ন থেকে নির্ধারিত হল ঐতিহাসিক সৃষ্টির ভগ্নে।

ভারতে সরোজিনীর কবিতাগুলি বড়টা ছিল, তাঁর কাব্যের প্রভাব ছিল তার তুলনায় অনেক কম। এর কারণ নিম্নরূপ তাঁর নির্বাচিত কাব্য। এসময়ে তাঁর অল্পবয়সী পাঠকের সংখ্যা ছিল অল্পই। ১৯১২ সালে (বা হয়তো তার কিছু পূর্বে) এতদূর গঙ্গা সরোজিনীকে ভারতের স্রোত জীবিত কবি বলে দৃষ্টিভঙ্গি করতে বিধা করেন নি। কিন্তু সরোজিনী জানতেন ভারত তার বহু পূর্বে থেকেই এক অস্বাভাবিক বিরাট প্রতিভার সঞ্চিত। সরোজিনীর কাছে এই প্রতিভার দ্ব্যর্থতা শুনেই হয়তো গঙ্গা কিছুটা সম্বোধন করে এইটুকু বোঝার করেছিলেন— 'What lyric wonders the native languages of that country may be producing I am not competent to say'। কিন্তু কৌতূহল বিষয় এই যে, এই ১৯১২ সালেই ইয়েইস্‌এর মধ্যস্থতায় লণ্ডনে 'সীতারঙ্গি' প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার ফলে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক-সমাজে অসংখ্য চাকল্যের স্রোত হয়। সরোজিনী নিজেই বরীজনাথের এতদূর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে ভারতবাসীর চক্ষে বৈদেশিক খ্যাতির মুখ্য ছিল অসাধারণ। বরীজনাথের পূর্বেই সেই খ্যাতি অর্জন করা সবেও সরোজিনীর বরীজজড়িত কোনো তারতম্য ঘটে নি। তাঁর তিনখানি বই-ই প্রকাশের সময়েই বরীজনাথের কাছে তাঁর আশীর্বাদের মন্ত্র পাঠিয়েছিলেন। এবং একাদিকবার তাঁকে এই কথাই জানিয়েছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীর উজ্জ্বলিত প্রকাশ্যে চেয়ে বরীজনাথের এতটুকু প্রকাশ্যে হাম তাঁর কাছে অনেক বেশি।^১ বরীজনাথ ও সরোজিনীর প্রতিভার তুলনা বা উভয়ের সম্পর্কনির্ণয় এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিতাসাহিত্যে এসময়ে সরোজিনী বড়টুকু সমান পেয়েছিলেন এসময়ের অন্তরের বঙ্গাঙ্গুতির ক্ষেত্রে তার ভগ্ন নয়; তা শুধু বিশেষ-অঙ্গিত খ্যাতির প্রতিফল। ভারতের সমসাময়িক বা পরবর্তী কাব্যসাহিত্যে কোথাও সরোজিনীর কোনো প্রভাব আছে কি না আমরা জানা নেই।

এ বিষয়ে সম্বোধন নেই যে, যদি সরোজিনীর কাব্য ভারতীয় কোনো ভাষার রচিত হত, তবে তাঁর কীর্তিকে বেশবাসীরা এত সহজে লুপ্ত হতে দিত না, অল্পবয়সের জন্যে অভিভুক্ত করে তাকে সৃষ্টিরকাল ঠাট্টায়ে রাখত। আজ সরোজিনী নাইডু হুজুর পর এই প্রশ্নই বনে আসে— ভারতের একজন মহাদম্পনী নারী হিসাবে এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে তাঁর বিশেষ ভূমিকা হুজুর ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষর হয়ে থাকবে। কিন্তু শুধু ভাষার বৈষম্যের জন্যে আমাদের এই ভারতীয় কবির কাব্যপ্রবণাকে কি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অস্বীকার করব ?

আমল কথা, 'এসময়ের শিক্ষিত কাব্যছাত্রীদের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সরোজিনীর কাব্যে বড়টা আছে শব্দভোজনার পাখিগাটা ও স্বাক্ষর, সে পরিমাণে প্রেরণার গভীরতা বা অন্তঃস্বাদ নেই। সরোজিনী নিজেই এই প্রতিজ্ঞা বহু পরিশ্রম সহ্যকৃত করেছেন তাঁর বাস্তবতার

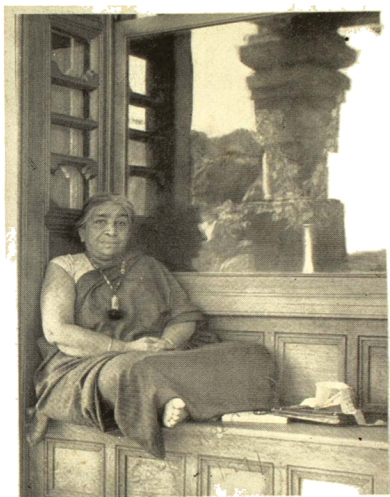
১. বিজয়লক্ষ্মী দত্ত এমিল ১৯৪০ সালের প্রকাশিত সরোজিনী ও বরীজনাথের পরস্পরক সিদ্ধির পরামর্শী প্রবন্ধ

দ্বাৰা। বঙ্কতায় তাঁর বাক্‌গ্রন্থ ছিল এমন সম্বন্ধ ও অবশ্য যে, স্রোতান্বয়েই তাঁর বিশ্বকৰ্ম কলাইনুপুণ্যে মুগ্ধ হত, কিন্তু সেই পৰিমাণে বঙ্কতায় আত্মবিকৃত্যাব আবেশন তাৰেৰ মনে পৌছত না। চমক্‌গ্রন্থ আৰ্ট নিৰ্দেশৰ বহিৰব্ধেৰ বিৰুদ্ধে সত্য মনোযোগ আকৰ্ষণ ক'ৰে অনেক পৰিমাণে নিৰ্দেশ উৎকৃষ্টই দাৰ্ঘ্য কৰে। সৰোজিনীৰ বঙ্কতায় এই সত্যোৰ নিৰ্ধৰন বিলত। কিন্তু সৰোজিনীজীবনে তাগোৰ পৰিহাস এইখানেই যে, তাঁৰ অতিবিকৃত-দৃষ্টি এলোকেৱেন্দুসেৰ পিছনে স্পষ্টিত হত একটা সত্য আবেগময় ভৱ, আৰু তাঁৰ লক্ষ্যালিত্যোৰ পিছনে ছিল অবিপৰ্য্যয়িত কাব্যাত্মকুতিৰ প্ৰেৰণা।

অভিলাষিত্যোৰ অভিযোগ সৰোজিনীৰ বঙ্কতায় সম্বন্ধে বহুটা প্ৰযোজ্য, কাব্যসম্বন্ধে ততটা নহ। কিন্তু একবা ঠিক যে, এই যোগ কিছু পৰিমাণে তাঁৰ কাব্যে আছে। যদি একে দোষই বলা যায়, তেনে এই যোগ ভৱসেবেৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ছিল, এমনকি কালিদাস-রবীন্দ্ৰনাথও কিছু পৰিমাণ ছিল। মলংকাৰ বা শব্দেৰ ক্ষতি বন্ধন কাব্যবৰ্জক অতিক্ৰম ক'ৰে নিৰ্দেশৰ বঙ্কত মৰ্ণনাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হতে চাৰ তখন তা অৱগ্ৰহই সমৰ্থবোপা নহ। সেই ক্ষতিবিলাগে প্ৰেৰণাৰ দুৰ্গলতাই প্ৰমাণিত হয়। কিন্তু যে কনি ও মলংকাৰ আসে তাবাবেগেও সমন্ধৰ্থে, আধুনিক কাব্যবিচাৰয়ীতিতে তাকেও কাব্যমূল্যেৰ হানিজনক বলে সিদ্ধান্ত কৰা হয়। সবন্ধেৰে এই একই নিয়মেৰ প্ৰযোগচেষ্টাও যে একৱকম অনুসন্নেৰ মূৰ্ণেৰ সমালোচনামত্বিতে কিবে হাওয়া— একবা অনেক কৃতী সমালোচকও তুলে যান। এই নিয়মতাত্ত্বিক চিন্তা ছায়াপাত কৰেছে এওঁৰ আৰ্ট টেম্পনেৰ রবীন্দ্ৰ-সমালোচনাৰ। শেক্সপীয়াৰও হেটৱিক-বাহুল্যেৰ যোগ থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বিখ্যাত সমালোচক ওয়াল্টাৰ পেটাৰ শেক্সপীয়াৰেৰ লাভল্‌ সেবাবল্‌ লষ্ট নামক নাটকেৰ অতিৰঞ্জনময় বাচনভাৱিকে যে তাৰে পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰেছেন তা এই প্ৰশংসে স্বৰ্ণবোপা। সৰোজিনীৰ অনেক কবিতা বাইৰে উজ্জল, অজস্বেৰ দুৰ্গল। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁৰ অনেক কবিতা আছে যাৰ যথো পাওৰ। যাৰ তাৰ তাবা ও বংকাৰেৰ সূক্ষ্ম সান্ধৰত।

ইংৰাজি ভাষা এক ইংৰাজি কাব্যৰূপ ও ছন্দেৰ উপৰ সৰোজিনীৰ অধিকাৰ আতৰ্ব্বজনক। কিন্তু তাঁৰ কবিতাৰ কৃতিত্বেৰ এই বহিৰাবৰণটুকুই সব নহ। তাঁৰ এমন কবিতাৰ সংখ্যা খুব অল্প নহ যাৰ যথো তাৰেৰ জীবন্তত্ব আছে। সেই কবিতাগুলিৰ সাহায্যে তাঁৰ কাব্যেৰ মৰ্ণনামাটনেৰ চেষ্টা কৰা যাক।

বিচিত্ৰ এই জীবনকে খুঁজে নেওতা বৃত্তে নেওতা, তাৰ বিভিন্ন পৰ্যায় অৱকৃতিৰ যে অক্লুত সমাৱোহ তাৰ যথো নিৰ্দেশ চিত্ৰকে বৰ কৰা— এই হল সৰোজিনী কাব্যেৰ মূল প্ৰেৰণা। এৰ যথো ছিল একটা চুপাৱসিক আয়তন্ত্ৰকাৰেৰ উদ্ভৱ, একটা কোথাও-বাখা-না-বানা জীৱীপাৰ আবেগ। সৰোজিনীৰ যন কিশোৰবয়সেই প্ৰৱণ কৰেছিল তাঁৰ পিতা অযোৰনাথ চক্ৰোপাধ্যায়েৰ আদৰ্শ। তিনি বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ভি. এ.সি. হৰেও আলকেমিৰ সোনাৰ বস্ত্ৰে বিভূষিত ছিলেন। কবিতাৰ সৰোজিনী তাঁৰ পিতাকে বৰ্ণনা কৰেছেন 'সোনাগি-ছৰ শিও' বলে। তাঁকে বলেছেন splendid dreamer in a dreamless age— স্বপ্নহীন যুগে অসুৰ স্বপ্নৰটো। অভিনন্দিত কৰেছেন আশা থেকে আশায়, জীবনেৰ ত্বৰ থেকে ত্বৰে তাঁৰ অৱ্যক্ত অভিযানকে। তাঁৰ যথো লক্ষ্য কৰেছেন সত্যসন্ধান আৰ বস্ত্ৰপ্ৰয়াণেৰ অক্লুত মিলন। সৰোজিনীৰ কিশোৰবয়সটি ছিল এৰনি একটা মধুৰ উদ্‌গ্ৰীৱ বস্ত্ৰে বৰ্জিত, অজানা অশেষ সম্ভাৱনাৰ আশায় তখন ক্ৰম স্পষ্টিত হত তাঁৰ তপস্বী দৃষ্টি। তাঁৰ নিৰ্দেশৰ শিক্ষা ও বুদ্ধি, পান্থিৱিক



Savitri Nair

আবহাওরা, সামাজিক আবেষ্টন সবই ছিল অহুসুল। আবিষ্কারের একটা বিপুল ক্ষেত্র, সৃষ্টির একটা চিত্তহারাীভূত তাঁর সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ ও অবিকার করেছিল। অবশেষে একদিন তাঁর সমস্ত কক্ষতা ও সমস্ত ঐচ্ছিক্যকে সংহত করে সরোজিনীর কবিত্বের পাড়াল সেই বাহিত গোচর সোনার চৌকাঠে। তরুণ কবির সেই প্রথম নিম্ন অতিক্রমতার কদল স্থান পেয়েছে *The Golden Threshold* গ্রন্থে।

সরোজিনীর এই অগতে পাই পদ্যবাহীন সৃষ্টির আনন্দ, উদ্বেগহীন ইঞ্জিয়াসৃষ্টির স্বপ্ন। বাউল নতকী চুড়িওয়ালা ধোঁয়ের-ঘোঁরে জেলে গীতি প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার মধ্যে কখনো তিনি আবিষ্কার করেন জীবনের বিভিন্ন অহুসুলের বিভিন্ন স্বপ্ন— ইঞ্জিবেব চিত্তের নতুন নতুন পার্বত্যতা। কখনো বা বাইবেব তপসস থেকে চোখ কেমন নিঃশব্দ অস্তরের দিকে। সেখানে চলেছে কি একটা অসমাপ্ত কাহিনীর বস্ত্রলীলা; সেখানে পোনা ধার অচেনা সৌন্দর্যের আশ্রয় আর তার উত্তরে কবি-আত্মার সাড়া— কখনো আগ্রহের কখনো বা বিদায় কণ্ঠিত। সরোজিনীর ভাষায় এই দুই বকম অভিব্যক্তির প্রথমটি সত্যসন্ধান এবং দ্বিতীয়টি বস্ত্রপ্রমাণ।

মনে হতে পারে সরোজিনীর এই ভাবের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রথমত অযোগ্যনাথের কাছে তিনি ষ্টী, তাকাতা তাঁর আপে তাঁর চেয়ে শক্তিম্যান একাধিক কবি এই একই ভঙ্গিতে জীবন ও অগতে বেবেছেন ও বেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ গোটেব কাউন্টের জীবনসন্ধান, টেনিসনের ইউলিসিসের জীবনগেহালা শেষ পর্যন্ত পানের লক্ষ্য, এমনকি বর্তমান যুগে বহীজ্ঞানধর্মের নিষ্ঠারের বস্ত্রভবের উল্লেখ করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, এই ভিন্নতর কবিভাষায় সরোজিনী প্রভাবাবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর গুটিভক্তি তাঁর নিঃশব্দ। কাউন্টের পার্শ্বী, জীবনের গভীরতর বহুত সম্বন্ধে অনিবার্য প্রশ্ন, তাঁর অন্তর্গত সরোজিনীর মধ্যে নেই। তাঁর কৌতূহলের স্বর অনেক বহুত, অনেক হালকা, তাতে যিশেছে বেন একটা নবীন প্রত্যাশার আগ্রহ ও আনন্দ। তাঁর *The Soul's Prayer* কবিতাদিতে তিনি এই তরুণ আগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন :

Give me to drink each joy and pain
Which Thine eternal hand can mete,
For my insatiate soul would drain
Earth's utmost bitter, utmost sweet.
Spare me no bliss, no pang or strife,
Withhold no gift or grief I crave,
The intricate lore of love and life
And mystic knowledge of the grave.

নিষ্ঠারের বস্ত্রভব বিন্যস্তভবক আলিঙ্গনের যে প্রমাণ দেখি, কবি-আত্মার যে অকারণ অব্যবস্থিত আবেগ অহুসুল কবি, তার সম্বন্ধে এও কোনো মিল নেই। বহুত ইউলিসিসের জীবন-পুহায সম্বন্ধে এই কিছুটা মিল আছে। কিন্তু ইউলিসিসের জীবনবোধ হিরোইস্, তার যুগ যাহবের বিরাট কীতির দিকে; সরোজিনীর জীবনবোধ গিরিকাল্প, তার লক্ষ্য বিভিন্ন অহুসুলের দ্বন্দ্বাব্যবের দিকে। এই

অহুত্বিশায়নতার অন্তরেই সর্বোচ্চমাত্রায় কাব্যরূপের সঙ্গে বাংলার বাউল আর কীর্তনের মূহুর্ত সান্বিত হোয়া যায়। Wandering Singersদের মূহুর্ত দিয়ে যখন তিনি বলান The voice of the wind is the voice of our fate, তখন বাউলদের আনন্দময় বৈরাগ্যের কথা মনে পড়ে। ঐরাবতার প্রেম সম্বন্ধে তাঁর কবিতাগুলিতে বৈষ্ণবকাব্যের অন্তরের মূহুর্তিকে যেন নতুনভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য হু ক্লেই এই তফাত যে, সর্বোচ্চমাত্রায় এইসব কবিতায় বঙ্গাতিরিক্ত কোনো আধ্যাত্মিক বাঙলার চেঁচা নেই।

আবার সত্যতার জটিলতা ও পৃথক ভাববিশালকে অতিক্রম ক'রে প্রাথমিক জীবনের সহজ সৌন্দর্যে পৌছবার আশ্রয় দেখা যায় সর্বোচ্চমাত্রায় এইসব কবিতাতে। ভারতীয় নৃত্যকীর্তনের জীবনকে তাঁর মনে হয় সুন্দর, কারণ নাচের সময় তাদের তিনি দেখেন 'celestially panting'। হুড়িওয়ালাকে তাঁর ভালো লাগে, কারণ তাঁর হুড়ির পশরার বর্ণনাব্যবহারে তিনি রামধন, কদনা, পাহাড়ী ফুয়ালা, বা বৌদ্ধরঞ্জিত পঙ্ক্তের মত দেখেন, এবং কোন মূল্য ও কোন প্রকৃতির মেয়ের হাতে বিভিন্ন হুড়ি ধানাবে তাও অস্বপ্নান করেন। এই প্রগল্ভ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর বেগের বেগে সম্বন্ধে কবিতাটি। শিকারী পাখির মত মেয়েটির সতেজসৌন্দর্য, মল্ল তার অচ্যুত, মাঠে যেখানে তাঁর অস্বাভাবিক বাগা সেখানে স্বাভাবিক নামে কালো পাহাড়ের মত, পৃথিবীর আদিম রহস্যের সে সহজাত—

She is twin-born with primal mysteries,
And drinks of life at time's forgotten source.

সর্বোচ্চমাত্রায় স্বপ্ন-অভিলাষ বেলন কবিতায় বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এইগুলি স্রেষ্ঠ : Village-Song, To My Fairy Fancies, In the Forest এবং The Flute-Player of Brindaban। এর মধ্যে দেখি কোনো গানের বেগে বিবাহবালার ছেড়ে যেন বেগিয়ে যেতে চায়, কারণ 'The bridal-songs and cradle-songs have cadences of sorrow' এবং সে পরীষের ভাক শুনেছে। দেখি নিভের ঘোহর অদ্বুত কল্যাণগুলিকে আগের বীথনে বীথতে না পেরে কবি তাদের বিচার দিচ্ছেন :

Nay, no longer I may hold you,
In my spirit's soft caresses,
Nor like lotus-leaves enfold you
In the tangles of my tresses.
Fairy fancies, fly away
To the white cloud-wildernesses,
Fly away !

In the Forestএ কতকগুলি স্বপ্নের সাহিত্যিক সঙ্গীত করেছেন 'কান্না কবি। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যপিনাস আবার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষের দিকের কাব্যে, The Flute-Player of Brindaban নামক কবিতায়, যার মধ্যে তাঁর স্বপ্নের বেগতা তাকে ভাক দিয়েছেন বীথির মূহুর্ত, যে তাকে জীবনের সীমারে গিয়ে ঠাকতে হয়। সাংস্কৃতিক বাহুর্বে এই কবিতাগুলি অস্বাভাবিক। ওয়াশটন ডি না মেগের কবিতায় মত এতে এক অপরূপ জাদু-লীলা আছে, সৌন্দর্যচেনার বাতায়না এবং সম্পূর্ণ বিশিষ্ট।

দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Bird of Time* সরোজিনীর কবিতাবলির একটি সুন্দর পরিণতি দেখা যায়। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা এখন আশ্রয় পেতে চার প্রকৃতির তপ ও রসের মধ্যে, বিশেষ করে প্রকৃতির যে দিকটা স্পষ্ট প্রকৃতির বর্ণনামাধ্যমে বনোবস সেই দিকটায়। তাই এই সময়ে তিনি বিশেষ অর্থে বসন্তের কবি। নিজের শারীরিক অক্ষমতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি যেন নিজেকে আত্মত্যাগে দান প্রকৃতির আনন্দের অধিনেত্রী। কিন্তু এতই সঙ্গে এসেছে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীবনের মধ্যে এতদিনে তিনি পেয়েছেন একটি অর্থ। সৌন্দর্যবোধ তাঁকে তাঁকে নিখোঁজ প্রকৃতির হৃদয়, কল্যাণবোধ তাঁকে বাহ বাহ নামিয়ারে আনন্দ করবার কোলাহলময় ক্ষেত্রে। তাঁর মন যে অরণ্যে যে যেখানে যেখানে কল্যাণের পথ তাইই প্রাণের বেগে *Death and Life* ও *The Faery Isle of Janjira* নামে দু'টি কবিতায়, যদিও বিখ্যাত প্রবন্ধের একটি সমাধান চেষ্টা দেখা যায় এইভাবে—

Where brave hearts carry the sword of battle,
 'Tis mine to carry the banner of song—

Guerdon নামক কবিতাটিতেও তিনি একই সঙ্গে তাঁর তিনটি আনন্দের উৎসের উল্লেখ করেছেন— প্রেম, সংগীত ও সত্য। শেষ পর্বত এই *rapture of truth*ই তাঁর সমস্ত চিত্তকে অধিকার করল। এটা যে সম্পূর্ণ তাঁর স্বাধীন নির্বাচন তা হয়তো নয়। মনে হয় মহাশক্তিমান ব্যক্তিগত প্রভাবই সরোজিনীর এই পরিবর্তনের কারণ। গান্ধীজীর মধ্যে তিনি বেথলেন সত্যের অনন্ত মূর্তি। *The Lotus* নামক কবিতায় তাঁকে বললেন *Mystic Lotus*, অধিষ্ঠাতা করলেন সেই লোকান্তরিত সন্তের মধ্যে অক্ষর শক্তি, সত্যের অনির্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু এই সত্যের প্রেরণা কাব্যসৃষ্টির অপ্রকৃত ছিল না, এর একমাত্র মূর্তি ছিল কর্ণের ক্ষেত্রে। প্রথম দৃশ্য যে অভিজ্ঞতাকে সরোজিনী 'সত্য' বলে অভিহিত করেছিলেন, তা বলা দিয়েছিল তাঁর কাব্যগ্রন্থটায়। কিন্তু নতুন এবং মহত্তর যে সত্যের পরিচয় তিনি পেলেন তা বোধ করল তাঁর কাব্যের উৎস। এই মহত্তর সত্যকে যদি তিনি তাঁর কাব্যবোধের মধ্যে ধারণ করতে পারতেন, যদি এর সঙ্গে তিনি বলতে পারতেন *truth is beauty*, তবে নিশ্চয় তাঁর কাব্যে একটি গৌরবময় দৃশ্যের প্রবর্তন হত। তাঁর কবিতায় বর্ণিত কালের শাসিত সত্য তাঁরও আশা ছিল জগতের সমস্ত দুঃখঃ-বিষাদকে থেকে আহরণ করবেন তাঁর গানের সুব। কিন্তু শাসিত তান্না ভাঙল, সুবও ছুটল। *The Broken Wing* বহন প্রকাশিত হয় তখন মহামতি গোপলে প্রেরণ করেছিলেন, 'Why should a song-bird like you have a broken wing?' এর উত্তর এই যে জীবনের স্রেষ্ঠ সত্যকে বাধুর্বে রসে দিলে করা যায় যে অভিমানেই নম্রতা, যে নিঃশব্দ আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে, সরোজিনীর তা ছিল না। তাঁর চরিত্রে কোথাও ছিল একটু কাঠিন্য, লুকোনো ছিল আত্মপ্রতিপত্তির অনমনীয়তা। কবিতাটিকেই জীবনে এমন এক সময় আসে যখন তাঁর কাব্যধারা শাসিত পথ অবলম্বন করে অতিক্রম করে হঠাৎ বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা বাইরের নয়, কবির ব্যক্তিত্বের মূলভিত্তিতেই এই বাধা প্রতিষ্ঠিত। কাব্যপ্রেরণার আবেগ যখন একে আঘাত করতে থাকে তখন কোনো-একটি চরমতাপ্রেরণের দ্বারা তাই নিরসরণপন্য তৈরি করে দিতে হয়। শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির নায়কদের মত কবিরও কেবলি অগ্রসর হতে হয় চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। কবি যেমন কাব্যরচনা করে চলে, কাব্যও তেমনি কবির অন্তরঙ্গতাকে ভেঙে গড়বার চেষ্টা করে।

ଜାଣିବେ ନା ଛାନ୍ଦ ବସ, ଡାକିବେ ନା ବର୍ଷ ବସ,
 ଛୁଟିବେ ନା ବୀଣା,
 ମରବୀନ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରି ହବ ଜାଗି
 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତେ ନା :

কিন্তু *The Broken Wings* এ একটি অত্যন্ত কোহুলজনক ব্যাণার বেগা বার। কবিচিত্র বহন অল্পবয়সে বিধাশ্রম এবং কাব্যরসগন্ধ থেকে চিরবিলাসের মুহূর্ত বহন আসার, তখনই হঠাৎ একটি তীব্র গভীর শ্রেন-অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির আত্মসমর্পণ। কবির অল্পবয়সকাল এ যেন একটি সুন্দর সাময়িক সমাধান। অতিথ্যজনের সম্বন্ধে ব্যাপ্তি বা বলেছি তা এই প্রেমের কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ অলংকার ভাবের বৈজ্ঞানিক নয়, এ হল ভাবসমৃদ্ধির স্বাভাবিক সৃষ্টি। তিনি তার প্রেমের অনুরোধের সঙ্গে সুরিত নন, অল্পতপ্ত নন। কবির মত শূন্যতা, নিশ্চাপচক্ৰ তার স্রোতাস্বর স্বর্ণ তপ্পানের অল্পপ্রস্রাব কখন, তিনি তার কামনার অনুরোধে বুণের গর বুণ অধিগত হতে রাজি আছেন—

So you be safe in God's mystic garden,
 'Inclosed like a star in His ageless skies,
 My outlawed spirit shall crave no pardon—
 O my saint with the sinless eyes !

আর্থার সাইমন্স সরোজিনীর প্রথম যুগের কবিতার ‘bird-like quality,’ পার্থক্য কালটির মত সহজ সংগীতকমতা, আবিষ্কার করেছিলেন। এই যুগের ইন্দ্রজাল তাঁর অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। এর স্রোত উদাহরণ To My Fairy Fancies, The Flute-Player of Brindaban, Ecstasy, Song of Radha the Milkmaid, Village Song প্রকৃতি। গল্প সাহেবের মতে সরোজিনীর ভাষা ও ছন্দ বিলাতি হলেও তাঁর কাব্য সম্পূর্ণভাবে ভারতের মাটির ফসল। কিন্তু সরোজিনীর কাব্যে গোটে টেনিসন, এবং তাঁর প্রকৃতির কবিতার কৌটুকের প্রভাব দেখা যায়। ববীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁর কাব্যে আছে। কিন্তু তাঁর মূল প্রেরণা তাঁর নিজেরই। এমন কবি কেউ আছেন কি না সম্বন্ধ ধায় স্বাধীন কাব্যসৃষ্টিতে অপর কোনো কবির কাব্যের ছায়াপাতমাত্র নেই। সরোজিনীর এই বৌলিকতা সাইমন্স ও গল্প দুজনেই স্বীকার করেন। সরোজিনীর কাব্য ভালো করে পড়লে সম্বন্ধ থাকে না এ একটি নতুন কণ্ঠ, এর ধ্বনি ও আবেশন স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কবিতার বঙ্গবোধের নিষ্ক্রিয়তার পর ভারতবর্ষ এখন আশানিবাণার স্বপ্ন অতিক্রম করে একটা বৃহৎ নিঃসংশয় আগ্রহের মুখোমুখি ঝড়িয়েছে, সেই সময় সেই দৃশ্য কণ্ঠের একটি বিশিষ্ট উপভোগ ধরা পড়েছে এই কণ্ঠের সংগীতে। সনুত্বের সামনে ভূবিকণ্ঠের উদাত্ত উজারদের যে মহত্ব তা এই কবির মধ্যে আশা করা সম্ভব, তাঁর মস্তে আত্মার বেতে হবে ববীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু লক্ষ্যবর্ধনে যে স্বতঃ-স্বর্ত্ত ব্যতিক্রমী আনন্দের অট্টো কিশোরকণ্ঠে প্রকাশ পায়, তাঁরও একটি ঘাঘুর আছে। সরোজিনী-কাব্যের স্বর এই কৈশোরের স্বর। কোনো গভীর উপলব্ধি, গভীর স্বর এতে নেই, কিন্তু এর একটি আবেগময় প্রত্যাশাবর্ণন চমক আছে। ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্যের ভাঙার এত সমুদ্র নয় যে, আমরা এই কবির এই আনন্দের হানটুকে অস্বীকার করতে পারি।

শ্রীমদ্রোলচন্দ্র সরকার

সরোজিনী-স্মরণে

সর্বদা সরোজিনী নাইডুকে দেখেই অনসাধারণ বেশনেত্রী স্বামী কবি বলেই জানেন। কিন্তু তাঁর পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণা অনেকেই নেই, বরং অনেক ব্রাহ্ম ধারণা অনেকেই গোপন করেন। খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে ধরা যেতেছেন তাঁরা জানেন তিনি নিজেকে একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতেন। ঐ বহিরাবরণের অস্ত্রবলে তাঁর যে একটা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাব্রণ মহত্বের ছিল তা নিয়ে তিনি সকলকেই আকৃষ্ট করে রাখতেন। তিনি একাধারে হুঙ্কার হুপ্তী ও হুমাতা ছিলেন। পিতামাতার প্রতি তাঁর অকৃত ও সাংস্কৃতিক ভক্তি ভ্রাতা ও ভাগ্যবাসী ছিল। পিতা অধোদন্তাচ্ছত্রোপাধায় সম্বন্ধে তাঁর পর্বও কম ছিল না। অবসরসময়ে তিনি তাঁর পিতামাতার কথা, তাঁদের হৃদয়ের স্পৃহা বন্ধনের কথা, নিজের শৈশবের নানারকম স্থিতির কথা বলতেন। তখন তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে বোকা মেনে পৈশবে পিতামাতা ভাইবোনদের নিয়ে জীবন তাঁর কত যুগের ও কত যুগের ছিল।

তাঁর বাশ্পাত্মীয় ছিল শান্তিপূর্ণ। যেসব নাইডুকে তিনি স্বেচ্ছাকৃত হয়ে বিয়ে করেছিলেন। পত্নীর অসাধারণ প্রতিভা ও বেশসেবার অমর আকাঙ্ক্ষা দেখে তাঁর স্বামী তাঁকে ঘরের কোণে বেঁধে রাখেন নি। সহস্র অধিবিশা সম্বন্ধেও পত্নীকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন বেশের ও দেশের কাছে।

কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সন্তীতির অভাব তাঁদের কোনোদিন ছিল না। স্বামীর মতামতের প্রতি স্বেচ্ছাও তাঁর ছিল যুব। অনেক সময়েই তাঁর মুখে শুনেছি 'My husband says this'। নিম্ন বৃদ্ধের ক্ষত্র তাঁর প্রাণের চান ছিল অস্বাভাবিক। অল্পাত্ম পতিব্রতের বশন সেহমেন দ্রষ্ট হইবে পতন তখন তিনি বাড়ি বাবার ক্ষত্র হাশিরে উঠতেন।

মনে আছে একবার আগা খাঁ প্যালেস থেকে বাপুর্ন মুক্তির পর পুনরায় কংগ্রেস গুহারিং কমিটির অধিবেশন হয়। আমি তখন সেক্টা ব্যাকারের অতিথিরূপে পুনরায় উপস্থিত ছিলাম। মিসেস নাইটু তাঁর কস্তার সহযোগে এসে উঠলেন। বিকেলে খানকরেক চিঠি আদায় হাতে ধিরে বললেন, 'তোমাদের চিঠির সঙ্গে ভাঙে দিও'। তার মধ্যে একখানা যেহর নাইটু নামে আর একখানার উপর নাম Nicobar Esq.। আমি অবাক হয়ে দেখছি, তিনি হেসে বললেন, 'তোমাদের কুতুব'। আসবার সময় ওর অস্থির দেখে এসেছি কি না, তাই একখানা চিঠি লিখলাম। হিমিও আদায় স্বামীর সঙ্গে ওর তার বেশি, কিন্তু আমি বাড়ি থাকলে ও কিছুতে ক্ষত্র কোথাও যায় না।' তারপর চলল তিন-চার দিন তারের খেলা, এখান থেকে যায় ওখান থেকে আসে। আর পরবার মুখে শুধু এক কথা, 'ও ময়ে গেলে বাবার কি হবে। শুকে যে বড় ভালোবাসেন।' তার পর একদিন যবন এল কুতুবের কুতুব। যবে গিরে বেশি, বড় কামছেন যা তত কামছে ঘেরে। আর বত কামছেন কুতুবের ক্ষত্র তত কামছেন কুতুবের প্রকৃৎ ক্ষত্র। Poor father! তখনই condolence-এর তার চল পেল মেহর নাইটু কামছে।

কস্তা পরবার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল বিভিন্ন ও মনুষ্য। দুজনে ছাত্রছাত্রী থাকলে পনরো-ষোলো পাতার চিঠির আদানপ্রদান হত যোগ; কর্তব্য মিনের অঙ্গদানে কর্তব্য মেহমেন নিরেও শোবার আগে ঘেরে কামছে চিঠিটি দেখা চাইই।

পনরবার পরীক্ষা বহনিন বেরনোর অস্থিরে কাতব ছিল। সে সময়ে সে শীতের তিন মাস যাব কামছে থাকত। যাব সহর কামের মধ্যেও একটি চোখ থাকত ঘেরে বিকে। তার গারে পদম কাপড় ধুখেই আছে কি না; তার গিঠের বালিস ঠিক আছে কি না; দুই মলের হল সব ঠিক সময় খাওয়া হয়েছে কি না—এইসব। আমি একদিন কলেছিলাম এত কামের মধ্যে আপনার এ কামও হো কাম নয়। তাতে বললেন, 'ওরে বাবা। ওর বাপ শুকে বহুবে তিন মাস আদায় কামছে ছেড়ে মেন। ওর অস্থিরে বাড়িবাড়ি হলে কি আদায় বলা আছে!' এটা অবত একটা অস্থিরতা—তিনি নিজেই ঘায়েই এসব করতেন। ইহানী: পরবার পরীক্ষা বেশ ভালো হয়ে গিরেছিল, সে যাব কামছেই সব সময়ে থাকত। যাব পরীক্ষা তখন ভেঙে পড়েছে। যা-মেহেতে হুন্টটি লেগেই থাকত। ঘেরে নিয়মিতাশী, যা অতিথিক আমিতাশী; ঘেরে পরিমিতাহারী, যা অতিথিক ভোজনবিলাসী। এ নিরে অনেক মজাও হত যাবে যাবে। যা বলতেন 'তোমার বাতের মধ্যে আছে কি?' ঘেরে বলত, 'Mother is a glutton'। এ নিরে দুজনে 'পরামর্শক মূর্ত্তনী' করতেন সমবয়সী বত। কিন্তু দুজনের বহন ছিল লুট, ভালোবাসা ছিল অস্থিরতা।

যা পেলেন জেল, ঘেরে হোটলে বর ভাড়া নিরে এক বছরের ক্ষত্র কামের হলেন। যালে দুবার রেলপথে যাত্রায় তার বাতের অস্থিরতা নয় বলে। এখানেও ঘেরেনের পনরবার প্রতিদিন পত্র-বিনিময় অস্থির ছিল। যোড় পুত্র কিরে করছিল বিশেষিনী মহিলা। এই পুত্রবৃৎ প্রতি তাঁর দেহ ছিল পতীর। দুয়ারোগা ব্যাধিতে দীর্ঘকাল কুপে সে যাবা যাব। তার শেষ সময় তিনি অল্পাত্ম দেবা

করেছিলেন এই বন্ধু। ছোট মেয়েও একবার শক্ত অস্থির হয়। সে ভালো হতেই অকস্মিক কান্না নাকে চলে আসতে হয় কণ্ঠস্বারা। সেবার সঙ্গে ছিল এই কথা। বললেন, 'এখনো ভালো করে সাধে নি, তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম। নইলে তখনো থাকত।' গুরু দিকে এখনও দৃষ্টি মেগনা হয়েছিল।

ছোট ভাইবোনদের দলও গেল তখন। তিনি প্রত্যেকের সংসারের খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। তাদের সুখদুঃখের ভাগ নিতেন সর্বদা। অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে— অনেক আশা বসে আছি, তাঁর কাছে একথানা তার এস। গড়ে খুব হেসে বললেন, 'আমার একটা ছোট ভাইএর ছেলে হয়েছে। ওরা আমার চেয়ে এক ছোট বোঁ ওঁদের ছেলেরপিলে হলে আমার মনে হয় আমার একটি নাতি-নাতনী হল।'

তিনি স্থপাটিকা ছিলেন, যদিও সচরাচর বন্ধনচর্চার সুযোগ তাঁর হত না। তবে সুখিও পেলে ছাড়তেনও না সুযোগ। তাঁর মাঝের খুব বন্ধনব্যাধি ছিল। সেখান খুব দীর্ঘ কয়েক বসতেন। জেলে বন্ধনচর্চার খুব সুযোগ মিলেছিল তাঁর।

একবার আমি ও আমার পুত্র শ্রীমান কিতেন ঘেরোকা জেলে পদ্মক্ষেত্র সন্ধ্যা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গাই। সন্ধ্যাকালের সুযোগও ঘেটনের অস্থিরতায় ঘটেছিল। সামনের ইন্টারভিউতে মেজব নাইডুর আশ্বাসের কথা। তাই সেটা নষ্ট করা হয় পদ্মক্ষেত্র ইচ্ছা নয়। 'তবে সে বললে, 'আমি দেখা করিয়ে দেব।' ঘরে ঢুকলেই একথানা ঘেটে কয়েকখানা বাকি নিয়ে, মুখে কিছু সেমিন তাঁর সেই দল্ল সবল হাসিটি ছিল না। তিনজনের মুখে তিনখানা বাকি শুধু দিয়ে বললেন, 'আমি তৈরি করেছি।' তাঁর পর পদ্মক্ষেত্র দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার বাবার চিঠি পেয়েছি কি? খবরের কাগজে অস্থিরের খবর যেখান।' পদ্মক্ষেত্র বললে, 'ভালোই আছেন।' তখন প্রশ্নমুখে আমায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

একবার আমি বলেছিলাম, 'আপনার দামীর কি বিপদ! খবরের কাগজে নাম বেরলোও আপনার দামী বলে পরিচয় দেয়, পুত্রবান্দ্রবের সঙ্গে এ বিতর্কনা!' এক দল হলে তিনি বললেন, 'But he likes it. He is very proud of me, you know'।

কান্ড কাটা তাঁর আর-এক রোগ ছিল। জেলে স্ট্রীমারে সাতার ঘাটে সুখিও পেলেই কান্ড কেতে জানালায় বসিও যে-কোনো জায়গায় হোক টাট্টিয়ে দিতেন। আমি একদিন বললাম, 'আপনি কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট।' চুপে থাকেন, আপনাকে কান্ড কাটতে দেখলে লোকে বলবে কি?'

বললেন, 'কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট কান্ড কাটবে না, এ কথা কংগ্রেস-আইনে লেখে নাকি?'

একটু অবদর পেলেই তিনি ডিটেকটিভ উপস্থাপন পড়তে বসে যেতেন। একবার একজন লোক আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, একথা পতা কি না। আমি চুপে বসলাম সে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে বইল আমার মুখের দিকে। তাইটা এখন বেন মিলে নাইডু একটা খুব গঠিত কাজ করে থাকেন। আমি সেখান থেকে বলেছিলাম। ক্রোধ পাকিয়ে তিনি বললেন, 'কেন, ডিটেকটিভ উপস্থাপন লিখতে কম বুদ্বির দরকার হয় নাকি?' তিনি সুখিকা ছিলেন। তাঁর বসিকতা এক-এক সময়ে বাজা ছাউনির বেত। একবার তাঁর বিধানচক্র মাঝের বাড়িতে একদর লোকের সামনে ঐ রকম একটা কথা বলে বললেন। কেউ মাথা নীচু করে বইল, কেউ হো হো করে হেসে উঠল, আর অস্থিরতা ওড়লোকে চেয়ার

ছেড়ে পাড়িয়ে উঠে বললেন, 'You don't say so'. আর তিনি চূপ করে বসে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন যেন মস্ত বড় একটা বাহাদুরী করে বসেছেন।

তিনি বেশবেরী ছিলেন, সবচেয়ে উচু গাও গেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা কর্মীর মনোভাব ছিল যা সচরাচর নেতাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। একজন তাঁর সঙ্গে কাজ করার একটা আনন্দ ছিল। ছোট ছোট কর্মীদের তিনি উৎসাহ দিতেন, ঘেঁষে-ভরা আদর বুল করতেন, আবার ধরকার হলে ধমকও দিতেন কম নয়। হাজারাবাধের নিজ দুহেব কল তাঁর প্রাণের টান ছিল অত্যন্ত। Home বলতে বড় গর্ব ছিল। কিছুদিন পর পর গৃহে ক্রিবে বাওয়াব কল বাহুল হয়ে উঠতেন। কংগ্রেস-প্রেসিডেন্টত্বের যখন বা-লাবেশ লক্ষ্য করতে এসেছিলেন তখন বেগানে যেতেন স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের শিল্পজাত বহু জিনিস উপহার পোতেন। ক্রিবে এসে সেগুলি নিজ হাতে প্যাক করে বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এই কর্মকোলালে থেকে দুটি গেরে যখন বাড়ি যান তখন আপনাদের সময় কাটে কি করে?' তার জবাবে তিনি বলেন, 'বেন, স-গার কবি, বাড়ির বেধাওনা কড়ি, চাকরদের পেছনে টিক্‌টিক্‌ কড়ি, দ্বালাঘরে ধানিক সময় যায়।' সানের কল মাথায় তেল মাখছিলেন, কাছে এসে বললেন, 'এই বেধ, নিজের বাগানের নারকেল থেকে নিজ হাতে তেল তৈরি করেছি। কি স্বাদ পড়ে, দেখ।'—যেখো শিশিটা আমার নাকের কাছে ধরলেন। দীর্ঘ বিন আগের কথা মনে পড়ল। আমার মাও নারকেলের তেল দিয়ে তেল তৈরি করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি শিখলেন কোথায়?' বললেন, 'আমার মার কাছে।' আমি ভাবলাম, সেকলে বাহুবাহ অনেক জানতেন যা আমরা জানি না। তার পর মোহাখালি গিয়ে দেখেছিলাম ঘরে ঘরে একাধারে তেল তৈরি হয়। এই তেল তারা ঘিয়ের হত ডাতে মেখে খায়।

মিসেস নাইটু বলতেন, 'আমার মা'র ইচ্ছানুযায়ী হয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর জীবন যেন বুর্জা হয়ে গিয়েছিল। কেবল বলতেন, তোমার বাবার কাছে হবে খাব। আমি বোম্বই সন্ধ্যাবেলা মা'র কাছে যেতাম। একদিন কেবলব সময় যা বললেন, সন্তোজিনী, কাল আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। আমি হেসে বললাম, বাওরা বললেই যাওয়া নাকি, ডাক এসে তবে তো যাবে। মা বললেন, হাসছ ? কাল এলময়ে আর হাসবে না। কাল তোমার বাবা আসবেন নিতে। সকাল নটার একবার এসে, বিদায় নেবে। আমি ভাবলাম মা'র মাথা বোম্ব হয় একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বয়স তো হয়েছিল।* সকালে কিন্তু আমার মন মট্‌কট্‌ করতে লাগল। সেলাম মা'র কাছে। গিরে যেখি আন করে সেজেগুজে বিছানার ফুল ছড়িয়ে যা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। আমি কাছে গিয়ে পাঁজাতে চোখ বুজে যেসে বললেন, এসেছ ; তোমারই অপেক্ষা করছি। এখানে আমার কাছে বোস, কথা বোলো না, আমি জাতি বোম্ব করছি। এই বলে তিনি চোখ বুজলেন। আমি মনে মনে জাবছি, মা'র তো কিছুই হয় নি তবে এল কি ? হঠাৎ মা'র হিকে চেয়ে যেখি তাঁর নিম্নলিখিত আদ পড়ছে না। বুখে একটি দিষ্ট হাসি ফুটে উঠেছে। যা চলে গেছেন।' এগুলি সবই ছোটখাট কথা। কিন্তু আমার মনে হয় বড় কথাই সেবে ছোট-ছোট কলার মাছবের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক বেশি।

যদেই বুগেরও অনেক আগে থেকে তাঁর দখে পড়িত ছিল, কিন্তু কট্টাইই বা তাঁকে চিনতাম। তাঁকে জানতে-জানতে কবি যখন কংগ্রেস-সভানেত্রীত্ব তিনি বা-লাবেশ লক্ষ্য করতে আসেন তখন

থেকে। আমি আগাগোড়া সবে ছিলাম। মহম্মদসিঃ পৌছে আমার মাতৃসুত্র শ্রীমান চিরন্তনের দুহা-
সংখ্য পাই। তিনি নিজেই এ সংখ্য আমার মিলেন। কিন্তু তার পর থেকে কলকাতা পৌছন
পর্যন্ত তিনি একবারও আমার সাধনাথাক্য বলেন নি, বা ওঠে বাও ইত্যাদি অবাস্তব কথা বলে বিরক্ত
করেন নি। তাঁর এই ব্যবহার আমার মর্ম স্পর্শ করেছিল। শোকের গভীরতা ও পবিত্রতা অব্যক্ত
কথায় নই হয়, যে শোকগুণ্ডণ্ড কথা তার ভালোও লাগে না, সেটা তিনি বুঝতেন। বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
ও তিনি দুজনে মিলে গ্রিক করেছিলেন সত্য স্মৃতি রেখে সকলেই সেইদিন বসেন। হয়ে চলে আসবেন।
তাই হল, আমার একা আলতে মিলেন না তাঁরা।

আমি অনেক সময় ভাবতাম, পাশ্চাত্য প্রভাবে মানুষ হয়ে পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষা পেয়ে এত স্বদেশ-
প্রেমি তাঁর প্রাণে কোথা থেকে এসেছিল? তাঁর খুব অল্পবয়সের লেখা একটা কবিতা মনে পড়ছে।
কবিতাটি একটা খাদিক পত্রিকায় বেধিয়েছিল। সে কবিতার কথা তাঁর নিজের মনেও ছিল না। আবার ছোট
তাইটি কবিতা আশ্রয় করতে খুব ভালোবাসত। তাকে বললেই সে উঠে পুস্তকভাণ্ডারে এই কবিতা
আশ্রয় করত। বহুদিনের কথা, আমার নিজেরও সবটা মনে নেই— প্রথম ও শেষ দু'ছত্র মনে আছে—

Your England is mighty
Your England is free,
The Temple of justice and sweet liberty.
The Sun never sets where your flag is unfurled,
And glorious England is Queen of the World.

তার পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ছিল, শেষ দু'ছত্র মনে আছে—

Yet the dust of my beautiful country to me
Is dearer than England, the land of the free.

কবিতাটিসাথে এটা তেমন কিছু নয়, তাই বোধ হয় তাঁর বইয়ে স্থান পায় নি। কিন্তু এটুকু
বোকা ব্যাং যে, স্বদেশপ্রেমের বীজ তাঁর অন্তরে ছোটবেলা থেকেই নিহিত ছিল— এই বীজই অঙ্কুরিত
হয়েছিল পরিশতাব্দে।

বহুদিনের সাহচর্যে তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ভালোবেসেছিলাম, তিনিও আমার খুব
প্রেম করতেন। লেডী থ্যাকারের সুন্দর ও পোচনী বাগানে পয়চার সবে বেড়াতে বেড়াতে অনেক
গল্পই হত। তার মধ্যে দিয়ে তাঁর গৃহস্থালীর একটা সুন্দর ছবি পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল
তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে। কলকাতায় এসে পড়নোই হাউসএ সেবার ছিলেন, তখন তিনি
দুস্তপ্রবেশের পতন হইয়াছেন। শান্তিনিকেতনে থাকছিলেন বোধ হয় এই শেষ উপলক্ষ্যে। এসেই পত্রিকা
টেলিফোন করে বলল, 'আমরা এসেছি।' মা অস্থির, কোথাও বেধতে পারবেন না। দেখা করতে এস।'

তার পর মৃত্যুর ষোল্লদিন আগে আর-একবার এসেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি
তখন আমার পঞ্চাত্তরবর্ষীয়া গ্রাম্য গৃহে। তিনি আমার বাড়িতে আসতে চেয়েছিলেন। আমি কলকাতার
নেই গুনে বসে, 'উমিলাকে বোলো, আমার কিছু বোঝ নেই। জুড়ি যেতে চেয়েছিলাম তার
বাড়ি।'— আমার সঙ্গে আর দেখা হল না জীবনে।

শ্রীজুড়িলা দেবী

রক্তকরবী

প্রথম অধ্যায় বিধি

রক্তকরবী নাটকের মর্মার্থ কি ? শ্রুত ইহা দুই ভিন্ন জাতীয় সভ্যতার মধ্যে ঘর্ষণের ইতিহাস। কর্ণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহােবের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি কৃত্রিমির্ভব সভ্যতার সহিত স্বমির্ভব সভ্যতার ঘর্ষণ। এ ঘর্ষণ একটি আধুনিক সমস্যা! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নিম্নতর আধুনিক সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিতে চান নহেন। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, “আধুনিক সমস্যা ব’লে কোনো পদার্থ নেই। মানুষের সব গুণের সমস্যাই চিরকালের।” এ চিরকালীন সমস্যা যে কত বেশি পুণ্যতন তাহারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কবি রামায়ণের কাল পর্যন্ত গিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস, রামায়ণে কথিত যান ও রাবণের ঘর্ষণে এই চিরকালীন সমস্যার একটি তৎকালীন রূপ পাওয়া যায়। প্রচলিত-সংস্করণ রক্তকরবীর প্রস্তাবনাতে তিনি এই সমস্যাটির সম্যক আলোচনা করিয়াই কান্ন হন নাই, রক্তকরবী নাটকটির সহিত রামায়ণের মূলগত ঐক্যের কথাও বলিয়াছেন। তাহার মতে রামায়ণের সমস্যাই রক্তকরবীর সমস্যা। নাটকটির শিল্পসত্তা সযত্নে আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার আগে তাহার তত্ত্বসত্তা সযত্নে ধারণা শ্রী করিয়া লওয়া আবশ্যক— তাই সমস্যাটি সযত্নে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বস আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইবে— কিন্তু সেই দীর্ঘতাই প্রমাণ করিবে, সমস্যাটি কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে।

প্রথমে রক্তকরবীর প্রস্তাবনা^১ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করা গাইতে পারবে।

“রামায়ণের পঙ্কেত ধারার সঙ্গে এর যে একটা নিল বেগছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ-করা। আসল কারণ, কবিত্বকরই আমরা গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, বর্ণনাত্মক তার কালে এখন উচ্চ চুড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই হাজার হাজার তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

“ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

“কর্ণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিঘ্ন ঘন আছে, এ সযত্নে বহুমুখলো মানি গ্রাহ্যই আলোচ্য করে থাকি। কৃত্রিমতার থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃত্রিমতার থেকে বেরি উদ্ধার করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার দ্বারা তৃষ্ণা যেন হিসসা বিলাসবিস্রম হৃদয়কে ব্যাকসেরই মতো। আমরা যুগের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের সুদিকে লুটিয়ে আশ্রয় করেছেন, সেটা প্রবিশ্রুত করলেই বোঝা যায়। নববুর্জবুলজার সাম্রাজ্যের বক্ষসংলগ্ন গীতাকে বর্ণনাত্মক অব্যবস্থার দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি লোকালের কথা, নী একালের? সেটা কি

ক্রেতাগুণের ভবিষ্যৎ কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার গনির মাসেকরা নববৃন্দাবনবিলাসী কুব্জকেশরী টি খরে টান মিথিছিল?

“আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কুব্জ-বে দানবীর লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ক্রেতাগুণে তাহি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার ক্ষেত্রেই সোনার বায়সুগের বর্ণনা আছে। আরওের দিনে থাকলেও বায়সুগের লোভেই তো আত্মকেশর দিনের সীতা তার হাতে পরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পলকটাক্ষাশীতল হৃদির ছেড়ে চারিদিক টিপেড়ে চটকলে মরতে আসবে কেন। বাস্তবিকর পক্ষে এ সমস্তই পদবর্তী কালের, অর্থাৎ পদবর্তী-বৃত্তান্তের গোড়ায় ছিলেন মত, তার পরে মতাবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন যামের। অর্থাৎ পদবর্তিতার প্রত্যয় এভাবে কবিত্ববিচারে বহন বীকা নিলেন তখনি হৃদয়ের আশ্রিত্যে তার বীকা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোভের মনে কেপেছে। এক কালে তিনি বহু ছিলেন তিনিই বহন কবি হলেন, তখনি আত্মকেশর হাতে বর্ণলতার পরাভবের বাগি তার বর্তে এমন জোলের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা ভুলক কথা বিশেষত বহন ঘেরি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিশদীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাবুয়ের মারু, পলবের মরু; আর-একটিতে শান-বাধানো রাস্তার উপর দিয়ে বৈতালদের বীভৎস পুঙ্খনি।”

উক্ত অংশ হইতে জানিতে পারিলাম যে, রামায়ণে ও বক্তাবলীতে তত্ত্বগত ঐক্য আছে; উক্ত কার্যেই তত্ত্বগত ভুল হইতেছে, দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার বহন; বক্তাবলীর মতাবৃত্তিত্যাগের মধ্যেও বহুব্রনাথ একটা ইঙ্গিত দেখিয়াছেন; এমনকি রাম ও রাবণ নাম দুটিও তাঁহার নিকটে দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার সঙ্গে রক্তিত হইয়া প্রতিষ্ঠাত হইয়াছে।

রামায়ণের তত্ত্ববিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহুব্রনাথের অত্র রচনাতেও আছে, এবং আরও শান্তি আকারে আছে। ‘সীতা’ পঞ্চটিতে তিনি একটি বিশেষ অর্থ ও বিশেষ রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়—রাম কতৃক হরণহৃত, সীতার বিবাহ, অহম্যার শাসন—মতবর্তী একটি বৃহৎ ভগ্নকের অংশ বলিয়া বহুব্রনাথ মনে করেন। বহুব্রনাথ বলিতেছেন, “রাম বহন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরণহৃতকের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরথাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। বিশ্বাসিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র বহন বাহির হইলেন তখন ভুল বধনসেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তিনি শৈববাক্সদগিকে পরাস্ত করিয়া হরণহৃত ভগ্ন করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে-কৃষি হলচালনের অযোগ্যতায় বহল্যা হইয়া পাখান হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাথের প্রথম অগ্রণাবীহেতু মধ্যে অন্ততম ভবি গোতম যে-কৃষিকে একরা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিপন্ন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ধাতুতে বাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়া ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন শাখরকেও সীতা করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিইনপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয় কাম্রিয়লগ্নের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণের বে বিধে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই কল্পকবি বিশ্বাসিত্রের শিত্ত আপন কৃষকলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।”

২ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ব্যাখ্যা, পরিচয়, বহুব্রনাথবলী ১১-শ খণ্ড, পৃ ৪০২-৪০৩। পরিচয়-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯১০ সাল। অবশেষে রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী। ইহাতে বৃদ্ধিত পাঠ্য বাইবে, বক্তাবলীতে যে তত্ত্ব প্রকাশিত ভক্ত দীর্ঘকাল বলিয়া বহুব্রনাথের মনে তাহা বিচার করিতেছিল।

উপরে অংশ হইতে নীচা নামের ব্যাখ্যা জানা পেল। নীচা কি না স্তিমতী ভূবিবিদ্যা। তাহা হইলে নবদ্বীপলগ্নায় রামচন্দ্র কর্তৃক নীচাবিখ্যারের অর্থ পাড়ার— আর্থসম্বন্ধ কর্তৃক ভূবিবিদ্যাকে বোঝায়। আর বাবণ কর্তৃক নীচাহরণ এবং বাব কর্তৃক বাবণকে পর্যালোচনা করিয়া নীচাহর উদ্ধারের মর্ম এই যে, আকর্ষণজীবী সত্যতা ভূবিবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে উদ্ভত হইলে কর্ষণজীবী সত্যতায় ও আকর্ষণজীবী সত্যতার একটা প্রবল লড়াই বাধিয়া পড়ে। সেই হুঁড়ে বাবণ কেবল পরাজিত হইল না, সাময়িকভাবে আকর্ষণজীবী সত্যতার উপরে কর্ষণজীবী সত্যতার আশ্রয়প্রাপ্তি ঘটিল। জাতাবাদীর পক্ষে* রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও পূর্বেদ্বিত অংশের এবং রক্তকরবী-ভাষ্যের শোভক। কিন্তু সেসব উদ্ধারের আর আবশ্যক আছে মনে করি না, যেহেতু এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতেই সমস্তের তথ্যটি বিশদ হইবার কথা।

রামায়ণের সহিত রক্তকরবীর তুলনাত একটা প্রবর্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কাজ হন নাই, নাটকটিকে বস্তুব সম্বন্ধ রামায়ণের প্যাটার্নের বা ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নীচাহরণ এবং তাহার ফলে লক্ষ্যপূরণ রামায়ণের মূল বিষয়; নাটকটিরও মূল বিষয় অল্পতপ, নন্দিনীকে বক্ষপুত্রীতে আনয়ন এবং বক্ষপুত্রী-লগ্ন। লক্ষ্যপুত্রীর বাবণ ও বক্ষপুত্রীর স্বাক্ষর মধ্যেও সামুদ্রিক বস্তমান। আকর্ষণ আকর্ষণজীবী, তাহার কর্ষণজীবিতার বিরোধী। বক্ষপুত্রীর বোমাইউত্তরও তদাভ্যন্তরে কি তাহাই নয়? এমত বিধের বিচারে তুলনাকে বহুবর্ষ পর্যন্ত টানিয়া লওয়া উচিত নয়, আভাস-ইন্ডিতেই চেষ্টা অধিক প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না। কবিও আভাস-ইন্ডিতেই কাজ সাধিয়াছেন, তবু বৃত্তিতে পায়া ধার, রক্তকরবীকে ঢালাই করিবার সময়ে রামায়ণের ছাঁচটা উদ্ধার মনে ছিল।

“আমার পালার একটি স্বাক্ষর আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবিং মতো ভয়গা থাকলে দিতেই, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মাহুয়ের হাত পা মুণ্ড অল্পতপে বেড়ে গেছে। আমার পালার স্বাক্ষর যে সেই শক্তিবাহকের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহলগ্রহী বহুগ্রামী বাবণ বিদ্যাৎ-বল্লভাবী দেবতাদের আপন প্রাসাদঘরে সূক্ষ্মলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রত্যক্ষ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবতাহী সন্নিবিষ মাতৃবানে হঠাৎ একটি স্বানবক্সা এসে পাড়ালেন, অমনি ধর্ম জোপে উঠলেন। মুচু নিয়ন্ত্রণ বানবকে দিয়ে তিনি স্বাক্ষরকে পরিত্যক্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকল্পার আবর্তিত আছে। তাছাড়া, কলিযুগের স্বাক্ষরের লগ্নে কলিযুগের বানবের হুঁড়ু ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

“আদিকবির সত্য কাণ্ডে স্থানান্তার ছিল না, এই কারণে লক্ষ্যপুত্রীতে তিনি বাবণ ও বিভীষিকাকে বস্তর স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তাহা একই, তাহা সহোদর তাই। একই নীচে পান ও সেই পানের বৃত্ত্যবাপ লালিত হয়েছে। আমার স্বাক্ষরতন নাটকে বাবণের বস্তমান প্রতিনিধিটি এক মেহেই বাবণ ও বিভীষিক; সে আপনাকেই আপনি পরিত্যক্ত করে।...

“বর্ণলগ্নার মতোই আমার পালার ঘটনাবলীর একটি ভাষ্য-নাম আছে। তাকে কবি বক্ষপুত্রী বলে জানে।”

উদ্ধৃত অংশের সাক্ষ্যে কৃত্তির বলে রামায়ণের ছাঁচের সহিত রক্তকরবীর ছাঁচের ঐক্য প্রমাণ করা যায় কি না সম্বন্ধে— তবে অল্পকৃতির বলে নিশ্চয় যায়। শিল্পবিচারে অল্পকৃতির সাক্ষ্যকেই বিধান করিতে হইবে।

বহিঃ অল্পকৃতিই রামায়ণের প্রধান সাক্ষী এবং সে যেচারা ইন্দিরের বেশি করিতে সমর্থ নয়, তবু তাহার ইন্দিরময় সাক্ষ্যের অল্পকৃতি কতকগুলি তত্ত্বের উল্লেখ করিতে পারি, তাহাতে রক্তকরবী যে রামায়ণ-কাব্যের ছাঁচে ঢালাই-করা তাহা প্রমাণিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

রামায়ণ-কাব্যে রাম ও রাবণের দ্বন্দ্ব, তাহাদের দ্বন্দ্বের হেতু সীতাহরণ। এই ঘটনাটি রক্তকরবীতে ভাবরূপে দেখা দিয়াছে। রক্তকরবীর দ্বন্দ্ব কর্ণপঞ্জীবিদ্যা ও অকর্ণপঞ্জীবিদ্যার মধ্যে, নাকশ্রমে দৃষ্টিগোচর নহিনী। রবীন্দ্রনাথ সীতাকে মৌলিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, সীতা অর্থাৎ হলধোলা-বেশা। সোণা কথাই এই যে, সীতা রূপবিদ্যা, আর তাহাকেই লইয়া দ্বন্দ্ব দুই ভিন্ন গোত্রের সভ্যতার। রক্তকরবীতেও দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতার, তাহাদের দ্বন্দ্বের কারণ নহিনী। তাহা হইলে এই নন্দিনীকে নাটকধারি ব্রুববার পক্ষে নন্দিনীর বর্ষগত পরিচয় জানা বিশেষ আবশ্যক, এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার আশাতেই এখন ক্ষান্ত হইলাম। আমার রামায়ণ ও রক্তকরবী দুই কেবলই বেশি আসল দ্বন্দ্বী মাহুদের সহিত তত্ত্বের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব-সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মতে যান্ত্রিক সভ্যতা। রামায়ণ ও রক্তকরবীর শিবির-সম্মেলনের একপক্ষে গ্রামের মাহুদ, অপরপক্ষে আত্মঘাতী ঐশ্বর্য; একপক্ষে আনন্দ, রাম ও রজন; রাম যে আনন্দ দান করে, রজন যে মনকে রাঙাইয়া তোলে; অপরপক্ষে দারণ ও বন্ধপূরীর অসৌখ্য। দুইখানি কাব্যেই বেধা যায়, গ্রামের সঙ্গে লুপ্ত প্রচেষ্টার সংঘাত; রাম সীতাকে গ্রামের দ্বারা আপন করিয়াছেন, রাবণের পুত্র প্রচেষ্টা তাহাকে হরণ করিয়াছে; রজন ও নন্দিনীর যথোক্ত অদ্বন্দ্ব গ্রামবৃত্তকে লুপ্ত লুপ্ত উপদ্রবগ্রাম হরণের দ্বারা আপন করিয়া দ্বিধা কলিতে চাহিয়াছে। এবং তথা যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি ইন্দিরময়ের অধিকও নয়, তবে কাব্যদুইখানি এক ছাঁচে ঢালাই বলিয়া অল্পকৃতির সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইলে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি সেই বিশ্বাসের বিনিময় দৃষ্টতর করিয়া দিবে বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইবে না।

২

নন্দিনী কে, আর রক্তকরবী বলিতে কবি কি বুঝিতেছেন? এ ছুটি বিষয় পরিষ্কার হইলেই নাটকধারি বর্ষগ্রহণ সহজ হইবে, কারণ নন্দিনী ও রক্তকরবীর দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা বর্ষগত যোগ আছে। নন্দিনী তাহার মানবরূপ, রক্তকরবীপুত্র তাহারই প্রতীকরূপ; রূপে ভিন্ন, বস্তুতে এক। কবি মানবরূপ নন্দিনীর রূপে যে অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহাকেই আরও নৈসর্গিক করিয়া, আরও পারিপার্শ্বিকবৃত্ত বিস্তৃত করিয়া, অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত করিয়া, রক্তকরবীপুত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আগে নন্দিনীর বস্তু ব্যাখ্যা কবির ভাষাতে শোনা যাক—

“রক্তকরবীর সমস্ত প্যালাটি ‘নন্দিনী’ বলে একটি মানবীয় ছবি। চারদিকের পীড়নের ভিতর দ্বিগুণে তার আত্মপ্রকাশ। কোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অক্ষমত কলরবনিত উর্ধ্ব উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে যেমন তাহলে হয়তো কিছু বল পেতে

পাবেন। নরহত্য বক্তব্যবীর পাশড়ি আড়ালে অর্ধ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আত্মস বিয়েছে যে, মাটি খুঁজে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নশ্বিনী পেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নশ্বিনী সেই সহস্র দুঃখের, সেই সহস্র দৌলখের।”

কবির সত্যবগী সবেও নশ্বিনীর স্বরূপ সন্ধান না করিয়া উপায় নাই এবং বক্তব্যবীর পাশড়ি আড়ালে না হোক পাশড়ির সহিত মিলাইয়া লইবাই নশ্বিনীর স্বরূপ সন্ধান করিতে হইবে। নশ্বিনী যদি অপর্ণা বা ইলা হইত তবে তাহার স্বরূপ সন্ধান করিবার কথা কাহারো মনে উঠিত না, তাহার রূপই সকলে সজ্ঞে থাকিত। কিন্তু নশ্বিনী যে বক্ষপূরিতে আদিয়া পৌছিয়াছে সেখানে সকলেই কিছু-না-কিছু সন্ধান করিয়া যত্নেছে। পেখানকার অধ্যাপক ও পুরাণবাসীও শেষের অর্ধ খুঁজিতেছে, পেখানকার খোলাইকরের দল মাটির তলায় সোনা খুঁজিয়া যত্নেছে, জালের আড়ালের রাজা নিজেই অজ্ঞাতসারে নিকট সন্ধান করিতেছে, যখন নশ্বিনী রক্তরূপে খুঁজিতে আদিয়াছে— এমন আশ্চর্য্যের হৃৎভাঙ্গা সমালোচক যদি নশ্বিনীর স্বরূপসন্ধান প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মোহ বেগা বার না। তবে তাহার ভয়ের কারণ নাই, বৈহত কবি যখন অস্তিত্ব নশ্বিনী রূপ ব্যাখ্যা করিয়া পথপ্রদর্শন করিয়াছেন—

“নারীর চিত্রের গিরে বিভিন্ন বসন্ত প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমে মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার স্বরূপে যত্নের প্রাধান্য ঘটে। তখন মাহু আপনাব স্বই যত্নের আঘাতে কেবলি শীড়া ঘেঁষ, শীড়িত হয়।

“এই ভাবটা আমার বক্তব্যবীর-নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বক্ষপূরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ স্থির করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুণ্ঠ চেষ্টার তাত্ক্ষণিক প্রাণের মাহুঁ সেখানে থেকে নির্বাসিত। সেখানে ঝটিলতার জালে আপনাকে আপনি ভিত্তি করে মাহুঁর বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে কুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দান বেশি; কুলেছে, প্রাণের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মাহুঁকে দাস করে রাখবার প্রকট আয়োজনে মাহুঁ নিজেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নশ্বিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যত্নের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুণ্ঠ চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনার কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেল প্রাণের প্রবাহকে বাধানুস্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।”

সত্যতাই সংসারের একটা দিক বাস্তবিক সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক কাঠামো, বাস্তবিক কাঠামো, সবই অজবিত্তর বাস্তবিক, তাহাকে বাদ দিলে মাহুঁর চলে না, যেমন কচ্চালের নীড়ল অচল পুট কাঠামোটাকে বাদ দিলে মানবসংসার চলে না। কিন্তু কচ্চালের কাঠামোটাই সব নয়, তার উপরে বক্তব্যস আছে, এবং সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে মেয়ের দাবী ও মুখশী। ঐখানেই মাহুঁর পথচিত্র, কচ্চালে কচ্চালে ভেল নাই। কবি বলিতে চান, যত্ন এবং প্রাণ, বাঢ়া ও প্রেম, কতরা ও আনন্দ মিলাইবাই জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সমাজে যদি যত্নের দিকটাই প্রবল হইয়া

ওঠে, তখন সে সম্বন্ধে মন্থিত বলে। তখন সেই সম্বন্ধের মধ্যে হয় নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে নর সেই সম্বন্ধ ধরে হয়। হস্তকরবী সেই সম্বন্ধে একটি সম্বন্ধ। যত্ন সেখানে সর্বজনীন হইয়া মানুষকে শীতল ও মন্থাচ্ছন্ন করিতেছে। হস্তকরবীর সৌভাগ্য যে, যত্নী বিনষ্টির আগেই সেখানে নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটানো। নন্দিনী কি না আনন্দময়িনী।

পিতার কথিত হইয়াছে যে, অধর্মের অভ্যাস হইলে ভগবান অবতীর্ণ হন। তিনি মুক্তিদাতা-রূপে আসেন। নন্দিনী মুক্তিদাতারূপে আসিয়াছে। হস্তকরবীর সম্বন্ধে প্রাণের অভাব ঘটানো, অধর্মের অভাব ও বলা হইতে পারে, কেননা, অধর্ম প্রাণহরণ বিধা শুরু করে, প্রেম হরণ ও সৌন্দর্য্যবৃত্তি হরণ করিয়া তাহার কাছের সমাপ্তি ঘটে।

পুঙ্খ সজ্জনস্বভাবী, সজ্জনের প্রেরণায় সে কেবলি অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কি বহির্বিষে, কি অন্তর্বিষে, কোথাও তাহার সজ্জনের শেষ নাই। কেহ খুঁজিতেছে মাটির তলাকার সোনা, কেহ খুঁজিতেছে মনের তলাকার পুণ্যতা; তাহার এই অনন্ত সজ্জনসৌভাগ্য আর শেষ নাই, এমন সময়ে সনাতনের অবন্তরীণ নারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কত বৈরাগ্য বাস্তবের পুঙ্খ কেবলি বহু গতিয়া চলিয়াছে, যত্নে গৃহ হইতে গৃহতর করিতেছে। এমন সময়ে নারী সেখানে আসে প্রেম। পুঙ্খ টানিতেছে বাহিরের বিকে, নারী টানিতেছে ভিতরের বিকে—দুই টানটানিতে সমস্ত বসিলে পুণ্যতার পতন বিকলিত। হইয়া ওঠে, সেই পতনের উপরেই তো বিজ্ঞাননাথ মস্তুর আসন। পুঙ্খী শক্তি ও নারীশক্তির যথার্থ সম্বন্ধে সংসারের পুণ্যতা। কিন্তু বাস্তব সংসারে এমন পুণ্যতা কখনো কল্যাণিত ঘটানো। হস্তকরবীতে তো ঘটেই নাই—পুঙ্খী শক্তি সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়া উঠিয়া যত্নে আনন্দকে হস্তে করিবার ভেঁয়া নিম্নত। তাই সেখানে নারীশক্তিপন্থি, প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক রূপে নন্দিনী আবির্ভূত। এই নাটকের মধ্যে নন্দিনী কোথা হইতে আসিল কবি বলেন নাই, ইচ্ছা করিয়াই বলেন নাই, প্রয়োজন নাই বলিয়াই বলেন নাই। বিশ্ববিধানের ইচ্ছিতে যে আসিয়াছে, সে সংসার বিশেষ করিয়া বিবাহ সার্বিকতা কি?

নন্দিনীর স্বরূপ হইতো কতকটা পরিচায়ক হইল। এবারে হস্তকরবীর পুঙ্খ বলিতে কবি কি বোঝেন দেখা যাক। আগেই বলিয়াছি যে, নন্দিনী ও হস্তকরবী অভিন্ন। দুয়ের স্বরূপ এক, কিংবা বলা চলে যে নন্দিনীর প্রতীক হস্তকরবীর পুণ্যগুণ।

এবিষয়ে একখানি গল্পের আনবিশেষ উদ্ধার করা হইতেছে—“কৃত্যের অল্প কিছুদিন পূর্বে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন—বেতুন, প্রাণের স্বরূপ ভয় নাই। উপনিষদ বলেন, প্রাণই সত্য, তাহা বৃত্তা নাই, ভয় ছিল ভয়ের স্বরূপ। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু তাহাও বৃত্তা নাই। যবে বস্তুনা মানুষের বস্তু কৃত্রিম অলপ বস্তু। হস্তকরবীতে আমি সে কথা বলেছি। হাতের পাত্রে বেধেও, পত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে করে মারেতে পেতেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালম্ব-জাতীয় আবরণের সূপ ছিল। তাহা নোটে একটা ছোট কণ্ট্রীপাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাই নি, পরে লোহালম্বি গহিরে আর চায়টুকুর বোঝ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন বেধে ঐ লোহার আলম্বাল দেহ করে একটি কৃত্রিম কণ্ট্রীপাছা উঠেছে একটি লাল ফুল বকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে বেন তার বৃক্ষের বক দেখিয়ে সে মধুর হেসে শ্রীতির

সজ্জাৰণ জানাতে এলো। সে বললে, তাই যদি নি তো, আমাকে দাঙতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিজয়ের প্রকাশ বেধে গেল। নাটকটাকে তাই 'বন্ধপুতী' 'নন্দিনী' প্রকৃতি বলে আমার মন তৃপ্ত হইল, তাই নাম বিলাস 'রক্তকরবী'।"

পট্টাবলির মর্ষ অবগত হইবার পরে রক্তকরবীর স্বরূপ সবচেয়ে আর সম্বন্ধে ধাক্কা উচিত নয়। "চারবিকের শীতনের ভিতর যিহে তার [নন্দিনী] আশ্রয়প্রকাশ। কোয়াবা বেধন সৌকর্য্যতার শীতনে হাসিতে অকস্মেৎ কলকলিতে উঠে" উল্লসিত হয়ে ওঠে, তেমনি।" রক্তকরবীর চায়াটিও কি তেমনি তাহে ওঠে নাই; নন্দিনীকে বন্ধপুতীর জালে চাপা দিতে পারে নাই, রক্তকরবীর চায়াটিও তো গোহার জ্বপের কালজ্বলে চাপা পড়ে নাই। নাটকে আছে যে, বন্ধপুতীর একান্তে অন্যমনে অবহেলায় আবর্তনাত্মকের নিকটে একটীমাত্র রক্তকরবীর পাছ আছে। বন্ধপুতীর যে ব্যবস্থা তাহাতে রক্তকরবীর পাছ অধিক থাকিবার কথা নয়। সে ফুলের লজ্জাও আবার মাথের কিশোর নামে একটি বালক। ভালোবাসার দৃষ্টিতে সে নন্দিনীকে দেখিয়াছে, তাই তাহার দৃষ্টিতে বৃষ্টি রক্তকরবীর পাছটি আশ্রয়প্রকাশ করিয়াছে। পট্টাবলিখিত রক্তকরবীর চায়াটি একটি ফুল ফুটাইয়া বলিয়া গেল যে, তাহাকে মাঝরা ফেলা সম্ভব হয় নাই। নাটকের শেষেও দেখি, বন্ধপুতীর কটিন শাখরের উপরে বৃকের রক্ত টানিয়া যেন এক শুভ্র রক্তকরবীর ফুল ফুটাইয়া দিয়া যেন বিহার লইয়াছে। সে যেন শত্রুও লিখিত রক্তকরবীর চায়াটির মতোই বলিয়াছে—"যদি নি তো, আমাকে দাঙতে পারলে কই"। প্রাণের প্রতি, প্রেমের প্রতি, আনন্দের প্রতি "অর্থাৎ নন্দিনীর প্রতি রক্তন তো অবিশ্বাস গোষণ করে নাই। তবে আর মরিগ কই? ঐশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসেই তো দৃষ্ট। নাটকের চূড়ান্তে নন্দিনী ও রক্তকরবী এক হইয়া গিয়াছে, গিথিগঠনের চূড়ান্তে অন্তরান দ্বন্দ্ব ও অলস বেধ বেধন করিয়া এক হইয়া যায়।

চুই-ই যদি এক, তবে শূন্য সত্তা বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? নন্দিনী মানবকল্প, মানবগুণ বা পারিশাখিক বাহ দিয়া তাহার মনোকার বিশুদ্ধ প্রাণরূপ দেখানো সম্ভব নয়। প্রাণের ও প্রেমের, আনন্দের ও সৌন্দর্যের রূপটিকে বিশুদ্ধভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই রক্তকরবীর অবতারণা করিতে হইয়াছে এবং তাহার উপরে প্রতীকের মাধ্যমে কল্পিত হইয়াছে। কোনো বস্তু বিশুদ্ধ রূপটি একমাত্র প্রতীকের দ্বারা প্রকাশ সম্ভব।

৩

নন্দিনী-চরিত্র নাটকখানির গ্রাণ। তাহার প্রাণবেগে নাটকের ঘটনা চকল হইয়া উঠিয়াছে। যে বন্ধপুতী এককাল জিমিতবেগে আগমার অত্যন্ত পথে চলিতেছিল নন্দিনীর প্রাণপ্রবাহ আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চকল করিয়া তুলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব মনো বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া আগাইয়া গিয়াছে। বন্ধপুতীর জীবনে নন্দিনী যেমানান, এখানে সে বাস করে নাই বলিয়া কেহ-বা তাহাকে আশ্রয় প্রদানে চাহিতেছে, আবার কেহ-বা তাহাকে একটা দুর্গোপ বনে করিয়া বন্ধপুতী হইতে বাহির করিয়া দিবার

চোঁটা করিতেছে। বন্ধপুত্রীর স্বল্প-সংস্রাভে নন্দিনীর প্রাণকণা এক বিপন্ন ঘটাইবার মুখে— এমন অবস্থার নাটকের সূত্রপাত।

“মেলোমের আলো বৈবাং মাঝে-মাঝে অশান্ত জ্বলন্ত জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাংক-প্রকার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা আল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। এই নাটোর ঘটনাকালের মধ্যে নন্দিনী-নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। স্বল্পসংস্রাভ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই ঘেরে টিকতে দেখে না বুঝি।”

নাটকখানির অস্ত্রাশ্রয় পাত্রপাত্রীকে বৃত্তিতে হইলে নন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়া, নন্দিনীর আকর্ষণের পটভূমিকার প্রবেশ করিয়া তাহাদের বৃত্তিতে হইবে। অর্থাৎ, নন্দিনীর আগমনে বিভিন্ন চরিত্রে যে অন্তর্ভুক্ত প্রতিচ্ছিন্না বহিরাহে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই তাহাদের মনের প্রতিবিম্ব বৃত্তিতে পাবা যাইবে।

রাজা অধ্যাপক পূর্ণদ্বাদশীশ কিশোর পোঁসাই কল্লোল চক্ৰা বিত্ত ও সর্বদা প্রকৃতি নাটক-খানির প্রধান পাত্রপাত্রী। অবশ্য-বলনও আছে কিন্তু তাহাকে স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

নন্দিনীর প্রতি রাজার মনে দুটি বিকল্প ভাব— একটা আকর্ষণের, একটা বিকর্ষণের; একটা নন্দিনীর বিকে তাহাকে টানিতেছে, আর-একটা নন্দিনীকে ভাড়াইয়া দিতে পারিলে সে বাচে। রাজা যেখানে বন্ধপুত্রীর অসীম, অর্থাৎ বন্ধপুত্রীর স্বল্পসংস্রাভের মধ্যে বহুতম স্বল্প, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার বিকর্ষণ। রাজা অজ্ঞাতস্বরে বুঝিয়াছে যে, এই মেয়েটি তাহার স্বল্পধর্মকে বিকল করিয়া দিবার অজুই আনিয়াছে। কিন্তু রাজা সেখানে মাহুৎ, বন্ধপুত্রীর জটিল আলোর আড়ালে থাকিয়া যেখানে তাহার মানব-স্বল্প অপর চরমের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণ। স্বল্পভাব ও মানব-স্বল্পতাবের ঐক্য উপকরণে বন্ধপুত্রীর রাজা গঠিত। তাহার ঐক্য স্বল্পতাবের পরিচরমান-উপলক্ষ্যে কবি বলিতেছেন—

“আমার পালার একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটাব বেশি মৃত ও দুটাব বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আধিক্যের মতো ভয়লা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মাহুৎের হাত পা মৃত অশ্রুতভাবে বেতে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহল-গ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যাব্যবহারী সেবতাবের আশ্রয় প্রাশনার্থে পৃথলিত করে তাদের দ্বারা কাজ করার কবিত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষর থাকতে পারত। কিন্তু তার সেবত্রেহী সত্যের স্বাক্ষরানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে ধাক্কা দিলেন, অমনি ধর্ম ক্ষেপে উঠলেন। মৃত নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি ব্যাকসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে রিঁ কিং, এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের ব্যাকসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের মূর্ত ঘটে, এমনও একটা ঘটনা আছে।

“আধিক্যের পাত কাণ্ডে স্থানান্তর ছিল না, এই কারণে লক্ষ্যপুত্রীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে

পাণ ও সেই পাণের সূচ্যবান লানিত হয়েছে। আমার অন্বেষণের নীচের ধারণার বর্তমান প্রতিনিষিদ্ধ এক মেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপন পদাঙ্ক করে।*

উপরের বর্ণনা হইতে মকররাজ্যের যে পঞ্চদশ পাইলাস তাহাতে জানা গেল যে, রাজা অমিত-শক্তি। তাহার সহস্রাত বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তি মূল হইয়া তাহাকে প্রবল কমতাপাদী করিয়া তুলিয়াছে। আর অমিতাশ্রম, বর্মবুদ্ধি ও পাণবুদ্ধি বিভীষণ ও রাবণ, তাহার এক মেহেই বিরাম করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় জানিতে পারিলাম, তাহার বিপুল লব্ধির মাধ্যমে একটি মানবকল্পার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই মানবকল্পার স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের মনোকার সহস্রাত মানববুদ্ধি ও চৌহাত বৈজ্ঞানিক শক্তি, তাহার মনোকার রাবণ ও বিভীষণ আশ্বোদিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে মানববুদ্ধির, রাবণের উপরে বিভীষণের প্রতিটা ঘটনা, রামায়ণের মতো ঘটনা-প্রবাহে ঘটে নাই, মধ্যমীয়া কালের শিল্পকীর্তি অল্পবয়স করিয়া তাহা প্রবাহে ঘটয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ আর দশানন ও সহস্রাক্ষ। কিন্তু বিশ্ব এই যে, মানুষ এই শক্তিকে নিজের কল্যাণকর্মে নিয়োগ করিতে জানে না। বালকের হাতে অস্ত্র পড়িলে তাহা বিধা। সে যেমন বসন্ত আঘাত করিয়া একপ্রকার সৌর্য অস্ত্রের করে, অবশেষে তাহার দ্বারা হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়ে, মানুষের আর তেমন দশ। মানুষ আর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের অবদান হইতে পারিত, বৈজ্ঞানিক শক্তির চরিতার্থতা হইতে পারিত—যদি সে আপনাদের প্রাণবর্ধের সঠিক ব্যবহারে কোনোবাক্ষে মিলিয়াই হইতে পারিত। কিন্তু তাহা তো আরও হইয়া উঠিল না, বরঞ্চ বেশিতেছি যে, যন্ত্রের চাপে প্রাণ আর শীর্ণিত। সেই শীর্ণ মানবদশায় দ্বন্দ্ব হাতে হাতে অস্ত্রের করিতেছে। মকররাজ্যও সেই শীর্ণায় শীর্ণিত, দ্বন্দ্ব। তাই নবীন্যের প্রতি তাহার এমন আকর্ষণ, তাই তাহার প্রতি একরকম দৃষ্টি প্রণয়ের জায় সে অস্ত্রের করে, তাই বক্রের প্রতি তাহার ঈর্ষার অস্ত্র নাই। মুক্ত বিজ্ঞান প্রাণবর্ধের প্রতি বহুশীর্ণিতের যে মনোজায়, নবীন্যের প্রতি মকররাজ্য তাহাই অস্ত্রের করিতেছে।

এ যেমন গেল তাহার একই মেহে প্রাণবর্ধ ও যন্ত্রের সত্তার অভিব্যক্তি, আবার যেদি সে একই মেহে রাবণ ও বিভীষণ। পাণের পালনের দ্বন্দ্ব সে দ্বন্দ্বী বটে, কিন্তু তাহার প্রতি একটা প্রতিবাদও আছে তাহার মনে। নবীন্য আপনাদের আগেও ছিল, হস্ত ছিল; নবীন্য আপনাদের সেই হস্ত প্রতিবাদকে কাগাটকা দিয়াছে। বক্রযুগের জীবনের যে ভটল জালকে সে বন্ধ করিয়াছে, অবশেষে নিজের হস্ত যে ভটল দানবের আড়ালে সে অস্ত্রবাহিত, একদিন নবীন্যের প্রেরণার ও প্রয়োচনার তাহাকেই দীর্ঘ করিয়া সে মুক্ত হইয়াছে, আপনাদের রচিত প্রাণবর্ধ নিয়মকল্পের বিরুদ্ধে সে বিরোধ ঘোষণা করিয়াছে।

এ মুক্তি দানবের মুক্তি, বক্রবাদের ব্যবহারের অভিকারিক নিষেধ হইতে প্রাণের মুক্তি। বক্রবাদের বসিতে চান, মানুষ বসেই বক্রবাদের হইয়া, বক্রবাদের হইয়া পড়ুক না কেন, তাহার মৌলিক প্রাণবর্ধ একেবারে বিনষ্ট হয় না। দ্বন্দ্বের ভিতরে জল জমিতে জমিতে এক সময়ে যেমন পানুর তেজ করিয়া তাহা উজ্জ্বলিত হইয়া ওঠে, জলে ও জলে চাপা-পড়া প্রাণও তেমনই মুক্তির মুহূর্ত ঘটিতেছে

—একদিন না একদিন স্বপ্নে বেগে উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাহার ভগ্নে চাই প্রাণের প্রয়োচনা। নশ্বিনী সেই প্রয়োচনা যহিয়া বক্ষপুত্রীতে অবতীর্ণ।

উপরে উদ্ভূত অংশে রবীন্দ্রনাথ পাশ ও পাশের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন? ভক্তের কাছে আত্মসমর্পণকেই তিনি পাশ বলিতেছেন। নশ্বিনীর প্রাণবেগ বক্ষপুত্রীর লক্ষ্যমের তিতিকে শিথিল করিয়া দিয়া প্রাণের মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে।

এখানে রক্তনের বাণ্যা পাশিলা লগ্না ঘাইতে পারে। রক্তন ও বালা একই দৃষ্টান্তে গড়া— ইহা দ্বারা কবি বুঝাইতে চান যে, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব আছে। নশ্বিনী রক্তনকে ভালোবাসে, আবার বালায় প্রতিও একটা আকর্ষণ অস্বত্ব করে; বহিঃ তাহাকে ভালোবাসা বলা চলে না। হৃদয়ের প্রভেদের কারণ, রক্তন হইতেছে মানুষের বিতন্ম ভণ্ড, রক্ত ও বহুর উপেঁ সে প্রতিষ্ঠিত। আর বালা স্ব-জাণা-গড়া মানুষ— তাহার মধ্যে মানুষের বিতন্ম ভণ্ডটা দেখিতে পাই না, তাহার কাঁকে কাঁকে কিরণমাত্র দেখি। তাই তাহার প্রতি নশ্বিনীর আকর্ষণটা প্রেমের দিগা পৌছাইতে পারে নাই, রক্তনের মধ্যে যে নিমুক্ত মানবরূপ প্রত্যক্ষ তাহারই প্রতি নশ্বিনীর প্রেমের আকর্ষণ। কবি বলিতে চান, প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ, পৃথিব্যতম আকর্ষণ মানুষের প্রতি; বহুর প্রতি তাহার যোহের তাব থাকিতে পারে, শক্তির প্রতি তাহার বিশ্বাসের তাব থাকিতে পারে, কিন্তু ভালোবাসিতে সে মানুষকেই বাসিবে। তাহার হৃদয়ের হস্তকরবীর দ্বারা মানুষের হৃদয়ের ভিত্তি দ্বিগুণ হইয়া আছে।

স্বাধা ও সংস্কার পক্ষে নিয়মতন্ত্র অপরিহার্য, কিন্তু সেই নিয়মতন্ত্র প্রাণের বিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিলে বিতন্ম পবিত্র হয়। তখন তাহাকে তাত্ত্বিক প্রয়োজন হয়। বক্ষপুত্রীর নিয়মতন্ত্র অদ্বৈত প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা লাভ করিয়া বস্তু পবিত্র হইয়াছে। তাহাকে তাত্ত্বিক ভিত্তি নশ্বিনীর, আবির্ভাব। বস্তুকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিতে হয়। তাহাকে তাত্ত্বিক ভিত্তি উপায় নাই। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি সাধারণ ধারণা। তাহার অস্তিত্ব নাটকেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। মুক্তদান-নাটকে অতিশয় আপনায় গ্রাণ দিয়া মুক্তদানের দ্বৈতকে আঘাত করিয়াছে। অলসারতন-নাটকের অন্তর্গত পক্ষ আপনায় দুর্ভাষ প্রাণপতির প্রয়োগ করিয়াছে অলসারতনের প্রাচীর তাত্ত্বিক ভিত্তি উদ্ভেদে। অলসারতনের আচার্য ও হস্তকরবীর দ্বারা— দুইয়েরই এক অবস্থা। তাহাদের আনিকটা নিয়মতন্ত্রের দ্বারা প্রাণ হইলেও তাহার বিতন্ম একটা প্রতিবাদ তাহাদের মধ্যে আছে। শেষ পর্যন্ত বহুর বিতন্ম এই প্রতিবাদেই ভয়লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু হস্তকরবী-নাটকের সকল পাত্রপাত্রী এমন সৌভাগ্যবান নয়, তাহাদের আনিকাই নিয়মতন্ত্রের দ্বারা সর্বভোক্তাও প্রাণ। সর্গীয় প্রকৃতির কবাই আর্গে বরা থাক। সর্গীয়, দেহো সর্গীয়, ছোটো সর্গীয় প্রকৃতি কেবল নিয়মতন্ত্রের অধীনস্থ নয়, তাহারা এই নিয়মতন্ত্রকে অটুট রাখিবার কাছে নিযুক্ত। নিয়মতন্ত্র তাহাদের মন্ত্রন না করিয়াছে, আবার তাহারা নিয়মতন্ত্রকে দক্ষা করিতেছে— এইভাবে একটি বিতন্মের সৃষ্টি করিয়াছে।

পৌসাই ও টিকিলসক ও নিয়মতন্ত্রের দ্বারক ও বাহক। পৌসাইয়ের কাক ধর্মোপদেশ-দান। কিন্তু তাহার এমনি দ্বৈতগা যে ধর্মোপদেশকে সে নিয়মতন্ত্রের অঙ্গগত করিয়াই দান করে। উপদেশের ভিত্তি সম্বন্ধে সে সর্গীয়কে জানাই—

“বাবা, বস্তা-ম-পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, সূর্য-স্বা ইহানীঃ অনেকটা বেশ মধুর হলে মনেছে। যার নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো ক’টা দাস পাড়ার কোম্ব রাখা ভালো। কেননা, নাহংকাতাং গবো বিপুঃ। কোম্বের চাপে অহংকারটোর ধমন হয়, তার পরে আমাদের শালা।”

এখানে ‘ধমে’ই ‘ধমে’র শেষ’ নয়, ধর্ম’ এখানে সম্পদের বৈভূ, ধর্ম’ও কোম্ব দমক প্রবো-বুপনের মতো এখানে নিষমতন্ত্রের বক্ষক। ধর্ম’ বখন নিজ লক্ষ্য বিস্মৃত হয় তখন তাহার মতো ভালাই আর নাই।

বক্ষপুত্রীর চিকিৎসক গ্রাণ বাচাইবার জন্য মাহুথকে চিকিৎসা করে না। মাহুথকে যন্ত্রে গারে বলি দিবার উদ্দেশ্যেই সে মাহুথকে বক্ষা করে।

অধ্যাপক বুদ্ধিহীরা ব্যক্তি। কিন্তু বক্ষপুত্রীর এমনি আবহাওয়া যে তাহার বুদ্ধিটা নিষমতন্ত্রের অঙ্গগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সর্বার প্রকৃতির মতো সে সম্পূর্ণ গ্রন্থ হয় নাই। কেননা, নখিনীকে বেধিয়া তাহার বনে কপে কপে উল্লেখ্যজ্ঞান। নখিনীকে বেধিয়া সে বলে—

“কপে কপে অমন চমক লাগিয়ে দিবে চলে যাও কেন। যখন ঘনটাকে নাড়া দিবেই যাও, তখন নাহয় সাড়া দিবেই বা সেলে। একটু নাড়াও, ছুটো কথা বলি।”

সে বলে—

“আমরা নিজেই নিবন্ধকাম-পতের পতন, বন কাজের মধ্যে সেঁদিয়ে আছি; তুমি কীকা সময়ের আকাশে লজ্জাতাবাটি, তোমাকে দেখে আমাদের জানা চকল হয়ে ওঠে। এগ আমাদের ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে যাও।”

বক্ষপুত্রীর সময় কাজের চাপে ভরাট, কোথাও কীক নাই। নষ্ট কবিবার মতো সময় বাহায আছে, বৃত্তিতে হইবে সর্বতোভাবে নিষমতন্ত্রের অঙ্গগত হইয়া সে গড়ে নাই।

বস্তবাস্তব ও অধ্যাপকের তুলনায় পুণ্যবাস্তব লোকটা এখানে নব্যগঙ্কক। সে এখানকার হালচাল ভালো বৃত্তিতে পারে না। অধ্যাপক তাহাকে বুঝাইয়া বলে—

“পৃথিবীর গ্রাণভরা বৃশ্চিকানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে ওই আমাদের নখিনী। এই বক্ষপুত্রে সর্বার আছে, মোড়ল আছে, বোরাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জ্ঞান আছে, সূর্যকাম আছে, সব বেশ মিল খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেধাপ। চারদিকের হাটের চেঁচামেচি, ষ্ট্রীট-লুপা তবু।”

অধ্যাপকের বিশ্বাস এই যে, কিছুকাল এখানে থাকিলেই পুণ্যবাস্তব বক্ষপুত্রীর জনতার মধ্যে বেশ ধাপ পাইয়া পাইবে।

কান্তলাল ও চন্ডা বাবুদত্তী। বক্ষপুত্রীর জীবনে অজ্ঞান হইলেও দেশের টানটা এখনো তাহারে আছে। নবাবের সময়ে দেশে কিহিবাব জন্ত সর্গারের কাছে তাহার ছুটি চাহিয়াছে। নখিনী বাহাদের মনে উল্লেখ্য জাগাইয়াছে কান্তলাল তাহারে অন্ততঃ। শেষ পর্যন্ত সে নখিনীর নেকড়ে চালিত বিরোধীদলে যোগদান করিয়াছে। নখিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণকে চন্ডা ইধার চক্ষে দেখে। ইহাতে বৃত্তিতে পারা যায়, সে এখনো নারীষজাবলষ্ট হয় নাই। বক্ষপুত্রীর মরনারী সোনার মলে এখনি বণ্ডল ধৈ, সামাজিক মানবের সাধারণ সোফটু হইতেও তাহার্য বসিত।

কিশোর নবাগন্তক খোদাইকর। বন্ধপূরী এখনো তাহাকে গ্রাস করে নাই, তাই সে নশ্বিনীর প্রতি শ্রুতির টান অহুতব করে। সেই শ্রুতির টানে দুঃখাশা রক্তকরবী মূল ভোগায় সে নশ্বিনীকে, পান ভোগায় বেদন বিতপাগল।

বিত্ত পাগল। এক সময়ে সে নিরবতন্ত্রের অধীন ছিল। কিন্তু দৌভাগ্যক্রমে 'অনুই' তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। বন্ধপূরীতে এখন সে বেমানান, সেখানকার লোকে বলে পাগল, কাহিরের লোকে বলিবে মূকপুত্র। এইরকম এক-একটা মূকপুত্র বা পাগল বা ঠাকুরদাস বা বাউল স্বীকৃত্যনাথের অনেক নাটকেই আছে। বিত্তকে সেই পর্যায়ের অন্তর্গত করিয়া বিচার করা উচিত। মূকধারা-নাটকে অভিজিতির সঙ্গে খনকর বৈরাগীর যে সম্বন্ধ, আলোচ্য নাটকে নশ্বিনীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধ বিতপাগলের। দু'জনেই মূকপুত্র, মুক্তিময় দান করিয়া বেড়ানোই তাহাদের কাৰ। তাহাদের মুক্তিরূপে উন্মোচিত হইয়া অভিজিৎ ও নশ্বিনী দুটিহাছে, বন্ধকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া তাড়িয়া কেলিবার উদ্দেশ্যে।

8

নাটকখানি যে কর্ণকরী ও আকর্ষণকরী পভ্যাতার মধ্যে বন্ধমূলক তাহা বুঝাইবার অল্প কবি আবহঙ্গমীকরণে ফলকটোর গানটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বন্ধপূরীর কানে সে গান প্রবেশ করে না, দ্বারদ্বা সর্বতোভাবে বন্ধপূরীর ব্যবহার অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে তাহাদের কানে অস্ত্র প্রবেশ করে না। নাটকটির ঘটনার কাল পৌষ, ফলকটোর সময়, নবাত্মের পর্ব আসন্ন। শীতকাল বেদন ফলকটোর সময়, তেমনি আবার খোদাইকার্যের পক্ষেও প্রণয়—কানের ধর্মের মাধোই স্বপ্নের কারণ নিহিত, কবি তাহার সম্ব্যবহার করিয়াছেন।

একদিকে বন্ধপূরীর খোদাইকরের দল পৃথিবীর অল্প ভের করিয়া সোনার তাল তুলিয়া আনিতেছে আর অন্যদিকে দূরে মাঠের মধ্যে রনিত হইতেছে—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আর যে চলে'। কিন্তু পৌষের ডাক বন্ধপূরীর কাণের কানে ঢুকিতেছে? রাজার কানে ঢোকে না, নশ্বিনী তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সে তনিত পাষ বটে, কিন্তু মাঠে গিয়া সে কি করিবে তাহা পাষ না।

আর তনিতে পাষ বিত্ত কাগলান ও চিত্রা। কিন্তু ইহারা কেহই তো সর্বতোভাবে বন্ধপূরীর অন্তর্গত নহ। সর্দার ও খোদাইকরের দল তনিতে পাষ না, কিংবা তনিতে পাইলেও পৌষের ডাককে একটা আশ্রয় মনে করে, মনে করে যে বন্ধপূরীর ব্যবহারকে পও করিয়া বেওয়াই অসম্ভব উদ্দেশ্য। ইহাতে বুঝিতে পাষ দার পৌষের আশ্রয় হইতে, চাবের ক্ষেত হইতে, তনিত হইতে তাহারা বেহে ও মনে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। স্বীকৃত্যনাথ তাহার শেখরসের অনেকগুলি নাটকে আবহঙ্গমীতের ইঙ্গিতের দ্বারা ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণনীর পীতিকা এক মূকধারার ভৈরবপণী গান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তমূল। রক্তকরবী-নাটকের ফলকটোর গান সেই পর্যায়স্থক।

9

রক্তকরবী-নাটকখানিকে বিশেষভাবে ধ্রুবাসক্ততার নাটক বলিয়া বৈদ্য করিবার কারণ নাই। বক্তোক্তার ধ্রুবাসক্ত একটা উপলক্ষ্য মনে করা চলিতে পারে। ধ্রুবাস্ত বা Industrialism নাটকখানির ঘটনাংশ, কিন্তু ইহার ভাবনাংশ কি? ধ্রুবাস্তের প্রতিষ্ঠার ফলে নিরবতন্ত্রের আভিমন্যে দ্বাভবের দ্বন্দ্ব

কিছু অশাড় হইয়া পড়ে, অশাড় জ্বর কিছপে শুভাশুভবোধকে লক্ষন করিতে থাকে, শুভাশুভবোধ লোপ পাইলে শক্তিবানের নিকটে দুর্বল কিছপে প্রয়োজনসাধনের উপকরণে পরিণত হয়— তাহারই চিত্ররূপপ্রদর্শন এই নাটকের মুখ্য লক্ষ্য। যন্ত্রাবলম্বতা উপলক্ষ্যমাত্র। আরও লক্ষণে বলা হইতে পারে যে, জড়ত্বের সঙ্গে প্রাণত্বের স্বল্প প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। নবীনী প্রাণের প্রতীক, বন্ধপুত্রীর সামগ্রিক জীবন মানবতাব্যাপ্ত বর্ণন করিয়া ঈদের প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। ইহার অমূল্য ইব্রাহীম-নাট্যগ্রন্থে আরও আছে। জান্নৈকবল্যে আতিশয্যে মাহুৎ কিছপ দৃঢ় হইয়া পড়ে অচলায়তন-নাটকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কমতাপিণাচার মাহুৎবে শুভবুদ্ধি কিছপ বিকল হইয়া পড়ে তাহাই প্রদর্শিত মুক্তবারা-নাটকে; আর যন্ত্রাবল্যে অতিবাহিতার মাহুৎ কিছপ প্রাণহীন হয়, নির্মৌখ লোনার তাল তুলিতে তুলিতে মাহুৎ কিছপ জড়পিতে পরিণত হয়, তাহারই প্রকাশ রক্তকরবীতে। তাই যন্ত্রাবল্যে লক্ষ্য না মনে করিয়া উপলক্ষ্য মনে করাই উচিত, মাহুৎবে মনের উপরে যন্ত্রাবল্যে আতিশয্যমাত্র প্রতিক্রিয়াটাই নাটকের লক্ষ্য। নাটক-তিনটির মধ্যে আরও একপ্রকার যোগ বর্তমান। জান্নৈকবল্যে মাহুৎবে চিত্ত কিছপ অশাড় হয় তাহার দৃষ্টান্ত অচলায়তন, কমতালোকে মাহুৎবে জ্বর কিছপ জড়ত্বই হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত মুক্তবারা, আর যন্ত্রাবল্যে ফলে মাহুৎবে কর্মশক্তি কিছপ বিকল হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত রক্তকরবী। রক্তকরবী-নাটকের কর্মগ্রন্থে বেগবান হওয়া সঙ্গেও কর্মগ্রন্থেই কেবলমাত্র বাহ্যিক স্বয়ং-আপন স্বই জাগের অন্তরালে আবদ্ধ। যে যন্ত্র মাহুৎবে কর্মশক্তি ব্যাড়াইয়া দেব বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কবি বলিতে চান, সেই স্বই শেষ পর্যন্ত মাহুৎবে কর্মশক্তি হরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলে। জালাতনিত বাহ্যিক তাহারই দৃষ্টান্ত। জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার পরেই সে পুনরায় আপন কর্মশক্তি করিয়া পাইয়াছে। অচলায়তনের প্রাচীর, মুক্তবারার বাঁধ, আর রক্তকরবীর জাল— তিনটিই প্রতীক; যন্ত্রাবল্যে মাহুৎবে বুদ্ধির জড়তা, ভালোবাসার নিষ্কল জোড়ের এবং কর্মশক্তির বিকলতায় প্রতীক। শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া বুদ্ধি জড়তামূলক হইয়াছে, মুক্তবারাতে বাঁধ ভাঙিয়া অতিজিন্তের দৃষ্টান্ত হইবার অবশ্য জোড়ত্বই এবং বাহ্যিক স্বয়ং জাগের ভালোবাসা পুনঃপ্রবাহিত হইয়াছে— আর বাহ্যিক আপন জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তবেই আপন কর্মশক্তিকে করিয়া পাইয়াছে।)

৬

নাটকখানির পত্রিশাঙ্গী কেহই ব্যক্তিবিশেষ নয়— সকলেই প্রেমীবিশেষ, কেহই ব্যক্তিজন নয়— সকলেই প্রেমীজগের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি মানেই একপ্রকার প্রতীক। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, যন্ত্রাবল্যে ফলে মাহুৎবে বৈশিষ্ট্য কমেই লোপ পাইতেছে। কোনো ব্যক্তি কলকারখানার সহরে গেলে দেখিতে পাওয়া হইবে সহস্রটি একটা বিশাল দ্বারের ছল, তাহার ব্যক্তিব্যুৎপত্তি সমস্তই নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা। মাহুৎবল্যে অর্থই ছাঁচে ঢালা। কারখানার প্রবেশ করিবার মাত্র তাহার সংখ্যার পরিণত হয়। সহস্রত্বের অর্থ যদি মাহুৎবে নির্দিষ্ট স্বত্ব বা গুণ হয় তবে বলিতে হইবে যন্ত্রাবল্যে প্রসারের ফলে সহস্রত্বের নিষ্ঠাই লোপ হইতেছে, আর তাদের ফলে সংখ্যাগুণের উত্তর হইতেছে। সংখ্যাগুণ প্রেমীজগের ক্ষেত্রের আরও নির্ভর, আরও দৃঢ়। এই তাহাট প্রকাশের উদ্দেশ্যই। কবি বন্ধপুত্রীর পাড়াগুলিকে বজা-ন-পাড়া, দুর্বল-পাড়া প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মাহুৎবে

ব্যক্তিগত নামের বদলে সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। বাহাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় নাই তাহারাও নামের দ্বারা পরিচিত নহ, ব্যবসায়ের দ্বারা পরিচিত, যেমন অধ্যাপক গৌসাই চিকিৎসক ইত্যাদি। বিত্ত বণন খোসাইকর ছিল তখন ছিল ৬২-৪, তার পরে সে ব্যবসা পরিভাগ করিবার পরে আপন নামের দ্বারা পরিচিত, তবু সে ব্যক্তিবিশেষ নহ; সে বিভাগগণ অর্থাৎ যে-কোনো পাগল। ফাগুলাল চন্দ্রা কিশোর স্বনামের দ্বারা পরিচিত—তাহারা এখনো সর্বতোভাবে স্বকপূরীর অন্তর্গত হয় নাই, হইলে বিগতনাম হইয়া সংখ্যায় পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই। আনন্দমঠে যেমন সবাই সন্ন্যাসী এবং সবাই একই ছাঁচে সন্ন্যাসী—অর্থাৎ কাহারো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাই, স্বকপূরীতেও অনেকটা সেইরকম আর কি। Regimented হইলে পর মানুষের বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব কর্মদ্বারা সব একই ছাঁচে ঢালাই হইয়া যায়। প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আতিশয্য সবেও স্বয়ং মকরদ্বাজও ছাঁচে-ঢালাই। কেবল নন্দিনীতে বিশিষ্ট গুণ বা ব্যক্তিত্বের কিছু লক্ষণ আছে। কবি তাহাকে একেবারে সংখ্যায় পরিণত না করিলেও বিশিষ্ট গুণ ও ব্যক্তিত্ব বহুদূর সম্ভব বর্নন করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ সে প্রাণের প্রতীক। কিন্তু মানুষ করিয়া গড়িতে গেলে কিছুপরিমাণ ব্যক্তিত্ব না দিয়া উপায় থাকে না, তাই নন্দিনীর গুণকে আরও নির্ধারিত করিয়া লইয়া রক্তকরবী প্রতীকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রাণময় মানুষের নির্ধারিত নন্দিনী, নন্দিনীর নির্ধারিত রক্তকরবী, রক্তকরবী বিভূষিত প্রতীক। এই নাটকের অপর প্রতীক লোহার জাল। লোহার জাল ও রক্তকরবীর মধ্যে ঘন ঘটিয়া শেষ পর্যন্ত লোহার জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারের পূর্বে উদ্ধৃত পত্রখানি স্মরণ করা দাক। লোহালক্কের গজালের স্তূপে চাপা-পড়া রক্তকরবীর চারটি মরে নাই, স্বয়ংগ পাইবামাত্র ছোট্ট একটি লাল ফুল ফুটাইয়া সে বলিয়াছিল—জড় লোহার স্তূপ চাপা দিয়াও আমাকে মারিতে পারিলে ভই; বলিয়াছিল, লোহার চাপে আমার বক্ষ বিধীর্ণ হইয়া রক্ত-স্রবিতোছে বটে, তবু মরি নাই। আর সে কথাটি সে সঘোচে বলিতে পারে নাই ফাঁদা হইতেছে যে, প্রাণের কাছে ঐ জড় লোহার স্তূপেরই পরাজয় ঘটিল। সে অস্ত্রত কঠে নন্দিনীর অর জনিত করিয়াছিল। রক্তকরবী-নাটকখানিতেও শেষ দুহুতে নন্দিনীর অর জনিত হইয়াছে।



“নন্দিনী। (আদের দরবার বা ঘরে) জনতে পাছ ১”

বদলেদ্বারা গঠিত অক্ষর

গান ও গায়কি

ঐক্যমিত্রনাথ সান্ডাল

উত্তরভারতে প্রবণ খেলা টঙ্ক। ঠুমরী এমন কি কছাড়ী শাওন স্থান ঘোষি ও চৈতিয়া শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত মার্জিত গীতরূপগুলির সমালোচনার সময়ে শুদ্ধা ও বিশেষতঃ ব্যক্তিগত গ্রায়ই 'গায়কি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। গানের মত্বলিখে যখন কোনো শুদ্ধ উদাহরণ শিল্পী স্বাধীন অথবা আলাপ-অণ্ডার দিয়ে গীতটির বিশেষ চিত্র ক্ষুটিয়ে তুলতে বিভোর—তখন প্রধান শুদ্ধাধারা পতঙ্গেরে ব্রহ্ম শব্দে হস্ত বলাবলি করতেন, "হা হা ইংকা আওয়াহ, ব্রহ্মলা হা, হা-অণ্ডারভি দ্রুত হা, মস গায়কি ঠিক নহি হা, অথবা "অবে তাই ঠুমরিকা গায়কি এক হা, কিন্তু হোরিকা গায়কি অণ্ড হা" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শুদ্ধাধারা 'গায়কি' বলতে চং মনে করেন না। সম্ভ্রান্তি গীত-ভ-ব্রহ্মলিখিত রূপে এই ক্ষুদ্র শব্দটি তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছিত ও ভাবনাম্পদের মাধ্যমে প্রণিধানযোগ্য হলেই মনে করে প্রবন্ধের অবতারণা করি।

গণ-শিক্ষার দ্বারা এগর্ভ শুদ্ধাধারা শুদ্ধাধার ও অত্যাগ যিহেই চলে এগেছে, এবং চিরকালই এরকমে চলতে থাকবে। বাস্তব গীতরূপ একটি শব্দরূপ। এই শব্দরূপের মধ্যে স ব গ ম প্রকৃতি বয়ের শব্দরূপগুলি পরস্পর আবির্ভূত ও তিরোভূত হতে থাকে; তারই সঙ্গে মিশিয়ে অ আ ক খ প্রকৃতি বর্ধকরূপগুলি বৈশিষ্ট্যগরূপের দিয়ে শব্দ ব্যাক্য ও গম সৃষ্টি করতে করতে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। শব্দরূপ ও বর্ধকরূপ-রূপগুলির সংগ্রহ বা চূর্ণীকৃত অবস্থাকে কোনো প্রতীক বা প্রতিলিপি দিয়ে ধার্যভাবে প্রকাশ করা যায় না। সাক্ষ্য শুদ্ধ মূখ থেকে বা গীতশিল্পীর মূখ থেকে নিঃসৃত হয়ে যে শব্দরূপটি শিখা বা স্রোতার সংবিদের মধ্যে বিশিষ্ট শব্দপ্রতীতি বা শব্দাহুতির রূপ গ্রহণ করে, সেই প্রতীতির বা অহুতির প্রতিনিধি হয় না। অর্থাৎ, একবার শব্দরূপই শব্দপ্রতীতি বা শব্দাহুতিতে পরিণত হয়। এই পরিণতিকে সহজ বাস্তব অবস্থার-পরিণতি মনে করা যায়। সহজ বলেই প্রত শব্দরূপকে শুদ্ধকরণ করাও সহজ অর্থাৎ অসম্ভাব্যসাধ্য। শুদ্ধ শব্দ, কাগজের উপর ছককাটা স ব গ ম অথবা ক খ প্রকৃতি ব্যাপারগুলি আসলে শুদ্ধকরণ, শব্দরূপ নয়। এই শুদ্ধকরণ-শব্দলিকে চক্ষু দিয়ে সংবিদের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেই যে তারা সহজ বা স্বভাবে শব্দরূপে পরিণত হবে এরকম মনে করা যায় না। শুদ্ধকরণগুলিকে শব্দপ্রতীতি শব্দাহুত বা শব্দরূপে পরিণত করতে হলে, অর্থাৎ শুদ্ধকরণ-সাধন করতে হলে, শুদ্ধকরণ-ব্যাপারের মধ্যে কিছু-না-কিছু বিজাতীয় আলোড়ন ও পরিভ্রম হয়। এই আলোড়ন ও পরিভ্রম অভ্যন্তর হয়ে গেলে আশাধার কষ্ট হয় না—এইমাত্র। তবুও এই শুদ্ধকরণ-সাধনকে সহজ সরল বা স্বাভাবিক বলা যায় না। আরও এই যে, যাইবের শব্দরূপ শুনে সংবিদের মধ্যে স্বাভাবিক শব্দপরিণতির ব্যাপারে শব্দরূপের বংশায়ত্ত্ব বিকৃতি সম্ভব হলেও তা স্বতঃস্ফূর্ত মতো নয়। স্বাভাবিক একই শব্দরূপ শোনার কালে সেই বিকৃতিগুলি আপনা থেকেই অন্তর্ধান করে। কিন্তু অবশিষ্ট শুদ্ধকরণগুলিকে শুদ্ধকরণের মধ্যে বিজাতীয়, অর্থাৎ শব্দরূপ, শব্দপ্রতীতি

বা শব্দাত্মকভাবে, ভাষাস্বরূপে কবিতার ব্যাখ্যার মধ্যে বিকৃতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। এবং এই বিকৃতিগুলির সমন্বিত সংস্কার না করলে, অর্থাৎ অন্ত-এক রকমের পরিভ্রম না করলে, ভাষাস্বরূপে প্রতীতি বা অহুত্বের মধ্যে বিকৃতিগুলি থেকে গিয়ে শব্দাত্মকত্বের হুমকি বা বাস্তবতার মধ্যেই পড়তে পারে। ফলে, শব্দের অহুত্ব-ব্যাখ্যাটিও দৃষ্টিতে চলে পড়ে। শ্রীত ভ্রমে গান করার চেষ্টা ও পরিভ্রম এবং শ্রীত না শুনে স্বরলিপি বেধে গান করার চেষ্টা ও পরিভ্রম—এই দুইএক মধ্যে পার্থক্য ও ভেদগত প্রভেদ বুঝতে কষ্ট হবে না।

সাক্ষ্য ভ্রমে শ্রীতের যে আংশিক বা সমগ্র রূপটি প্রতিভাত হয়, ছাত্র বা শিষ্য সেই শব্দগোচরীকৃত ক্রটি দিয়ে গ্রহণ করে, শব্দবৃত্তি দিয়ে ধারণ করে, শব্দাত্মকত্ব দিয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্য উপভোগ করে, এবং অহুত্বগতত্ব দিয়ে কণ্ঠে প্রকাশ করার চেষ্টা করে ও অভ্যাস করে। ক্রটি বা ভ্রম নামের হুমকি ব্যাখ্যা-বাস্তবতা না স্বীকার করলে অহুত্বগত শব্দের সংস্কারবিষয়ে অন্ত-কোনো 'উৎসাহক কারণ' প্রমাণ করা যায় না। 'শব্দবৃত্তি' নামে একটি আশ্রয়-বাস্তবতা স্বীকার করলে যত্নে শব্দ-প্রতীতির কারণ পাওয়া যায় না। শব্দাত্মকত্ব নামে একটি বিশেষ বৃত্তি-বাস্তবতাকে স্বীকার করলে শব্দভ্রমের ভেদ অথবা 'এই হুত্বটি এই গানটি ভালো লাগল—ঐ হুত্বটি বা ঐ গানটি ভালো লাগে নি' এরকম উৎসাহকণের ভেদ ও হুমকি-বোধের কোনো কারণ দৃষ্ট হয় না। এবং অহুত্বগতত্ব বা বাস্তবতা স্বীকার করলে সর্বজনপ্রত্যক শব্দাত্মকত্বগতত্বের মূলকেই স্বীকার করা হয়। অতএব এই চার রকমের ব্যাখ্যা-বাস্তবতা আদর স্বীকার করতে বাধ্য; যদিও হুত্ব-কীট দিয়ে জীবিত বা মৃতের ব্যবচ্ছেদ করে এগুলিকে বেধানো সম্ভব নয়। শিশু ভেড়াবে বাস-না-ভাই-বোনদের কথা শুনে কথা বলতে চেষ্টা করে এবং ক্রমশ অবিকল অহুত্বগত করে, গ্রিক সেইভাবেই ছাত্র গুরু নিকটে উপস্থিত হয়ে গানশিক্ষা করে; এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈষাদ বা মৌলিক ভেদ নেই। এবং গান-শিক্ষার ব্যাপারে এ থেকে সহজ সরল ও প্রস্তুত অন্ত উপায় নেই।

সমগ্র ভ্রমভ্রমকেই 'শ্রীত' বলা যাক। কার্গের উপর লেগে রূপকে 'শ্রীত' না বলে 'শ্রীতি' বললে কোনো ক্রটি নেই, অথচ ভারতের কিছু-প্রাচীন শাস্ত্রকারের পরিভাষাকেও প্রভা করা হয়। এবং শ্রীতিকে শ্রীতরূপে অভিযুক্ত করার কার্যকে 'গান' বা 'গান করা' বললে যদি একই ব্যাকরণের প্রতিশব্দপাত করা হয়, তাহলেও ভ্রম বা দ্বিগত হওয়ার কারণ দেখি নে বর্তমান পর্যন্ত পড়িয়ে অর্থবোধ হয় এবং শ্রীতি, শ্রীত ও গান শব্দগুলিকে অর্থত এটাকে গুরু যাতে চাপিয়ে দিয়ে যথোচ্ছাসের না করা হয়।

এখন গুণ্যসংগে কথা ও ইচ্ছিতে 'গায়কি' বলতে যে অভিপ্রায় উদ্ভাব করা যায় তা আলোচনা করে পরিকৃত করা সম্ভব হবে।

সংগম প্রভৃতি শব্দভ্রমের বিশিষ্ট বিভ্রাস এবং অক্ষরগুলির বিভ্রাস বা বাঁধনি অবিকল ও নিশ্চিত বেধেও গান কীভাবে একই শ্রীতির কিছু বিভিন্ন শ্রীতরূপে ছুটিয়ে তোলা যায়। এই ব্যাখ্যা ভারতে বহুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রত্যক হয়ে আসছে, এখনও হয় এবং পরেও হবে। কণ্ঠে দেখিয়ে দিলে এই ব্যাখ্যাটি স্বহৃদে ও হৃষ্ট সত্য বলে প্রত্যক হয়। লিখে আলোচনা করে এই ব্যাখ্যাটি প্রত্যক জানানো যায় না, কিন্তু বোঝানো যায়। অর্থাৎ এর মধ্যে কোনও mysticism বা হি-টিং-হুট নেই, যায় দলন কথা ছুটাই হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক শিষ্য একই গুণের নিকটে একই ক্রমবর্ণনা দিচ্ছিলেন। সুতরাং তাতে পক্ষে সেই সীমিত নিবন্ধ, অর্থাৎ আটপুঠি বাদ্য। বলা যায় যে, সকলে একই সীমিত শিক্ষা করেছেন। পক্ষ, ছাত্রগুলি তার সীমিতগতি অভিব্যক্তি কথার সময়ে শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে সীমিত অভিব্যক্তি ও অবিকৃত অর্থকরণ করলেও দেখা যায়, একজনের কৃতিত্ব সীমিতগতি গ্রাণবান ও উচ্ছল হয়ে উঠেছে এবং স্তম্ভ একজনকে ধোঁয়াশযুক্ত ছোট ও অবিকৃত অর্থকৃতি সত্ত্বের সীমিতগতি নির্ভর ও নিম্নতম। কঠোর মাদুরের তারতম্যই এখন হবার কারণ এ রকম সিদ্ধান্ত করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। হঠাৎ দেখা গেল, পঞ্চমিক মূরুর কঠোর নির্ভর রূপটি অভিব্যক্তি হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত সাধারণ, এমন কি কিছু রকম কঠোরের, গায়কটিই গ্রাণবান ও উচ্ছল রূপটি প্রতিষ্ঠাত করেছে। কঠোর মাদুর ও সীমিতগতির অভিব্যক্তি বা ঔজ্জ্বল্যের এমন কোনো অব্যক্তিরই সমস্ত পাওয়া যায় না বা খোঁজ মনে হয় যে, মাদুর মূরুর কঠোর উত্তম সীমিত হতে পারে অথবা অমূরুর কঠোর কখনোই সীমিতরূপ সার্থক হয় না। এর দুইজনে হলেন, বিশদায় রাও ও মহিমাবান। দুজনই অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন ছিলেন (ইংরেজি ১৯১২ থেকে ১৯১৩)। মহিমাবান কঠোর অত্যন্ত মূরুর এবং বিশদায় রাওজির কঠোর সত্যসত্যই রকম ছিল। এই দুজন সীমিতগতিকে বহুবার ক্রমবর্ণনা-গামার গান করতে শুনেছি; এবং বর্ণনায় (composition) গামার গান করতে শুনেছি। কিন্তু এই বিশেষণটি আর কারও ভাগ্যে ঘোটে নি। পরে, ১৯১২ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, মূরুর চন্দন চৌবেজির গামারও অনেকবার শুনেছি। এর কঠোর অত্যন্ত রকমের মূরুর ও বসন্তালী ছিল। এ দুটি গুণ একত্রে পাওয়া বিরল। তার গামারের পার্থক্য ও অন্তর্ভুক্ত্যের ছিল। তবুও বেশ মনে পড়ে যোগজির পার্থক্যে এমন-একটি দীর্ঘ বা চমক ছিল যা চৌবেজির গামারের পাই নি। বীজগতি ও সীমিতগতির সর্বদেও অল্পতম দুটোর পাওয়া যায়; বা খোঁজ মনে হয় যে, মাদুর কঠোর সীমিততা থাকলেই সীমিতের উচ্ছল গ্রাণবান সার্থক বা চমক রূপ অভিব্যক্তি হয় না, তার সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন আছে।

নির্ভর হোক বা সত্যিই হোক, যে-কোনো সীমিতগতকে সীমিত মনে করে আশ্চর্য্যজনক লাভ করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে নানা কারণে। কিন্তু বর্ণনা অল্পতমী ওস্তাদ সমালোচক কেবল সেই সীমিতগতকেই পার্থক্য-সম্পন্ন মনে করেন যেগুলি উচ্ছল রক্তির সীমিতকর ও কাম্য রূপে দেখা দেয়। সীমিতগতের মধ্যে এই গুণগুলির আবর্তিতবে এক কথায় 'বর্ণনা-কারসম্পত্তি' বলা যায়। বসন্ত রক্তের রূপসীমিত হ'ল, বহাযোগ্য ভাবে ও প্রদায়নের কৃতিত্ব ছাড়া তার রূপের বিশিষ্ট ও চরম অভিব্যক্তি হয় না। টিক সেই রকম সীমিত বসন্ত রক্তই হোক, গানের মধ্যে বর্ণনা-কারসম্পত্তি না থাকলে সীমিতগতের সৌন্দর্য বিকশিত হয় না—এজন কথা প্রাচীনতম সীমিতগতসিদ্ধি মহাত্মা নিতান্ত বলে গিয়েছেন।

বসন্ত গান ছাড়া সীমিত নিশা হয় না, তবু গানজিয়ার মধ্যে এমন-কিছু বিশেষ ব্যাপার ঘটে যার ফলে সীমিতগত প্রাণের প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং রূপটি প্রত্যক্ষ হৃদয়ের মতো বিকশিত হতে থাকে। যেমন লতার মধ্যে সপ্তক আনন্দিক ভাবসম্পন্ন, পাণ্ডুরোপাধিকারের মধ্যে প্রাণবন্ত হতে হতে উপযুক্ত মুহুর্তে ক্রমাগত ও সমস্তভাবে হৃদয়ের রূপে পরিণতি লাভ করে এবং তার বর্ণনায়ের সমাবেশ

ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মনিবেশন ক'রে একটি বিশেষ আকাজ্ঞার চরম পরিচয় লাভ করে, সেইজন্য গীতশিল্পীর স্বভাবের ভাবী গীতেরও একটি বিশেষ আকাজ্ঞা থাকে— যে আকাজ্ঞা একটি বিশেষ তৃপ্তি বা পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করে। সেই গীতির গুণ ভাবসম্পদগুলি গানের ক্রমাবিকাশে কাব্যরূপের মধ্যে সঞ্চারিত হতে হতে গুণসমূহের গীতরূপে রূপায়িত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ও সন্দেহভাবের স্বয়ং-সং-ভবের সমাবেশ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আত্মনিবেশন ক'রে চরম পরিচয় ও সার্থকতার পথবিশিষ্ট হয়। গীতরূপের মধ্যে ভাবগুলি উজ্জল ও শ্রীতিবদ্ধ হয়ে ফুটে উঠলে তারা প্রোতাহর চরমের সমান বা সঙ্গ ভাব ও অঙ্গভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সেই বিশিষ্ট ভাব ও অঙ্গভূতিকে জাগিয়ে তুলতে গায়ক সেই গানের চরম ফল বা একমাত্র সার্থকতা। অতঃপর স্বয়ং-ভাল-পদ দিয়ে গান করে গীতের একটি তৃপ্তি-স্বাদের খেলা বজায় রাখে যায়। কিন্তু মাত্র খেলা বজায় রাখাই সেই গীতির পূর্ণ অভিযান্ত্রিক নয়, গীতশিল্পীরও চরম লক্ষ্য নয়।

গানক্রিয়ার মধ্যে যেমনকি বিশেষ ব্যাপার খটলে গীতির বর্ধার স্বরূপ পূর্ণ বিকশিত ও উজ্জল হয়ে দেখা দেয়, যার মতাব হলে গীতরূপ গান ও স্বরবর্ধক বলে বোধ হয়, সেই ব্যাপারগুলি সমগ্রভাবে 'গায়কি' শব্দ দিয়ে সূচিত করা যায়। প্রকৃতভাবে বলা যেতে পারে, গায়কি কতকগুলি 'কোনো' বা technique— যার মধ্যে একান্ত ও বিশেষ ভাবে গীতরূপকে ফুটিয়ে তোলার রহস্য নিহিত আছে। সুখে গান করা, শব্দ বা শব্দগুলি সুস্থর উচ্চারণ করা এবং বিস্ময় দিয়ে গীতির ছন্দোময়ী রূপ প্রকাশ করা— এগুলি ব্যাপার সাধারণ অর্থ, থাকে ওস্তাদবা 'খানাপুরি' বলেন। গায়কি এসেও অতিরিক্ত এবং একটি বিশেষ ব্যাপার। এই বিশিষ্টতা তখনই সূত্রে পাবি, যখন সেমি অল-সর স্ববিস্মৃতি হয়েও, পরবর্তীকৃত বিকৃতি বা অস্পষ্টতা হয়েও, এমন কি মাত্রাশ্লোপ বা ছন্দোভঙ্গ হয়েও গীতরূপের বিশিষ্ট অভিযান্ত্রিকি সত্ত্ব হচ্ছে; স্বয়ং, স্বয়ং-ভাল-পদের সৌন্দর্য্যটিকে ঢেকে গীতরূপকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা গায়কির মতোই আছে। এই শক্তির পরিচয় পেলে আমরা বলব। করতে পারি, স্থিতি বটে যথোপযোগ্য স্বয়ং-ভাল-পদ দিয়ে এবং বিশেষ গায়কির সাহায্যে গান করলে গীতরূপটি কত সুস্থর ও বিশিষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারে। ভাগ্যবান শিল্পী তিনিই, যিনি স্বীকৃতির কোনো-কোনো মুহূর্তে এইকরটি ব্যাপারের সহযোগে চাকনিমিত্তির কোণদ্বারা সূত্রী করবার ছলে অপর গীতসূত্রী বচন। করতে পারেন। মাত্র তখনই আত্মদেব, স্বর্গ্য প্রোতাহর, যনে উদয় হয় 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী'। গান কে না করে? কিন্তু গুণী, তোমার গানের মহিমা, তোমার কোণদ্বারা বস্ত্র! কোনো বস্তুকে গান করে যাহোক একটা গীত হয়। কিন্তু একমাত্র কোণদ্বারা দিয়েই স্বর্গ্য গীত বা সার্থক গীত হতে পারে। মাত্র গান করা স্বাভাবিক হতে পারে, এবং পাগলও গান করে। কিন্তু কোণদ্বারা তৈরী করাটাই art বা কৃত্রিম চাকনিমিত্তি— মাত্র গায়কি বলে, খান। হলে গীতের অপর সূত্রী হয় না।

গায়কির অধিকার খুবই ব্যাপক ও বিচিত্র। অগতঃ যেখানে গীতি ও গীতশিল্প আছে সেখানেই গায়কি আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে অলংকার ভাষা ও গানের খেলা গদ্য আছে। নিশ্চিত সঙ্গীত বা প্রসিদ্ধ যোগ বা melody ছাড়াও অলংকার ও উচ্চ স্বর-সঙ্গীত আছে। ছন্দ ও তালেরও দেখ নেই। একথা ভেবে যেখানে বোকা যায়, গুণী বা শিল্পী কত বিচিত্র সংস্কার ও গায়কির কোণদ্বারা দিয়ে নিত্যনব চাকনিমিত্তির প্রয়োগ করতে পারেন।

ভারতের কথাই বলা যাক। এখানে এমনও গীতচেষ্টা আছে, যাতে গীতির পদমর্যাদা একেবারে নেই বললেই হয়; এজন্য ক্ষেত্রে রাগের গায়কিই শিল্পীর কল্পনার প্রধান হয়ে উঠতে হয়। ফলে, রাগের গায়কি ও গীতির গায়কি হৃষ্টচিত্তে শুধু ক্রেত্রেতে গড়ে উঠেছে। গীতি আছে অথচ তার প্রাণ্য পদমর্যাদা বেঁধে দেয়া হচ্ছে না, এজন্য ক্ষেত্রে শিল্পী যে ছপ অভিব্যক্তি করেন তাকে 'গীত' বলা সংগত কি না, এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করব না। এরকম গীতচেষ্টার দুটোই প্রথম খেয়াল ও টম্মা; 'টম্মা' অর্থাৎ পাঞ্জাবি ভাষার টম্মা। এসকল ব্যাপারে গীতিগত পদ ও ভাবের মূল্য না বেঁধে দেয়া হলেও গীতরূপের মধ্যে রাগের যে সমাহিত ও স্থির অথবা উচ্চাঘ ও চলমান মূর্তি বিকশিত হতে থাকে, প্রোতাহিনেশের উপর তার ঐকান্তিক বিশিষ্ট ও অকৃত প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অন্তরিক, এমনও গীতচেষ্টা হয়েছে যাতে গীতির অন্তর্নিহিত অর্থ লক্ষণ ও ব্যাখ্যা, এক কথায় সুপ্রতীত ভাবলক্ষ্যই, প্রধান ও বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্তি হয় এবং প্রোতাহিনেশের বসুধা মনের মধ্যে অকুণ্ঠিত হয়। এরকম প্রচেষ্টারও বহু ভেদ দেখা যায়। উত্তরভারতের পাশ্চাত্যধর্মে টুমরি ও গজল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্যধর্মে, অর্থাৎ বাংলাদেশে, এরকম গীতচেষ্টার অপূর্ণ ও অস্পষ্ট সূত্র দেখা যায় পরকীর্তনগীতের মধ্যে এবং কাব্যবহুগীতের মধ্যে। পরকীর্তনে রসের অহুত্ব, উল্লাস ও পরিবেশই কাম্য বলে মনে করা হয়। এই শিল্পেরাণ্য ও প্রচেষ্টার অহুত্ব গায়কিও শিল্পকলায় লক্ষ্য হয়ে আছে। বাংলাদেশের কীর্তনগানের গায়কিকৌশলের তুলনা পাওয়া যায় না। এর নিমিত্ত এতই স্থল মনোজ্ঞ ও লক্ষিত যে, গানের প্রবাহিত্য ও মাত্রার তারতম্য অভিকৃত ও অবশুণ হয়ে যায় এবং অভিব্যক্তি গীতরূপের মধ্যে তা কলকের ছলে গুণ হয়েই দেখা দেয়। গানের রসবোধ বা রসদৃষ্টির অভাব অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সুপ্রথর, তাঁদের কানে কীর্তনগীতের বা গায়কির গুণগুলিই কল হলে দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকের বসুধা দৃষ্টিতে হৃদয়ী ঠোঁটের নীচে তিলটি রসমাখা মুষ্টি তুলছে কি না ততটা গোচর হয় না; সেই তিল আঁচিলের পর্দারত্ব, না, অল্প চর্চাবোধের প্রেক্ষিত, এই চিন্তাটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কবি ও চিত্রশিল্পীরা চোখে সেই তিলটির মূল্য একেবারেই অজ্ঞান; তার অস্তিত্ব ও অবস্থানের মর্যাদাও সম্পূর্ণ বিহীন। সেরকম, লজ্জার বা রসজ্ঞ প্রোতাহিনেশ পক্ষে কীর্তনগায়কির দোষগুলের মূল্য নির্ধারিত হয় গীতরূপের রসাতিক্তি ও কাব্যরাস দিয়ে। বলা বাহুল্য, কীর্তনের গায়কি গুরুশিক্ষারূপে ও সাহুত্ব সাধনার দ্বারা একটি নিম্ন বিশিষ্ট ও সজ্জ গায়কিগীতে পরিণত হয়ে আছে এবং এর পরিবর্তন করে কোনোরূপ উন্নতিসাধনের প্রয়োজনও নেই, অবকাশও নেই। মহাজনপরাধনীর রসভাবময়ী গীতির সঙ্গে কীর্তনগায়কির সম্বন্ধ এতই নিগূঢ় ও ঐকান্তিক যে, সেখেকে প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে গেই সেখেকে লাঞ্জে দাখা বা তেলে ভুঁষিয়ে বন্ধ করার চেষ্টার যে উৎকট ও বীভৎস পরিণতি হয়, পরামর্শকে গায়কি থেকে বিচ্যুত করে প্রথম-খেয়াল-টম্মা-টুম্মা-সিনেমা-গায়কির প্রসাধনে যুক্ত করে গান করলে সেইরকমের কল-পরিণতি হয়।

কীর্তন বাধ দিয়ে এবং লাড়ি-বাউল-মুসুর-ভাটিয়া-হাওরাসারী নামের ছক-কাটা গীত-রূপগুলিকে বাধ দিয়ে বালার যে অজ্ঞান গীতরূপ পাওয়া যায়, সেসকলের মধ্যে ভাবুত্ব বা ভাবলক্ষ্যই প্রধান ও বিশিষ্ট; কোনো রসের সূচনা বিরল অথবা অপ্রধান। এক-একটি গীতি যেন মূচ্ছক, ধার মধ্যে,

বহুভাবের পাঁচদেশালি মধু পাণ্ডা ঘায়। একটিকে আমি 'কাব্যবদ্ধ সীতি' নামে অভিহিত করেছি, কারণ কাব্যগুলি মধুর ও বিভিন্ন ভাবেই সমাহারই এর বৈশিষ্ট্য; এবং বিশিষ্ট রূপের স্ফোতনাই স্বপ্রধান। এইজাতীয় সীতির সম্বন্ধে মহাত্মা তরুত সুবিচার করেই 'কাব্যবদ্ধ' নাম দিয়ে গিয়েছেন, সে কারণে আমি ঐ নামটি অব্যাহত করে অল্প কোনো আধুনিক নাম দিতে ইচ্ছা করি না। সম্ভ্রুতি 'রাগপ্রধান' 'কাব্যপ্রধান' ও 'আধুনিক বাংলা' গান নামে যে পরিভাষা ও শ্রেণী স্থাপিত করা হয়েছে, তাই মধ্যে কোনো সংগতি বা যুক্তি খুঁজে পাই নে। অসংগতি পাওয়া যায়, যেমন 'রাগপ্রধান' গানকে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা টপ-বেঞ্চাল বা টম্বার শ্রেণীতে রাখা যায়। নতুন করে 'রাগপ্রধান' শ্রেণীর প্রয়োজন কি? বাংলাভাষার কি ক্রমবর্ধমান বেঞ্চাল বা টম্বার সীতি হয় নি বা হতে পারে না? যেভাবে ধরন ঘোষণা করা হয় 'এখন রাগপ্রধান গান...' তখনই মনে হয় ইতিপূর্বে যে অমূলক ক্রমবর্ধন বা খেলায় গাইলেন সেগুলি কি 'অরাগপ্রধান'? 'কাব্যপ্রধান'-লক্ষ ও 'কাব্যবদ্ধ'-লক্ষ একার্থক। একেই মধ্যে 'বদ্ধ'-লক্ষটি বিভ্রান্ত ও বিশিষ্টরূপ ঘটনা করে বলে 'কাব্যবদ্ধ'-লক্ষটিই উত্তম। 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটির মধ্যে মাত্র দুটোই ইঙ্গিত আছে, কোনোবাক্য বাধুনি বা বিভ্রান্তবিশিষ্টের লেখন্য ঘটনা নেই। বলা বাহুল্য, কথিত 'আধুনিক' গানগুলির সীতি ও সীতরূপের আলোচনা করলেই দেখা যায়, সীতি-অংশটি নিছক 'কাব্যবদ্ধ' এবং সীতরূপগুলি একাধিক রাগের মিশ্রণ, রাগবলিত ব্যাপার নয়।

অতএব কাব্যবদ্ধ শ্রেণীটিই বলায় থাকে। কোনো বিশেষ রাগকে গায়কি দিয়ে ছুটিয়ে তোলা আদৌ এর লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য হল স্বর-লম্বায়েণ দিয়ে সীতির বিভিন্ন ভাবগুলিকে অভিযুক্ত করা। এইরকম ভবিষ্যৎ করনাই সীতিরচর্চা ও সীতিশিল্পকে অমূল্য, এমন কি কিস্ত, পতীকা প্রদত্ত করে। ফলে, এ দু'গের সীতবদ্ধ-রাগের free-lance কবি ও সীতিশিল্পীসহ, যে কারণেই হোক থারা কবিতার নিয়ম বা গায়কি নিয়ম-ধর্ম পালন-গোষণ করতে অনিচ্ছুক, কাব্যবদ্ধ সীতির রচনার তীক্ষ্ণ করতে বাধ্য দেখা যায়। কাউকেই অস্ত্রের নিয়ম মানতে হবে না, কোনো গায়কির নিয়ম পালন করতে হবে না; এতে অস্বস্তি স্বাধীনতা ও আনন্দ লক্ষ্যে নেই। প্রত্যেকেই নিজেকে হয় Schubert, নাহয় Wagner না হয় Schonberg মনে করতে বীতিমতো প্রস্তুত। পরীক্ষা করে দেখাই হল মূলমন্ত্র।

এই পরীক্ষা ও কল্পনাবিলাস কিছুমাত্র সোয়েব হয় না বতকণ পবন সৌন্দর্যসুখী আনন্দিক নিয়মগুলি ভঙ্গ না হয়। কিন্তু সৌন্দর্যসুখীই হৃদয়ের পূর্ণাঙ্গার পরিচয় ও স্মৃতির অংশীদার করে। এককথায়, একটা সৌন্দর্যসুখীর সত্য্য আছে— যাকে অথেষ্টে পরিচয় করতে হয়। এই সত্য্যটি সুতীক্ষ্ণ ও, সুদৃষ্টি থাকলে, পরে কল্পনা বা পরীক্ষা দিয়ে সীতরূপের নিভা-নব ইঞ্জিনালরচনা সম্ভব হয়; মতো মাকড়সার আল রচনা হয়। মাকড়সার আল ও কথাটি বোঝে বাতালে স্বতন্ত্র করে। সীতরূপের বিকাশ দিয়ে থোকা যায় কিত্রণ ও কতখানি সৌন্দর্যের অমূল্যুতি ও প্রেরণা দিয়ে আলরচনা হয়েছে।

এ দু'গে কাব্যবদ্ধ সীতির বহু ইঞ্জিনালিক হয়ে গিয়েছেন। কাব্যবদ্ধ সীতের পরীক্ষা ও প্রচলন হয়েছে। নাটো দিনেমায ঘরোয়া-বৈঠকে যেভাবে বিশিষ্ট-কলার কাব্যবদ্ধের উদ্যম পরীক্ষা চলছে। এতদিনে এর গায়কি নিশ্চিত বা নির্ণায়িত হওয়ারই কথা। কিন্তু একমাত্র স্বাধীনসীতি ছাড়া গানকৌশল

বা পার্যকির কিছুমাত্র নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রস্বীতির স্বীকৃতগুণি দীর্ঘভাবে আলোচনা করলে তাবের ভিতরে বিশেষ পার্যকি ও গূঢ় সৌন্দর্যপূর্ণতা পাওয়া যায়। এগুলি এতই বিশেষ ও অস্বাভাবিক, এতই সফল যথেষ্ট সংগে যে, অতি সামান্য পরিবর্তন করলেই এদের স্বীকৃতির মারুৎ ও বৈশিষ্ট্য ক্ষয় হয়ে পড়ে। 'আমি' নিজে কিছু কিছু রবীন্দ্রস্বীতির স্বীকৃত্য এবং অল্প অনেক কাব্যবৃত্ত স্বীকৃত্যের পরীক্ষা করে দেখে এতদূর কথা বলতে সাহস করি। পরীক্ষা করেছি স্বীতির স্বর-শব্দ-তালবিভ্রাসের বহুদ-কেন্দ্র করে নয়, পার্যকির অগ্রবাহ বা আব্দুল পরিবর্তন করে। স্বীকৃত্যের সুখমা ও দৌলুহাধই কিছু হোম বা অজ্ঞান বস্তু নয়। তা যদি হত তবে মাটি বা পাথরে গড়া ফুলেরই বেশি আদর হত।

স্বীকৃত্যের বা যে-কোনো রূপের লাভ্য সৌন্দর্য বা সুস্বাদুরতার বিশ্লেষণ হয় না। কিন্তু যেসকল ব্যাপার দিয়ে ঐ গুণগুলির প্রকাশ সম্ভব হয়, সেই ব্যাপারগুলি পরীক্ষার যোগ্য। পরীক্ষা হয়েছে বলেই প্রসূতে কাব্য চিত্রশিল্প ভাষ্যশিল্প ও স্বীকৃত্যের সমৃদ্ধি হয়েছে। রবীন্দ্রস্বীতির স্বীকৃত্যগুলি যে অত্যন্ত সুস্বাদু, তাদের স্ত্রী ও সুখমা কোনো বস্তু বিজাতীয় পার্যকির স্পর্শমাত্র সম্ভব করতে পারে না—এ কথা শুধু সত্য নয়, যেসকল আধুনিক উদ্যোগগামী শিল্পী রবীন্দ্রস্বীতি নিয়ে বেলা করবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তাঁদের স্বকোণোল্লসিত পার্যকি দিয়ে রবীন্দ্রস্বীতির উচ্চতর স্তর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, সেইসকল free-lanceদের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যতো অগ্রিম কাম আর কিছু নেই। প্রসূ হতে পারে রবীন্দ্রস্বীতি এত স্পর্শবিহীন কেন? প্রসূর যদি উত্তর নাও পাওয়া যায় তাহলেও ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রস্বীতি ও স্বীকৃত্যগুলি পরীক্ষা করে দেখে উক্ত প্রসূর এককম উত্তর পেয়েছি। খুব সোজা করে বলতে গেলে স্বর্গের তিলোত্তমাকে নিয়েও ধান্ন ভানিয়ে নেওয়া যায়; সেজন্য অবস্থার নিশ্চয়ই তিলোত্তমার অল্প বস্তু স্ত্রী, বা হস্তস্ত্রী, ফুটে ওঠে। কিন্তু তিলোত্তমার ভঙ্গলগণ্য ঢেঁকিতে গাড় দিয়ে ধান ভানবার পুত্ৰস্বয় সৃষ্টি করবার সম্ভব হয় নি। ধানভানা-পুত্ৰস্বয়ের স্থল্যতা বা চমৎকৃতি সৃষ্টি করবার জন্য অল্পবস্তুকে পার্যকি-বিধান বা অগ্রব-সংস্থানের প্রয়োজন। আবার তিলোত্তমার হাতে খড়্গ ত্রিশূল দিয়ে যৌস্মৃতি করনা করা যায়। তবুও তিলোত্তমার ঘোড়িনী রূপটিই সহজ ও অভিজ্ঞত, কহাণী স্মৃতিটি কহানাবিলাস বলতে হবে। উপমা ছেড়ে এবার বাস্তব স্বীতি ও স্বীকৃত্যে আসা থাকে।

দ্বৈতগুণস্বয় 'নিশীথ রাতের বায়লগায়' স্বীতিটি আলোচনা করা যেতে পারে। স্বীতিটির গূঢ় সৌন্দর্য হয়েছে ধনি বা বাঙালি মধ্যে, আভিধানিক অর্থ বা যোগজ্ঞানী লক্ষ্য বা indicationএর মধ্যে নয়। 'নিশীথ রাত' ও 'বায়লগায়' কথাগুলির আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট হলেও কবি এই অর্থপ্রকাশমাত্র লক্ষ্য করে নয় রচনা করেন নি। এজন্য স্পষ্টার্থ থেকেও অল্প অভিন্ন ইঙ্গিত বা লক্ষ্য সংগ্রহ করা যায়, যথা অবিস্ময় অবিরল বর্ধনের বিব-কিম্ব, যুগ্মাফানো গান, নবরূপ বা অস্বৃষ্টি। কবি এই লক্ষ্যার্থকেও লক্ষ্য করেন নি, অর্থাৎ লক্ষ্যপ্রয়োগ করেও কান্দন নি, আরও একটি সূক্ষ্মতর বস্তু বা ধুনিকে প্রকাশ করেছেন নিশীথ রাতের তরু-পত্নীর নিকমসাহস, তরুতীতি নির্বেদ-নিঃশব্দ পরিচয়, অন্ধকার ও বায়লগ্রপাতের কায়াবৈঠা—এসকলকে ভেদ করে উত্তীর্ণ হয়ে অভিক্রম করে কবির আত্মা একটি অপ্রাকৃত ধনির গোপন-অভিধান ও বিলম্বের অসুখী রচনা করেছেন। বাইরের অন্ধকার হৃদই নিবিড় হোক, তার কমতা নেই এই অপ্রাকৃত ধনি-রূপকে আকৃষ্ট করে বা চির-মাকামিত অভিধানে প্রবৃত্ত করে; ধারাগ্রপাতের শক্তি নেই গোপন-অভিধানের ক্রমাগত স্ব-স্বাধীকে অবলুপ্ত করে। সমগ্র স্বীতির মধ্যে বিশ্রলভ ও আদার সূক্ষ্ম

ধ্বনিগুলি অশেপাকৃত শুল ও শীত জাতীয়ের স্বরকে স্বরকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অসংখ্য কবিপ্রতিভা জাতীয়ের মধ্যে তুমি গিয়ে যে অসংখ্য অসুস্থ ও ধ্বনিরূপ লক্ষ্য করেছেন সেই অসুস্থ ও ধ্বনিরূপের দৃশ্য অসুস্থগণই এই লক্ষ্য-বিভাগের মধ্যে। 'নিশ্চয় রাতের বায়ল দ্বারা'— বস্তু এই একটি চরিত্রের মধ্যেই সেই অসুস্থগণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়ে আছে: স্বর-তাল-গানের গুণমিত, গায়কস্বরের বিশেষত্বের মধ্যে, গায়ক-প্রতিভার সহজ স্বর উদ্ভবের মধ্যে। এই প্রতিভা স্বরীক্সনাথেরই প্রতিভা। প্রতিভা সেই গুণ ও শক্তি, যা ইতিপূর্বেই স্বর ও সৌন্দর্য্যের সংস্কার সঞ্চিত ও আশ্রিত করে বেবেছে, যা শব্দ ও কণ্ঠকে করে স্বর-অসুস্থ উচিত-অসুস্থের বাছাই করে না। অপরিণতিগত স্বর প্রতিভাই বিভ্রান্তের বলকের মতো। একনিমেষে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য উদ্ভবিত করতে পারে।

কবি-মনের নিষ্ঠুর গুণ থেকে এই গীতি যে বিশেষ ধ্বনি বহন করে এনেছে, তার একমাত্র সার্থক ভগ্নটি ছুটে উঠেছে তার গীতরূপের মধ্যে। এখন যে-কোনো কৌশলী বা পামখোশী শিল্পী গায়কির পরিবর্তনসাধন করলেই বৃত্তে পারবেন গীতরূপের কিরকম অনতিপ্রস্তুত পরিবর্তন এসে পড়ে, গীতির ধ্বনিরূপটির কতখানি উচ্ছেদ ও অবলোপ হয়। কিন্তু ধ্বনিরূপটি নিয়ে অসুস্থ কবি আসল কথা। ধ্বনিরূপটির অসুস্থ না হলে এই গীতিকে রামপ্রসাদী স্বরের ছকে কেলে গান করা অথবা কোনো প্রচলিত রূপ-বেয়াল-বেয়টা-পল্লব বা বাহো-একটা-কিছু দিয়ে হয়ে তলে গান করা একই কথা। অর্থাৎ, মনে হবে, 'কেন, এও তো একরকম বেশ লাগল মনেই বা কি?' স্বর-তাল-গান তো বেশ ছুটে উঠেছে'। রূপ-বেয়ালের শিল্পী নিজেই ইচ্ছা ও কল্পনামতো এই গীতি গাইবার সময়ে 'চোড়' 'মোড়' 'বোড়' 'গমক' 'খুকা' 'মুত' প্রভৃতি গায়ক কৌশল অথবা ভাগবান-গুণহারা-বান্ধু প্রভৃতি বাস্তব গায়ক ছুটিয়ে তুলতে পারেন সন্দেহ নেই। অগতঃ ছুটে ওঠার স্বর নেই, লক্ষ্য ও ছুটে ওঠে চান-বসন্ত ও ছুটে ওঠে। আসল কথা, গায়কের অসুস্থগণ কি রকম ছুটে ওঠা আসা করে সে সম্বন্ধে একই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এবং ছুটে ওঠার গান বা লক্ষ্য লক্ষ্য এই গীতির দৃশ্য ধ্বনিটি বেঁচে থাকে কি নিশ্চয় হয়ে যায়, এও অসুস্থ গীতি বিভ্রান্ত করতে হবে।

'নিশ্চয় রাতের বায়ল দ্বারা' গুণ ধ্বনিকে বাস দিয়ে তার অস্তিত্ব ও লক্ষণীয় ব্যান করেও স্বর ও গায়ক বেওয়া যায়। বস্তু নিশ্চয় রাতের বায়ল দ্বারা তিম্‌তিম্‌ শব্দ ও বহু-বহুসংখ্যের বিভিন্ন উল্লাসকে (শব্দীয়ভাবে ছুটি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ) অথবা তার সঙ্গে কথোপকথন ছাউনির উপর ধ্বনিত্বের দ্বারা অসংখ্য শব্দ এবং গানের পাশেই বড় বড় মানসাত্মক উপর বৃত্তিপাতের তুল-কোলাহল (গৃহপ্রান্তে ত্রিবিধিধ্বনের পারিপার্শ্বিক) ইত্যাদি লক্ষণও বেছে নেওয়া যেতে পারে। এবং শাস্ত্রাত্মক harmony-discord বা tonic-counterpoint এর বিভিন্ন সনাক্ত ও গায়ক নিয়ে ঐকল লক্ষণীয় অসুস্থ ধ্বনি-বিকাশ-বৈশিষ্ট্য বা cacophonyর অসুস্থ চিত্র ছুটিয়ে তোলা যেতে পারে। কোনো উদাহরণ শিল্পী যদি এতদূর cacophonyর প্রাকৃত আদর্শ খোঁজেন, তাহলে তাঁকে বেশি দূরে নয় গুণিগায়ক বা এককিম্বা নিশ্চয় অস্তিত্ব সন্ধান করতে বলি। সেখানে তিনি একসঙ্গে সমস্ত লক্ষণগুলির প্রাকৃত স্বরূপ পাবেন। ইচ্ছামতো একটি programme বা symphony বেছে নিয়ে 'নিশ্চয় রাতের' গীতের সঙ্গে ছুটে দিতে পারবেন, এও কল্পনা করি। তিনি শিল্পীত্বের প্রয়োগ করে এই অসুস্থ কাক-বিশাল হৃদয় ছুটিয়ে তুলবেন, ততই যে কবি-স্বরীক্সনাথের গীতি বা শিল্পী-স্বরীক্সনাথের গীতিরূপটির নির্ধার লক্ষণসমূহ হবে, এ বিষয়ে

কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কারণ, সীতির ধ্বনি ও সীতের গায়কির যে অশূৰ্ মিলনবন্ধন ববীন্দ্রনাথ নিজে যতনা করে গিয়েছেন, সেই বন্ধা-দৃষ্টিই বর্গাৰ্ণ অশুদ্ধত্বের অভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। যে শিল্পী ও শ্রোতা এই বন্ধা-দ্বয়ের মহিমা অশুদ্ধত্ব করতে পারে না, তার পক্ষে এই সীতি গান করা অথবা উপভোগ করা অসম্ভব, এবং চেষ্টা করা বৃথা।

সংক্ষেপে বলা যায়, কাব্যবদ্ধ সীতির মধ্যে যেভঙ্গিতে দৃষ্ট ধ্বনি বা ব্যঙনাই বাগ্মী হয়ে, প্রধান বা লক্ষ্য হয়ে স্বন্দররূপে সেবা দেয়, সেভঙ্গির পক্ষে ধ্বাংসোপা ললিত হুঁহুয়ার ও শব্দ গায়কিই প্রয়োগের যোগ্য। যাত্রা এই উপায় অবলম্বন করলে ধ্বনি ও সীতরূপ সার্থক হয়ে প্রতিষ্ঠাত হয়। তেঁনে তেঁনে এই স্বাভাবিক নিয়মকে অবহেলা করলে জ্ঞানকৃত পাগল হয়। সেই পানের নাম সীতি-হত্যা।

যাত্রা একটি সীতি বা সীতরূপের বিশ্লেষণ থেকে বোকা বার প্রত্যেক সীতির একটি নিম্নম অংশোজ্ঞা বা সীতরূপ আছে। প্রত্যেক সীতের যোগ্য গায়কির এমন-একটি নিশ্চিত নির্বাচিত রূপ পড়ে ওঠে, যার লামাত্র পরিবর্তনশাধন করলেই সীতরূপে হানিয়া ও বর্ষতা সেবা দেয়। ধ্বনিগর্ভ কাব্যবদ্ধ সীতি যে স্পর্শালব্ধি হতে তাতে আশ্চর্য কি? এবং অধিকাংশ সীতই ধ্বনিগর্ভ বলে সমান ধর্মের প্রেরণার ববীন্দ্রসীতির গায়কিও অবজ্ঞির বিশিষ্ট ও হুঁহুয়ার ভণের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। আগেই বলেছি, তিনোতমাকে ধান ভাঁনতে বিলে তার লাবণ্যের অভিযুক্তি হয়ে না।

ববীন্দ্রসীতি ছাড়াও অনেক কাব্যবদ্ধ সীতি আছে। কিন্তু মোটের উপর লক্ষ্যার প্রাধাত্য এবং অর্থের বৈচিত্র্যই এই সীতিভঙ্গিকে অধ্বিগত হুঁহুয়ার করে রেখেছে। লক্ষণা ও অর্থের সহযোগ বা প্রাধাত্য থাকলে একসিকে হুঁহুয়া এই যে, শ্রোতার অশুদ্ধত্বের কাছে দৃষ্ট হিসাব ঘিতে হয় না; তার জ্ঞানের বাহো প্রবেশ-অধিকার ও স্থানলাভ করতে পারলেই কাব্যবদ্ধের কিছু সফলতা হল। ফলে এই ধ্বনের সীতির একাদিক অভিযুক্তি বা interpretation হতে পারে। এখানে interpretation শব্দটি 'সীতরূপ' অর্থেই ব্যবহার কথ্যে, ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। বহু রূপের সম্ভাবনা থাকে বলেই স্বাভাবিক অথবা পরীক্ষামূলক গায়কিরও নামারকমের সমাবেশ এসে পড়ে। প্রত্যেকটি এসে বলে 'বেগত আমি কত সুন্দর, চমৎকার'। তেঁনে বলতে হয়, 'ইদ তুমি সুন্দর, চমৎকার; এমন কি অশুদ্ধও বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?' মনে হয় শতকরা নিয়মনসইটি নাট্যসীত এই শ্রেণীতে পড়ে। এদের মধ্যে এমনও দু'চারটি সীতি আছে, যার মধ্যে হয়তো ধ্বনিই প্রধান, লক্ষণা ও অর্থ অপ্রধান। কিন্তু বিনির বিড়ম্বনায় বা box-office-এর তাগাধার এতের রূপ অভিযুক্ত করা হয়েছে অনাবশ্যক রকমের চটুল বা উচ্ছল গায়কি দিয়ে অর্থাৎ স্বাভাব্য চাক-চোল-কাপির সঙ্গে বহু-কনের সাধের মতো।

পর্যকীর্তনে ও কাব্যবদ্ধে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি বহুবদ্ধ এবং রসদৃষ্টের কামনাই দ্বাধুরূপ বিনির বিভারিত ও বিচিত্র গায়কিসমূহকে অপেক্ষা করে। হুঁহুয়ার গান করে সীতরূপটি সম্যক হুঁহুয়ে তুলতে বেশ-কিছু সময় লাগে। কাব্যবদ্ধের সাধনা একটি ধ্বনিরূপকে অভিযুক্ত করে ও কোনো অরপেত বঙ্গাধারের দৃষ্টোদ্যোগ করে অস্তহিত হওয়া। অস্তএব একটি কাব্যবদ্ধ গান করতে মুনপক্ষে তিন মিনিট এবং উন্নপক্ষে সাত-আট মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। কথ্যটিং হুঁ-একজন পাঠ্যকার সীতিশিল্পীকে (duration-singer বলা যায় কি?) কাব্যবদ্ধের সামূলি রচনাকে গানের বড়ি দিয়ে

এরিক ওরিক বিশ্ববীজ টানটানি করে তার জ্ঞান পরিশোধ করতেও সক্ষম। প্রত্যেককে হৃদয়ানি করা ছাড়া এর ভবিষ্যৎ দেখি নে।

রবীন্দ্রস্বীতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলেই গান ও গায়কির মধ্যে বিশিষ্টতা এসে পড়েছে। অল্পশব্দে এমনও লক্ষ্য করতে পাওয়া যায় যে, শিল্পী স্বীতির স্বরলিপি অর্থাৎ official record এর মাতিমালা নকল করে গান করে সেতে থাকলেও স্বীতি বৈশিষ্ট্যহীন সমন্বিত হয়ে মতো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অথচ সেই একই স্বীতি ও স্বরলিপির নির্ণয় অসম্ভব করে অল্প-একজন শিল্পী এমন ভঙ্গি প্রকাশিত করছেন যাতে প্রত্যেক সুরকেই নিখুঁত ও বিজ্ঞ হলে একমনে স্বীতিস্বার্থে আকৃষ্ট হয়ে আছে। এবং গানের শেষেও চরিত্রের মধ্যে সেই ভঙ্গি শব্দের মধুর সুরের অসম্ভব মতো কিছুকণ থেকে দিচ্ছে। যদি প্রত্যেক মনে একটি বিশিষ্ট চিত্র ও সুন্দর প্রভাব সৃষ্টি করাই কাব্যরচনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে, স্বর-তাল-গানের অবিকল অসম্ভবতম করেও প্রত্যেক গানকেই বার্ষ্য হতে হবে। এবং স্বর-তাল-গানের অসম্ভবতম করে অবিকল বোধগম্য গায়কির সাহায্যেই প্রত্যেক গান সার্থক হয়েছে। এই অবিকলই রবীন্দ্রস্বীতির গায়কি বা বিশেষ গায়কি। এই বিশেষ গায়কি এতই বাস্তব ও প্রত্যক্ষযোগ্য এবং প্রয়োজনযোগ্য যে, গায়কিবর্জিত ও গায়কিহীন একই স্বীতি হৃদয়ে যেখানে দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

এখন একটি প্রশ্ন, শুধু মূখ থেকে সাক্ষাৎ স্বীতিরূপ শুনে অসম্ভব করে গান করার অভ্যাস করলে অসম্ভবতম প্রভাবই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গায়কি বুঝে নিয়ে আসবে। তাহলেই তো স্বীতি-রূপটি আশা থেকে গায়কিহীন হবে। অতএব স্বীতিরূপটি উত্তম ও সার্থক হবে। যদি অসম্ভবতম সুর করে গানের চরম সাধনা ও স্বীতির ইষ্টসিদ্ধি হয়, তবে গায়কি নামে একটি অভিনব তর উপস্থাপিত করে পরিচয় বাড়িয়ে লাভ কি।

সংক্ষেপে ও উদাহরণ দিয়ে এর উত্তর দেওয়া যায়। গায়কির অধিকারে এত বিভিন্ন ও বিভিন্ন ব্যাপার আছে এবং স্বীতিরূপ ও এত বহুবিধ যে, প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ আলাদাভাবে এখানে সম্ভব হবে না। মাত্র সাধারণভাবে মন্তব্য করা যাবে।

স্বীকার করা যাক, ছাত্র বর্ধা অসম্ভবতম করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শুধু প্রত্যেকটি চরম পৃথকভাবে ও ব্যবহার গান করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। শুধু মাত্র একবার ও সমগ্র স্বীতিরূপটি গান করে দেখিয়ে দিলেন এবং ছাত্র সেই গানক্রিয়া আরম্ভ করেই স্বীতিরূপটি প্রকাশিত করল; এমন ক্ষতিগ্রস্ত আশি স্বপ্ন দেখি নি। রাই হোক, একই চরম ব্যবহার গান করে দেখিয়ে দেওয়া এমন একটি গায়কি-পড়ানোর মতো যাত্রিক ব্যাপার হয়ে যায়, যা শুধু সেই চরমটির বর্ধা রূপ অভিব্যক্ত না হয়ে গায়কি-বর্জিত স্বর-তাল-গায়কিস্বরূপ একটি সামান্য নূনতর রূপ অভিব্যক্ত হয়; অর্থাৎ শিক্ষারানের সময়ে শুধু শুধুই একটি হয়, শিল্পী চাপা পড়ে যায়। সেই স্বীতিরূপটি মনসিদ্ধে অভিব্যক্ত করার সময়ে শুধু শিল্পী হয়ে যখন গায়কি বং কলাতে থাকেন, যা শুধুই স্বীতির চরমটি সমগ্র পরিচয় বা পূর্ণরূপে দর্শন ও অস্বীকৃত হয়ে তার নিম্ন একান্ত কাম্যরূপে আবিস্কৃত হয়। শিক্ষারানের পরেই শুধু শুধু সত্যের নৈতিক বা ব্যবহারিক পরিচয়ের মধ্যে যখন মাত্র শিক্ষারান ও বহুলাভই শুধু ও শিল্পের লক্ষ্য থাকে, তখন শুধু শুধু এক-একটি বিচ্ছিন্ন স্বীতিচরনের ব্যবহার আবৃত্তি করে দেখিয়ে

দেওয়ার সময়ে সেই চরণটির বর্ষা স্বরূপের বিকাশ হয়তো সম্ভব হয় না। সুচি-পটিন বার আকৃতির মধ্যে যদিই বা দু'একবার গায়কিগুলি ছুটে ওঠে, ঠিক সেই মুহূর্তগুলিতে ছাত্র হয়তো ঘর-তাল-পরের সমাবেশবিশিষ্টের প্রতি ধ্যাননিবদ্ধ হয়েচে এবং জ্ঞান বিধে বস্তুরাতের আগ্রহে অন্তরাত্ম্যের অল্পকৃতি স্তব্ধ করি ব্যাগারে নিরুদ্ধ হয়ে আছে; অর্থাৎ গুরু নিরুট শিক্ষা করার সময়ে শ্রুতির নীচল নানতম ও গাঢ়তম রূপটিই ছাত্রের মনে সংক্রান্ত ও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। এই নীচল অধ্যবসায় ও অভ্যাসের শক্তি মিলিত হয়ে ছাত্রের সংবিৎ ও শ্রুতির মধ্যে শ্রুতির যে সমগ্র রূপটি প্রতিকলিত করে সেই রূপটিই ভবিষ্যৎ শ্রুতলংকরের বীজরূপে থেকে যায়। অভ্যাস ও পরিশ্রম করে থাকে অর্জন করা হয় তার সংস্কার বা প্রবণতাকে গান করার সময়ে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন, বীকার করতে হইবে। এর সুখাত উল্লেখ্য, গুরু মূল্যবোধগুলি ছাত্রের বর্তার এবং অবস্তাব্যী হয়েই দেখা দেবে— যদি গুরু বা ছাত্র এ বিষয়ে অববহিত থাকেন। যাই হোক, ছাত্র যখন তার অভ্যস্ত শ্রুত-রূপটি গান করে তখন একটি নীচল গায়কিবল্লিত রূপই ছুটে ওঠে। তার নিষেধ পক্ষে সম্ভবত সেই রূপটি অসুন্দর বা অপ্রিয় লাগে না। কারণ, অভ্যাসের এমনই মহিমা যে, আফিমের মতো দুর্গন্ধ ও তিক্তবাদ বস্তুরও নেশাখোরের রসনার অতীত স্বাদু এবং নাসিকার সুস্রাব বলে মনে হয়। গায়কিবল্লিত শ্রুতরূপের সৌভাগ্য এই যে, শ্রোতার মধ্যেও নেশাখোর শ্রোতা থাকে।

এরকম সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে মাত্র নেই, কারণ আধুনিক শ্রুত-বিদ্যালয়গুলিতে পাইকারি হারে শ্রুতশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে স্বাধীনভাবে গানচোটা ও শ্রুতরূপের বায়না দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের পিতামাতা এসকল ব্যাপারের সম্বন্ধ রাখেন না, বোধ হয় তাঁরা অনন্ত— 'তমর বড়শি হয় অসিতবরণ, প্রহতির কাছে সেই কবিতা কাকন' ভ্রায়; অথবা তাঁরা প্রয়োজনের দিকটা বেছেন না।

এ পর্যন্ত মনে করা হয়েছে যে, গুরু মাবেমাবে শিল্পীরূপেও দেখা দেন। কিন্তু অত্র সম্ভাবনাও আছে। বয়োবৈপ্লব বা অত্র কারণে গুরু পক্ষে শিল্পকৃতির অসম্ভবও হতে পারে; অথবা কৃতিত্ব কটলাগেও হতে পারে। কঠিনাধা কৃতিত্বের অগ্রকরণ থেকে গান শিক্ষা করার সময়ে কঠিনাধনহুচক বিকৃতি বা বোধস্তমিরও অভ্যাসসাথে অসুগর্য হয়ে পড়ে।

এর উপরেও মনে করা থাক, বেবোক্ত গুরুটি অত্যন্ত কড়াপাকের isolationist, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবাদী। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, একবার তাঁর জ্ঞান ও প্রয়োগই ঠিক, অত্র সবই বিকৃত ও ভ্রান্ত; অথবা তাঁর সম্ভবন বা ধরনানার শিল্পপ্রয়োগ প্রকৃতিই ভারতের একবার আদর্শ, অত্র সমগ্র ধরনানার আদর্শ বা সুইকোড়। এরকম গুরু মনে করেন, ছাত্ররা তাঁর কৃতিত্ব বা ধরনানার অচলাবস্থানের মধ্যে বদ্ধ থাকবে; অত্র গুরু সম্ভবন বা শিল্পের ছোঁচাচ তাগের পক্ষে হাম-বসন্তেরই মতো মারাত্মক ও বর্জনীয়। অত্রএব শিল্পের বাইরের সংস্পর্শ থেকে বাচিয়ে রাখতে হবে। এই শ্রেণীর গুরু অবিরল নয়। এরকম দু'চারজন মঠবাসীর সঙ্গে মালাপ করে পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁদের সরল মত উদ্ধার করেছি। মতটি এই— "আমি বা গোঁইব করব বা সেখব তাই-ই পার্যকি। পার্যকি বলে সেখবার মতো বস্তুর বস্ত নেই। অত্র ওস্তাদ বা ধরনান যে পৃথক পার্যকির কথা বলে সে-সবই বুদ্ধকর্কি"। এঁদের মধ্যে যারা শিল্পী তাঁরাই ধরনান বজায় রাখেন বা নূতন করে ধরনান তৈরী করেন। বেরকমই হোন, ছাত্রগুলি

জন্মে ভক্তিতে নিজেদের অচলাবতনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তাদের মনে অস্বাভাবিক সংকোচ ও পরশ্রীকাতবতার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এবং পূর্বাভাসভাবে শ্রীতের নীরব স্থিতি অভ্যস্ত হয়ে গেলে তত্ত্ববিজ্ঞানীরা কখনোই সর্বল গ্রাণবান শ্রীতাভিযুক্তি সম্ভব হয় না; এবং সংকোচের কারণে অস্ত্র শিল্পী বা সুরবানার স্বার্থ সাংকীর্ণতার সাধারণ-মানে বোধগম্য করতে পারে না। এরূপ শিক্ষাপদ্ধতির দুই কি তিন পুটপাকের পর যে শিক্ষার্থক গড়ে ওঠে, সেগুলি এক-একটি পাথরের ছড়ি বিশেষ। হাইফেল বা মন্ট্রিয়েল দলবদ্ধ হয়ে দলল সৃষ্টি করা ছাড়া এই ছড়িগুলির অমূল্য জীবনে আর কোনো সাংকীর্ণতার উদ্ভব হয় না। এই দললী শিল্পী বা গাইয়ের এখনো প্রচুর আছে এবং বহানিয়মে প্রস্তুতও হচ্ছে। এখনো যে অলসার দলগত বা ব্যক্তিগত কলহের উদ্ভব হয়, সেগুলি পাথরের ছড়িদের চৌকাত্তরীক যাত্র। স্কুলভোগীরা এ বিষয়ে অবগত আছেন।

মোটের উপর অবস্থা এই। এখন এরূপ আশা করা যায় না যে, প্রত্যেক গুচ্ছই এক-একজন বিশিষ্ট শিল্পী। শিল্পী হলেও গায়ক-গায়িকা শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে। গাইকারি বসোবাস্তব জিহে গানশিকার সাধারণ হল অস্থায়ী করা কঠিন হয় না। এরূপ অবস্থিত সম্ভাবনায় মধ্যে স্বীকা-শিক্ষা শেষেও দু'একজন শিষ্য যে পরে উত্থানের শিল্পী হয়ে বেধা সেন, সে কেবল অধীষ্ট ছদ্ম অহুতবশক্তি ও কর্কশতার বাহ্যিকতা, শিক্ষার স্তরে নয়। এদের মহোদয়ের কারণে গুচ্ছ বা সুরবানার বা বিভাগভনের বাহ্যিকতা বাড়ে চো মল, কিন্তু শওজয়ের উদাহরণ সেখা নিরাপ 'হতে হয়।

এই একবার প্রতীকার আছে 'গায়ক' প্রত্যয়ের মধ্যে। প্রত্যয়টি সংক্ষেপেই বলা যাক।

সাংকীর্ণমাত্রা শ্রীতাব্যবহাই একটি উৎকৃষ্ট অভিযুক্তির উপযুক্ত রূপ আছে। গান করে এই অভিযুক্তি-সাধন হয়। গানকার্যের মধ্যে কতগুলি বিশেষ ব্যাপারই 'গায়ক'। সন্য শ্রীতির সাধারণ্যকে মনে করলে গায়কিরও সাধারণ্য মনে করা যায়। এই সাধারণ্য বাঙ্গালার বা ভারতে বা ইউরোপে বা সারা ভূগোলেই শ্রীতভবের সাধারণ অপরিসীম অলম্বনীয় হয়ে আছে। এই সাধারণ্যের জ্ঞান ও প্রয়োগ চর্চা করা উচিত, ঠিক যে কারণে বালক-বালিকাকে নাকানিচোষানি না দিয়ে ভূবে দাবার ভয় না হতে দিয়ে এবং জল না পাইয়েও বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামপদ্ধতি অল্পমাত্রা শ্রীতার শিক্ষা দেওয়া কত বা। ন্যূনপক্ষে ছ'হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার কোনো অতিপ্রাচীন স্মৃতি ও স্মৃতিস্মরণে যুগে শ্রীতবিষয়ে গায়কির এই সাধারণ্য-প্রয়োগ গভীর বিচার ও সিদ্ধান্তের অবিকৃত হয়ে গিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তগুলি অনেকা হুচ্ছ ব্যাপক বিনয় ও বাস্তব কোনো সিদ্ধান্ত আর পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় তথাকথিত classical ও romantic শ্রীতিভেদগীর্ণ পক্ষে যে গায়কি উদ্ভূত হয়েছে, সেও এই সাধারণ্যের স্বত্ববৃত্ত।

সাধারণ্যের অতিরিক্ত বিশেষ বা বিশিষ্ট গায়কিও আছে। কিন্তু এগুলি সবই সাধারণ্যের তত্ত্ব বা categoryর মধ্যেই আছে। কালেকালে বেশেবেশে যে শ্রীতভব সেখা দায়, তাদের মধ্যে এই গায়কির বিশেষ ও বিশিষ্ট ভেদগুলি পাওয়া যায়। বিশেষ আর কিছুই নয়, সমাবেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। এগুলিও আলোচনা ও প্রয়োগযোগ্য, কারণ শিল্পী বেশ ও কালের গভীর মধ্যেই উদ্ভিত হন।

শ্রীতির, স্বার্থ, প্রত্যেক শ্রীতির, ব্যক্তিগত দলল ও বৈশিষ্ট্য আছে। সে কারণে ব্যক্তিগতভাবেও বিশিষ্ট গায়কির সমাবেশ আছে।

এই গায়কি বা গায়কিত্বের কল্পনা বা abstraction নয়, এর মধ্যে কোনো অতি-প্রাকৃত

মহত বা mysticism নেই, তার স্থান নেই অবকাশও নেই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ অহুতবেশ যোগ্য ও বাস্তব।

প্রশংসক্ৰমে বলা যায়, গায়কির বিভিন্ন চিত্রাখন ছাড়া পীতরূপের দৃশ্য বা কাব্য অভিব্যক্তি হতে পারে না; সাধারণ বা বিশেষ গাথকি আদিত না করে শিল্পী হওয়া অসম্ভব; একমাত্র অগাধায়াণ প্রতিভাই গায়কি আদিত করার পরিশ্রম না করেও বহাছরুণ গায়কি দিয়ে পীতরূপ সৃষ্টি করতে পারেন। গায়কি না যেনে বা আদিত না করে নিম্ন ইচ্ছা ও কল্পনা প্রসূত গায়কি দিয়ে পীতরূপকে খাড়া করা যায়, কিন্তু সেই রূপটির পক্ষে বর্ধাৰ্ধ পীতরূপ হওয়া বা না-হওয়া শিল্পীর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে chance and law of probabilityর উপর, অর্থাৎ হৃৎ-তাল-পদের সমাবেশ ভেদ এবং গায়কি-সাধাবণের নির্দিষ্ট ছেট্রিগটি ভেদ এদের বহুরকম ইচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় যোগাযোগ হতে পারে তাদের মধ্যে যাত্র একটি সমাযোগই বর্ধাৰ্ধ পীতরূপের মধ্যে থাকে। উপমাধ্বন্যে, হাত পা নাড়তে পারে ও বল আছে এমন একটি সীতার-না-জানা বালককে পুহুরে কেলি হিলে তার পক্ষে আগ্রাণ চেষ্টায় বেঁচে পারবে গঠার সজাবনা বা যোগাযোগ যেন, পূর্বোক্ত সজাবনা বা যোগাযোগও সেই রকমের। গায়কিবলিত কলরংমাত্রাংশল গান অভ্যাস করিয়ে তরুণ মনের সহজ অহুতবশক্তির ও সৌন্দর্যলোপুতায় উত্তমভাষে অবলোপশাখন হতে পারে, যদি অচলায়তন ও ছুৎয়ার্গণকৃতির বেড়া বিধে ছাত্রদের বিধে রাখা যায়। কোনো কিছু শিক্ষা না করে, যাত্র শ্রদ্ধাভেব বশে বালক-বালিকারা সেই সেই পীতের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেগুলি গায়কির গুণে সজীব ও রক্তিবায়ক; কিশোরবয়স্কদের গান শিক্ষা দেওয়ার তার যিনি গ্রহণ করেন বিশেষ করে সেই গুরু ও শিক্কেয় গায়কিবিশয়ে অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত বাহনীয়, কারণ তিনিই সম্ভবত তরুণ মনের উপর প্রাথমিক রেখাচন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সাংক্যভক্তর কাছে গান শিখতে গিয়ে যদি এত বয়সের ব্যাঘাত ও অভাভেব সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে নির্ভীক ছাত্রের কাগরের উপর লেখা স্বরনিশিক সাধনে যেনে গান শিক্ষা করার চেষ্টা অবশ্য বর্ধাৰ্ধ পীতরূপকে অভিব্যক্ত করার প্রথম কতটুকুই-বা পার্থক্য হতে পারে, এরূপ সমীচীন প্রেরণ বা তরুণ আদনা খেকেই জেনে ওঠে। ব্যাঘাতের এই প্রর ও তরুণের মীমাংসা করার ইচ্ছা রইল।

গ্রন্থপরিচয়

বেশে বিশেষে : নৈরব মুক্তবা আলী & নিউ এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ক্যানি: স্ট্রিট, কলিকাতা। দ্ব্য পাচ টাকা।

ডাক্তার সৈয়দ মুক্তবা আলীর "বেশে বিশেষে" বইখানির প্রকাশনকে আধুনিক বাঙালি সাহিত্যের ইতিহাসে আমি একটা লক্ষ্যীয় ঘটনা ব'লে মনে করি। এই বই সপ্তাহে সপ্তাহে "বেশ" পত্রিকায় এক এক অধ্যায় ক'রে বহন প্রকাশিত হ'চ্ছিল, তখন আমি অখীর আগ্রহে বহনই "বেশ" বেরিয়েছে এই বই প'ড়ে আসছিলাম। সম্পূর্ণ বইখানি এখন বেরিয়ে যাওয়ার আমি বিশেষ আনন্দিত। কারণ এই বই বাঙালি ভাষার বেশভূষণকে অবলম্বন ক'রে রচিত আর গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত অল্পতন বসন্তী রূপে চিরকাল বিরাম ক'রেবে। প্রথম পড়বার দমরে লেখকের বসবোধ, গভীর জ্ঞান আর সমীক্ষা, হাতুভাষার প্রতি বদন, আর সহজ সাবলীল বসপূর্ণ ভঙ্গীতে তাঁর নিজের চোখে বেধা বিনিস আমায়েব চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলাবার শক্তি, এই সমগ্র, আর এ ছাড়া আরও অসংখ্য অনেক গুণ, আমাকে বিশেষ তাঁর মুগ্ধ ক'রেছিল। মনে প্রাণে তাঁর প্রশংসা ক'রেছি, পাঠকদেরকে তেঁকে তাঁর এই লেখার তারিক ক'রেছি আর প'ড়ে ভনিবেছি। আর তাঁর সঙ্গে বঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে বহু:প্রস্তুত হ'য়ে পরমাণে পাঠক-হিসাবে আমার সানন্দ ও সন্তোষ অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার মতন আরও অনেক পাঠক তাঁর এই বই প'ড়ে প্রশংসার পক্ষপাত হ'য়েছেন সেখ আমি বিশেষ খুশী হ'য়েছি।

বিভিন্ন ধর্ম (অর্থ্যাৎ শেষ কথায়, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস) পোষণ করার মানুষ যে তার সমাজটি আর সমাজী, ভাষার আর বক্তব্যের সঙ্গে সে এক, তার কাছ থেকে একেবারে আলাদা হ'য়ে যায়— এই ব্রাহ্ম মতবাদের প্রচারের কলে বহন ভারতে Two Nation Theory, অর্থ্যাৎ ভারতের হিন্দু আর মুসলমান হচ্ছে দুইটা পৃথক্ জাতি এই ধারণা, নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রবল ধল বেধা দিলে, আর বহন দেশব্যাপী যুক্তায়ক্তি, যুগোয়ুনি, বহুভাষা, জাতিহত্যা, দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের বহিষ্করণ প্রভৃতি মনর্ষ ও অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ছিটিও হ'য়ে গেল, তখন, আর কতকগুলি উদার মনোভাবের মুসলমান সম্মনের সঙ্গে একতর উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান উভয়ের সাধারণ ভাষায় এই অপরূপ বইখানি লিখে, নীচবে উপস্থাপ্ত দলের মতবাদের আর ধর্মসাধক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ জানালেন, আর প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, ধর্ম আলাদা হ'লেও বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান একই মানসিক সংস্কৃতির মানুষ, একই জাতির মানুষ। বৃহত্তর ভারতীয় জাতির অন্তর্গত বাঙালী জাতির মধ্যে যে ধর্ম এসে অনশনের পার্থক্য ঘটাতো "পারে না, ভারত আর পাকিস্তান রাজনীতির দিক থেকে পৃথক্ হ'লেও তার ও চিন্তায় দুই ভাষা বা তাত্ত্বিক নয় আর দুই রাষ্ট্র হওয়াও যে কঠিন, একথা তাঁর বইয়ের মাধ্যমে ডাক্তার মুক্তবা আলী মেথিরে দিলেন।

ডাক্তার মুক্তবা আলী সর্পন্যায়ের বিশেষ পণ্ডিত, আর তা ছাড়া তিনি ইংরেজি ফার্সী আর অংমান এই কটা ইউরোপীয় ভাষারও পণ্ডিত। কারনীয় কাক-চালানো জ্ঞান তাঁর ছিল, মিসরে

অশ্ব-কাহিনী বা কাইরোর আল-আম-হার বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পাঠ করার মত্ন তিনি প্রাচীন সাহিত্যিক আরবী আর আধুনিক আরবী এই দুইয়ের মধ্যে পরিচিত। এখনকার শাস্ত্রানুসারে অরবী খ্রীষ্ট জেলায় তাঁর বাড়ী, নবী মোহাম্মদের বংশের মূলস্থান খর্ব-গুফ সৈয়দ জুরের ছেলে তিনি ; কিন্তু কৈশোর ও প্রথম যৌবনে শাস্ত্রনিক্ষেপনের আব-হাওয়ায় বহু যৌবনাবধির চরণতলে তাঁর মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'য়েছিল। প্রদারগুণবিশিষ্ট, সত্যকার হাত্তরসোচ্ছল, লক্ষ্যশীল অথচ ভাবগম্ভীর চম্ভি বাঙলা ভাষায় তিনি যে অগাধাধরণ বহল তাঁর লেখার সেরিয়েছেন, সেটা তাঁর মনের স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে যৌবনাবধির যেরূপ প্রদার উজ্জ্বল গন্ধামুনা-মিলনের ফল।

বইখানি প'ড়তে আরম্ভ ক'রলে, বাঙলা ভাষার সত্যকার প্রেমী লেখকের এই ভাষার প্রয়োগ যেনে কেউ সাধুবাহ না ক'রে পারবেন না। বাঙলা চম্ভি ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্য, তার বাচ্যবক্তা আর ভাবপ্রাচুর্য, আবার তার অক্ষমতা আর বৈচিত্র্য—এক কথা, চম্ভি বাঙলা যে কত মোহনকার ভাষা, তা ইনি নিজেই বিশিষ্ট ভাষীতে বা চম্ভে নোভুন ক'রে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। এই হৃদয় ভাষা পৃথিবীর যে কোনও ভাষা ভাষার সঙ্গে তাল রেখে চ'লতে পারে, তাতে আর সন্দেহ নেই। অস্বনিহিত শক্তিকে টেনে খাঁর তরাতাই মুশিয়ানা—ভাকার মুক্ততা আলী সে মুশিয়ানার অধিকারী। সহজাত কবচের মত হৃদয় শক্তিশালী ভাষার বর্ম তাঁর লেখার ভাবমহকে ঘাতসহ ক'রে রেখেছে।

আকগানিস্থানের আখীর আমাছুজাহ নিজের যেনে বাতায়তি miracle বা কেহামৎ জাহির করার দুহাণা ক'রেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন আকগানিস্থানের ইরানী আর প'তানা বা প'তানা অর্থায় পাঠান জাতির মাজুকে ন্যায়সের ইরানী আব-হাওয়া থেকে এক হেঁচকা টানে দুমিনে অতি-আধুনিক ক'রে তুলবেন, এখন কি বোরকা-ঢাকা বিলিহেবাবের কয়েক মাসের মধ্যে আলোক-প্রাণা ক'রে Parisienne-এ পরিণত ক'রবেন। শিকা হীকা প্রকৃতি নানা বিষয়ে তিনি পন্ডিতের দুনিয়ায় নোভুন হাওয়া শূরের পুখাতন যেনে বহান্তে চেয়েছিলেন। নানা যেন থেকে বিভিন্ন বিখ্যাত পণ্ডিত এনে পাঠান ছেলেমেয়েদের মানসিক উন্নতি তিনি ক'রতে চেষ্টা হন—কানুলের সরকারী কলেজে বা ইচ্ছলে ফরাসী কব জরমান আর ভারতীয় শিক্ষকের মেলা ব'সে গিয়েছিল। এই আকগান-মাপুতির শুভ দিনে জান-বজ্ঞে অল্পতম পুরোহিত হবার ক্ষত জাক প'ড়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে এই মূলস্থান বহু-সন্তান ভাকার সৈয়দ মুক্ততা আলীরও—মুখ্যতঃ বিবেকীয় নানা ভাষা আর তাদের সাহিত্য পাঠান আর ইরানী ছেলেমেয়ে পড়াবার ক্ষত, আর তাও আকগানিস্থানের শিক্ষার ভাষা, জরমানায়েভ ভাষা ফরাসীর মাধ্যমে। শিক্ষক রূপে তাঁর কলকাতা থেকে বেলে আর বাসে কানুল পর্যন্ত দ্বারা, কানুলে তাঁর থাকবার কথা, সেখানে তাঁর নানা বিভিন্ন চরিত্রের মাজুকের সঙ্গে, মেলাবেশা (এ'রা বেসীর ভাগই ছিলেন তাঁর সহকারী, আর তা ছাড়া তাঁর ভৃত্য; আর কব মৃত্যুবাসেও বহুবা)—এই-সব কথা তিনি আশাবের তনিয়েছেন। তার পরে, কানুলে থাকতে-থাকতে বেশা দিলে আখীর আমাছুজাহের অতি উৎসাহের বিকসে প্রতিজ্ঞা—খর্ববিরে বক্ষশীলতা বা গোড়ায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠ'ল—কমতাপোসু লুঠেয়া আখি খর্ববরী যোরা এই দুইয়ের খবিত গতি এত্ন দিকে, আর সংস্কার-বিলানী, আনর্গরানী, মাজুকের উহার প্রকৃতিতে আনর্গরানী মাজার অলপ মরর গতি অত্ন দিকে। আমাছুজাহ বিতাক্ত হ'লেন, নানা পোশন বক্ষরুর পরে একান্ত বিরোধ আর রাজার অক্ষমতা একদমে

সেখা বিসে, সেবে খ'টল সেনের যথো রাষ্ট্রবিমূৰ্খ, বাচ্চা-ই-সক্কার সিংহাসন অধিকার, আনানুজ্ঞাহেব পলায়ন। ঘটনাবলী অতি ক্রত খ'টে পেল; কিন্তু তার যথো নিরীহ বিশেষী ভারতীয় অধিবাসীদের সমস্তা, বিশেষ কষ্ট আর উৎপেদেৰ ব্যাপার হ'বে পাড়াল। ভাস্কর্য মূৰ্ত্তবা আলী আর তাঁর সহকর্মী আর শান্তিনিকেতনের মূৰ্ত্তব আর সতীর্থ বৌলানা জিয়াউল্লীনকে-ও এই অনশেষিত রাষ্ট্রবিপ্লবে দেখেট ভুগতে হ'ল। এই-সব কথা, চমৎকার বঙ্গপূৰ্ণ তথ্যেতে বাঙালী পাঠকদের ভিত্ত গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। প্রদৰ্শ-ক্রমে, আকগানিস্থানে ভাবতবাসীর প্রথম বেতনে পুট ইংরেজ-জাতীয় ভারতের বাস্তবত্বের ভারতীয়দের লক্ষ্যে নিহঁর জঘ-হীনতা ও বাবিস্বজ্ঞান-হীনতার কথা-ও এসে গিয়েছে।

ভাস্কর্য আলী কত মিন বা কত মাল বা কয় বংগের কানুলে ছিলেন, তা স্পষ্ট ক'রে কোথাও জানিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। একটীও তারিখ নেই তাঁর এই অশূৰ বিবেদ-বর্ণনের কথায়। আকগানিস্থানে বাচ্চা-ই-সক্কার বিব্রোহ আর আনানুজ্ঞাহেব পতন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা হ'চ্ছে তাঁর কানুল-বাসের শেষের দিকের অস্তিত্ব পটভূমিকা। সে-সব ঘটনার তারিখ, শেখাবারী সন-তারিখ-সেওয়া ইতিহাসের কেতাবে পাওয়া যাবে। সন-তারিখ না সেওয়াটাই যেন ভাস্কর্য আলীর বইয়ের পক্ষে একটা symbolic বা প্রতীক-স্বাধী অথবা deliberate বা সচেতন উদ্দেশ্য-মূলক ব্যাপার। কারণ, বিষয়ের দরুন বিশেষ-বেশ-বিশদ থাকতে বাধ্য হ'লেও, যথার্থ বঙ্গবন্ধুর মনে তাঁর বই কাল-নিরপেক্ষ হ'বে নিশ্চিই কালের উল্লে'গিরে স্পীচেছে।

লেখকের সতীর্থ মন, তাঁর সঙ্গে আর তাঁর চার পাশে যে-সব মাহুদ ব'য়েছে, চ'লেছে-ফিরছে, গ'য়ে ব'লে আছে তাদের সম্বন্ধে তাঁর বহুসম্পূৰ্ণ কৌতূহল, তাঁকে কতটা না মূর্ত্তমূলক ক'রে বেখেছে! বস্তু লোকের তিনি সম্পর্কে এসেছেন, তা তাঁর বেলগাড়ীর ক'লকাতার তালতলায় কিরিকী হেলের-পার্শ্ব সহযাত্রীটী থেকে আরম্ভ ক'রে শেখাওব কানুল-পথের বাসের শিখ মোটরচালক পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব, তা সে শব্দ-চলতি সতীর্থ হোক, তাঁর কানুলের তৃত্য অকৃত চরিত্রের আবহ-বহমানই হোক, নানা মনোজাবে তাঁর সহকর্মী আকগান শিককেয়াই হোক, লকলের মধ্যে তিনি দেখেছেন তাদের সমস্ত মানবিকতা, তাদের প্রাণ। আর তিনি যা দেখেছেন তা জীৱন্ত ক'রে তুলেছেন তাঁর বর্ণনায় নৈপুণ্যে। এটা একটা কম গুণ নয়।

ভাস্কর্য মূৰ্ত্তবা আলীর হাঙ্গ বা বাস্তব অতি সূক্ষ্ম বস্তু। সেটী একসংক্ৰান্ত-পূত মানবপ্রেমীরাই পরিচায়ক, তাহাব যথো কলকতা বা কর্কণতা অথবা নিহঁবতার লেণ মাত্র নেই। সব কথা, শুক গম্ভীর কথাও তিনি সবল ক'রে হাসিয়ে-হাসিয়ে সোনাতে পারেন, এটা বড় অশূৰ জিনিষ। বই মূলে প'ড়তে আরম্ভ ক'লেই চোখে পড়ে—"চাঁদবি থেকে ম-গিকে বিয়ে একটা শট কিনে নিয়েছিলাম।" এই বকম ছাড়া ভাবে শুক হ'ল যে কেতাবেব, তা প'ড়ে যেতে কোথাও যাবে না, গ্রন্থকারের পরিহাস-বসিকতা সদা বিদ্যমান থেকে, জটিল সমস্তা, বড় বড় গুরুপাক আন্তর্জাতিক কথা, সাংস্কৃতিক বিচার, সমগ্রই লঘুপাক ক'রে দেব। তাঁর হাতবসের তাও তিনি একেবারে উপকৃত ক'রে ঢেলে দিয়েছেন; তাঁর এই মানসোত্তা কিন্তু অনেককে একটু বিব্রত ক'রে তুলবে।

যে বাস্তবগুলির ছবি তিনি এঁকেছেন তাহা প্রত্যেকেই জীৱন্ত, প্রত্যেকেই বিশিষ্টতা-মূলক। ভাস্কর্য আলীর চোখে দেখে তাদের সঙ্গে আশাবেরও যোজী হ'বে যাব— মনে হয়, তাহাও আশাবের

জেনা, আমাদেবের পরিচিত। বাত্রাশবে বা কানুলে অবস্থানকালে, চলচ্চিত্রের মত তাঁর কথাবলিতে বাসেব ছবি তিনি নিয়েছেন, তাহা প্রত্যেকেরই গ্রাণ পেয়েছে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে থেকে পাঠকের জন্যে তাহা অর্থ হ'বে থাকবে। ক'লকাতাও ট্রেনের সেই ভালতদার ঘেটে কিবিকী লহনামা, পাঠ্যেবে শেখাওবের পথে শিখ সযসায়কী আর পাঠান সৎযাত্রী, শেখাওবের তাঁর পাঠান বন্ধু আহমদ খানী বাব য'রে তিনি অতিথি হ'য়েছিলেন, বৃত্তো শিখ বাস-চলক যে ছিল একটী থাকে বলে character, আকগান রেতিও কর্তব্যরী যিনি একই বাসের যাত্রী ছিলেন; কানুলে তাঁর চাকর আবদুর-রহমান, বরফের শেখ পান্দির থেকে তার বিয়াটু বগু আর তার সুখম কোমল ছদর নিয়ে লেখকের সেবা ক'রে তাঁর ছদর জয় ক'রে নেব যে, আমাদেবের ছদর জয় ক'রে নিয়েছে সে—লেখকের নকশ-নকশে তাঁর বইয়ের শেষ কথা আমদাও প্রতিরনিত কবি—"মনে হ'ল, চতুর্দিকের বরফের চেয়ে উন্নতর আবদুর-রহমানের প্যাপটি, আর উন্নতম আবদুর-রহমানের ছদর"; বসিক-প্রবর যৌব আসলম, যিনি লেখকের তাঁর অজ্ঞাতশায়ে তালীম দিয়ে ফারসীতে শোক ক'রে দেবার অস্ত্র ছাপার হরফের ভাষার পক্ষ পক্ষ আবদী কথার ভয়া ফারসী প্রথমটায় ব'লতেন, পরে সৎজ চলুতি ফারসীতে তাঁর লম্বু বহুশ প্রকাশ করেন; অধ্যাপক সাইফুল আলম, অধ্যাপক যোত যোতমহ; ফরাসী অধ্যাপক আমাদেবের পূর্ব-পরিচিত শাভিনিকেতনের বেনোখা লাহেব, আর কথ অধ্যাপক বগদানক; কথ বাটুসুতাবাসের বন্ধুগণ—সেনিক, বলক, আরও অস্ত্র অস্ত্র উন্নতজান ও মহিলা; লেখকের ছাত্র, বাচ্চা-ই-সত্যার আদ্যীর যে উনিশ বছর বয়সেই সত্যার কৌশে "কর্ণাইল" হ'য়ে, বিগবেষ মধ্যে ছাষের যিনে deus ex machina অর্থাৎ ভাগ্যবিধাতার মত আচমকা উদিত হ'য়ে লেখক আর তাঁহার সহকর্মী, সত্যার ও সত্যার ছিরাউকীন লাহেবের জীবন-বাবশ সত্যার সলাব ক'রে যের; অজ্ঞাতশক সর্বমন্ত্রিহি ছিরাউকীন লাহেব, শাভিনিকেতনে ধীর বন্ধু লাহের স্বেগ আমদাও হ'য়েছিল, আর ধাব অকালমৃত্যু যঃ বদৌল্লানাকেও ব্যথিত ক'রেছিল ও ধীর স্মৃতিতে কবি তাঁর এক অর্থ কবিতার নিষেহ রেহ নিষেহন ক'রেছিলেন;—কত নাম করা যার? এত উপর, তাঁর অনহকবটীর রসপূর্ণ ভাষার ও চেষ্টে তিনি আকগানিস্থানের রাজ্যত-পুংবের পলিটিক-এর এমন স্খর ইতিহাস জীহত ক'রে ছুটিয়ে তুলেছেন, যে তার তুলনা হয় না। আমদা আমদুল্লাহের সত্যার নামও তিনি, কিন্তু তাঁর কৌতুকাহিনী, তাঁর "কায়নামা" এমন রসনিত ক'রে কে লিখতে পেয়েছে? আমদুল্লাহের বড় ভাই দুইহ-ন-সলতানে যিনি একটী মেঘের ভালবাসার প'ড়ে, হেলায়, লোকে ব'লবে নিবোযেব মত, শিখাসন ভ্যাগ ক'রলেন, সেই মেঘের বহীরাণী প্রকৃতি, পরবর্তী কালে তাঁর নারী-সুলত দেবকীল ছদর, আমদা লেখকের সৎজও অহতব ক'রেছি:—বিশেষ, স্খর চেহারা তরুণ অধ্যাপকটিকে একা-একা মেখে তাঁর মাতৃজয় তাহ সৎজে সহস্রছবিত্তে ভ'রে যার—তিনি স্বামীকে যে ব'লেছিলেন—"বাচ্চা গম মীথুর—হেলেনটার মনে ত্ব নেই"—একথা প'ড়ে আমদাও তাঁর উৎসে নীচু হ'য়ে লেখকের মতন আমদা তুলিয়াত আনাই।

বইবানির documentary value বেশ আছে—প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, কি ভাবে কোন্ ঘটনা-পরম্পরা কল আমদুল্লাহকে বিভাজিত হ'লেন, বাচ্চা-ই-সত্যাকে আলব ক'রে পোড়ার বল বিষয়ী হ'ল। বইখানিতে ঘটনার আলোচনা আছে; কিন্তু এর মূখ্য মূল্য হ'চ্ছে যে একে কতকগুলি স্নাতকের মনের পর্দা তুলে আসল স্নাতকগণকে চিত্রকালের অস্ত্র হ'য়ে দেওয়া হ'য়েছে। বই প'ড়ে বিশ্বের আর স্মৃতি মন ভ'রে

যাহ—বীথ আসলম, সাইক্ল আসলম, বোত মোহনবের মত এমন সংস্কৃতিপূর্ণ মানুষ আফগানিস্থানে আবার বেধা দিচ্ছে—এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা হয়; মনে এক-একবার প্রশ্নও ভাগে, সত্যই কে এরা এত বিদগ্ধ, এত মূল্যবান ব্যক্তি? না এখানে লেখকের মূল্যবান। আছে—ছোঁখে হঠাৎ চমক প'রে তিনি সব বেখেছেন, তখনকারে তাঁর বর্ণনাত্তেও গোলাপী রঙ এসে গিয়েছে? কিন্তু সমস্ত বইখানা প'ড়লে, তাঁর sincerity বা ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না! অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হ'চ্ছে সংস্কৃতিপূর্ণ উনার মনের দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে লোহা-ও সোনা হ'য়ে যায়।

একটা কথা ব'লবো। লেখকের পাঠ আর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এত বিস্তৃত যে তিনি অবলীলাক্রমে যেকোনো বিষয়ে পাঠটা ভাষা আর সাহিত্য থেকে নানা কথা নানা সাহিত্যিক প্রসঙ্গ এনেছেন, তাঁর সমস্তের সঙ্গে পরিচয় রাখেন এমন বাঙালী খুব কমই আছেন। কিন্তু সে-সঙ্গে বইয়ের বক্তব্যের ব্যাপা হয় না—পার্বত্য নবী গতিবেগের মধ্যে পাথরের চাবড়ার মত হয়তো মনে হবে তা বাধা সৃষ্টি ক'রছে; কিন্তু কার্যতঃ তা করে না—বইয়ের বক্তব্য নৃত্যময় গতিবেগকে আরও সুস্থর আর চিত্রিত্যবৃত্ত ক'রে তোলে। তবে ছাপাখানার কারদাজিতে এই-সব বিষয়ে ভাবার নামের আর বাক্যের বাঙলা প্রতিবর্ণে একটু-আধটু মূল-চুক মাঝে মাঝে এসে গিয়েছে।

লেখকের ব্যক্তিত্ব বা তাঁর বইয়ে ধরা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে আর দুই জিনিস লক্ষণীয়। তিনি একদিকে যেমন international, বিশ্বের একজন, বিশ্ব-মানবিকতার ভাবপূর উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় আর ইন্দো-ব্রাহ্মণ তিনটা সভ্যতার বাহু ইতিহাস আর স্বপ্ন আর তাঁর ভিতরের কথা সব নথ-বর্ণনে রাখেন,—তিনি ইতিহাস, বর্ণন আর সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, বাঙলা (প্রাচীন আর আধুনিক), সংস্কৃত, ফারসী, আরবী আর তা ছাড়া অন্ত কতকগুলি সাহিত্যের হাওয়া আর তাঁর ধরাবাক্য আর বচন তাঁর মনের মূলবাগানে সৌরভের মত ভেসে বেড়াচ্ছে—তাঁর কাছে গোঁড়াধিব লেশমাত্র নেই।—আর অন্যদিকে তিনি হ'চ্ছেন তেমন খাঁটা বাঙালী—কেবল খাঁটা বাঙালী নয়, খাঁটা মুসলমান বাঙালী; তিনি নিজে মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্মের গোবধে, "বে মহিহি", নিম্ন মহিবার প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁর আত্মজাতিকতা, বাঙালী মুসলমান জাতীয়তার চিহ্নের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত; সেইজন্য তাঁর আত্মজাতিকতা এত পাকা : কারণ এই কথাটা অতি সত্য কথা—*he alone is truly international who is most intensely national*. যাকে যাকে যখন তিনি দুই-চার বার তাঁর নম্র গভীরতম প্রশ্নেরে বাতায়নপথ একটু-আধটু উজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন, তখন মুসলমানী রঙে রঙানো অস্বচ্ছন্দ্য বা বসোপলভির তলক চোখে লেগেছে :—আমি বাঙালী হিন্দু ধর্মের ছেলে, এতে দুইই হ'য়েছি; কারণ আমি একক তো চাই-ই, বহু আর বিচিত্র সেই একেই প্রকাশ ব'লে পৃথক-পৃথক ভাবে এই বহু ও বিচিত্রকেও আমি চাই।

বইখানি থেকে বহু বহু অংশ প'ড়ে পোনাবার বা উদ্ধার ক'রে বেধার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ক'রবো না। "বেশে বিশেষে"—তে অপূর্ণ ভোজ্যলভ্যার সংস্কৃতিকারী বাঙলা-পড়িয়ে' বাহুবের দ্রুত পরিবেশিত হ'য়ে র'য়েছে; আমি সন্মতকে তাতে ব'লে বেতে আনান কবি।

ঐশ্বরীভিক্রম চট্টোপাধ্যায়

কল্ককারার দিনগুলি : ঐবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। সিগনেট গ্রেস, ১০১২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

দুয়ারাবিহীন : ঐরুকা হাতিসিং। সিগনেট গ্রেস, ১০১২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

শৃঙ্খলকংকার : ঐবীণা দাস। সিগনেট গ্রেস, ১০১২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

জেনালা কাটক : ঐগানী চন্দ। মডার্ন বুক্‌স লিমিটেড, ১৮০১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

কাব্যসাহিত্যে পুরুষের দান ইতিমধ্যেই সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশেষ করিয়া বাংলায়। বাংলার বহু বিদ্যবী তাঁহাদের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক বাংলাসাহিত্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা ঐউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' নিঃসন্দেহে প্রথম ও প্রধান পুস্তক। ঐউল্লোল্য চক্রবর্তীর 'জেলের ত্রিশ বছর'কে আমরা আপাততঃ সর্বশেষ ও প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। একমাত্র বাংলাদেশেই লক্ষ্যক নরনারীর জেল-জীবনের কবচের অভিজ্ঞতা বহিরাছে। ইহাদের মধ্যে বহু লেখক এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে স্থায়ী ভূমি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এতদিন পুরুষের একক দানেই কাব্যসাহিত্যে পুষ্টি হইয়া আসিয়াছে। অধুনা কয়েকজন মহিলা নিজেদের রচনার সাহিত্যের এই দিকটি সমৃদ্ধি ও পুষ্টি বিশেষভাবে সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা জেল-জীবনের যে-দিকটি উন্মোচিত করিয়াছেন, তাহা এককাল অনাবিষ্কৃতই ছিল। এক্ষেত্রে নারীপ্রতিভা ও মহিলা লেখকেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন আশাতিবিক্রম্যভাবে তাঁহারা সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নেহরু-পরিবারের বিজয়লক্ষ্মী ও রুকা এবং বাংলার বীণা দাস ও গানী চন্দ—এই চারজন লেখিকার দান এই প্রসঙ্গে স্থায়ী কীর্তির মর্যাদা লাভ করিবে।

বিজয়লক্ষ্মীর 'কল্ককারার দিনগুলি' (Prison Days) কারা-জীবনের যোজনামালা। এই কারণেই ইহার পরিধি ও বিস্তৃতি স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। ভূমিকাতে লেখিকা বলিয়াছেন, "জেল-খানার প্রাচীরের অন্তরালে যা ঘটে, তা জানতে থাকা উদ্ভ্রম, তাঁদের কাছে এই বইখানি আমি নিবেদন করছি।" কিন্তু বইখানির প্রকৃত আবেদন অন্যত্র। এই ভাষারি আড়ালে নেহরু-পরিবারের অন্তরীকী উপস্থিতিই পুস্তকখানির মূল আকর্ষণ। অন্ততাবে বলা চলে যে, পুস্তকখানির আকর্ষণ ব্যক্তিগত। বিজয়লক্ষ্মীর মধ্যে যিনি যাতা, তাঁহার মনটি এই পুস্তকের আশ্রিত একটি কলম ও স্তম্ভ দ্বারা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। লেখিকার যাতপরিচয়ই এই যোজনামালায় অমূল্য সম্পদ। পুরুষের বিশেষ কোনো পরিচয় নাই, শিতা-পুত্র-ভাই ইত্যাদি কোনো পরিচয়েই পুরুষের পার্শ্বত্ব বা চরিতার্থতা বহন করিতে পারে না। কিন্তু বেদেরের ক্ষেত্রে যাতপরিচয়ে তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বের চরিতার্থতা ও পূর্ণতা পরিচুই হয়। 'কল্ক-কারার দিনগুলি' কাব্যসাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, তাহা এই যাতপরিচয়ের জন্তই। লেখক পুরুষপ্রতিভাতেও ইহা সন্তুষ্ট ছিল না।

‘ছায়াবিহীন’ (Shadows on the Wall) সাহিত্যের বিচারে ‘কন্দকার্য দিনগুলি’ হইতে শ্রেষ্ঠতর। কুলা বাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা অকণ্ঠ সাহিত্য। বিধর-নির্বাচনে কুলা যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সাহিত্যিক মন ও শক্তি দুইয়েরই পরিচায়ক। ‘ছায়াবিহীন’ কাব্যজীবনের বোধনামায়া নয়, ইহা কাব্যকাহিনী এবং তাহার চেহেও অধিক কিছু। জ্ঞানবাসের অভিজ্ঞতা-অধনমনে সেবা বাঘোটি সত্যমূলক কাহিনীর সমষ্টি এই ‘ছায়াবিহীন’। ইহা একাধারে সত্য ঘটনা ও সাহিত্য, এইখানেই পুস্তকখামির সার্থকতা ও মৌলিকতা। ‘ছায়াবিহীন’ চিত্র-চিত্রশালা।

‘ছায়াবিহীন’এর গল্প কয়টি উদ্ভেদমূলক, পুস্তকের ভূমিকাতে সেখিকা নিম্নেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “বাহীনতাপঃপ্রাণের সেই অসংখ্য মজ্জাত যোদ্ধার প্রতি আঘাত অকৃত্ত প্রভা করেকটি জীবনের কাহিনীর মধ্য দিবে নিবেদন করলাম।” এই উদ্ভেদ অশান্তিবিহীনভাবে সিদ্ধ করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। ‘চিত্রা’ নামক গল্পটিতে একটি মল্লবরজা বদেঈ বেবের বে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মর্যস্পর্শী ও মর্যস্বিক। অস্তঃসকা অবস্থার যেরেটির জেল হয়। বানী কঃপ্রেলকর্মী ও পাশীপদী হইয়াও বোমার মামলার অভিযুক্ত হন। স্ত্রী নিকট হইতে পবনঃপ্রাণের উদ্ভেদে পুলিস মেয়েটিকে স্তানাস্বিত করে এবং প্রতিজ্ঞাতি দেয় যে, তার বানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যই এই ব্যবস্থা। আগ্রহ উৎসৃকা ও উৎকর্ষ। লইয়া মেয়েটি অবশেষে এক জেলের নির্জন সেল-এ আসিয়া আসক্ত হয়। তথাকার মেইনের হাতে চিত্রাকে শায়েজা করিবার তাব দেওয়া হয়। তাবপর নির্জন সেল-এর নৈশ অভকায়ে যে বীভৎস ও অমানুষিক অভ্যাচারের বর্ণনা সেখিকা দিয়াছেন, তাহা মনকেবই মর্ভা-বর্ণনা।— “পরদিন বদন সেল-এর বরজা খোলা হল, তখন তীর জরে তার গা পুড়ে দাচ্ছে, প্রলাপ বকছে অবিরত, বৃত সপ্তানের বেটাকে তখনো অচেতন হাতে আঁকড়ে বসেছে।” এই গল্পটি যিনিই পাঠ করিবেন, তাহারই স্মৃতি চিরকালের জন্য একটা মর্যস্বিক বেদনা ও অসহনীর কোথ একদশে বহন করিতে বাধ্য হইবে।

জেল-জীবনের কি গভীর দুঃখ ও কি নির্বাসনের মধ্য বিদ্যা করেকটি মহিলাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, বদেঈ গল্প কয়টিতে তাহা বর্ণিত ও ব্যক্ত হইয়াছে। কাহিনী কয়টিই এমন যে, তাহারা নিজেহাই নিজেদের বক্তব্যপ্রকাণে সক্ষম, শিল্পীর তুলির কোনো অপেক্ষা করে না। একটি গল্পে (‘সখী’) কিন্তু কুলা অগাম্যস্ত শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই একটিমাত্র গল্পের জন্যই কুলা সাহিত্যিক-প্রতিভা দাবি করিতে পারেন।

‘ছায়াবিহীন’ সাধারণ ঘের-করেসীয়েব লইয়া যে কয়টি গল্প বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও উদ্ভেদ-মূলক। সমাজব্যবস্থার মধ্যে কত বড় অবিচার ও নির্বাসন গৃহ ও সক্রিয় বহিরাছে, এই গল্প কয়টিতে সেপের দৃষ্টি সেখিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই গল্পকয়টিও নিজস্ব কাহিনীতে সম্পূর্ণ প্রকাণের জন্য সাহিত্যিকের লেখনীর বিশেষ আবশ্যক করে না। কুলা এই কাহিনীগুলিকে বেদনা ও মননের দৃষ্টিতে সেখিয়াছেন। কলে, ইহার আবেদন আরও মর্যস্পর্শী ও দ্বারী হইয়াছে। ‘ছায়াবিহীন’ সত্যকার কাব্যকাহিনী। ‘কন্দকার্য দিনগুলি’ হইতে ‘ছায়াবিহীন’ সাহিত্যিক মানসও যেমন শ্রেষ্ঠতর, সমাজনাঃস্বারকের দৃষ্টিতেও ইহার দ্বারা সমর্থক। কুলা বচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, আনন্দের চেহে বেদনাই তার লেখনীমুখে অধিকতর ব্যক্ত।

চারজন লেখিকার মধ্যে দুজন নেহরু-পরিবারের ও দুজন বাংলায়— এই আকস্মিক বিভাগের আড়ালে একটি বাস্তব বিভাগও পরিস্ফুট হয়। বিষয়লব্ধী ও কৃষ্ণা উভয়েই রচনা বিদেশী ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু বীণা দাস ও রানী চন্দ্র উভয়েই মাতৃভাষা বাংলাতে তাঁহাদের কাব্যকাহিনী রচনা করিয়াছেন। নেহরু-ভ্রম্মির এই বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞাতা অহরহালেরই পরাম্ভ অঙ্গবৎ করিয়াছেন। পাকীস্তানী পর্বত তাহার বিখখ্যাতে আত্মজীবনী 'সত্যের পরীক্ষা' মাতৃভাষা গুজরাটিতে লিখিয়াছিলেন, ইহা মনে রাখিলে বাধা হইয়াই যত্নবা করিতে হয় যে, বিষয়লব্ধী ও কৃষ্ণা উভয়েই দৃষ্টি প্রকাশের চেয়ে প্রচারের দিকেই অধিকতর নিবদ্ধ। নেহরু-ভ্রম্মিরের হৃদয়ে সত্যকার মাতৃভাষা কিছু নাই, থাকিলেও তাহাকে উভয়ের কেহই প্রত্যাহা সহিত আশ্রয় করিতে পারেন নাই, এই অভিব্যক্তি হৃৎকৃত্যভাষেই উপাধিত হইতে পারে। বাংলাভাষাতে যিনি নেহরু-ভ্রম্মিরের পুস্তক দু'খানি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তুল রচনার লেখিকাদের চেয়ে এই দিক দিয়া তাঁহাদের কৃতিত্ব কম নয়।

বীণা দাসের 'সুখলকংকার' নিঃসন্দেহে 'কঙ্ককারার দিনগুলি' ও 'ছায়াবিহীন' হইতে বহুতর এবং সমধিক দূরীকৃত জ্যেষ্ঠতর পুস্তক। কিন্তু 'সুখলকংকার' নিম্নক কারাগাহিত্য নহে। পুস্তকের মাত্র এক-চতুর্থাংশ জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ব্যক্তি হইয়াছে। 'সুখল-কংকার' আসলে বাংলায় একটি বিদ্রবী বেষের আত্মজীবনী। ইহাও আবার মূলে রাজনৈতিক আত্মজীবনী। সুখল-কংকারের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঠকের উৎস্রুত ও আগ্রহ আশ্রয় অস্বল্প থাকে, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। পুস্তকখানির কোথাও ছন্দগতন নাই। ভাব ও ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য পুস্তকখানির দ্বিতীয় কৃতিত্ব। স্টাইলেই নাকি সাহিত্যিকের পণ্ডিত। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, বীণা দাসের স্টাইলটি বেগবান ও প্রাণবান একটি পার্বত্য নদীর সঙ্গে তুলনীয়। বীণা দাসের ভাষা ঐশ্বর্যবল।

বীণা দাস আত্ম-সচেতন লেখিকা। আত্মজীবনীর যে বৈশিষ্ট্য অস্বল্প, তাহা বীণা দাসকে অস্বল্পী করিয়াছে। নেহরু-ভ্রম্মির হইতে বীণা দাস সমধিক অস্বল্পী এবং সমধিক গভীর। কৃষ্ণার 'ছায়া-বিহীন' উল্লেখযোগ্য, বীণা দাসের 'সুখলকংকার' আদর্শপ্রণোদিত। বিশেষ একটি আদর্শের বেস অথবা ভাষাভাষা তাঁহার রচনাতে যুক্ত। বিদ্রোহী ও বিদ্রবী যনেরই সেই আদর্শ। এই কারণেই ইহা আত্মজীবনী হইয়াও অসম্পূর্ণ প্রাণজীবনী— জীবনের বৃহত্তর অংশ পুস্তকের সীমানার বহির্ভূতই রহিয়া গিয়াছে, এবং সাহিত্যরচনা হইয়াও ইহা অসম্পূর্ণ সাহিত্য নহে, কেবল রাজনৈতিক সাহিত্য। 'কঙ্ককারার দিনগুলি'তে বিষয়লব্ধীর মাতৃপরিচয় যুক্ত, 'সুখলকংকার' বীণা দাসের বিদ্রবী ও সমাজসেবিকা পরিচয়টি অভিযুক্ত। যেখানে বীণা দাস তাঁহার পিতৃ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, সংসারের সেই ব্যক্তিগত আবেদনীয়তা তাঁহার কল্পাপরিচয় প্রস্তুট এবং 'সুখলকংকার' সেখানে প্রকৃত মনোবিশ্লেষণের দ্বারা উন্মীত হইয়াছে।

জেল জীবনের দুঃখ ও ক্লিষ্টাভাবের বর্ণনা চারজন লেখিকাই কম্পাশি দিয়াছেন। সাধারণ কয়েদীদের কাহিনীও চারখানি পুস্তকেই অল্পবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জেল-জীবনে জেল-কর্তৃপক্ষের অসঙ্গ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রতিবাদ ও দ্বাণবরণ একমাত্র 'সুখলকংকার' পাই। বীণার মানসিক গঠন বিদ্রবী, এই কারণেই তাঁহার রচনাতে অসঙ্গা ভীতভ্রাতা এবং ভিক্ষুতাও প্রথমভাবে প্রকট। সাহিত্যের মানদণ্ডে ইহা হৃদয়ে ক্রটি বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু পাঠকের মনে একটি বলিষ্ঠতায়

অতি-বদ 'সুখলকংকার' হঠাৎ অলক্ষ্যে সূক্ষ্মভিত্তি হয়, ইহাও তুচ্ছ করিবার যত ব্যাণাস নহে। 'সুখলকংকার'ের উপসংহারে আদিয়া দেখা যায় যে, শেষ হইয়াও তাহা শেষ হয় নাই। যে বীণা হাস ঘেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর যে বীণা হাস মুক্ত হইয়া আসিলেন, এ দুজন এক হইয়াও এক নহেন। অধিকতর গভীরতা, অধিকতর সংহত প্রাণবেগ এবং অধিকতর মানসিক সমৃদ্ধি লইয়া এক অপরোক্ষের ব্যক্তিগত কাব্যের অৰ্ণব ত্যাগিরা নির্গত হইয়াছে। 'সুখলকংকার'ে গতি এখনও অব্যাহত কিন্তু পূর্ত্যাপ্রাপ্তি এখনও দূরে।

রানী চন্দ্রের 'জেনানা কাটক' কাব্যসাহিত্যে অসুখী স্ত্রী। বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা নেহরু-পরিবারের দান এবং বীণা হাসকে বলা চলে বাংলার বিপ্লবের দান, আর রানী চন্দ্রকে বীরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মুক্ত দান; কবির কাছে তিনি লইয়াছেন ভাবের সীমা, আর শিল্পীর কাছে লইয়াছেন রূপের সীমা। তাঁহার এক চোখে রসের দৃষ্টি, অপর চোখে রূপের দৃষ্টি। এমন মিলন ও সমন্বয় বাংলাসাহিত্যেও খুব বিরল। 'কঙ্ককারার বিনপুলি' ও 'ছায়াবিহিন্দে'র শিল্পে উদ্বেজের সাক্ষাৎ মিলে, আর 'সুখলকংকার'ে পাওয়া যায় একটি আদর্শ; কিন্তু 'জেনানা কাটক'ে শিল্পে কোনো উচ্চতর বা আদর্শ নাই। 'জেনানা কাটক' লভ্যকারের কাব্যবাহিনী। 'সুখলকংকার'ে স্ত্রীর কোনো বাস্তবীতি বা কোনো মতবাদের 'জেনানা কাটক'ে নাই। 'সুখলকংকার' এবং কতকংশে 'কঙ্ককারার বিনপুলি'তে দালা, শাপনকর্তৃগণের বিলম্বে বিষয়ে ও তিস্ততা পরিদৃষ্ট হয়—'জেনানা কাটক' তাহার বিপরীত স্পর্শ নাই। স্বাধীন পুরুষের কোথাও জেল-কর্তৃগণের বিলম্বে কোনো অভিযোগেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অথচ 'জেনানা কাটক'ে জেল-জীবনের দুঃখ ও কষ্টের বিবরণের কিছু কোনো অস্তাব নাই। সাধারণ ঘরে-করেই, যেইন, অসামান্য ইত্যাদি লইয়া 'জেনানা কাটক' আপনাকে স্বয়ংপূর্ণ একটি উপনিবেশ। 'ছায়াবিহিন্দে'কে বলা হইয়াছে চিত্র-চিত্র। জুলনাথ 'জেনানা কাটক' একটি চিত্র-প্রদর্শনী। 'ছায়াবিহিন্দে' কৃষ্ণা যেট বাতোটি ঘেরে-করেইর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, 'জেনানা কাটক'ে অগণিত করেইর ও আরও অনেকের জীবন-চিত্র অঙ্কিত। রঙে, বেগায়, মনে রানী চন্দ্রের চিত্রগুলি এক জীবন্ত যে, কৃষ্ণার 'লক্ষী' চিত্রটি ব্যতীত আর সবগুলিই ইহার তুলনার দ্বারা ও নিপুণ। 'জেনানা কাটক'ে বহু বৃহৎ উপস্থানের মালমগলা ও উপকরণ বহির্বিহীন। 'সুখলকংকার'ে বেশি গতি ও বেগ, কিন্তু এই গতির মধ্যে একটা ভীততা ও ভাঙ্গা গতিদৃষ্ট হয়। আর 'জেনানা কাটক'ে পাই একটি চরম প্রশাসি।

বীণা হাস, কৃষ্ণা, বিজয়লক্ষ্মী তিনজনেই সমতাপীড়িত, কিন্তু রানী চন্দ্রের মন সমতাপমুক্ত। 'সুখলকংকার' ও 'কঙ্ককারার বিনপুলি'— দুইরই গৈরিকার মাস্তুলচেতন এবং আনন্দোজ্জ্বল। রানী চন্দ্রের মন সংবেদনশীল এবং তাহার গর্ভবেদনশক্তি তীক্ষ্ণ। এই শক্তিই তাহার রূপসামনের অর্থাৎ জুলির সিদ্ধি। ইহার সবে 'মুক্ত হইয়াছে তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ। এই দুই শক্তির পরিচয় 'জেনানা কাটক'ে য় প্রায় পাতারই পাওয়া যায়। 'ছায়াবিহিন্দে' কৃষ্ণার রচনায় আনন্দের চেয়ে স্তব্ধতার প্রকাশ অধিকতর—'জেনানা কাটক'ে রানী চন্দ্রের রচনায় শান্তি ও আনন্দশক্তি অধিকতর অতিব্যক্ত— স্বপ্ন, হৃৎ, বেদনা ইত্যাদি সেই আনন্দ ও শান্তির আকারে অগণিত-জীবনকার যত প্রস্ট। বীণা হাস, কৃষ্ণা ও বিজয়লক্ষ্মী— তিনজনেই রচনাতে হস-বোধ (humour) অগণিত-প্রকাশিত। কিন্তু এখিক দিহা 'জেনানা কাটক' রসের ভাণ্ডার। রচনাসাহিত্য হিসাবেও তাই 'জেনানা কাটক' বাংলাসাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর আদন দাবী করিতে পারে।

সর্বশেষে 'হেনানা কাটকে'র একটি বিশেষ ক্রটির উল্লেখ আবশ্যিক। ইহাতে সাধারণ কয়েদীদের কাহিনী লইয়া মাকে মাকে ঘটনা ও অবস্থার পুনরাবৃত্তি পরিলভ্য হয়। পুত্রকের পর্বতভী পংক্তিতে এই ক্রটি বর্ণিত হইবে, ইহাই আশা করি।

ঐজমলেদু হাসগুজ

ত্রেণ কাল পাত্র। জীয়েনকাঠি: ঐজমলশচর রার। তি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কন'গ্যালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকটি পাঁচ টাকা।

জ্ঞানান্তিকে: ঐমজিত দত্ত। মিস্ত্র-সাবলিন্দার, ২০২ রাসবিহারী অ্যাটিনিউ, কলিকাতা। মূল্য পঞ্চ টাকা।

ব্যক্তিগত: ঐবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১২ বার্ডলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাংলাদেশে প্রবন্ধপুস্তক সংগ্রাহ অল্প কিন্তু গুণে ভাষি। প্রবন্ধ বলতেই আমরা বুঝি তথ্যবহুল তত্ত্বগতীয় এক ধরনের সাহিত্য। সেক্ষেত্রে গল্পের মতো বিখ্যাত 'গোয়ার তাল'— যেমনি মোটা তেমনি ভাষি। মিনি গল্পের তাঁর গুণে বাড়ি, তপ বাড়ি কি না সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে, গোল্ড এক জিনিষ, গল্পনা আরেক; একটির মূল্য গুণে, আরেকটির মূল্য কাঁচশিল্পে। গোল্ডনাগাই যেমন গল্পনা নয়, প্রবন্ধনাগাই তেমনি সাহিত্য নয়।

আমাদের দেশে প্রবন্ধ ছিল পাণ্ডিত্যের বাহন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকে পাণ্ডিত্যের বোকা থেকে মুক্ত করেছিলেন, আর বীরবল প্রান্ততত্ত্বের মারমতে তাঁর প্রকৃতি ঘিরেছিলেন বললে। এঁদের প্রবন্ধের মধ্যে কোনো তত্ত্বকথা থাকত না বললে ভুল বলা হবে। তত্ত্বকথা তাঁরাও বলেছেন, তবে তাকে মনে জুড়িয়ে পরিবেশন করেছেন। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে লিখকের আবেশ আছে। আর বীরবল তাঁর চুম্বকি বসিয়ে বসিয়ে প্রবন্ধকে অলম্বনে অলম্বনে করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। গভীর হয়ে গভীর কথা বলাকেই আমরা প্রবন্ধরচনার আট বলে জানতুম, কিন্তু হাতী হয়েও যে গভীর কথা বলা চলে সে কথা আমাদের জানতে বাধি ছিল।

আজকাল যে প্রবন্ধকে আমরা রসসাহিত্যের আদরে স্থান দিই সে প্রবন্ধ ব্যক্তিবিশেষের খোয়ালি চিন্তার কণকালীন বহিঃস্থরূপ: ইংরেজিতে যাকে বলেছে a loose galley of the mind। এ জাতীয় প্রবন্ধকার আগে লেখক, পরে লেখক। তাঁর মন মজলিশি মন; বুদ্ধ-মজলিশে বেঁধা হসিইে তাঁকিয়ে বলতে ভালোবাসেন সে কথাই ফুটাই মজলিশি অর্থাৎ বিশ্বস্ততার পাঠকসদর্পকে উদ্দেশ্য করে লিখে থাকেন। এ ধরনের লেখার আসল রূপটি হচ্ছে মজলিশি রূপ। আর মজলিশি মাহুকের প্রধান ভাগ— তিনি স্রোতা কিংবা পাঠকের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার স্পর্শ স্থাপন করতে পারেন। এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধকে নাম সেও গায়েছে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। লেখার অন্তরালে লেখকের অন্তিপ্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বটিই এর প্রধান আকর্ষণ। বাক্য এবং অর্থে যেমন সংপৃক্ত, এখানে ব্যক্তি এবং বক্তব্যে তেমনই সঙ্গীতি।

পাণ্ডিত্য নিয়ে এই অন্তরঙ্গ দুইটি কোটানো সম্ভব নয়। কারণ, পাণ্ডিত্য লেখক এবং পাঠকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। তাছাড়া এজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অবকাশ তেমন প্রাপ্তও নয়। কেননা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হচ্ছে এক ধরনের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ— কেবলমাত্র স্বার্থ বোধে কথা বলে যাওয়া : বলটা এই কথা, বিদ্যবস্ত্র পৌণ। পদ্ম হাওয়ার মাথার টুপি উড়ে গেছে, টুপির মালিক তার শেফর শেফন ছুটেছেন। এই পুত্র নিয়ে ইংরেজি ভাষার অনবদ্য রচনার সৃষ্টি হয়েছে। যৎসামান্য ব্যাপারও যে কত অসামান্য হতে পারে এল লেখা তার প্রমাণ। ল্যাম্ব, স্টিভেন্সন এ জাতীয় সাহিত্যের পথিকৃৎ ; চেস্টারটন, বেলক, লিও, গার্ডিনার এঁদের উত্তরাধিকারী। আমরা যাকে trifles বলি সে যে কতখানি "tremendous trifles" হতে পারে এঁরা তাই আমাদের শিখিয়েছেন। এঁরা যা-তা নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু কল্পনাকালেও যা-তা লেখেন নি। বরং এসে লাগিতো কেঁতুকে এল রচনা সাহিত্যের ধরনকে প্রথমজ্যেষ্ঠীর আসন পাবার যোগ্য। একটি কথা এঁরা খুব ভালো করে জানেন যে এজাতীয় লেখার মধ্যে লজিকের চেয়ে মালিকের প্রয়োজন বেশি। বলা বাহুল্য, এখানে মালিক মানে বস।

এর ব্যক্তিগত স্বভাবের কথা পূর্বেই বলেছি। কোনো কোনো সমালোচকের মতে এজাতীয় প্রকাশেরা অত্যন্ত বেশিদূর পর্যন্ত অসঙ্গত ; অর্থাৎ কি না, এঁদের লেখার মধ্যে উত্তমপুরুষেরই প্রাধান্য। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্রষ্টা ক্যানি সাহিত্যিক বন্টেন ; তিনি গোড়াতেই বলে দিয়েছেন "It is myself that I portray"। ইংরেজ প্রবন্ধকার জে. বি. প্রিস্টলির মতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্বন্ধে এটিই প্রথম এবং শেষ কথা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রবন্ধকার যখনই হচ্ছেন হিতো, তাঁকেই কেন্দ্র করে সমস্ত চুনিয়া চলছে। প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁরই আনন্দবিভবের টুকরো অংশ। ল্যাম্বের প্রবন্ধাবলী তাঁর আনন্দবিত ছাড়া আর কী ? প্রত্যেকটি পাতা সৃষ্টিবিভবের সিদ্ধ। কোথাও ছাড়া কেঁতুকে উজ্জল, কোথাও অন্তরালে সজল। নিজের ভালো লাগা না-লাগা নিয়ে সবকিছুর বিচার। তার ফলে এঁদের মহামত অল্পবিস্তর একপেশে হতে বাধ্য। কিন্তু তাতে কিছুই ব্যর্থ আসে না। ইনি যা বলছেন তা দুজিগ্রাস্য কি না লেখা অবাস্তব, সবটা মিলিয়ে তিনিসটা বসগ্রাস্য কি না সেটাই বিবেচ্য।

উপরে যেন যত্নব্য করেছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে প্রীত অন্তরঙ্গতার যারের 'সেন কাল পাত্র' এবং 'জীবনকাঠি' গ্রন্থ এই জাতীয় প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর বিদ্যবস্ত্র আর-দুখানা বইএর মতো আটপোরে নয়, কতকাংশে একটু বরং গুরুগম্ভীর। কিন্তু আলোচনার দুইটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এমন কি অন্তরঙ্গ বলেই সব কথানা গ্রন্থকে একত্রে গ্রন্থিত করা হয়েছে। 'সেন কাল পাত্র'র প্রথম প্রবন্ধ 'জন্মবৃত্তান্ত' 'পথে প্রবাসে'র দ্বারা লেখা। অল্প এতদ্বারা সেন বলতে যেন, কালও অশ্রুতকৃত হাল আনন্দের, এবং পাত্রও সকলেই লেখকের মিত্র— অনতিদীর্ঘ বোধাই-এবাদের অভিনব স্বর্ণপট্টা বিবরণ। অন্তরঙ্গ প্রবন্ধে লেখক একালের সাহিত্যবীতি কিংবা রাজনীতি সমালোচনা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন, কিন্তু নীতিবোধিতা করেন নি। হিতকথা যদি বা বলেছেন বাচনভঙ্গির গুণে আলোচনা যথার্থই মনোহরী হয়েছে। ভাষায় অলংকরণের ঝিক থেকে অন্তরঙ্গতার বাংলাসাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাবশিল্পী। ছাথের বিষয়, 'সেন কাল পাত্র' এবং 'জীবন-কাঠি'র অধিকাংশ রচনা অভিনব কৌশল। প্রবন্ধের কাব্য পরিচুত হবার আগেই ছায়ায় মিলিয়েছে।

বক্তব্যকে তিনি সবিভাৱে ব্যক্ত কৰে বুলেন নি। মনে হয়, কথাৰ বৈশেষ্য কথা বুলে বাওঁদাৰ হাত তীব্র নহ। হতটুহুৰ আভাশ বেন ততটুহুৰ প্ৰকাশ কৰেন না। অস্ত্ৰ তা শত্ৰু অৱশ্যেই লেখাৰ মধ্যে তাঁৰ বজাবলৈ গঢ়িহুট। আত্মকালৈৰ অধিকাংশ লেখক যোগো-মানা হৃদয়ীৰী, চৰমবক্তাকে তাঁৰা অৱস্থা কৰে থাকেন। অৱশ্যেই লেখাৰ মধ্যে একমিকে চৰ্ণত অভিভূতা অশ্লিষ্ট হৃদয়তাৰ ব্যক্তি মিলন ঘটেছে। মননশক্তিৰ প্ৰবৰতাৰ এবং চৰমবুদ্ধিৰ অহৰণে প্ৰত্যেকটি হৃদয় প্ৰাণৰূপে উল্লিখিত। পাকী, বৰীপ্ৰনাথ, বলাই আলোচনাৰ লেখক অস্ত্ৰপ্ৰি় পঢ়িছা দিয়েছেন। এই তিনি মহাপুৰুষৰ মধ্য বিধে এ হৃদয়ৰ বাহুৰ বিশ্বজন ধৰ্মন কৰেছে— সে কথাত লেখক অনবদ্য ভাষাৰ প্ৰকাশ কৰেছেন।

শ্ৰীযুত অজিত সত্তৰ 'জনাঙ্কিত' শাস্তি অনতিদীৰ্ঘ প্ৰবন্ধৰ সমষ্টি। এখানে ব্যক্তিগত দুইটি সৰ্বব্যাপী। প্ৰথমে প্ৰথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত একটি অত্যন্ত মিষ্টাৰী এবং সুস্থতাৰ ব্যক্তিৰ পঢ়িছা মেলে। দুইটি প্ৰবন্ধ নিত্যই আটপোৰে বিবৰ নিৰে লেখা— যেনলাই এবং ঘটি; কিন্তু প্ৰকাশকৰি শুণে তা যে স্নোতীৰ্ণ হয়েছা তসিক পাঠকমাজেই তা স্বীকাৰ কৰেন। অস্ত্ৰ প্ৰবন্ধ ক'টি একটু শুকগতীৰ বিবৰক হলেও আলোচনাৰে অথবা পাঠীৰ্ণভাৱাক্ষৰ কৰা হয় নি। অজিতবাবু কবিপ্ৰকৃতিৰ মাহুৰ; কাৰেই তাঁৰ প্ৰবন্ধে, এমন কি বেথানে তৰ্ক এবং তাতিকৈৰ কথা বুলোছেনও লেখানে, কোমৰ ঠেং তৰ্ক কৰতে বুলেন নি। এলৰ লেখাৰ বুদ্ধিতৰ্কৰ কোনো প্ৰয়োজন থাকে না, মন এবং লেখনীকে বুদ্ধি হিতে পায়লৈই হল। বুদ্ধিৰ কথাতোহা হলালোচনা কখনো এসোয় না, বৰং বাধা পাৰ। এই কথাটি অজিতবাবুৰ জানা আছে। কবিমহী মাহুৰ বলে তাঁৰ লেখাৰ লিখিতৰ দ্যাকটাই বেলি। কাৰেই একটু অভাৱ আছে। সামান্ত একটু ভাললগা মেশাতে পায়লে জিনিসটা বোধ কৰি মাৰেকটু মুখৰোটক হত।

উপায়াক এৰ কথানাত মধ্যে শ্ৰীযুত বিমলাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়ৰ 'ব্যক্তিগত' প্ৰবন্ধ। আশা কৰি, এই প্ৰবন্ধ ইতিপূৰ্বেই বসিকলমাহেৰ পুষ্টি আকৰ্ষণ কৰেছে। প্ৰথমে প্ৰকৃতি নামেৰ মধ্যেই পুচিত। প্ৰত্যেকটি প্ৰবন্ধেৰ আখ্যানবৰ আটপোৰে, কিন্তু আখ্যানপ্ৰণালী আভিভাৱপূৰ্ণ, বিবৰ মনেৰ পঢ়িছা প্ৰতিচ্ছব। প্ৰবন্ধৰ নিজেই বুলেছেন— "অনেকদিন ধৰে যা বেবেছি জাহট কিছুটা মুক্ত বনে বন্ধাৰ চোটা কৰছি।" সে চোটা যে পাৰ্থক্য হয়েছা লেখা বলাই বাহ্য। লেখক চোখ দিয়ে যা বেবেছেন মন বিৰে তা চোখে নিৰেছেন। সন্ধান পুষ্টি আৰ সজীৱ মনেৰ মিলনে সত্যিকাহেৰ বসন্তই হয়েছা অৰে মূৰে কঁতে মিলিৰে হলেৰ বৈচিত্ৰ্য সৃষ্টি কৰেছে। ইনি ওপৰ্ণীৰ কথক মাহুৰ, কথা বলাৰ আট লেখনীমূৰে ধৰা দিয়েছে। জিবেৰ শুণৰ বেথবা অনায়াসে আনে কলমেৰ ভণাৰ লেখা অনায়াসে এসে তৰেই লেখা প্ৰাণ পাবে। বিমলাপ্ৰসাদ সেই দুৰ্গত কমতা অৰ্জন কৰেছেন। এই ভৰ্তই প্ৰথমে প্ৰত্যেকটি লেখা পাৰ্থক্য হৃদয়। বিশেষ কৰে ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধেৰ আগৰে 'গোলবাধি' বাগ্যসাহিত্যেৰ অন্ততম প্ৰেৰ সামগ্ৰী। এককালে আমবা যে গোলবাধীকে জানতুম সেই গোলবাধী কথকালেৰ অন্ত আনাসেৰ চোখে প্ৰত্যেকজন লাভ কৰেছে। গোলবাধীৰ রূপ বলাৰ নি, কিন্তু অৰ্জন বুলেছে।

বিষয়বস্তুনির্ধাৰে বসন্তকী সত্ত্ব কি সত্ত্ব নয় তাবাই মধ্যে ভাষার আসল শক্তিশীলতা। সুখের বিষয়, বাংলাভাষা সে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে। বাংলা এ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের ভাষাকে প্রথমতঃ এবং দুঃখের কবে তুলেছেন তাঁরা সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন। স্বর্গীয় প্রথম চৌধুরী বিদ্যুৎ বীরবলের চম্পনাথ গ্রন্থ করে আমাদের সাহিত্যে 'বিদ্যুৎ' বা অনোরজন-শিল্পের আদর্শনি করেছিলেন। তিনি গ্রন্থ করে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে 'গুণশাস্ত্র জ্যোত্স্নামো'র বড় অভাব। উল্লেখের সাহিত্যেও যে জ্যোত্স্নামোর স্থান আছে এই মহা সত্যটি তিনি স্বীকার করেছিলেন। বীরবলের হালখাতা রচনা করে তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে, জ্যোত্স্নামো যখন গুণশাস্ত্র হ'ল অর্থাৎ সাহিত্যের প্রসার লাভ করে তখন সেটা আর নিছক জ্যোত্স্নামো থাকে না। এই গুণশাস্ত্র জ্যোত্স্নামো থেকেই belles-lettres নামক সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। বীরবলের পূর্বে এ জাতীয় জিনিস আমাদের সাহিত্যে ছিল না। ফলে জ্যোত্স্নামো বিনিসটাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি নি। সেটা বসি গুণশাস্ত্র হ'ল তাহলেও তাকে স্বীকার করে নিতে আমাদের প্রতি কঠিনতা বাধে। ইরানী অনেকেরই দুটি একিকে মিলিয়ে নিয়েছে। এটা মূলতঃ। যে জ্যোত্স্নামো বসন্তকীর কথা দ্বিগুণে মাত্র সামান্য পরিমাণে গুণশাস্ত্র হ'লে তা যে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং লেখকরা তা প্রমাণ করেছেন। সামান্যতক অসাধারণ করতে গেলে ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট কাকতালী প্রয়োজন। বাংলাসাহিত্যে belles-lettres এর প্রচলন বড় বাড়বে, আমাদের ভাষাগত কাবশিল্পের ততই উন্নতি হবে।

ঐহীরেজমাথ ৩৩

অরুণিপি

ভৈরবী—সাঁপতাল

গান ৷ মহা সিংহাসনে বসি

কথা ও হুব ৷ ববীজনাথ ঠাকুর

অরুণিপি ৷ ঐষ্টমিতা দেবী

মা	মা	মপা	-মপা	মপা	মা	জা	রা	জা	I
ম	হা	সি	ং	হা	স	নে	ব	সি	
কা	সা	সকা	-জকা	মা	জা	কা	কা	সা	
ও	নি	ছ	..	হে	বি	ব	পি	তঃ	
পা	সা	জা		মা	পা	মা	পা	-মপা	সাঁ
তো	মা	রি		ব	ডি	ও	ছ	...	খে
পা	পমা	-বা	-া	মপা	মপমা	-জা	জা	-ওসা	কা
ব	হা	.	ব্	বি	খে..	ব্	ঈ	..	ত
II	।	মা	-মপা	পা	সাঁ	সাঁ			
ম	তো		..	ত	তি	কা			
পঁকা	কা					সাঁ	পঁমা	পা	I
ছ	এ					ঠ	ল	হে	
পা	মা	পমা					জা	-মজা	মা
জা	বি	ও					ত	..	ব
	পা	পঁমা	-পা	মপমা	জা	জা	জা	-ওসা	কা
	হে	ছি	হে	উ..	প	নী	..	..	ত
II	।	সা	সা	-ওসা	রা	জা	জা	মা	-া
কি	ছ	না	..	ছি	চা	হি	যে	.	ব
জা	বা	জা		মজমা	জা	জা	কা	-সা	সা
কে	ব	ল		দ..	র্	ন	যা	.	পি
সা	মা	মাঃ					পঁজা	জা	I
তো	হা	হে					ঈ	ত	

দ্বিতীয় সংখ্যা ।

বহুলিপি

ক	সা	স্বক	-স্বক	বা	জা	কা
এ	সে	হি.	..	তা	হা	বি
।	ক	বা	-ক	বা		
	গ	হে	..	বা		

দাঁ দাঁ
বা বে

পদ্য	-পদ্য	বা	পা	পা	দাঁ	-দাঁ	বা	I
হে.	..	গা	হি	তে	চা	..	হে	
দা		দা	দপদ্য	জা	জা	-জা	কা	II II
ড		ক	তে..	হ	চি	..	ত	

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

‘পালকি-বেহারার গান’

[দরোজিনী নাইডুব Palanquin-Bearers কবিতার অল্পবয়স ‘পালকি-বেহারার গান’ এই সংখ্যার অন্তর্গত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অল্পবয়সটি বঙ্গবর্ধনে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অল্পবয়সকেই নাম প্রকাশিত হয় নাই। তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবর্ধন-সম্পাদক ছিলেন, স্বাক্ষরহীন রচনা সম্পাদক-কৃত বলিয়া অস্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্গবর্ধনেই ইহার প্রতিকূল সূচক আছে, যথা রবীন্দ্রনাথের লেখন গ্রন্থে অল্পবয়স বৃত্তিতে পুনর্মুদ্রিত প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা। স্মৃত্যায় বিষয়টি অল্পসন্ধান-সাধক ছিল। এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্র-তথ্যাহুসন্ধানের পবিত্র ঐশ্বর্যভাষ্য মহানবিশ ও ‘রবীন্দ্রচৌধুরী’-কার ঐশ্বর্যভাষ্য মহানবিশ ঐশ্বর্যভাষ্য মহানবিশ সেনকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা নিয়ে মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা]

১

‘বঙ্গবর্ধন’ চৈত্র ১০১২ সালে প্রকাশিত ‘পালকি-বেহারার গান’ সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন জুগেছ, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

অনেকদিন আগে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটা তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে ঠিক করে নিষেধিসুখ। সেই পুথানো তালিকা একদিন প্রিভিভিটে ছিল। সম্ভ্রতি সেখান থেকে কলকাতায় আনিয়া দেখছি যে ‘পালকি-বেহারার গান’ কবির নিষেধ অল্পবয়স বলে এই তালিকায় লেখা আছে। আমার নিষেধও এই ভাবই স্বরূপ আছে। কবি এই গানটি নিষে ওজর্য্য করেছিলেন—এ বিষয়ে কোনো সম্বন্ধ নেই।

বৈশাখ ১০১৬

ঐশ্বর্যভাষ্য মহানবিশ

২

তুমি জানতে চেরেছ বঙ্গবর্ধনে (১০১২ চৈত্র) প্রকাশিত কবিতা ‘পালকি-বেহারার গান’ কার রচিত। বঙ্গবর্ধনে কবির বেশর রচনা তাঁহার নিষেধ লেখা ভা’তে তিনি লাপ দিয়ে গিয়েছেন, সেসব প্রশ্ন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে। এ কবিতাও তাঁর লাপ দেওয়া।

তাছাড়া কবির কাছ হতেও আমি জেনে নিই যে ওটি তাঁর, কৃত তর্জনা।

গত অক্টোবর মাসে আমি যখন লখনৌ যাঐ, দরোজিনী দেবীর সহিত লাক্ষ্য করি এবং নানা বিষয়ে বীর্ষ আলোচনা হয়। ঐ পালকি-বেহারার গানের কথা প্রসঙ্গত ওঠে; তিনি জানতেন যে ওটি কবি অল্পবয়স করেছিলেন।

১৫. ০. ৪২.

ঐশ্বর্যভাষ্য মহানবিশ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ - চৈত্র ১৩৫৬



বিষয়সূচী

‘হুগোপন্যাসী’র ভাষ্য’র খসড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গাছীখি	ঐশ্বর্যচন্দ্র গুপ্ত
টাচের কাজ	ঐনামলাল বহু
গীত ও অরুণিণির প্রয়োজনবোধ	ঐশ্বর্যচন্দ্র গুপ্ত
রবীন্দ্রগ্রন্থ	
রবীন্দ্রসংস্কৃতির ত্রিবেদীসংগম	ঐইন্দিরা দেবীচৌধুরানী
কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী	ঐরত্নেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রসূচী

কলকলি	ঐনামলাল বহু	১৫৫
চলচ্চিত্রশালা	ঐনামলাল বহু	১৫৬-৫৭, ১৬২-৬৩
মহাশক্তি গাছী	ঐরত্নেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮-৬৯
‘খানী’ চিত্র	প্রাচীন চীনা চিত্র	১৭০
টাচের ছবি	প্রাচীন চীনা চিত্র	১৭১

মূল্য এক টাকা

শিশুদের কঁোকড়ানো কালো
চুলে ঢাকা মাথার দিকে
চাইলে চোখ যেন আর
ফেরানো যায় না—সত্যি সে
এমন চোখ-জুড়ানো। ওদের
মাথার যত্ন নিন, দেখবেন
চিকণ-কালো ঘন চুলে উজল
হয়ে উঠবে শিরের শোভা।

শিরের শোভা



গোমই রংয়ে রংয়ে
চুলে গোড়ায় তেল ঘেঁষে
চুল দুলে ক'রে দেবেন।

প্রতি সপ্তাহে একবার
ক'রে চুল ধুয়ে পরি-
ষ্কার ক'রে দেবেন।



প্রসাধনের
জোড়াউপায়

টাটা অয়েল
মিলস কোং লিঃ

উদ্দেশ্য

কোকোনাট (হয়ার
অয়েল ও শ্যাম্পু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬

‘সুরোপযাত্রীর ডায়ারি’র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধবার। লগুন অভিবৃথে চল্লম। Charing Crossএ পৌঁছে বেশি Mrs. Palit ও সিল্ অংশকা করছেন। ত্রিবিংশত Custom Houseএর মধ্য দিগে নিয়ে আসতে যাত্রীবানেক হয়ে গেল। হোটেলের ভাড়া নেই। Mrs. Muller ওখানে Mrs. Palit থাকেন সেইখানে এসে আড্ডা করা গেল। সুবিধেযত ভাড়া নেই। Miss Mullerকে দেখা গেল। এই সেই বিখ্যাত Miss Mull! সন্ধ্যের সময় লোকের ভাড়া এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল। বিপদ!

বৃহস্পতিবার। সকালে বেহোনা গেল— এক Hausmanএ চড়ে প্রথমে লুক্ক লুক্কতে বেহোলুম। ভাষের বাড়ি গিগে ভনলুম তাহা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে— বাড়ি বিকি হয়ে গেছে। কেউ ভাষের টিকানা জানেনা। তার পরে Miss Sharpeএর ওখানে গিয়ে বোনা গেল— তিনি Engaged, visitors receive করবেন না। আমবা জানমুখে রাস্তার বেঘিরে পড়লুম— তার পরে সৌভাগ্যক্রমে আবার তাক পড়ল। তুকে বেশি Miss Sharpe নিভান্ত বৃদ্ধা হয়ে গেছে। Engagement কিছুই বিশেষ নেই— একটি পীড়িত বৃদ্ধবানাকে দেখা করছেন। অল বাবু, বাবু, কালের পরিবর্তন, প্রকৃতি সবচেয়ে দু চারটে কথা করে বেঘিরে পড়া গেল। আমার প্রাচীন বন্ধু Scottএর বাড়ি গিয়ে ভনলুম তাহা দেখানে নেই তাহা New Maldinএ গেছে। সেখানে Gower Street Stationএ এক পাতাল-বাশাখান নিয়ে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল— কিন্তু বা চেষ্টা করা হার তা সব সময়ে সফল হয় না। Hammersmith ষ্টেশনে পৌঁছে চৈতন্ত হল যে ক্রমেই গম্যস্থান থেকে দূরে বাড়ি। একজনকে রিজালা করা গেল— সে বলে, তুল পাড়িতে উঠেই আবার ফিরে যেতে হবে। আবার কিরলুম। অনেক হাসান করে সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি পৌঁছলুম। তখন এখানকার অ্যুথোরের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার আমাদের ভক্তে ছুড়িয়ে বাড়িরে একটু আটুটু এনে দিল। বেঘে সেবে, দ্বার এক চোট রাস্তার বেঘিরে আসা গেল। জিনায়েত পর Miss Mullএর সহযোগে বানিকটা গান বাজনা হল। Miss Mull মন্য গান না।

শুক্রবার। চিঠি লেখবার দিন। চিঠি লিখতে বসলুম। লোকের ভাড়া উৎপাত বাড়িয়ে দিলে। ঘোর করে চিঠি লিখকেশ করে দিগে বেঘ করে নিয়ে গেল। 'Busএ চড়ে প্রথমে Grindlay আফিসে বাওয়া গেল। সেখান থেকে ঘেরবালা এক Dentistএর হোকানে পাঁচ বাধাবার বন্দোবস্ত

কবডে গেলেন। সেখান থেকে এক প্রকাণ্ড জাঁকালো আঁহাবহুলে নিয়ে যাওয়া গেল। তার পরে National Galleryতে ছবি দেখতে গেলুম। অনেক ছবি—অল্প সময় দেখে মনে বসে না। এক একটা খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু দেখলো হঠাৎ কোন বার্থ চিত্রশিল্পীদের ভাল লাগেনা—বোধ হয় অনেক বিখ্যাত ভাল ছবি আমার কিছুই ভাল লাগেনি। 'Busএ চড়ে বাড়ি ফেরা গেল। Miss Mull আমার উপর কতকটা অভিমান প্রকাশ করলে। বললে—Mr. T' কেন তুমি সমস্ত দিন বাইরে কাটাও, ঘরে থাকলে আমরা বেশ গান বাজনা নিয়ে থাকতে পারতুম।—আমি বলুম বেশ, আর সন্দের সময় কোথাও বেবোব না। সে বললে সন্দের সময় বেশি সময় হাতে থাকেনা।—যা হোক সন্দের সময় আর একবার গান বাজনা নিয়ে বসার গেল। Walter Mull বেশ Piano বাজায়। Miss Mullএ আমার মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। সে আমাকে নাচাবার চেষ্টাও ছিল—সেটা আমার পোহাল না। এরা আমার গলায় অনেক তারিফ করচে। Mull বদুছিল আমি যদি গলায় চর্কা করি তা হলে SL James Hall Concertএ পাইতে পারি—আমার রীতিমত উচ্চ শ্রেণীর গলা আছে। তা আছে বোধ হয়।

পরিবার। আর জ্যোৎস্না আসবে। কিন্তু কখন জাহাজ আসবে তার খবরতা নেই তাই Docksএ দাওয়া হলো। তাকে সমস্ত directions দিয়ে এক নম্ব চিঠি লিখে দেওয়া গেছে।

বসতে বসতে জ্যোৎস্না উপস্থিত। খুব শরৎ সন্দর্ভ সঙ্গতিত। নির্ভর নির্লক্ষ নিদ্রাপন্ন। সেখানে যা করা উচিত তা ঠিক করেছে। King Companyর উপর লাগেজের ভার নিয়ে Special Train নিয়ে Liverpool Street Stationএ পৌঁছে Underground রেলপথে ঠিক গাড়ি নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে এক Hansom ভাড়া করে আমাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে হাজির। এ ছেলের কোথাও হাফাবার আশঙ্কা নেই। ছুটি হাফার সজ্জাবনা নেই। আনাবের উপরে এর ভার বেগুনা নিত্যন্ত উপহাসের মত দেখায়। 'Coppe' পড়া গেল। একটা ভুলেছি—জ্যোৎস্না আসবার আগে আমরা সকলে মিলে গুন বেঁধে এক ছবি নিয়েছি—Mr. রাজনারায়ণ ছবি নিলেন। বিকেলের দিকে বেহিয়ে পড়া গেল। Holborn Restaurantএ গিয়ে আহার। সে এক অস্বস্ত ব্যাপার। সমস্ত বেত প্রাপ্তয়ে—চাষ তলা—হস্ত প্রাপ্ত—বাণ্ড, বাজচে—নিম্নে হাজার লোক খেতে বসে গেছে। সেখান থেকে Oswaldদের ওখানে যাওয়া গেল—আনাবের ইংরিজি accentএর অনেক তারিফ হল। সেখান থেকে বাড়ি স্যাড়ে এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি তখনো Miss Mull জেগে। তার সঙ্গে একটু আধটু গল্প হল। কথায় কথায় উঠল তার বোন নেই—সে বলে I am glad of it. I hate having sisters—Brothers are ever so much nicer। এ দেশে বোনে বোনে competition কিনা, উভয়ের মধ্যে বোধ হয় বিটিমিটি চলে। আমার বোধ হয় আনাবের দেশে যদি ভাইবোনের বেশি দিন একসঙ্গে থাকবার সজ্জাবনা থাকত তা হলে দুই-বোনের চেয়ে ভাই বোনের মধ্যে বেশি ভাব হত।

পরিবার। গুন বাজনা—Miss M. একটুখানি flirt করেছিল—Don't you think of me Mr. T. when you sing Riez riez &c.? I did laugh when I had my photo taken, didn't I?

তার Shelleyর কবিতা খুব ভাল লাগে ইত্যাদি অনেক কবিতার কথা পাড়বার উদ্দেশ্যে
করেছিল আমি তাকে বড় গা লাগালুম না। আমাকে পীড়াপীড়ি করতে তার Confession Bookএ
লিখতে। তার মধ্যে যেখান একজন বাকসী Favourite Poetsএর মধ্যে আমার নাম লিখেছে।
আমার Autograph বাছলো ও ইংরিজিতে লিখে নিয়েছে। সমস্ত দিন প্রায় গান বাজনাতে কেটেছে।

সোমঃ সন্নিহিত জন্তে বেহালা কেনা গেল। তব্ব হুজু পাছে কাল আমার নামে বাড়ির চিঠি
না আসে—তা হলে আমি এসেনে চিঠিতে পারবনা। আর Savoy Theatreএ Gondoliers
দেখবার জন্ত টিকিট কেনা গেল। সে চমৎকার কাণ্ড। যন্ত্রের মত বোধ হল—এমন সুন্দর। এমন
সুন্দর নাচ। মনে হল যেন আমার চারদিকে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। Miss Oswald প্রকৃতি
আর একমল আমাদের সঙ্গে ছিলেন। Supper শেষে বাড়ির একটার সময় কেঁচা গেল।

মঙ্গলঃ আর সকালে উঠে যখন কেবল একখানি ছোটবোয়ের চিঠি পাওয়া গেল তখন
মনটা নিতান্ত ধবে গেল। আর একবট এখানে চিঠিতে ইচ্ছে করছিল না। তার পরে যখন Break-
fast খেতে গেলুম তখন মেছালা বাবির একখানি পোলা চিঠি দিলেন। পোলা চিঠির চেয়ে
লোকালবদ্ধ চিঠি অনেক ভাল লাগে। Miss Mullএর সঙ্গে আমাদের বেশ চমুচে যা হোক।
সে আমাকে Robin Adair বলে। কাল রাত্রির যখন আমি তাকে good night বলুম
সে আশনার মনে মনে একটু আগ্রহে বলে good night, good night beloved।
সে বলে রবিবারে Churchএ ধাওয়া সে sinful মনে করে—তার চেয়ে বাড়িতে বৈকে
কাছকাছ করা চেয়ে উচিত—অধিকাংশ মেয়ে কেবল নতুন কাপড় বেহাতে আর এবং যন্ত্রের মত বহু
আউড়ে আসে এবং মনে করে পরিভ্রাণের পথ খোলসা হয়ে এস। জোয়াংলা এসবাকি বাড়িয়েছিল।
অনেকগুলো Chopinর বাজনা হল—আমার বাবির বাজনা মনে পড়ে। আমার মনটা বড়
খাখান হয়ে আছে—কে জানে জীবনটা কেন তারি ন্যূন এবং নিফল মনে হচ্ছে। আস্তে বঙ্গের
বাবিরা বিলেতে আসবে এই প্রত্যাশাটা উত্তরোত্তর পাকা হয়ে আস্তে—

বুধবারঃ বরজির বোকানে গিয়ে দু হুট কাপড় হজুম করে এলুম। তখনক দায়।
ফোটোগ্রাফের লোকানে গেলুম—বাবির একটা ছবি Porcelainএর উপর খাঁকাবার ব্যবস্থা
করা গেল—৪ পাউণ্ড ৪ শিলিং লাগবে। আমার একটা ছবি নেওয়া গেল। আর মেঘ করে বয়েছে
—খুঁয়ালোক নেই। কোথাও বেহাতে ইচ্ছে নেই—মেছালা বেহাওয়ার প্রস্তাবে করছেন। কি হবে
লওনে আছি কে জানে। খুব বরচ হচ্ছে—বাড়ির জন্তে Present কেনবার টাকা আর বইল না।
মনে করছি কেবল হুঁরিবাবির জন্তে কিছু নিয়ে যাব—যার করতে হবে দেখছি।—Niagara falls
দেখতে গিয়েছিলুম—চমৎকার কাণ্ড। রাত্রির গান বাজনা অমাজিলুম এমন সময় এক গ্রুপে জ্যাটা
ছেলে এসে রাত এগারোটা পর্যন্ত বকাবকি করে গেল।

বৃহস্পতিঃ আর সতুর সঙ্গে বেধা করতে বেতে হবে। অনেক রাত্তা কুলে লোকজনকে
ঝিঁজালা করতে Eastbourne লতুর ওখানে পৌঁছলুম। বেচারী একলা পড়েছে বেধে হুঁথু হল।
সেখানে তিনার শেষে রাত্রির সাড়ে দুপুরের সময় বাড়ি ফিরলুম—বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেক
দুঃখে হয়েছিল।

তরুণ্য। সুদূরিক চিঠি লিখে দিলুম। Confession Album-এ লিখ্‌লুম। দরজির কোকানে সেলুম। আৰ্জ Scott-এর ওখানে ধাবার ইচ্ছে ছিল— লোকের গেল না, তার অস্ত্র স্রীষক্লর সঙ্গে Engagement আছে। Miss Mull গান দেখালে। তার সঙ্গে Kensington Park-এ বেড়াতে যাবার মত্রে অহুযোগ করেছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল না— তাই বিকিং অভিমান করেছে। একটুখানি একলা ধাবার মত্রে জারি ইচ্ছে করচে।— (এসের কাঙ্ক্ষকর্ম এসের আমোদপ্রমোদের মধ্যে এখন ভাল করে চেয়ে দেখি তখন মাহুদের ক্ষমতার অস্ত্র দেখা যাবনা। এরাই রাখা বটে! এরা অস্ত্রে সঙ্কট ধাবার নয়— এসের প্রবিধে করবার এবং এসের আঘোষ দেবার মত্রে মাহুদের চরম শক্তি অবিশ্রাম খেটে বরচে। এরা গান শুনে তাই সহস্র বস্ত্রের সহস্র ভাল আশ্রয় সঙ্কতি রক্ষা করে জনিত হতে। কোথাও তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নেই— অসীম বস্ত্র অসীম অভ্যাস। নাট্যশালায় কি অদ্বুত বিচিত্র ব্যাপার— কি আশ্রয় পৌষ্যের মরীচিকা— কোনখানে নামাত্র ক্রটি বা অশোভনতা নেই। কোকানে মিনিমপত্র কেবল 'সারাজে ও হুগল' করে রাখে কত দুঃস্থ পরিজন ও চোঁটা করতে হয়েছে। আহায়ে এখন ছিলুম তখন তাবতুম যে এই আহায চালানো কি বিপুল ব্যাপার। আমবা ত ডেকের উপর বলে হাওয়া বাড়ি, হুগোয়ার পৃথ্যাত্ত দেখ্‌চি— কিন্তু কতপত লোক দিনরাত্রি অগ্রিকুণ্ডর মধ্যে কি অঙ্গ পরিভ্রম করচে— এক ত অবিশ্রাম বস্ত্র চালনা করে দীর্ঘ পথকে নক্ষিত্র করা সেই ঘণ্টে, তার উপরে আরাম এবং সুখের মত্রে কি তীব্র চোঁটা! আহায-মাত্রের সেবার মত্রে নতম ভূতা অবিরত নিযুক্ত— ধাবার ঘর, Music Saloon শাখা পাথর ঘিরে বোড়া স্থলর করে মাজানো, নতম বিদ্বানীপ জনচে। চর্য্য চোখ লেহু পেয়েই সীমা নেই। আহায পরিচার্য্য ধাবার মত্রে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত! আহাযের প্রত্যেক দড়িটুকু ধবাহানে শোভনভাবে ভড়িয়ে ধাবার মত্রে কত দৃষ্টি! আমাদের বেগের লোকের ধ্যানের অতীত— এরকম বিপুল চোঁটাচালিত বস্ত্রে আমাদের বেগের লোক failure মনে করত। কিন্তু চেয়ে দেখ্‌লে এই একটা অদ্বকার দিক আছে— Song of Shirt শব্দে তা টের পাওয়া যায়— এই হুগলবস্ত্রের অন্তরালে কি অঙ্গ রাবিত্র্য আপনার জীবনপাত করচে— সেটা আমাদের চোখে পড়েনা— কিন্তু প্রতিটি ধাবার উত্তরোত্তর তার হিসেব অজ্ঞা হতে। প্রতিতিতে উৎকণ্ঠিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বস্ত্র করে পরদায় প্রতি বিভ্রান্ত অনাধর করা যায় তাহলে ক্রমে সেই অনাদৃত পরদা বহু বস্ত্রের ধন গৌরব টাকাকে বিনাশ করে। আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত দুর্বল অজ্ঞান স্বল্পবল জনকে বিনাশ করেছে। যদি সত্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় ত প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। ছোট শক্তি বস্ত্র একসঙ্গে সারা রক্ষা করে কাঙ্ক্ষ করে ততই বসল— যেমন আকর্ষণ শিষ্টকর্ষণ— স্বার্থ এবং পরার্থ— আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি— নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে— বর্ধরত। সত্যতাকে ধন্য করে। আমায় ত সেইমত্রে মনে হয়— আশ্রয় নেই যে জীবিত্যে কাক্রিয়া ইয়ুগোপ কর করবে— ক্রম অযাযতা দিনের আলোকে গ্রাস করবে— আফ্রিকা খেঁচে হারি এসে হুগোপের তম দিনকে আচ্ছন্ন করবে। হুগোপীয় সত্যতার আবিষ্করণী গ্রীষ্মকে যে দুর্বল জাতি অভিকৃত করবে



চলচ্চিত্রমালা
প্রিন্সমাল বহু

মোহনগাড়া
১৯৮৮



চলচ্চিত্রমালা
প্রিন্সেপাল বহু

মোশাকপুঃ
১০০৭

এ কি পেরিক্লিসের সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারত? আলোকের মধ্যে ভব নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চকু গড়ে আছে— কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্ছে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করছে— সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।—

সন্দের সময় যেহালা হঠাৎ নাচের প্রস্তাব করলেন। Miss Mull তাঁর সাথে খানিকটা বেচে আমাকে নাচবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কাটাবার অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কয়েক সেখলুম অতঃপর হয়ে পড়তে। দু’টার পা বেচে থেমে গেলুম— এমন দু’তিনবার নাচিয়েচে— আমি বাঁহানায় নাচখানে থেমে ঘাই— এককম জটাজড়ি নৃত্য আমার জাতি বর্জ্য হয়ে হয।

শনিবার। সকালে মোকানে বেয়োনো গেল। অনেক জিনিষপত্র কেনা এবং হুম্বর মুখ বেশা গেল। আর আমার রাস্তিরে Drury Lane Million of Money দেখতে যেতে হবে। Theatre দেখে আসা গেল। Scenery খুব আশ্চর্য। Race Course সত্যিকার ঘোড়দৌড়— চৌঘুড়ী। সমুদ্রের মধ্যে পর্বত।

রবিবার। Oswaldদের বাড়ি গিয়েছিলাম— এক কয়সি বেয়ে দেখলুম— অতুত। সে আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলে। বয়ে Indianদের বড় ভালবাসে। যেহালা Kew Gardens দেখতে গেছেন। আমাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে Miss Mull অনেক পীড়াপীড়ি করলে। রাজনারায়ণ আমাদের নিয়ে বড় বাড়িবাড়ি স্বয়ং ঠাট্টাঠুটি আরম্ভ করেছে— সে কথকিং Jealous হয়েচে।

সোমবার। ছোট্টোয় সন্নি আর বাবির চিঠি পেলুম। মনটা একান্ত অস্থির হয়ে আছে— বেঁচে থাকতে ভাল লাগছেন। বাবিকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করা গেল। Richmond এ ইস্কুবে বেয়েবেয়ে দেখতে বাবার সঙ্গে বেহালা টানটানি করছেন। চিঠি কাল শেষ করা যাবে। নোয়েল বেশ মোটাগোটা শরু হয়ে উঠেচে। সীলাকে তেমন ভাল দেখতে নেই। স্বামী আমার সঙ্গে ভাব করে নিয়ে Zoological Gardens এর গল্প জুড়ে দিলে। ভাবি হুমা করে খিট করে ইংরিজি কথা কর। কিরে এল ভাবে বোধ হল Miss M আর রাজনারায়ণ একটু কগড়া হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে এই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে একটু বিটিমিটি বেখে গেছে। রাজনারায়ণ এমন স্পষ্ট করে তার Jealousy প্রকাশ করে যে আমাকে জারি অপ্রস্তুত পড়তে হয়। রাস্তিরে অনেকগুলো বাঁহলা গান পাইলুম। “অলি বারবার”টা Miss M এর ভাবানক ভাল সেগেচে— It is so sweetly pretty, so quaintly beautiful and it sounds so pathetic with its minor tones! ওর নীচেই যে লো নুখী নে— তার পরে “কি হল তোমার”।

মঙ্গল। আর সকাল থেকে shopping। সন্নি আর ছোট্টোয়ের সঙ্গে দুটো আয়না কিনেচি। স্থবির ভক্তে প্রকট ইলেক্ট্রিক আলো-মালা খড়ি কেনা গেল। কাল বাবির সঙ্গে একটা কিনলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হয়। সমস্ত দিন জিনিষপত্র কিনে একান্ত শ্রান্তভাবে সন্দের সময় ‘Bus’ এর মাথার উপরে কুঠীতে ভিড়তে ভিড়তে বাড়ি আসা গেল। একঘোড়া Bye glasses কেনা গেল। আজকাল এখানে পথেঘাটে অগণ্য চম্বাশরা বেয়ে দেখতে পাই। আবারু বিখাল তাদের ভাল দেখতে হবে বলে তারা চম্বাশা পরে। Miss M একঘোড়া চম্বাশা কিনে বেখেচে— কিন্তু তার চোখ খুব ভাল। কতগুলো নতুন গান কিনে এনেচি— সেগুলো গেয়ে দেখা গেল। Miss M আমার

"খলি বাবাবা"টা পাওযালে। সেটা ডায় অডাল ভাল লেগেচে। লোকেন Maryএ সঙ্গে বেধা করতে গেচে— রাত দুপুর বাজে— এখনো সে ফেরেনি— আমার বিশ্বাস Maryকে লোকেন একটু বিশেষ ভালবাসে।— মনটা এমন লুত উম্মাস হয়ে আছে— ইচ্ছে করতে এই বুঝোতে গিয়ে আর যদি খুদ না তাকে ত বেশ হয়— গ্রিক বেশ হয় না, সকলকে একবার বেশতে এবং সকলের কাছে একবার মাগ চাইতে ইচ্ছে করে। আম বাবির ছবির বড়টা এঁকেচে দেখে এলুম— বেধে হয় না; দিলে বেশ হবে— শুকনোবে বেধে— এখানে তাত দুপুর— কলকাতার ছটা—

বুধবার। সকালে আমার লোকেনে যেয়োমুখ। বাবির সঙ্গে একটি বেশ ভাল lamp পছন্দ করযামাত্র লোকেন সেটার সঙ্গে পীড়াপীড়ী করে দাবি করতে লাগল। তাকে ছেড়ে নিলুম কিন্তু মনটা ডাবি খায়াপ হয়ে বৈল— ভাবনি মনে মনে স্থির করলুম কতকগুলো জিনিষপত্র কিনেই একেবারে পরের সীমার নিয়ে লগ্নম থেকে P & O. জাহাজে চড়ে বসব— কিছু ভাল লাগচে না। Maple এবং Spriggsএর বোঝানে গিয়ে বাবির সঙ্গে কতকগুলো জিনিষ কিনে নিলুম— আমার যা কিছু সঞ্চল ছিল সমস্ত ছুরিয়ে গেল। Oswaldsএর গুহানে পেলাম— তারা আমাদের একটা Tennis Clubএর মত জাহগায় নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে Miss O বদ্বিচ্ছল— "একজনের সঙ্গে এক sisterই ঢের কিছু আমার ইচ্ছে করে আমার আরও ভাই থাকত।" Tennis খেলে Oswaldএর গুহানে গান গেয়ে এবং গান বাজনা শুনে বাড়ি এসে ঘেরে পুনক গান বাজনা করে শোবার ঘরে এসেচি।

বৃহস্পতি। আমার আমার সমস্ত Plan ভেঙ্গে গেল। রেজনার কিছুতে ইচ্ছে নয় যে আমি যাই— কাতই থাকতে হকে। মাকে মাকে এরকম আত্মলম্বন করা আবশ্যক। অনেকবার ত মাকে গচে করতে হয়েছে— কিন্তু অভ্যাস হল কৈ? Miss Mকে নিয়ে Oswaldsএর গুহানে গিয়ে তাদের ছড়িয়ে নিয়ে French Exhibition দেখতে গিয়েছিলুম। পথে আসতেই Miss M আমাকে নিয়ে একটু এগিয়ে গেল। কথায় বদ্বিচ্ছল I am quick at everything। আমি ঈহং সহ্যতে বহুম Quick to forget? সে সেই উপলক্ষে অনেক কথা বলে। কিন্তু বলেই তৎক্ষণাৎ আমার মনে মনে এমন বিচার উপস্থিত হল— কথাটা এমনি আমার-বতন-নয় বলে মনে হল। মনে হল আমি অজ্ঞাতসারে লোকেনকে নকল করচি— সে যে বহুম মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টার সঙ্গে Flirt করে আমিও সেই চাল অবলম্বন করচি— কিন্তু তার সেটা বেশ স্বভাবত আসে— তাকে বেশ মানায়— কিন্তু আমার মুখ থেকে আমার নিজের কানে ওটা এমন বিশ্রী পোনাল— তার একটা কারণ বোধ হয় Miss M আমার প্রতি কতকটা Serious ভাব ধারণ করেছে। সে আমাকে আরো কিছুদিন থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল— এবং ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে এলে তার সঙ্গে বেধা করবার জন্যে অহুযোষ করছিল। একটু বিব্রত নয় বিপ্লিত ভাব। তাই আমার আরো জীর অহুতাপ উপস্থিত হল।

French Exhibitionএ গওয়া গেল। অনেক ফ্রেডবা জিনিষ দেখলুম। জিন্মের আমাদের গাণের টেবিলে একটা পার্ট আমাদের দিকে তাকি Rudely Stare করছিল— আমার সহ হলনা— বখন ভেবে গেল আমি তাদের সাম্মনে ঠাঁড়িয়ে deliberately তাদের Out-stare করলুম। British stareএর মত insolent জিনিষ পৃথিবীতে আরই আছে।

আমার খাবণা ছিল ইংরেজ বেহেবের স্ত্র এবং চোপের পাতা বিবল— কিন্তু সেটা ভয়ানক তুল— বরক বিপরীত।

শুরুবাঃ। সকালে বেজবাসার সঙ্গে Regents Street-এ বেরিয়েছিলাম। বাবির ছবি চমৎকার হয়েছে। কিরে এসে সন্নিবেশিত লিখলাম। Brand-এর বোনের এখনো সন্তুষ্টবেলায় নিয়ন্ত্রণ ছিল। গেলুম। তাকে বেশ লাগল— বেশ Refined। চমৎকার Harp এবং পিয়ানো বাজায়। “অনি বাহবাব” গানটা খুব তার ভাল লেগেছে। ফলছিল যদি আমাদের ঐদকম কতকগুলো যিনি গান Sullivanকে পোনাই তা হলে সে একটা Oriental Opera লিখতে পারে। আমার Composition শুনে আশ্চর্য। আমি music-এর grammar কিছু না কেনে Compose করতে পারি এতে সে অবাক।

শনিবার। সকালে আমার Regents Street-এ যাওয়া গেল। সমস্ত দিন ঘুরে ভয়ানক প্রাণ হয়ে গাড়ি কয়ে আমি কিরে এলাম। আমার বাঁ পায়ে পিরায় বড় ব্যথা হয়েছে। লোকজন আমাকে সন্দের সময় বয়ে আমার বাসনা গান শুনে অনেক ভাল লাগল। শুনি কতকগুলো বাজনা গান গাও। অ্যোংগার কাছে একটা মায়াব খেলা ছিল সেইটে নিয়ে প্রথম থেকে একটা একটা করে অনেকগুলো গাওয়া গেল। আমার বেশ লাগছিল— লোকজনেরও ভাল লাগল। Lycium Theatre-এ যাওয়া গেল। Bride of Lammermoor অভিনয় হল। চমৎকার লাগল— কি সুন্দর scene। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর দীর্ঘ করে বিভিন্ন ভাবে concert বাজে সেটাতে খুব মনিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভাল অভিনয় করেছিল, Irving-এর অভিনয়ও খুব ভাল— কিন্তু এমন mannerism— এমন অশ্লীল উচ্চারণ, এমন অস্বাভাবিক অভিনয়! কিন্তু তবুও ভাল অভিনয়— সেই আশ্চর্য। একটা Box-এ দুটি বেয়ে বসেছিল— তার মধ্যে একটিকে চমৎকার বেশভূষা। একবারে নিখুঁত ছোট সুন্দর মুখখানি— অল্প বয়স— বীর্ণ বৌ পিঠে সুন্দর— বেশ ভূষার আভর নেই— কিন্তু সবুজ বাক দainty বলে তাই। অভিনয়ের সময় রক্তিমির সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল টেবিলে আলো জ্বল— সে টেবিলে উপবকার বসে বসেছিল তার মুখের উপর টেবিলের আলো পড়ছিল— কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! সমস্ত backgroundটা অন্ধকার— কেবল তার আর্দ্র মুখ আলোকিত— কি সুন্দর সুন্দর মুখের রেখা। কি চমৎকার গ্রীষ্মকালী। আমি অভিনয়ের সময় প্রায় তার মুখের বিভিন্ন ভাবে খেলা দেখছিলাম। সেও দ্ব্যবসায় দিয়ে আমাদের অনেকজন সেখানে কিন্তু নিঃসন্দেহ ততটা আনন্দ লাভ করেনি। কিন্তু নাট্যশালায় একান্ত নির্লজ্জ স্পর্ধার সঙ্গে পরস্পরের প্রতি দ্ব্যবসায় কথা আমার নিজস্ব শব্দ লাগে। আমি শুধু কিছুতেই পাবলুম না— তারি মতই মনে হয়। এসে মধ্য অনেকগুলো প্রাণ আছে বা প্রকৃতপক্ষে মত— সে আমাদের কিছুতেই অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত না— যেমন নাচ— দ্ব্যবসায় কথা— গান বাজনার সময়ে গল্প মুখে বোঝা।

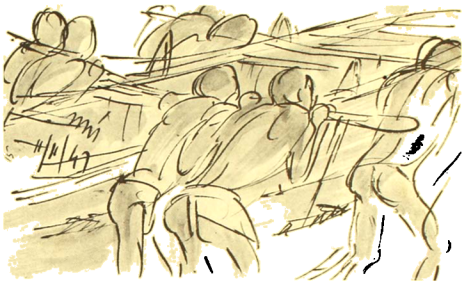
সেদিন French Exhibition-এ একজন বিখ্যাত artist-এর একটি উল্লসিত সুন্দরী ছবি দেখলাম। কি আশ্চর্য সুন্দর! যেখা কিছুতেই ভুলি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য পৃথিবীতে কিছু নেই— কিন্তু আমরা মূল দেখি, লতা দেখি, শাখা দেখি আর পৃথিবীর সঙ্গপ্রদান সৌন্দর্য থেকে একবারে বঞ্চিত। মস্তোত্তর চরম সৌন্দর্যের উপর সাধারণ অস্বস্তি একটা চির অস্বস্তি টেনে নিয়েছে। কিন্তু

সেই উল্লম্ব ছবি দেখে ঘর ভিলমাত্র লক্ষ্য। বোধ হয় আমি তাকে সহস্র দিকার হই। আমি ত স্থতীর সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিরেছিলাম— আর ইচ্ছা করছিল আমার সকলকে নিয়ে পাড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বেশি যদি বড় হত, তাকে পাশে নিয়ে পাড়িয়ে আমি এ ছবি দেখতে পারতুম। এ বকম উল্লম্বতা কি স্বাভাবিক! এই ছবি দেখলে সহসা চৈতন্য হয়— ইন্ডের নিম্নহস্তবর্তিত এক অপূর্ণ সৌন্দর্য পণ্ডা-মাত্র একেবারে অজ্ঞান করে রেখেচে এবং এই চিত্রকর যত্নবৃত্ত সেই অপবিত্র আচরণ উদ্ঘাটন করে সেই বিরাট সৌন্দর্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে। এই বৈশ্বানরিত্ত গুণ কোমলতা এবং প্রত্যেক হঠাৎ ভবিষ্যত উপর বিশ্বকর্ষার— সেই অদীমহুস্বেতের অজুলীয়া স্পর্শ দেখা যায় যেন— এ কেবলমাত্র দেখেই সৌন্দর্য নয়— একটি প্রেমপূর্ণ প্রকোবল নারী-ভবন— একটি অমর হৃদয় মানবাত্মা এটি মধ্যে বাস করে; তারি ভালবাসা তারি লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।— এই উল্লম্ব চিত্রে বসন্তের সেই হৃদয়ের কোমলতা এবং আশ্রয় গুণ অ্যোতি বাক্য করচে— মানব-অন্তঃকরণের চিরপ্রবাহ রহস্য কতকটা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

রবিবার। আজ সন্ধ্যার সঙ্গে Churchএ যাবার কথা ছিল। বোঁড়া পা নিয়ে দমত দিন পড়ে আছি। বাবির Porcelainএর ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছে— স্বপ্নের লাগুচে। কিন্তু মেজধারা সেটা দখল করে রেখেছেন— আমার তর হাড়ে পাছে আমাকে না যেন। রাত্তিরে গান হল। Miss Oswald সন্ধ্যার হাত দিয়ে আমাকে একটা গুণ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সোমবার। পা অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে। বিকেলের দিকে লোকের সঙ্গে Walleryর গুহানে নিয়ে একটা Cabinet ছবি নেওয়া গেল— তার্য অনেক বড় করে নানা Positionএ নিলে— বয়ে Splendid head— বোধ হয় আমার স্বপ্নী প্রসন্ন করবার জন্যে। Miss Oswaldএর গুহানে যাওয়া গেল— সে আমার একটা ছবি চাইলে— মিলুন। কতকগুলো বাঙলা গান গাওয়াগে— বিশেষ বকম ভাল লাগল— বিশেষতঃ “অলি হারবার”টা। ভরসা করি এর মধ্যে ঢালাকি কিছু নেই— চাপকা বলছেন বিশ্বাস নৈব কর্তব্যঃ স্মিৎ বাঙালেন্ চ। এরা একে স্ত্রী তাতে রাঙকুল। একজন musical পুরুষ বসেছিল সেও অনেক তারিক করলে। Birthday Book এবং Autograph Bookএ নাম লিখে দিয়ে National Liberal Clubএ সিদ্ধি বন্ধ আশ্রয় নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে Dinner খেতে গেলুম। সেখানে Voyseyর সঙ্গে দেখা। তাকে বেশ লাগল— সে বাবামশায়ের প্রতি খুব ভক্তি প্রকাশ করলে। তার নিষেধ ইতিহাস অনেক সোনা গেল। Christianity ত্যাগ করার দরুন ঘরে বাইরে তাকে অনেক উপহাস সহ্যে হয়েচে— বয়ে, সব চেয়ে কষ্ট থকন নিষেধ খবর মধ্যে sympathyর অভাব দেখা যায়। আমাকে বেধে বেধে বয়ে— তোমার বোধ হয় কথাটা খুব নতুন বোধ হবে—কিন্তু তোমাকে দেখে-আমায় আমার মনে হয়েছিল বিত্তপুটকে যে বকম ঝাঁক তোমাকে টিক সেই বকম বেপ্তে। আমি বহুদূর এ কথা আমার পক্ষে নতুন নয়। Clubটা একটা রাঙা-গাঙ্গার বজ্জাই হয়— চমৎকার পাখরের সিদ্ধি— খুব জম্কাগো, এবং বড় বকম আশ্রয় কল্পনা করা বেতে পারে তার বয়োবৃত্ত আছে।

মঙ্গলবার। চিঠি পাওয়া গেল। বাবির লিখেছে আর চিঠি লিখবে না। মেজধারার কাছে আমার একলায় বাড়ি পালাবার প্রস্তাব করা গেল— কিছু ফল হল না। বাবিকে চিঠি লিখতে বলা গেল।

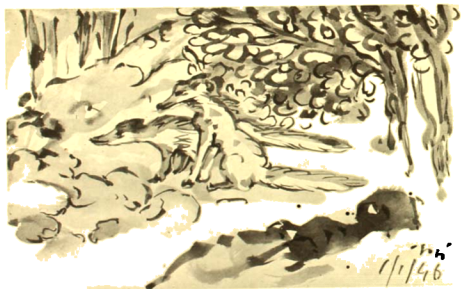


শিল্পকর্ম
 ১০০০



বোম্বলপাতা
 ১০০০

চলচ্চিত্রমালা
ঐক্যমান বহু



যুববার। কাল সন্ধ্য থেকে লোকের Margate-এ তার বহুদর্শন। আমি বসে ৩টি লিখি। Miss Mull-এর কাছে একটু গান শিখলুম। “হবি আসে” গানটা তার ভাল লাগল। লোকের দ্বিধা এসেছে। আজ পরশা অক্টোবর—এ মাসটা শেষ হয়ে গেলে ঝাঁটা যায়। কাল থেকে কোড়া বাতাস বহে—বেশ কঠোর হয়েছে—শীতও বেড়েছে। বোধ হয় রীতিমত ‘বিলিডী’ weather আরম্ভ হল। মেঘের কোন এশেণ ভাল লাগে আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনি—তিনি ত এখানকার ছড়োমুড়িতে ভেতন ঘোণ খেন না। ইচ্ছে করলেই এতটা কিছু করা যেতে পারে—নিশেন হাতায় বেরিয়ে পড়ে মোকানগুলো ঘুরে আসা যেতে পারে এইটে মনে করেই মন অনেকটা হিল্লিখ থাকে বোধ হয়।

বৃহস্পতি। নাবারগ হেমস্টের সঙ্গে দেখা—আক্ষর্য অধ্যবসা। বোয়ার কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখে আমি তাকে আবার এক হুট গরম কাপড় দিলুম। India Office-এ হয়ে মোকান হয়ে প্রান্তর হয়ে বাড়ি প্রত্যাগমন। বেঞ্চা কাল আমাকে Birmingham-এ নিয়ে যেতে পুত্রপ্রতিজ্ঞ। কাজেই এখন বসে বসে সন্নিবেহ তাজাতাতি এক চিঠি লিখে রেওয়া গেল। আরবে ভাল লাগে না।

শুক্র। Birmingham যাত্রা। ইংলও দেখতে বড় সুন্দর। Lee Station-এ উপস্থিত ছিলাম। সহর বেশতে আবার আরবে ভাল লাগে না। Electric Tram-এ চড়া গেল। Electric Tram-এর কলকারখানার মধ্যে গিয়ে গেল—নির্জোবেহ [মতো] ঘুরে বেড়িয়ে হাঁকবে বেশতে লাগলুম। কিছুই বুঝলুম না—কেবল একান্ত ভ্রান্ত হয়ে Mrs Lee-র গুহামে ভিন্নার মধ্যে হোটেলে এসে নিভা। পরিবার সকালে আবার বিবিষ ভ্রষ্টা বিষয়ের সন্ধানে বেরোয়ানো গেল। এটা শোভা আপিস শুটা মুনিদিগাল আপিস সেটা অমালত এই করতেই একটা ছাপাখানার যাত্রা গেল—সেখানে রঙিন ছবি ছাপা দেখা গেল—এটা দেখবার জিনিষ বটে। সন্ধ্যের সময় লওনে ফিরে এসে Wallery-র গুহেন থেকে আবার ছবি প্রক পাওয়া গেল।

শনিবার—Voysey’s Church-এ গিয়েছিলুম। বেশ লাগল। মনটা অনেকটা ভাল বোধ হল। ফিরে এসে লোকের ঘরে বসে গল্প করছি—বানিক বাবে Mrs Palit এসে বলেন Drawing room-এ বাজনাধার আর Miss Mull-এ খুব Scene হয়ে গেছে। Miss Mull বসে বাজাচ্ছিল—তার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল তার বাজনা শুনে আমি drawing room-এ যাই—অনেকক্ষণ গেলুম না দেখে সে বাজনাধারকে জিজ্ঞাসা করছিল Is Mr Tagore out I wonder? বাজনাধার বলে No. Evidently your signal has not attracted him. Mrs Palit তাকে বলেন “Is that your signal Miss Mull?” সে রাগ করে Piano বন্ধ করে বলে I don’t understand what you say। বলে খুব থেকে বেরিয়ে চলে ফেল। আমাকে নিয়ে বাজনাধারের সঙ্গে তার ক্রমিক বিতর্কিটি চলছে। Oswald-র গুহেনে বিকেলে গিয়েছিলুম—বামলা গান হল। Mrs Oswald-এর ভাল লাগল। এখানে ফিরে এসে সন্ধ্যের সময় গান। Miss Mull “অগ্নি বাহবার”টা আবার গাইতে বসে সেটা তার জাতি ভাল লাগে—সে বলে I don’t know what is in it—it is so very pathetic. আজ বিকেলে লোকের আমাতে হুজনেই পাগড়ি পরে বেরিয়েছিলুম। হাতায় লোকের খুব মজা দেগেছিল। আমায় কালো মাছের টুক যদি ইংরেজের হস্তবেশ ধারণ করি তাতে এদেশের লোকের

অকৃত মনে হইল না। যখন স্বাক্ষর দেওয়া আমারে দেখে হাসে তখন আমার চেহারাও গরম অনেকটা চলে যায়। আশ্ব ৪ই। এখনো পাঁচ সপ্তাহ।

দোনবার। কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক ঝপ্প দেখেছি— ঠিক এইরকমের ঝপ্প আমি কতবার দেখেছি তাই ঠিক নেই— মনে হই কোনদিন সন্ধ্যা হবে পাড়াবে— এই এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক সেন মাসপানের অলঙ্কৃত পেরেছি এমন মনে হচ্ছে।— আশ্ব চিঠি আসবার দিন। বাবির চিঠি পাওয়া যাবে না। আমি ঠিক করেছি বাড়ি ফিরব— আর নয়।

মঙ্গলবার। Savoy Hotelএ মনোমোহনের ওখানে lunch খেয়ে P & O আফিসে Thames Steamerএ Passage engage করে নিশ্চিত। বৃহস্পতিবারে ছাড়বে। কাল রাত্তিরে Carlyle Societyতে গিয়েছিলাম। চুরোটার খোঁজার মধ্যে John Stirlingএর Life লম্বা এক্সোস্টর। বেজব্রা Newnan লম্বা একটুখানি বয়েন— লঞ্চের খুঁই ভাল লেগেছে। রাত্তির দুটো পর্যন্ত আমার বেগে কেরা লম্বা লম্বা লোচনা করা গেছে।— মঙ্গলবার রাত্তিরে লোকেন আমারকে Oswaldদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল—

বুধবার। সমস্ত দিন হিসেব করতে এবং জিনিষ কিনতে গেল। মেজদাদার কাছে অনেক বার হয়ে গেছে— তিনি আমাকে অমনি দিতে চেয়েছিলেন— কিন্তু সে আমার ইচ্ছে হল না— মেজদাদার চাকোতেই যদি বাবিরের সঙ্গে জিনিষ কিনলুম তাহলে আমার আর দেওয়া হল কই? অল্পে অল্পে তপে ক্লেব। কেন মরতে বিলতে এসেছিলাম কে জানে। বাড়িতে চিঠি লিখলুম। Miss Mull আমাকে সব গানগুলো পাঠালে। Remember me বলে একটা গানের পর সে আন্তে আন্তে আমাকে বলে Mr T, I shall remember you। আমি অপ্রতিভ হয়ে নিরুত্তর বসে রইলুম।

বৃহস্পতি। আশ্ব ত Thames জাহাজে উঠলুম। আমার Cabinএ একজন Civilianএর জিনিষপত্র বেগে মন বিগড়ে গিয়েছিল। তার পরে দেখলুম সে নেহাৎ কাচা— এই প্রথম ডারভবর্ষে যাচ্ছে। আমাকে নেপে ভাবি মুসি। জাহাজে কখন কি করতে হয়, কোথায় কি, আমাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নিলে— আমি তার মুকুন্নি হয়ে পাড়িয়েছি। মলিক এবং বাচুণের ভাবি গ্রন্থাঙ্গা করলে। Lord Riponএর মনের লোক। সেখানে গেলে কি হয় কে জানে। বোধ হচ্ছে Irishman। জাহাজে ভয়ানক ভিড়। Dinner Tableএ আমার ঠিক সামনেই রাজা টুকটুকে ট্রেট— জলজলে চোখ— এবং মিষ্টি হাসিওয়ালা একটা মূখ পাওয়া গেছে। আমাকে সকলেই পথন বিষয়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে।

শুক্রবার। চব্বিয়ার লঞ্চাল হয়েছে। সমস্ত দিব— আকাশ পরিষ্কার— সূর্য উঠেছে। কন্কনে ঠাণ্ডা। আনানের দক্ষিণে ভোরের বেলা অল্প অল্প তীব্রের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কোরাবার আরও উঠে গেল— Isle of Wightএর পার্শ্বতা তীব্র এবং Ventnor পর্বত ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল। পর্বতের ঢালুর উপরে সমুদ্রের তীরে শাদা শাদা বাড়ি বিজ্বিজ্ব করছে— লিপিগই সহরের মত। এ জাহাজে বিখ্যাত তীর্থ— এককোণে নিবিবিচি চৌকি নিয়ে বসে লেখবার ঘো নেই এবং ব্যাগও নেই। Brindisi থেকে আরো অনেক পোক উঠবে— ভরসা করি আমাদের Cabinএ আর কেউ আসবে না। আমাদের Massilia জাহাজের Purserকে এ জাহাজে দেখলুম। সে আমাদের বলে তোমার স্বপ্ন না। আমাদের Massilia জাহাজের Purserকে এ জাহাজে দেখলুম। সে আমাদের বলে তোমার স্বপ্ন না। আমাদের Massilia জাহাজের Purserকে এ জাহাজে দেখলুম। সে আমাদের বলে তোমার স্বপ্ন না।

উপর আদ্যকে পাশে নিয়ে হুইফটু করে বেড়াতে চায় এবং বিস্তর গল্প বলে— লোক খুব ভাল সম্বন্ধ নেই— নইলে আদ্যকে বেচে নিলে কেন— সমাজগার বটে। কিন্তু সর্বদা আদ্যের প্রতি মনোযোগ দিলে আদ্যের লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। Wallaceএর Darwinism পড়তি— বেশ লাগচে— ইচ্ছে করতে বাসলায় তর্জমা করতে। কিন্তু আদ্যের দায় হয়ে উঠবেনা।

আমি “জেক” বেড়াতেও একটি লোকের সঙ্গে আসাশ হল সে কর্তাধামন্যায়কে জানত। একটা বড় সেনাপতি গোছেহ লোক— Egyptএ থাকে। অনেক কথা হল। English Governmentএর কথা হতেই আমি ইংরেজের ব্যবহার সম্বন্ধে জুএকটা কথা বল্লাম। সে আশ্চর্য হয়ে গেল— সে বলে আদ্যের সময় ঐরকম ছিল বটে কিন্তু এখনো আছে না কি? শুনে স্বাভাবিক উপর ভাবি চোটে প্রকাশ করলে। বলে— লোক বলে ভারতবর্ষের ব্যাঘবে ভাবি ঠিকার— কিন্তু Bond Streetএর চেয়ে ঢের ভাল। নিরস্ত্রীয় ভারতবর্ষীয়েরা নিরস্ত্রীয় ইংরেজের চেয়ে বে কত ভাল তা বলতে পারিবে। বলে হিন্দুই বা খ্রীষ্টিয় Christian তাদের কমান্ডারগণ সচিব নম্রতা তাদের আশ্চর্যিক সজবতা গুহামনের অঙ্গকরণীয়। লোকটা খুব ধার্মিক— আমাকে গুহাবর্ধে লগাওয়ার কতকটা চেষ্টা করলে। আদ্যের ইংরিজি ভাষা শুনে খুব বিষয় প্রকাশ করলে। বিজ্ঞাসা করলে আমি Oxfordএ পড়েছি কি না— আমি বল্লাম— না— কোন দেশের কোন কলেজে পড়েছি কি না— না— শুনে অবাক।— সে বলে আমি India Officeএ থাকি— অনেকটা জানতে পারি আদ্যের সময়ের চেয়ে এখনকার ভারতবর্ষীয় ইংরেজরা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ বেশ। আমি বল্লাম আদ্যের উট্টো বিশাল— গুহাভ্যন্তর কর্তাধামন্যায়ের সঙ্গে ইংরেজের বেশাবিশিষ্ট কথা বল্লাম— সে বলে His was the only solitary instance। আমাকে বলে যদি কখনো পুনরুৎ ইংলেণ্ডে আসি তা হলে India Officeএ তাকে সন্মান করে বেন look up করি।— সমুদ্র আশ্চর্য শাস্ত্র এবং সবত দিন যৌত্বোচ্ছল পরিচায়। একটা নিরিবিদিলি কোণ গেল কথিতা লিখতুম। জাহায়ে ক্রমে আদ্যের বহুবুদ্ধির সন্ধাননা দেখ্টি।

ইংরেজ মেয়েদের চোখ আদ্যের ক্রমে ভাল লাগচে— মেঘবৃত্ত নীলাকাশের মত এমন পরিচায় এবং উজ্জল— গ্রামই বন গল্পের আচ্ছন্ন। আদ্যের বেশের মেয়েদের চোখে একবকম আবেশের তাহ আছে— এধে তা মোটে নেই।

লনিবার। Bay of Biscayতে পড়া গেছে। সমুদ্র ভিত্তি অশাস্ত্র। সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এখন পরিচায় হয়ে গেছে। আর একজন সংবাদীর সঙ্গে পরিচয় হল— তাকে Archerএর Studioতে দেখেছিলুম— টেবায়। Turbul— কৃতপূর্ণ স্থানিসিগাল সেজেটোরি। সে বল্ছিল আমাকে যদি কেউ মন হাজার টাকা দেয় তাহলেও আমি কলকাতা ছেড়ে ইংলেণ্ডে বসতি করিবে। আমি বিজ্ঞাসা করলুম— কেন?— সে বলে ইংরেজ জাত বড় উচ্চত বার্ষিক গঞ্জিত ইত্যাদি। কদাসীরা গনের চেয়ে ঢের ভাল।— আমি কখনো বোম্বুর কখনো মেঘ কহচে— খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। কাল চমৎকার সূর্য্যস্ত দেখা গিয়েছিল— আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে এমন স্বন্দর রং হয়েছিল। আমি মেঘের মধ্যে সূর্য্য অস্ত-গেল। সমুদ্র মাঝে মাঝে ফুল ফুলে উঠতে।

রবি। কাল রাত্তিরে আদ্যের সেই স্বন্দর স্বপ্ন দেখেছিলুম। যত্নে বোধ হচ্ছিল মনের কটে

আমি যেন উচ্ছ্বাসে চীৎকার করে কোথায় ছুটে চলেছি। ঠিক এই ধরনের ব্যপ্ত কতবার ঘেঁষেছি তার ঠিক নেই। সকালে আমার সহধাত্রী Connollyর সঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে কথা হচ্ছিল। সে বলে আমি ভারতবর্ষে কখনো Anglo Indian বলে ডিঙবনা— আমি সেখানকার বেশের লোকের সহায় এবং বন্ধু হব। আসবার আগে Lord Ripon এবং তার Private Secretaryর সঙ্গে এ বিষয়ে তার অনেক কথা হয়ে গেছে। আর সত্যলবেদা কুশাশঙ্কর। কুশাণা কেটে দিয়ে বেশ তোড়র উঠেছে— ছাতের চালেয়া খাটিয়ে দিয়েচে— তাই আর অনেকটা snug বোধ হচ্ছে— আর তেমন ঠাণ্ডা নেই। এ আহারে একটি মেয়ের হৃদয় নীল চোখ এবং চমৎকার ট্রাট— হাসলে বেড়ে দেখায়। আমার ভিনার টেবিলের সন্নিহীন চেয়ে একে অনেক ভাল দেখতে। এর মুখের ভাবে বেশ একটু কোনদ নহতা আছে— উগ্রতা কিছুমাত্র নেই। আর আর এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ করে নিলে— You belong to the great Tagore family of Calcutta? আমি গান গাইতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্লুম হ্যাঁ। সে বলে Colonel Chatterton বলে এক নব্ব Musician Brindisi থেকে আমাদের জাহাজে উঠবে— সে এলে আমাদের অনেককম আমাদের প্রমোদ হবে— আমাদেরও পাগুয়াবে।— Darwinism শেষ করা গেল। খুব ভাল লাগল—বিশেষতঃ শেষ Chapter। Spiritual Manএর মধ্যেও Survival of the fittest নিয়ে বেশ দ্বন্দ্ব চলেচে— তবে তার জীবন দৃষ্টা অস্ত্র বকমের। যখন কথিত প্রার্থনা করেছিলেন দৃত্যোগ্যত্বতঃপন্থ তখন এই Spiritual survival প্রার্থনা করেছিলেন। আমরা যে আত্মা পেয়েছি তারি দললতা চেয়েছিলেন।— চমৎকার পৃথাস্ত। সন্ধ্যার মধ্যে মল এবং আকাশে একরকম শারীরিক লাভ্যা প্রকাশ পায়— যেন হয় যেন তার মধ্যে জীবনের এবং মৌবনের পরিপূর্ণতা পরিফুট হয়ে উঠেচে।— Wallace পড়ে আমার মনে এই একটা চিন্তার উল্লস হয়েচে যে, আমাদের যে অংশ জন্ত সেই অংশই আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক— এবং Natural Selectionএর নিয়ম অনুসারে সেই অংশ ক্রমশঃ উদ্ধৃত হয়েচে— কিন্তু আমাদের অনেকগুলি মানবচিহ্নগুলি আছে যা আমাদের জীবনবন্ধ্য পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যক নয়— মৃত্যুঃ জীবনসংগ্রামের নিয়মানুসারে সেগুলো কি করে উদ্ধারিত হল কিছু বোঝবার যো নেই। আমাদের বর্ষভাব জীবনরক্ষার পক্ষে আবশ্যক এমন কি অনেক বলে বাধ্যজনক। উদ্ভিদ এবং জন্তুদের যা কিছু আছে সমস্তই তাদের আবশ্যক অথবা অতীত আবশ্যকের অবশেষ, কিন্তু আমাদের প্রধান চিত্তভূক্তিসকল আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত। এ পর্যাপ্ত প্রমাণ হয়নি পৌন্য আমাদের জীবনের পক্ষে আবশ্যক— যে জাতির যথো শিল্পচর্চা অধিক তত্বে অস্ত্র জাতির চেয়ে বশিষ্ঠ বা তাদের জীবনীশক্তি অধিক। গ্রীকরা রোমের কাছে পরাজিত হয়েছিল। যাত্রা সঙ্গীতচর্চা করে জীবনসংগ্রামে তাদের বিশেষ কি সুবিধে বোকা হার না। অস্ত্র এবং এলকল মনোবৃত্তি আবশ্যকের নিয়মানুসারে আবিস্কৃত হয়নি— পৌন্যপ্রিয়তা মানবের স্বভাবতঃ স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। এইসকল আপাততঃ আবশ্যক চিত্তবৃত্তি আবশ্যিককে কোন্ উচ্চতর আবশ্যকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কে বলতে পারে।

সোমবার। আজ চৌকিতে আমাদের হলে Modern Thoughts & Modern Science পড়ছিলাম— একল লোক এসে আমাদের Quois খেলতে নিয়ে গেল। Stupid খেলা। আর

সত্যিই বোধ হয় সত্য হবে। ইংরেজ সমাজের একটা আদর্শ চোখে খুব ঠেকে—এখানে মেয়েরা পুরুষদের প্রতি অন্যায়সে Rude হতে পারে—Public Opinion তাতে কোন বাধা দেয় না। ভয়ভার নিঃস্ব যে স্ত্রীপুরুষ ভেদে বিশেষ তফাৎ হবে তার কারণ আমি বুঝতে পারিনি। হঠাত হতে পারে গোলোপেই যে কারণে পাটা থাকা আবশ্যক—যেখানে স্ত্রীপুরুষে বেশি মেশানিগি সেখানে স্ত্রীলোকের সেই কারণে কতকটা প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। বাই হোক তার চেয়ে আমাদের মেয়েদের সর্জনীন কোনলতা এবং সমতার তার আমার চেয়ে বেশি ভাল লাগে।—এটা সবাই মিলে আমার কোণ থেকে আমাকে উশুড়ে বের করার চেষ্টা আছে।

Concertএ আমাকে গান পাওয়ালে। বিস্তর বাৎসর্য পাওগা গেল। অনেক মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে—পরিচিতিসংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠেছে। গানের পর খুব একটোট বাচ হয়ে গেল—আমি নাচি কিনা অনেক সন্ধান নিলে আমি বহু—*I used to dance—but I am out of it now—I am sure to come to grief if I attempt it.*—মিস্ট্রিক নামটা মনে পড়েনা বলে *Do try* আমি বহু *Excuse me*। *I belong to the obscure genus of wall flowers*। নাচ বেশলে আমার মন ধাৰণ হয়ে যায়। একটা অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়ে ছিল। Gounodর Serenade এবং If গিয়েছিলুম। আদ্যকাল আমি অনেকটা সাহেলপূৰ্ণক গলা ছেড়ে গান গাই—বাধি শুনলে বোধ হয় অনেক উৎসাহ মিত।

আমি দুপুখ বেলা Portugalএর একটুখানি বেধা বেধা গিয়েছিল।

ক্রমশ

মিল	=	তারকনাথ পালিতের কন্যা
Mrs Palit	=	তারকনাথ পালিতের স্ত্রী
মুতি	=	মুরোপবাসী ঠাকুর
ইন্ (ইন্দুতী দেবী) . ৪	=	মহাবীর স্ট্রীট কন্যা সোঁদামিনী দেবীর কনিত কন্যা
বোমেল	=	ইন্দুতী দেবীর স্ট্রীট পুত্র
বসি	=	ইন্দুতী দেবীর মধ্য কন্যা
দীপা	=	ইন্দুতী দেবীর স্ট্রীট কন্যা। ময়মনসিংহ স্ট্রীট
কর্মাধাৰনাথ	=	মায়কনাথ ঠাকুর
নামদল বৈশ্য	=	কলকাতা কলেজ, জ্যোতিষিন্দ্রনাথের স্ট্রীটকাণি কলকাতা কলেজ

গান্ধীজি

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সীকার করতে হবে বাংলাদেশে চার মণ্ড অস্ত্র নিয়ে গান্ধীজির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে নি। মহাত্মার চরিত্রের উল্লেখ মহত্ব, তাঁর আলৌকিক দীর্ঘ ও মৈত্রীর কাছে অস্ত্র সকলের মত বাঙালি মাথা হুটবেছে। মাহুবেব ও তার সামাজিক জীবনের যে আদর্শ মহাত্মার জীবনে কর্মে ও কথায় প্রতিফলিত তার ডাকে বাঙালি অনেকবার বড় বকন সাজা নিয়েছে। কিন্তু সে আদর্শের কল্পনা তার মনকে কানায় কানায় ভরে দেয় নি। বিচিত্র জীবনের পরিপূর্ণতার যে আনন্দ সে আদর্শে বাঙালি তার খান পায় নি। ও আদর্শের আত্মান উপেক্ষা করা যে কাণ্ডকারচা বাঙালি মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু সে আত্মান কতটুকুর আত্মান, বহুদূরী জীবনের বর্ণগন্ধের অহৈতুক আনন্দের আকর্ষণ নয়।

ধারা বলবেন গান্ধীজি কালের লোক, কর্মমহাবোধী, প্রকৃত কর্মীর মত উদ্ভিষ্ট লোকের দা উপায় তাতে তাঁর একাগ্র মন নিবদ্ধ, তার দা অবাস্তব সে চিন্তায় তিনি চিন্তের বিবেচন ঘটান নি, তাঁরা মহাত্মার কাজকে দেখেছেন অত্যন্ত বাইরে থেকে, তার মর্মকথা উপলব্ধি করেন নি। সম্মুখে নেই গান্ধীজি মহাকর্মবোধী; তাঁর জীবনব্যাপী বহু বিচিত্র কর্মের অগ্রদূত অশ্রুতানের ভুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর সঙ্কল কর্মের এক লক্ষ্য মাহুব, ব্যক্তিগত মাহুব। মহাত্মার রাষ্ট্রনীতি সমাজচিত্তা ধনতন্ত্র শিক্ষাতত্ত্ব সব-কিছুতে এক মাপকাঠি; মাহুবেব, ব্যক্তিগত মাহুবেব, চরিত্রের উপর কোন ব্যবস্থার কি ফল ফলবে তাই দিয়ে সকল ব্যবস্থার বিচার। যে ব্যবস্থা চরিত্রের আদর্শকে পূর করবে মনে হয়েছে তাকে তিনি নির্বন হবে বর্জন করেছেন, যতই আন্তরিকতায় সে ব্যবস্থা হোক-না কেন। মাহুবেবের প্রয়োজনে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক প্রয়োগের যে তিনি বিরোধী ছিলেন তার মূল এইখানে। সে প্রয়োগে মাহুবেবের দ্বিষ্ট। কিছু কমবে, যে মাহুবেবকে তিনি অসীম ভালোবাসতেন তার দুঃখকষ্টের কিছু লাঘব হবে সে কথা তিনি অবশ্য জানতেন। কিন্তু চরিত্রের অদৃষ্টক দা আঘাত করে তা থেকে বঞ্চিত করাই যে প্রিয়জনকে বাচানো সে সম্মুখে তাঁর চিত্ত দৃঢ় ছিল। যুদ্ধে রাষ্ট্র-আন্দোলন আরম্ভ করে তিনি যুগ্মপথে ধামিয়ে দিয়েছেন, বশনই দেখেছেন তাঁর ডাকে ধারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তাদের চরিত্রের উপর ফল হচ্ছে অমহুতোচিত। বলেছেন, তাঁর ভুল হয়েছিল, পর্বতপ্রমাণ ভুল। ভুল আর কিছু নয়; মাহুবেবের চরিত্রের উপর যে ভরসা তিনি রেখেছিলেন মাহুব তার উপদ্রুত হতে পারে নি। তাদের সকল ঋণি তিনি নিজের ঋণি বলে স্বীকার করেছেন। ফলশ্রুতি কোন কর্ম-মাহুবেব এমন সাধা ও সাহস হবে ?

যে রাষ্ট্রনায়কদের বলে 'পলিটিজান', তাঁদের সঙ্গে মহাত্মার রাষ্ট্রনেতৃত্বের প্রভেদ এইমত একবারে মূলগত। তাঁদের কথা বর্জ্যই না— রাষ্ট্রের কাজ আর দ্বিত ধানের উপায় ও উপলক্ষ্য, আসলে নিজের উন্নতি ও প্রতিপত্তিই প্রধান লক্ষ্য, ইংরেজিতে ধানের নাম 'কেরিয়ারিষ্ট'; সেই পলিটিজানদের কথাই বলা— নিজের কাজ দিয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল করতে পারবেন বিশ্বাসেই ধারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব কামনা ও অদৃষ্ট

করেন। অবশ্য মানুষের তটল মনোবৃত্তিতে রাষ্ট্রের হিত ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনেক সময় জানে ও অজানো মনে হতে পারে। কিন্তু যারা প্রকৃত পলিটিসিয়ান তাদের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি মোটেও উপর গৌণ, সকল রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের উপাধম্যায়। যেনব বিদিশ্যবস্থা রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলকর মনে করেন সেসকল বিদিশ্যবস্থা রাষ্ট্রে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন পলিটিসিয়ানেয়া। এ চেষ্টাই তাঁরা ধরে নেন যে, সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের, চরিত্রের যা নৈতিক পড়ন তা ঐ দৃষ্টিতে থাকবে, অস্বস্ত বস্ত্রমানে ও নিকট ভবিষ্যতে। অত্যন্ত মিশ্র পড়ন; ভালো-মন্দ, উদার-নীচতা, বদা-নিষ্ঠুরতা, সাহস-ভীকতা, বুদ্ধি-নিষ্ঠুর বর্ণনাকর। বিশেষ বিশুদ্ধি কি ভাবে উত্তমভাবে এ চরিত্রের সাময়িক পরিবর্তন ঘটে। যা বড় তা প্রকট ও ক্রিয়াশীল হয়, যা ছোট তা চাপা থাকে। অবশ্যই যোগাযোগে সেনের মানুষের মন যখন এর অধিকতর হয় তখন পলিটিসিয়ানেয়া এর সুযোগ নেন প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে, এ আত্মকৃত্যকে প্রচার ও ভীকতা নেন বাণবিকৃতির মহা অধরে। তাঁরা জানেন চোখের তল মার কৃৎস বক্তব্যি করলে তার না পেয়ে লোকের তখন উৎসাহ পাবে; মনের ক্ষত নিজেদের বলি দেওয়া নেন হলে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা এ-ও জানেন এ পরিবর্তন সাময়িক। উৎকট প্রয়োজনের টানে এর আকর্ষক আকর্ষণ। পে টান শিথিল হলেই মূল প্রকৃতি নেমে যাবে তার বিভিন্ন সামান্যতম। বহু উত্তেজনার অবশ্যে সাধারণ মন থেকেও কিছুকালের ক্ষত নেমে যাবে একটু বেশি নীচে। নীচতা নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিকতা কিছুদিনের ক্ষত স্বাভাবিকের চেয়েও প্রবল থাকবে। মানুষের এই প্রকৃতির স্বাধী পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করা পলিটিসিয়ানের কাজ নয়। এরের মধ্যে যারা স্বাধী বক্তা বড় তাঁরা সম্ভবত ভুল করেন যে, তাদের প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় বিদিশ্যবস্ত্রের কলে তাঁদের কালে বেশের বেশির ভাগ লোকের চরিত্রের ক্ষেত্র অংশগুলি বিকাশের যা সব বাধা আছে, আর্থিক রাষ্ট্রিক সামাজিক বাধা, তা কতকটা দূর হবে। বাধা ও দুর্ভাধা কারণে বেশব মানুষের চরিত্রে স্বাধী কাম্য পরিবর্তন আসে তারা শক্তি প্রয়োগের পথ পাবে। এমনকি গৌণ উপায়েই পলিটিসিয়ানেয়া চরিত্রের স্বাধী পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। সোভিয়েত দে চেষ্টা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। একসঙ্গে পলিটিসিয়ান ও চরিত্র-সংস্কারকের কাজ কেবল দুঃসাধ্য নয়, তার ফল যে ভালো হয় না ইতিহাসে তার নজির আছে।

পলিটিসিয়ানেয়া এই পলিটিক্স আর গান্ধীজির পলিটিক্স দুয়ের প্রমোদনই ছিল। গান্ধীজির পলিটিক্সে চাপাশনের আগাছা-মঙ্গল কেটে গাছকে বাড়বার সুযোগ দেওয়া, গাছকে বড় করার উপায় নয়। গাছের গোড়ায় এমন সার দিতে হবে, শিকড়কে রস টানার ক্ষমতা এমন শক্তিমান করতে হবে, যাতে গাছ আগনি বেড়ে উঠবে, আর তার মন ভালপাতার আগুতায় আগাছার বাড় তবিরে মরবে। মানুষের চরিত্রবিকাশের চেষ্টায় অধিকতর পাঠিশাধিক সামাজিক ও মানসিক কাহণের তটল কর্ণকারিতার বীর গতিতে ভরসা বাধা গান্ধীজির কর্মবৃত্তি নয়। গান্ধীজি চেয়েছেন, মানুষকে এমন প্রভাবের মধ্যে আনতে যা শক্তিতেই তার চরিত্রের প্রেক্ষিক বিকশিত হবে উঠবে, পাঠিশাধিককে প্রায় উপলব্ধি করে। আর এ পরিবর্তন আসবে ক্ষমত। কোনো কোনো মানুষের জীবনে ও চরিত্রে যেমন ঘটান পরিবর্তন দেখা যায়, সাদী হয় সাধু, সাংসারিক হয় উদাসীন ভক্ত। তবে এ পরিবর্তনই হবে বাণক; দু-একটি অসাধারণ মানুষের জীবনে ঘটবে না, বহু সাধারণ মানুষের জীবনে ও চরিত্রে দেখা দেবে। পাঠিশাধিককে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু এ ফল ফলাতে তার যে পরিবর্তন প্রয়োজন তার পরিমাণ

সামান্য। এবং বিকশিতচরিত্র মানুষের চোঁটোতেই পারিপার্শ্বিক এমন পরিবর্তন আনবে যা চরিত্রের জ্যেষ্ঠত্ব অঙ্কুর, জ্যেষ্ঠত্বকে স্থায়ী রাখার উপযোগী। পলিটিজানেরা যে ব্যাপক ও আত্মনিক পরিবর্তনকে কাজে লাগান এ পরিবর্তন দেয়কমের নয়। কারণ এ পরিবর্তন হবে স্থায়ী, কোনো বিশেষ কার্ণিভিলির সুযোগ ও উপায় নয়, সকল কাজের লক্ষ্য ও ফল।

২

মানুষের বহু বর্ষগ্রন্থক মানুষের চরিত্রে এমনধারা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, তাঁদের ধর্মোপদেশে, বর্ষজীবনের আদর্শে লোককে আকৃষ্ট করে। সে উপদেশ ও আকর্ষণে লোক সজ্ঞা দিয়েছে। চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে; কোথাও স্থায়ী ও গভীর, কোথাও চকল ও বাহ্যিক। কিন্তু এ-উপদেশ ও আদর্শের লক্ষ্য মানুষের সমগ্র জীবন নয়, জীবনের একটা দিক, যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা 'স্পিরিটুয়াল'। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং তাদের দনতাত্ত্বিক কাঠামোকে স্বীকার করে তার মধ্যেই মহত্তর ও বিস্তৃত জীবনের দিকে এ আদর্শের আদ্যমান। এখান থেকে আদর্শ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক, লৌকিক ও লোকাতীতের মধ্যে পড়ার ভেদেখা টেনেছে। যা রাষ্ট্রের তায়-দ্বাধি রাষ্ট্রকে মিটিয়ে নাও, যা ভগবানের তা দ্বাও ভগবানকে। যিত্তর চরিত্রলেখকরা তাঁর সুখের এই উপদেশে ঐ প্রভেদের ব্যঙ্গিই প্রচার করেছেন। কোনো আদর্শ অতুলন বা সাংসারিক জীবন দাপন করেও মনকে তা থেকে মুক্ত রেখে অসাংসারিক আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা দিয়েছে। পরমহংসমতের পাকাল নাড়ের পুষ্টক, কাহার বাল করেও গায়ে কাষ না লাগা, আমাধের বেশে গ্রন্থিত। এগর আদর্শ মানুষের সামাজিক জীবনকে চরম দুলা দেয় না। সে জীবনকে হর এড়িয়ে নয় দাড়িয়ে চলতে হবে, তাকে পাশ কেটে প্রকৃত জীবনে শৌছতে হবে, অথবা তাঁর আকর্ষণকে জয়ের চোঁটর আধ্যাত্মিক জীবনের বেলায়ওকে সফল করাই হবে তাঁর সার্থকতা। সেইজন্য ধর্মোপদেশোঁরা সামাজিক ব্যবস্থাকে জেতে পড়ায় প্রয়োজন বোধ করেন না। সে ব্যবস্থা বেরকম হোক সংসারের পাক তাতে থাকবেই। তাকে নির্বল করার বিকল চোঁটা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। জীবনের সমগ্রতার প্রলাব নেই বলে যদি এ-আদর্শকে বলতে হয় অসম্ভবশী, তবে এ-ও স্বীকার করতে হবে যে, এক লক্ষ্যে এর একান্ত নিবছ-দুষ্টি, এর পাথর অঙ্কু সাক্ষীর্গতাই একে প্রচণ্ড শক্তি ও নিত্যতা দিয়েছে। রাষ্ট্রিক সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে এ আদর্শ দিব নিষ্কল থাকে, ভাড়াপড়ার প্রলাব ও দ্বিত্ব আদর্শনে মানুষকে টেনে রাখে। অনেক লোক আছে এই আদর্শের তাকেই দ্বারা বড় সাজা দেয়। সমাজ-পরীয়ের ত্যারাই লবণ, পচন থেকে রক্ষা করাই তাদের কাজ।

৩

এর ব্যতিক্রম আছে। এমন ধর্ম ও ধর্মমত আছে যা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনকেই আগাতে ও পড়তে চায় না, মানুষের সমগ্র জীবনমাত্রাকে নিবছিত করতে চায়; রাষ্ট্র ও সমাজকে করতে চায় নিজেয় দুষ্টিপত, বিশেষ ধর্মমতের আদর্শের অঙ্কুর বিধিনিষেধে এদের বেঁধে দিয়ে। রোমান চার্চেও অঙ্কুরত পুষ্টক এর পরিচিত উদাহরণ। এ ধর্মমতে এমন বহু লোক জয়েছেন, আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়া কোনো-

কিন্তুতে ধারা পুষ্টি সেনা নি। কিন্তু এ সংঘের ধারা গুলু তাঁরা বলেছেন, ধর্ম ধর্ম সকলের উপরে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ হবে তার অধীন; ধর্মের অনুশাসনে এবে চলতে হবে। রাজা হবে সংঘের আজ্ঞাধর, আর ধর্ম হবে রাজ্যশাসনে রাজার সহায়। ঐহিক রাজসংঘের ভর পারত্রিক সমসংঘের ভর দুর্বার হবে। ধর্মের এই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাথলিক সংঘের ধর্মগুরুরা ইউরোপের রাজাদের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই লাড়িয়েছেন। কখনো প্রকাশ মিত্তি হয়েছে, কখনো প্রকাশ হার। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বেশ-বেশে ক্যাথলিক-রাজার অনুশাসনে রাষ্ট্রের শক্তিস্থিতি, আর ধর্মের অনুশাসন লক্ষ্যে পারলৌকিক সংঘের বিশ্বাসব্রাহ্মে এ চেষ্টার চরম পরামর্শ হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষি যে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সম্বন্ধচেষ্টায় ধর্মিকর্মের মনে আধ্যাত্মিক জীবনের আকর্ষণের চেয়ে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের কূটনৈতিক উৎসাহ শতগুণ প্রবল ছিল। আধ্যাত্মিকতা বেঁচে ছিল তাঁদের অবলম্বন করে ধারা সংঘটন এড়িয়ে লাগকের একনিষ্ঠ জীবন গাণন করতেন। ইউরোপে জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষের নিলাকপত্যর সেন-বহাসেনের অনেক ভাবুক আজ ধর্মের অভিজ্ঞাধিকতার এক ধর্মরাষ্ট্রের প্রাচীন আদর্শের দিকে লুভ চোখে তাকাচ্ছেন। বিশ্বর উপদেশ বা-ই হোক, রোমান সংঘ চেয়েছিল রাষ্ট্রকে ধর্মের কাছে লাগাতে; এরা চাচ্ছেন ধর্মকে রাষ্ট্রের কাছে লাগাতে। কল ভিন্ন হবার কারণ নেই।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার আদর্শ ক্যাথলিক ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিল মধ্যযুগের প্রবর্তিত ইসলামধর্মে। রোমান পদ্ধতি ছিল রাজাকে ধর্মগুরু ও ধর্মগুরুর শাসনে আনা। আরব পদ্ধতিতে রাজা ও ধর্মগুরু এক লোক। পদ্ধতির ভিন্নতার কারণ ঐতিহাসিক। ক্যাথলিক ধর্মগুরু ও নেতারা তাঁদের ধর্মপ্রচার করেছিলেন অশুভান রাজাদের অশুভান রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে। তবে হিসাবে তাঁদের বলতে হয়েছে তাঁদের ধর্মপ্রাচ্য এ পৃথিবীর নয়, লোকাতীত স্বর্গলোকের, সেইজন্যই পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের উপর তার আধিপত্য। ইসলামরাষ্ট্র আরম্ভ হয়েছিল ইসলামধর্মের মিশ্র-বিষয়ে। সত্যধর্ম প্রচারের জন্যই রাজ্যময়। পুরাতন রাজব্যবস্থা লোপ করে ইসলামরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ একাধারে ছিলেন ইসলামের ধর্মগুরু, ইসলামসেনার সেনাপতি, ইসলাম-রাষ্ট্রের রাজা। ধর্ম-অভিযানের উত্তেজনার পিছনে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক প্রেরণা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সত্যধর্ম প্রচারের আবেগও ছিল প্রকট ও প্রবল। মহম্মদের মৃত্যুর পরও এই প্রথম বেগ দত্বিন অব্যাহত ছিল নেতার মিনেত্বও তত্বিন ছিল বাস্তব সত্য। কালক্রমে ধর্ম ভাটা এল তবন খতাবতই এই একমন্তব্য হয়েছিল প্রাণহীন অব্যাহত; তবুও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তির অনবীক্য তবুও সত্যের টিক থাকলো। ফলে মুসলমান জনসাধারণের রাষ্ট্র যে মুসলিম ধর্মবাহকের সঙ্গে একাত্ম মুসলমান রাষ্ট্রের রাজবিধি চলবে মুসলিম ধর্মবিধান ও আচারের সব ধরে, এ ধারণার মূল বিচলিত হয় নি। মুসলমান রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসে দেখা যায় যে-মুগ ওর কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ স্বর্নানবীর সভ্যতার ধারায় অধীর্ণ কিন্তু কয়েকে সে-মুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের একাধিকত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল শিথিল। যে মুগে বিত্তল সভ্যতাব্যবস্থার নামে ওদের সম্বন্ধকে অচ্ছেদ্য করার চেষ্টা হয়েছে সে-মুগে রাষ্ট্র নিজেই ও অন্তর্কে শুণু পীড়ন করেছে; সভ্যতার ভাঙারে শূন্য অর্থের বেশি কিছু দান করতে পারে নি।

বাহুদ্বীপে যান হতে পারে গাছীজি যে আহম্মাঝোর কথা বলেছেন তা এই ব্যাখ্যাত্মক ও মূলনিম্ন আদর্শের সাধন। একটু সাধনানে যেখানেই সে দৃষ্টবিশ্রম দ্ব্যর্থ, তুল্য ধরা পড়ে। ধর্মের অহুশাসনে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পুটান কি মূলমান আদর্শে ধর্ম কতকগুলি বিশেষ বিশ্বাস ও তার অহুশাস্ত্রী আচার্যের সঙ্গে প্রকাশ ও নিগূঢ় বোঝে হুক্ত। সে বিশ্বাস ও আচার্যে যাদের আস্থা নেই রাষ্ট্রের ভিতরে থেকেও তারা থাকবে বাইরের লোক। ধর্মের নির্দেশ তাহের অন্তরে বাহ্য না হয়ে হবে বাহ্যিক বাহ্যনিবেশের কাটাতে। এ কাঠামোর মধ্যে উল্লার মুক্ত মানবতাকে গড়ে করানো যায় না; দার্শনিক তত্ত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ঠেকা দিয়েও নয়। বেশি টানাটানিতে কাঠামোই ভেঙে যাবে, যা থাকবে তাতে পুটর ও মূলনিম্নের অবশেষ পাওয়া যাবে না। গাছীজি রাষ্ট্রব্যাপারে যে ধর্মের কথা বলেছেন সে হচ্ছে বিশেষ ধর্মবিশ্বাসনিরপেক্ষ চারিত্রিক আধ্যাত্মিকতা। তিনি বলেছেন, সকল ধর্মবিশ্বাসকে সমান ভক্তি করতে। তার এক অর্থ প্রতি ধর্মভেদে যা একাত্মিক বিশেষ তাকে অবাস্তব জ্ঞানে তাহের মধ্যে যে সর্বধর্মসাধারণ আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা নিহিত আছে তাকেই ধর্ম মনে করা। এতে ধর্মবিশেষের কোনো বিশেষর থাকে না। সেইজন্য গাছীজি তাঁর প্রার্থনাসভায় যখন কোরাণ থেকে বচন পড়িয়েছেন তখন অনেক মূলমান তাতে খুশি হন নি এবং অনেক বিন্দু আপত্তি তুলেছেন। ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে, কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এক বস্তু নয়। ধারা ধর্মবিশেষের নিষ্ঠাবান ধার্মিক ওরা আধ্যাত্মিকতাকে নসত্ব্য করেন, কিন্তু ধর্মের আচার-বিশ্বাসময় যেহেতুই ধর্ম বলে মানেন।

যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমাজের আদর্শকে গাছীজি বাহ্যবাহ্য বলেছেন সে আধ্যাত্মিকতা সাধকের আত্মোপলব্ধি আধ্যাত্মিকতা নয়। উর্ন থেকে সৈবশক্তির অবতারগণ অতি-মাছুষের আধ্যাত্মিক সমাজের যে করনা, সে আধ্যাত্মিকতাও নয়। পরিচিত সমাজের সাধারণ মাছুষকে নিয়ে গাছীজির চেষ্টা ও চিন্তা। এই মাছুষের জীবন ও চরিত্রের এক আদর্শ গাছীজির মনে ছিল। তাঁর সকল কাজের চরম লক্ষ্য মাছুষকে এই আদর্শে পৌঁছে দেওয়া। রাষ্ট্রের বিধি, সমাজের পড়ন, ধন উপাধন ও বটনের কোশল এই লক্ষ্যের পথকে সুগম করার ও চারিত্রিক আদর্শকে স্থায়ী করার উপায়। শিক্ষার লক্ষ্য এই চরিত্র গড়া। সেইজন্য উপায় ও উদ্দেশ্যের প্রত্যেককরনা গাছীজি করেন নি। যে কাজের দ্বারা চরিত্রের আদর্শকে স্মরণ করে, শ্রম ও সহজে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আদ্যে সে উপায়ের উপদেশ তিনি কখনো করতেন না। এ ছিল তাঁর কাছে বিশ্বের যতন পরিত্যাগ। শিষ্টি বহু সাধনের উপায়কে শোধন করবে তাঁর কাছে এ কথা অর্থ ছিল না। কাহন, সিদ্ধি ব্যুত্বের কোনো কিছুই লাভ নয়। মাছুষের চরিত্রকে গড়ে তোলাই সকল সাধনাত্মক সিদ্ধি। যা উপায় তার চেষ্টাই এ চরিত্র গড়ে। উপায়ের প্রত্যেক পরিক্ষণ কেবল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে না, উপায়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যকে লাভ করে।

গাছীজি মাছুষের যে আদর্শচরিত্রের করনা করেছেন তার মধ্যে অটলতা নেই। মাছুষের মনে থাকবে বৈতী সকল মাছুষের উপায়। সেইজন্য সে হবে অস্থির ও অকোষ। তাঁর জীবনব্যাপী

হবে সঙ্গ, উপকরণবাহ্যলুপ্ত; অন্তের প্রেমের উপর বস সত্ত্ব কন্ম বাতে নির্ভর করতে হয়। নিজেই শরীরবাহ্যের অনেক উপাদান সে নিজেই তৈরি করবে, কারণ প্রতিমান না দিয়ে পথের প্রেমের কল সে আত্মসাৎ করবে না। যে ক্ষত্র সে হবে নিরাস। সমাজ ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবহারে জটিলতায় এই ধর্ম-প্রতিমানের পরিমাণের তুলনা করা দুঃসহ। সে ক্ষত্র ও ব্যবস্থাকে সরল করার প্রয়োজন, নিজের অঙ্গের বিনিময়ে অপরের অনেক বাতে আত্মসাৎ না করতে হয়। মানুষ হবে সত্যাত্মী; অসত্য ও অজ্ঞার সে আশ্রয় করবে না, নিজের দ্বার্ষ্যে কি দেশের দ্বার্ষ্যে। অন্তের অসত্য ও অজ্ঞার আচরণে সঙ্কট করবে না, তবে কি উপেক্ষার; নির্ভীক বীর্যে তার প্রতিরোধ করবে। সমাজের শত্রুজ্ঞানে কোণে আঘাত দিয়ে নয়; সে আচরণের সঙ্গে অসহযোগ করে, বৈদ্যুতিক জ্বলন্ত ক্রোধকে জ্বল করে, অগোচ্রে সোচ্চার লোভকে লক্ষ্য দিয়ে; প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণকে বিসর্জন করে। এমন চরিত্রের মানুষের সমাজেই সাম্য আসতে পারে; যে সমাজে হিংসা কোথ অসহ্য নেই। কেবল ধর্মের উৎপাদন ও বাটোয়াবার কৌশলে সে সাম্য লাভ নয়।

মুহুনি মুহুমানসি তবুও বহ্মানসি কঠোর এ মনকে কবি কল্পনা করেছেন লোকান্তর বহাণুকন্ম-বের দুর্জয়ের চরিত্র বলে। গাঙ্গীজি একে কল্পনা করেছেন সাধারণ মানুষের চরিত্রের আদর্শরূপে। সাধারণ মানুষের জীবনে এ আদর্শ বাস্তব হবে কোন্ উপায়ে? মানবদম্যের ক্রমবিকাশে ভ্রমণ যথেষ্ট তবুও তবিত্ত্ববশীলতার জীবনে এ বাস্তবতা-কল্পনা নিরাসক বিজ্ঞানীর চিন্তাতত্ত্ব, কর্মীর মনোভাব নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে এই চরিত্র বিকাশের ক্ষত্র তাকে আবাল্য বিশেষ শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে বাধ্য উপদেশও গাঙ্গীজি করেন নি। স্বীকৃত্যথেকে এক চিঠিতে গাঙ্গীজি লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মহত আছে উপযুক্ত জ্ঞাতক ও তা লাভ সেবে না। মানুষের এই মৌলিক মহত দ্বার্ষ্যে তুচ্ছতার, ঈর্ষাভেদের লজ্জাতম আচ্ছন্ন থাকে। তাকে মত্ত তাক পুনর্লই সমস্ত হীনতা কাটিয়ে যে মেগে গঠে, মানুষের মহৎ চরিত্র অগ্নি ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ হয়। সাধারণ মানুষকে আদর্শ-চরিত্রে প্রতিষ্ঠার গাঙ্গীজির এই পথ। কর্মের হাত্মপথে এ তাক গাঙ্গীজি অনেকবার দিয়েছেন। দামের তেকেছেন কখনো তারা অকৃত লাভা দিয়েছে; লোভে বলেছে অলৌকিক ঘটনা ঘটল। কখনো তারা লাভা সেব নি। ধন লাভা পেয়েছেন তখন বলেছেন, মানুষের মহত্ত্বের গুণ; ধন লাভা আসে নি মহাত্মা বলেছেন তাঁর নিজের দাম; যে মনে তিনি তেকেছেন তার বিতর্কিত দাম ছিল। মানুষের উপর মহাপুরুষের এই মহাবিশ্বাস হল সেই শক্তি যে শক্তি পর্বতের স্থাপত্যকে বিচলিত করে। মহত্ত্বের বেদনে জ্বল হয়েছিল ইতিহাসের পতীয়ে ছিল এই শক্তির ব্যক্তন।

মানুষের প্রকৃতিতে বড়-ছোট ভালো-মন্দে মৈত এমন প্রকট যে প্রাচীন কাল থেকে ভয়ভয় নানা রূপে এ তথ্যকে বর্ণনা করেছেন—দেবাসুরের সংগ্রাম, আলো-অন্ধকারের বিরোধ, নিত্যানিত্যের দ্বন্দ্ব। নিজের প্রকৃতির সত্ত্বের উপর উভয়ে জয়ী করার নানা কৌশল ও পথ জাতীয় উপদেশ করেছে। একজন জানী বলেছেন, বুদ্ধির বিমেষণে গুণ ও অগুণের বহুপের জ্ঞান হলেই মানুষ অগুণকে ধন করে চিন্তায় ও চরিত্রে গুণকে প্রতিষ্ঠা করবে। সূত্রগত গুণের সাধনা এই বিবেক-জ্ঞানের সাধনা। অন্ত

জানীয়া বলেছেন, এ উপদেশের চিত্তি মানুষের মূল প্রকৃতির এক ব্রাহ্ম ধারণা। ধর্ম কি তা জানলেই মানুষের তাতে প্রকৃতি হয় না, অর্থকি তা জানে তবুও তা থেকে নিবৃত্তি নেই। তার ছবিঙ্কিত ছবিকেশ যে পথে চালান সে সেই পথে চলে। প্রাচীনরা বলেছেন সে হচ্ছে ভগবৎকৃপা, যা না হলে স্বভাব-বুদ্ধি কিস্তিতে আসে না। সে কৃপার জন্য একান্ত ভক্তিতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। নবীনরা বলেন, যাদের অতিগরমে চেতনার অবচেতনে বাগ-বিতৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা-প্রকৃতির যে আলোড়ন চলছে সেই ছবিঙ্কিত ছবিকেশ মানুষের প্রকৃতিকে যে আকার দেয় সে সেই আকার দেয়। অন্য থেকে শৈশবের, জন্মপূর্ব থেকে বংশের পূর্বতনদের অহুত্বি চুইয়ে এই অভলে জমা হয়েছে। বাশের মত এদের পরিচ্ছিন্ন আকার নেই, কন্ড বাশের মতই এদের শক্তি। যেমিকে মানুষকে টানে, সচেতন চেতায় তার ভিন্নমুখে চলা দ্রুত, হয়ত অসম্ভব। বাইরের চাপ, সমাধ ও রাজার ভয়, পরলোকে দুর্গতির আশঙ্কা বাহ্যিক কার্যকলাপ অনেকটা নিষ্প্রতি রাখে, কিন্তু মূল প্রকৃতি অশোভিত থেকে যায়। চাপ ও বিশ্বাস শিথিল হলেই সেই প্রকৃতি চরিত্রে প্রকাশ হয়। অন্তেরা বলেন, মানুষের প্রকৃতির বলবৎ গুণ হীনতার উপর তার মহত্বের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন এই হীনপ্রকৃতিকে নিগ্রহে, ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে সেই নীচু মিকে টানে তার উপর বৈরাগ্যের অভ্যাস। কিন্তু কেন মানুষ এই নিগ্রহ-বৈরাগ্য-অভ্যাসের কৃচ্ছ সাধনার হত হবে? কঠিনতা প্রেমেব আকাঙ্ক্ষার সহজ বাগপ্রাপ্ত প্রেরকে ছাড়বে কিসের আকর্ষণ? জানীয়া বলেছেন, ঐ প্রেমেব আকর্ষণে, আর কিছু নয়। বোট লাভকতি হিন্দাবের পাটোয়ারিবুড়ি মানুষের প্রকৃতিতে বদলায় না, এ লোকের লাভকতিও নয়, পরলোকের লাভকতিও নয়। চরিত্রের স্রষ্টার আদর্শ যখন মানুষকে আকর্ষণ করে ফললাভের লোভে নয়, যে মহিতি, তখনই মূল প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়; মানুষের প্রকৃতি নবজর লাভ করে বিজয়ে উপনীত হয়। হীনতার আকর্ষণকে জয় করার কৃচ্ছকে আর কৃচ্ছ মনে হয় না।

যে উপলব্ধি তাকে মানুষের অন্তরতর মহত্ত্ব সাড়া দেবেই, গাছীজি বিশ্বাস করতেন, তা এই চরিত্রের আদর্শের আদান। এ আদর্শ কোন পথে যেন পৌছলে মনকে নাড়া দেয়, মূল প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে? গাছীজি চরিত্রের যে আদর্শ কল্পনা করেছেন তা অচিহ্নিতপূর্ব নূতন নয়। কিন্তু এ আদর্শ মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে তার চরিত্র পরিবর্তনের যে উপায় তিনি অহুদয়ন করেছিলেন তা নূতন। সে উপায় হচ্ছে নিষেধ জীবনে সে আদর্শচরিত্রকে মূর্ত করা। স্বভাবতই বেশির ভাগ লোক বলবে এর মধ্যে নূতন কিছুই নেই। সকল ধর্ম ও নীতি প্রবর্তক মহাপুরুষেরা এই উপায়ই অহুদয়ন করেছেন। তাঁদের জীবন ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই লোক আকৃষ্ট হয়েছে; তাঁদের ঘিরে শিষ্ট-সেবক সম্ভার পড়ে উঠেছে। 'আগনি আচরি ধর্ম পরেয়ে শিখার,' 'Imitation of Christ'—এদম এই ভণ্ডারই প্রকাশ। তাঁদের উপদেশের যে প্রভাব তার উৎস তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের আকর্ষণী শক্তি। কিন্তু এই মহাপুরুষদের সঙ্গে গাছীজির একটা পার্থক্য আছে। 'বেশর মহাপুরুষ মানুষের জীবনের অন্তঃস্থ পরিবর্তন এনে তাকে নবজীবন মিতে চেয়েছেন তাঁরা সমাধে, বিশেষ করে রাষ্ট্রে, সে জীবনের প্রকাশকে কখনো বড় মূল্য বেন নি। হয় এদের উপেক্ষা করেছেন, না হয় অপরিহার্য পরিবেশ বলে অল্প কিছুটা স্বীকার করেছেন। সম্ভরটাই মূলতঃ, বাহিরটা অবজ্ঞা আছে কিন্তু তার সঙ্গে যোগ দত কম ততই ভালো। গাছীজি তাঁর জীবনে কর্ণে ও বাহ্যে এ বৈত স্বীকার করেন নি।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে নিঃসংশয় একক ধ্যানের আসনে মাহুকের জীবনানন্দ তাঁর কল্পিত আশ্রয় নয়। এতকম ধ্যানের আসনে তিনি অনেক বলেছেন, হৃদয় প্রতিধ্বনি বলতেন। কিন্তু সে উপবেশন মাহুকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নেমে এসে দৃঢ়পায়ে পড়াবার প্রদানকৃতি। মাহুকের চরিত্রের পরিবর্তন তার সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র ও চেহারা বদল ঘটাবে না এমন পরিবর্তনকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। অথচ মাহুকের চরিত্রের পরিবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের উপায়মাত্র, এ কথা তিনি নিশ্চয়ই মনেতেন না। বেদন বহুপুরুষ মাহুকের অন্তরের মহত্বকে তার বাহ্যিক কন্দের চেয়ে অনেক বড় দেখেছেন গান্ধীজি যে তাদের অগোত্র তাকে সম্বোধনের অবসর নেই। ধর্মশাস্ত্রাঙ্গণিতা মহত্বের সঙ্গে নয়, যে পুষ্ট বলেছিলেন তাঁর রাজ্য পৃথিবীর নয় তাঁর সমুদ্রই যে গান্ধীজির সাক্ষাত্য অন্তিমীকরণ লোকেরও তা চোখ এড়ায় নি। গান্ধীজি যে মন নিয়ে জন্মেছিলেন সে মন মাহুকের ভবত্বঃপন্নাতা পর্যবেক্ষকাদিক মহাপুরুষের মন। কিন্তু তাকে তিনি প্রয়োগ ও প্রকাশ করেছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের ছোটবড় শতকর্মে। তাঁর কল্পিত আশ্রয়চরিত্রের মাহুকে নিষেধ চরিত্রকে এমনি করেই প্রকাশ ও প্রদান করে যে সেই আশ্রয়ই গান্ধীজি তাঁর জীবনে সৃষ্টিয়ে তুলেছিলেন। সমাজের, বিশেষ রাষ্ট্রের, কর্মীর যে কাজ তা বহু লোকের মধ্যে কাজ ও বহু লোককে নিয়ে কাজ। এই জনসংঘের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ মনের পঙ্খিততা মনে নিয়ে তার সঙ্গে আপস করে কাজের সফলতার চেঁচা অনেক কর্মীর কর্মপন্থা। সেই হচ্ছে তাদের মতে বাস্তব পথ, সফলতার সঙ্গী। এ পথের কাহা যে কর্মীদের গায়ে কিছু লাগবে সেটা বাস্তবিক। কিন্তু সেজন্য বেশি ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। গম্ভীরা স্থির থাকলেই হল। পথ যেমন হোক, লক্ষ্য পৌঁছানো নিয়ে কথা। কিছু গুণ ও অনেক পোষে সাধারণ মাহুকের চরিত্র গড়া। তাদের নিয়ে কাজে গুচিরাই পথের বাধা। যে অল্প কর্মী এ আপসে রাজী নয়, সাধারণ মাহুকের চরিত্রকেই ঠাসা বদলাতে চান, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজ মাহুকের কল্যাণে তাঁদের কাজের ক্ষেত্র কি না তাতে অনেকের সংশয় আছে। মাহুকে তার নিষেধ স্তরে এঁদের চোনে নামাতে চেষ্টা করবে, যদি না পারে একদিন তাঁদের হেঁটে 'কেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। গান্ধীজির হত্যার পর ইংরেজ লেখক আলডুন হান্সলি এ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বার্নার্ড শ মহত্বের আবরণে এই কথাই বলেছেন, 'বেশ, বেশি ভালো হওয়ার কি বিশদ।' গান্ধীজি অবশ্য বলতেন, মৃত্যুকে বা অমৃত' না করে সে অমৃত দিয়ে তিনি কি করবেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে যখন গান্ধীজির পথ ও মতের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন বালগদায়র তিলক বলেছিলেন, রাষ্ট্রকর্মে মহাত্মার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন 'বেচ্ছরিটি'র। রাষ্ট্রনীতিবৈত্তার কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংকটের মহাসঙ্কটে এক মহাত্মাকেই রাষ্ট্রসংক্রামের নেতা স্বীকার করেছিল। কল সে গেয়েছে। অল্প কল যদি থাকে ভোগ করতে হবে। কবি বলেছেন, সঙ্গীত প্রবৃতি কেবল শুভকেই জয় দেবে, বোধ কিছু মিশে থাকবে না এমন প্রায় বেধা ঘা না।

এইজন্য গান্ধীজির চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্বের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে। তাঁর চরিত্রের ভাব ও শক্তি বা কেন্দ্র— পবন মাহুকের উপর বাক্য-কার-মনে অহিংসা ও মৈত্রী,

বিশ্বমায় অদভা ও অন্তর্যক বৃহৎ কামাকলগাজের প্রয়োজনেও অস্বীকার— তাঁর বড়-ছোট সকল কাজেই প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট কর্ম কোন পথ নেবে তাঁর অন্তর্যক শিষ্টতাও পূর্ব থেকে তা প্রায় অস্বাভাবিকভাবে গায়তেন না। এর দুই কারণ। তাঁর মনের গভীরে অহিংসা ও সত্যের যে পরশমণি ছিল তাঁর পরীকার কোনটা সোনা আর কোনটা লোহা প্রমাণ হবে তাঁর শিষ্টতা তা জানতেন না। কারণ সে পরশমণি তাঁর মনে ছিল না, থাকার কথা নয়। তাঁর মহাত্মা গান্ধী নয়, অহুদয়কারী মাত্র। দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজির কোনো কর্মক্ষেত্র কেবল ছবরভূমি থেকে উৎসারিত স্রোতের মত নিঃসৃত বেগে নিঃসৃত পথ থেকে চলত না, অনন্তসাধারণ এক কর্মকুশলী বুদ্ধি তাঁর উদ্দেশ্যের উপায় উদ্ভাবন করত। বহু কর্মের আরম্ভে তাঁর উপনিষ্ট উপায় বহুমনের সাংগ জাগিয়েছে; কর্মশেষে তাঁর সফলতা সকলকে বিস্মিত করেছে। তুল হুই নি তা নয়, কিন্তু অপ্রতীকিত তুলনার তার পরিমাণ সামান্য। আর সে তুল সর্বপ্রথমে ও অকণ্টে গান্ধীজিই স্বীকার করেছেন। বাইর কর্মে এই বুদ্ধির নৈপুণ্যে অনেক, বিশেষ ভারতবর্ষের বাইরে আনাথের কৃতপূর্ব রাষ্ট্রীয় জাতির অনেক বুদ্ধিমান লোকে, বলেছেন যে গান্ধীজি মূলত স্বত্ববুদ্ধি পলিটিক্স, তাঁর মহাত্মতা বা 'সেটলিনেন্' বহিঃক— পূর্বসেশের অনদ্যাবরণকে নিঃসৃত পলিটিকাল কর্মশায়ার আকর্ষণের উপায়। যেসকল মহাপুরুষ হাতুর্ষের সাংসারিক ব্যাপারে উপদেশ করেন নি তাঁরাইও অনেকের গভীর বাস্তববুদ্ধি প্রদিত। বাস্তবে অদ্যাবরণী শুদ্ধচিত মহাত্মা তরু ও দারিক হন, মহাপুরুষ হন না। গান্ধীজি এক্ষণেই সেই ও পলিটিক্স ছিলেন। ওয় কোনোটাই বহিঃক নয়। কেবল তাঁর ভীক বাস্তববুদ্ধি বাস্তবের এমন-সব প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছিলেন সেটটা সত্যচর বা করেন না। আর সে বুদ্ধির অনন্তসাধারণতার মূলে ঐ সেটলিনেন্। হাতে মনের অতিগহনের সাগরে যে বুদ্ধিকে বিকৃত কি হান করে না। কোনো মনুষ্যের টান তাঁর সরল পথকে বেকে যে না, কোনো ঘোষের সুদৃশ্য দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায় না।

৭

সেইজন্য মনে বিশ্বাস লাগে আজ বহন গান্ধীজির মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্ট-মহত্ববো। যেনে লোককে ক্রমাগত বলেন, এই কাষের এই পথ, কারণ গান্ধীজির অহিংস্র পথ। তিনি বেঁচে থাকলে এই পথের উপদেশই তোবারের দিতেন। গান্ধীজির কর্মপথের বেগুলি মূলত্ব তা তাঁর নিকটশিষ্টতা যেমন জানেন, বাইরের স্ক্রোকেও তেমনি জানে। তাঁর মধ্যে শুধু ও শুদ্ধপদ্য কিছু নেই। কিন্তু সেই মূলত্বের প্রয়োগে কোনো ব্যাপক ও জটিল রাষ্ট্রকর্মের পথ গান্ধীজির অদৌকিক বৈজ্ঞ ও অনাবিল বুদ্ধিবিগুত মনে বা উষর হয়েছে তাঁর শিষ্টত্বেরও ঠিক তাই হয়েছে গান্ধীজির জীবনকালে এমন ঘটনা ঘটে নি। পথ তিনিই আবিষ্কার করতেন, নির্দেশ তিনিই দিতেন। শিষ্ট-সেবকতা ত্রা শিষ্যার্থ্য করতেন, প্রচার করতেন, অহুদয় করতেন; অনেক বৃক্, অনেক না বৃক্। তাঁর মতামতকে যে তাঁর শিষ্টতা বিনাবিচারে মেনে নিতেন সেমত্রে গান্ধীজি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা ছিলেন। এর বিরুদ্ধে তিনি উপদেশ অনেক দিয়েছেন। বিশেষ কল হুই নি। তাঁর বিশালব্যক্তিত্বের কাছে সাধারণ ঐতিহাসিক-মানে থাকা বড় পলিটিকাল কর্মী ও নেতা তাঁরাও অসম্ভব বাটো হয়ে যেতেন, অন্তরে চোখে ও নিঃসৃত মনে। কারণ গান্ধীজি ঐতিহাসিক-মানে অপ্রতিফলী পলিটিকাল নেতা ছিলেন না। জন-গণ-মনের উপর তাঁর যে অধিকার তার মূল হিসাবসেই

যত তার চরিত্রিক মহত্ব, আকাশের যত তাঁর উদার মন। যাতে দেশের পবিত্র মূৰ্ত্তি সকলেই মর্মে
 ছেনেছে এতকণ মাছুষ যাহুদের ইতিহাসে কসটিং দেখা দেয়; এবং গান্ধীজি ইতিহাসে কখনও দেখা
 দেয় নি। গান্ধীজির মৃত্যুর পর তাঁর সেই চরিত্র ও মন তাঁর শিল্পেরা উত্তরাধিকারস্বত্বে শেখেন
 এ কল্পনায় মনে তরঙ্গা আনে, কিন্তু তার কারণ ও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। গান্ধীজির দেশের শিল্প
 নিয়েই যত ও পথকে গান্ধীজির যত ও পথ ভাবছেন খুব সন্তুষ্ট নিয়েই মরকে তাঁরা গান্ধীজির মনের
 উপর আশ্রয় করছেন— সেই অধ্যান, মায়া ও মিথ্যাজ্ঞানের বা বীজ।

গান্ধীজির অনেক শিল্পের এ কুলের বিশেষ কারণও আছে। বাবা মহাপুরুষের জীবনকালে
 তাঁর আত্মজাতিক শিল্প চন্দ্র ও সান্ধ্য পান তাঁদের অনেক গুলক বাছ আচার ও রীতির অঙ্গুলন করেন
 দেখা যায়। এর কতকটা তত্ত্বিক বাছ অভিব্যক্তির আবেগ, কতকটা বাস্তবিক অঙ্গুলন অঙ্গুলন ও
 গুলক অঙ্গুলন অঙ্গুলন কতক গুলন পাবে এই বিশ্বাস। গান্ধীজির যত্নের বাটো বহির্বাণ, তাঁর আচারের
 সংঘ ও আচারের অন্তঃসংঘাত, চরকার নিষিদ্ধিত হতে। কাটা, নিরলস সরল বৈশিষ্ট্য জীবনধারণ,
 নানা উদ্দেশ্য ও উপলক্ষে উপবাস, নিজেই গৃহ ব'লে কিছু না রেখে আত্মনিক জীবন গ্রহণ, বস্ত্র উপর
 ব্যক্তিব্যক্তির ও স্বামির যেখানে আসে সোপের সীমারেখা—এসব বৈশিষ্ট্য অভিসংযোগ বৈশিষ্ট্য। এর
 দুটো-একটার অঙ্গুলনপথে সাধারণ মানুষের মধ্যে সোকে বাস্তবিক অঙ্গুলন হয়। আর গান্ধীজির
 এসব আচরণ ব্যক্তিক নয়। তাঁর অঙ্গুলনের বা সব গুলক অঙ্গুলন ও প্রিয়তম আদর্শ তাঁদেরই স্বাভাবিক
 বহির্বাণ। গান্ধীজির অঙ্গুলনী শিল্পেরা যদি মনে করেন যে এই অঙ্গুলনপথে তাঁরা গান্ধীজির চরিত্রের
 মত অনেকটা আদর্শ করেছেন তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষতঃ অহিংসা ও বৈশিষ্ট্য কথা গান্ধীজি
 সকল সময়ে বলতেন তাই বাচনিক পুনরুক্তি, এমন কি ব্যক্তিক পালন, বিশেষ স্বত্বিক নয়। এতে কুলনী
 দেশের শিল্প মনে করেন গান্ধীজির মনের অহিংসা ও বৈশিষ্ট্য তাঁরা নিয়েই মনে শেখেন তাঁরা হয়ত
 যাহা-এক, সত্যানে মিথ্যাজাতী নন। যদিও প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে পৌঁছানোর পথ খাড়া নীচু ও
 শিথিল। কারণ কুল ভাঙ্গলে ও ভোল ছাড়া অনেক সাধু পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়।

৮

বিবেচনার অসীমতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি হতে না হতেই গান্ধীজির মৃত্যুতে দেশে যে হত্যাণ্ডা ও
 আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বড় কারণ রয়েছে গান্ধীজি ও তাঁর নিকট শিল্পের মন ও চরিত্রের বিরাট
 পার্থক্যের মধ্যে। ইংরেজের হাতে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লহলেই এলো সেই প্রতিষ্ঠানের হাতে
 যেখানে গান্ধীজির প্রাধান্য শিল্পের অবাধ কতৃৎ। সে কতৃৎয়ের মূলে গান্ধীজির উপর দেশের লোকের
 সীমাহীন বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস সত্যবিত হয়েছে ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর, যা ছিল গান্ধীজির নানা কাজের
 শক্তিকরনের আধার ও শক্তিশ্রবাহের প্রণালী। সত্যাবিত চতুর্থাংশ সে যত্নের তিনি ছিলেন প্রাধান্য দাতা।
 দেশের লোক আশঙ্ক করেছিল যে গান্ধীজির শিল্পের হাতে স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসন ও গড়নে গান্ধীজির
 মনের ও কাজের ছাপ থাকবে যাতে স্বাধীন পৃথিবীর নিয়াকলতা ও ভারতবিশ্বাণের বিজয়িকার মধ্যেও
 সোকে অঙ্গুলন আদর্শ ও স্বত্ব উৎসাহ পাবে। তাই সে আশা পূর্ণ হয় নি? কি আশা? এবং কেন
 তা পূর্ণ হয় নি?

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আশ্রয় নেন্দুস্থানীয়, আধুনিক কি প্রাচীন রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের মাপকাঠির মাপে তাঁরা খাটো নন। পৃথিবীর এক অতি দুঃসময়ে বেশ বহন বহু সমস্তার শীড়িত ও নানা উৎপাতে বিব্রত তখন অন্ধকালের মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রসমস্তার সমাধানে তাঁরা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা নিম্ন গাভীজির তত্ত্বের পরিচয়, ইংরেজিতে থাকে বলে 'স্টেটসম্যানশিপ'। কিন্তু বেশ নিঃসংশয়ে ভরসা দায় নি, যন উৎসাহে জলে ওঠে নি—অনেক কালের পরাধীনতার অবসানে যা স্বাভাবিক। সত্য কথা, জলে উঠে স্তিমিত হয়ে এসেছে তেলের অভাবে। লোকে অহুতব করবেই এর যথো কোথাও যেন ঠাক আছে। স্বয়ং ঠিক হবে বাজছে না। এর প্রধান কারণ নহে যে বহু সমস্তার তাঁরা সমাধানে করতে পাবেন নি—অবশ্য আবাসে বাস্তব শিক্ষার সমস্তা—যা লোকের জীবন দুঃসং করে তুলেছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর অশিক্ষিত, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নহে। সেজন্য গাভীজির শিষ্টত্বের ভাষণে রামস্বামীর মনোহাণী বর্ণনা শুনেও কেউ মনে করে নি যে, ইংরেজের হাতে থেকে গাভীজির শিষ্টত্বের হাতে দেশের শাসন আশামাত্রই সকল দুঃখকষ্টের অবদান হবে, ধন-বাক্ত-বাস্তো দেশ ভরে উঠবে। জনসাধারণের দুর্গত্যা এসেছে হুগ্রাচীন। বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শ লাগলেই সকল সোণা নিয়েবে সোনা হয়ে উঠবে এমন স্বপ্ন কেউ দেখলেও, আশা কেউ করে নি। সূত্রম্ সে আশাভ্রমের মনোভ্রাণও বেশ দুগছে না। দেশের যনকে যা গীতা বিচ্ছে, তার কর্ণোচ্চয়ের মুখে বিকলতার সেতুবন্ধ বেঁধে সে পত্রিকে যা উচ্ছ্বল করে তুলেছে সে হচ্ছে গাভীজির সেন-শাসক শিষ্টত্বের দেশের লোকের সঙ্গে অসহযোগ। তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও কর্মনীতির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগ নেই। যেমন ছিল না সম্মতপন্থিত বিশেষ শাসনের আদলে। দেশের লোকের জন্মই তাঁরা কাম করছেন, কিন্তু সে কামের জন্য তাঁদের প্রয়োজন কেবল সৈন্য, পুলিশ, সরকারী আয়লা—জনসাধারণের উৎসাহ ও কর্ণোচ্চয় নহে। তাঁদের রাষ্ট্রশাসনের সঙ্গে 'কো-অপারেশন' করতে তাঁরা অবশ্য দেশের লোককে প্রতিনিষত বলছেন। কিন্তু তাঁদের কোন 'অপারেশনে' কেমন করে কোথায় কাঁচ লাগতে হবে দেশের লোক তার হৃদয় পাচ্ছে না। সূত্রম্ তাঁদের মনে যা-ই থাক, মুখে তাঁরা যা-ই বলুন, এ 'কো-অপারেশন' হাবির কার্যত অর্থ দাঁড়িয়েছে তাঁদের সকল ব্যবস্থাকে বিনা হাঙ্গামায় পরনদিতকারী বলে মনে নেওয়া। আর সত্য মিছিলে নেতাদের নামে লগননি তোলা। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকামী ক্ষুদ্রপুত্র ইংরেজ রামপুত্রদের অত্যাচারী কলাগাছ ও শালুয় রামপুত্রবৎ।

২

সবেমাত্র বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকর্মে ভারতবাসীকে অবশ্যই শাসকদের সঙ্গে 'কো-অপারেশনে' ভাঙার মনোভাবের উদ্যম যে প্রকাণ্ড ঠাক রয়েছে, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদস্বত্বিত্তে তার মারাত্মক গভীরতাই দেশের যনকে চকল করে তুলেছে। এর অর্থ বাধীনতায় যে দায়িত্ব সবেমাত্র নহে, শাসকসম্প্রদায়ের। উর্ধ্ব থেকে তাঁরা দায়িত্বোত্তর, কলতোপ অবশ্য করতে দেশের লোক, দুফল ও দুফল। কিন্তু তারা ভোক্তামাত্র, কর্তা নহে। ঠিক ব্রিটিশ আমলের ব্যবস্থা। কেবল দায়ী ও কর্তার বৎ বল রয়েছে। গাভীজি এখন 'হুইই ইণ্ডিয়া' হাবিকে সকল করার জন্য দেশবাসীকে তেজহিলেন তখন বলেন নি, আমাদের সঙ্গে কি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা—'কো-অপারেশন' করে। সে ভাবে

সবাই বুঝেছিল এ কাজ তাদের নিজেদের কাজ, নিজেদের করতে হবে। গান্ধীজি ও কংগ্রেস পথদর্শিতা ও স্বপ্ন। গান্ধীজির সকল ভাব ছিল এই স্বপ্ন ভাব। সহযোগিতা করতে থাকার মধ্যে যে তাকে ও যাদের তাকা হ'ল তাদের মধ্যে যে ভেদবৈধতা থাকে সে ভেদবৈধতা গান্ধীজি কখনো চানেন নি। অভিন্নত্ব সব নথ তিনি আবিষ্কার করেছেন ও তাতে বাস্তব করেছেন দেশবাসীকে সেই পথে চলার পথ দেখিয়ে। এ কথা ঠিক যে বিশেষত্ব হাতে থেকে স্বাধীনতা কাড়তে দেশের জনসাধারণের যে কাজ ও তার বা উপায় স্বাধীনতা পাওয়ার নয় দেশের শাসন ও গড়নে জনসাধারণের কাজ ও ঐতিহ্য তার দিকে এক হতে পারে না। কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, ভারতবর্ষের মত শিথিল-গড়া দেশ, অশুষ্ক-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা পীড়িত জনসাধারণের দেশ ও স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণে দেশীয়-অগ্রহুঁতপূত্র জনগণের দেশ—এ দেশের রাষ্ট্রশাসন পৃথিবীর অঙ্গের দেশগুলির সঙ্গে এক হতে পারে না। পতাকীর পথ আন্দোলনের চলতে হবে বহুদূরে। শাসনকালের মনুষ্য চাকা বত নিহুর্ণ ও বত জোরের দৃক সে গতির শক্তি কল্পায় না। সে শক্তির একমাত্র উৎস জনসাধারণের আশা ও উৎসাহ। ইংলণ্ডের মত দেশকে নব্বলের চোঁট লাভ নেই। সেখানে বহুদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমবিকাশে দেশের কর্মশক্তির বড় অংশের প্রবাহ চলে স্বাধীনশাসনের প্রণালী দিয়ে। দেশের লোক তাতেই অভ্যস্ত। আর সকলেই জানে সে শক্তির সাফল্যের পথে কোনো বাধা ধাঁড়াতে পারবে না; বিকল্প ব্যক্তিব্যর্থের বাধা, সরকারী আমলাদের শৈথিল্য অক্ষমতা দুর্লভের বাধা। রাষ্ট্রশাসন কঠোর নির্বন হাতে সকল বাধা চূর্ণ করবে। এমন বাধার সম্ভাবনার বিকল্পে জনসাধারণের দৃষ্টি যেমন প্রবব, তার মতামতের প্রতাপ তেমনি প্রবল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরের মনোভাব গড়ে উঠেছে সেই পরিবেশে। অভ্যস্ত প্রয়োজনও সে শক্তিকে বাধা দেওয়া কি এড়িয়ে যাবার কথা সম্ভবত্বের কাবও মনে হয় না। বহুদিনের সাধনায় এ সিদ্ধি। স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার বোতাম টিপলে ইংলণ্ডে যে কাজ হবে, ও কলের চাষি ঘুরিয়ে আমজকের জায়তবর্ষও সমান ফললাভ হবে, এটা অক্ষমতার আশ্রয়প্রদায়ী, হয়ে না দিয়ে বত লাভের বিবাস্ত্র। তা যে হয় না তার কুরি কুরি প্রমাণ ইতিমধ্যেই দেশের লোক ও দেশের শাসকব্রতা পেয়েছেন। ইংলণ্ডের মত দেশে দেশের শাসন ও দেশের গড়নের মধ্যে প্রায় অনগ্রভাব। সেজন্য আত্মশ্লিক বিশংগত কি অসাধারণ প্রয়োজনের জাগির ছাড়া ওসেপে আধুনিক সভ্যসমাজের বিপুলোহন নিত্যনৈমিত্তিক শাসন ও গড়নের হুই সম্ভাব্য জন্ত জনসাধারণের কর্মেৎসাহকে রাষ্ট্রের শাসকদের চোঁট করে জাগিয়ে তুলতে ও জাগিয়ে রাখতে হয় না। সে শক্তির সত্ত্ব ও সক্রিয়তা স্বভাবতই দেশের মধ্যে বয়েছে। কিন্তু যে দেশের সে অবস্থা নয় সে অনগ্রহণ দেশকে এগিয়ে নিতে হলে শাসনের চেয়ে গড়নের কাজ অনেক বড় ও অনেক বেশি। তার জন্ত জনগণের উৎসাহ ও শক্তির উদ্বোধন করতে হয় সজীব আশায় যত্ন। যে আশাকে কর্ম দিয়ে বাস্তবে গড়া যায়; অলস কল্পনায় আত্মহুই বাচনের হুগহুই নয়। উদ্বোধিত শক্তিকে সংহত করতে হয় বিশেষ কর্মে তাকে প্রয়োণের ব্যবস্থায়। উৎসাহকে জাগিয়ে রাখতে হয় সে কর্মের ক্রম-গতলভ্য চাক্ষু প্রমাণে। শাসনের কারখানায় আমল্যতন্ত্রের মন্থ্রিতে এ কাজ সম্ভব নয়।

এই আধুনিক দৃষ্টান্ত রয়েছে বলশেভিক বিপ্লবোত্তর ক্রান্তির রাষ্ট্রে। বলশেভিক রাষ্ট্রনেতারা হাতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড জনসংখ্যা, আর গ্রিক ভারতবর্ষের মতই অসহীন স্বাধীন পিকাশীন রাষ্ট্রবুদ্ধিদ্রূপে সে জনসংখ্যা। এ বেশকিছু বখন তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন নিজেদের আধুনিকত উন্নত দেশে এবং অল্পকালের মধ্যে, তখন তাঁরা শাসনের চাকর্য সাধারণ গতিতে সঙ্কট থাকেন নি, আর সরকারী আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের উপর ভরসা রাখেন নি। তাঁরা বেশকিছু ক্ষতিয়ে দিয়েছিলেন দেশের উৎসাহী সভ্যদের দ্বারা দেশের লোককে দুর্ভাগ্যবুদ্ধির আশা দিয়েছে, যেন বড় ধরার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে, সঙ্গে কাম করে কাজের পথ দেখিয়েছে। প্রাণাধারা-প্রভাবে যাদের যেন ধারণা হয়েছে এসব বুঝা, বলশেভিক দেশের লোকেরা কপিয়ার জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ আনে নি, এনেছে জাল, চাবুক উচিতের কলিবিহীন বিচারিকাধ্য কাজ আদায় করেছে, ক্রীতদাসের কাম যেমন করে আসায় করে, কাপ-কাপনের কাণ্ডজ্ঞান তাহের কম। আর সব ছেড়ে দিলেও যে জার্মানির নতুন সন্থা আধুনিক সভ্যতার সুপ্রাচীন, জ্ঞানবিজ্ঞানে যেনবলে সন্থা পশ্চিম-ইউরোপ এক বছরও খাড়া থাকতে পারে নি সে বেশকিছু আধুনিক দ্বিত্বিক বুদ্ধি পণ্ডিত করতে যে আয়োজন ও মনোবলের প্রয়োজন ক্রীতদাসের প্রত্যেক তা গড়ে তোলা যায় না। কোটি কোটি নিরক্ষর জনসাধারণের দেশে আধুনিক সভ্যতাসত্তার বিচার প্রথম শাঠ্যক ভর বেধিয়ে লব্ধনীন করা যায় না। এই বলশেভিক দেশের লোকেরা দেশের নানাত্বৈকটিকে শূন্য করেছো সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুর অত্যাচারে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব, অনেক মনোভাবের লোকের উদ্ধেয় করেছে, বলশেভিক নেতাদের আধেপে ও শাসনপন্থির সাহায্যে। রাষ্ট্রনেতারা এই উদ্ধেয়-পর্বতে বনে করেছিলেন তাঁদের কল্পিত আধুনিকতাজ ও রাষ্ট্র গড়ার অলম্বা উপায়, বর্ষদ্ব্যন্তর শাস্তিগণের পৌছবার সোজা পথ। যাকিন দেশের আদি উপনিবেশীরা যে-প্রয়োজনবোধে সে দেশের আদিম অধিবাসীদের উদ্ধেয় করেছিল। দেশের বেশির ভাগ লোকের মন এই অত্যাচারের বিকৃত ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। এ অত্যাচার সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে রাষ্ট্রের অত্যাচার। এ নিষ্ঠুরতার চরম কল কি হবে, দেশের লোকের ও নেতাদের মনে লব্ধনীর বীজ এতে যোপন হল কি না, আর ব্যবহারিক চোখে কোনো ফল যদি প্রকট না-ও হয় এ নিষ্ঠুরতা নিজেই নিজেকে বিকৃত করেছে কি না—এসব প্রশ্ন অব্যাহত। বলশেভিক নেতারা দেশের শাসনে সদাশ্র ও রাষ্ট্রের যে আধুনিক উপায় উপস্থিত করেছেন তাতে কপিয়ার লোকচরিত্র কি পড়ন দেবে, শোভন না কুশিত, সে তর্কও অপ্রাসঙ্গিক। অল্পপ্রসর দেশকে যে-কোনো আধুনিকের দিকে এগিয়ে নিতে সে দেশের নিখিল-পশ্চিম জনসাধারণকে যে উৎসাহে উদ্ধৃত করতে হবে, আর তার যা অপরিসীম উদ্যম আধুনিক কপিরা তার দৃষ্টান্ত। যে দেশের রাষ্ট্রনেতারা এ চেষ্টার প্রতীতি হতে চান—এ চেষ্টাকে সফল করতে চান সে দৃষ্টান্ত তাহের অমূল্য করতে হবে।

ইংরেজের হাতে থেকে পাঠানি পিত্তের হাতে বখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকমতা এগেছিল তখন বলশেভিক দেশের অল্পপ্রসর একটা দল তাঁদের পাশে ছিল, তাঁদেরই সহচর-অল্পপ্রসর কংগ্রেসের কর্মীও হল। পাঠানি প্রস্তাব করেছিলেন দেশের শাসন থেকে তার গড়নের কাজ হতটা সন্থা তফাত করা

হোক। যে কাজ দেশের জনসাধারণের হাত না লাগলে অচল, এবং যে কাজে হাত না লাগলে জনসাধারণের শরীরমনে মাহুদ হবে ওঠার পথ অচল, সে কাজকে যোগ্য হোক বহু পরিমাণে শাসনব্যবস্থে পশ্চিমের বাইরে। আর সে কাজের তার নিজ কংগ্রেসের কর্মীর হল। দেশের তারা ডুকিয়ে পড়ুক দেশের লোককে আশা মিটে, তাদের মনে মাহুদ হবার আতঙ্ক জন্মিত, কাজের সাই হয়ে কাজের পথ দেখাতে ও উৎসাহ আগাতে। কিন্তু তাদের পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি থাকবে না, যেমন ছিল কনিয়ার। দেশবাসীকে তাদের কাছে টানতে হবে নিজেদের সেবা দিয়ে। দেশবাসীর প্রজ্ঞা ও আশ্রয় মতোই সজ্জিত হবে তাদের বল। এ প্রস্তাব গান্ধীজি করেছিলেন দৃষ্টবলু কাবণে। দেশের কর্মীর হাতে যদি থাকে রাষ্ট্রের বল তবে দেশের লোকের বন অস্থূল করার কড়াটে না গিয়ে সেই বলে তার হাত দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া অনেক সহজ, আর অনেক তাগিদ তাতে লাজ হয়, যেমন কনিয়ারে বহু সময় নিষ্ঠুর হওঁকে। এ প্রলোভন দুর্বল। কিন্তু গান্ধীজির কাছে কাজের বল কাজের প্রধান ফল নয়। সে কাজের ফল মাহুদের চরিত্রের উপর যেমন ফলবে সেই বিচার চরম। আর সে বিচারে অবশ্যম্ভবি ফল যে ভালো নয়, যে করে আর যে সব গুণনার উপরেই নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল ব্যবহারিক পক্ষই যদি বিচার করা যায় তবে গান্ধীজির প্রণালীতে কাজের ফল বিলম্বিত কিন্তু তার ভিত্তি যে হয় দৃঢ় ও স্থায়ী তাতেও সন্দেহ করা চলে না। কারণ কাজের শেষেই তা শেষ হয় না। এ প্রণালীতে কাজে কর্মীর মনের গড়ন বদল হয়, বহু ভারী কাজের শক্তি ও উৎসাহ বা সফল করে রাখতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজি ঠায় শিল্পের দিনতেন নিষ্ঠুরের নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর মনে সংশয় ছিল না তাঁর বৈশিষ্ট্যের হাতে যাবে রাষ্ট্রশাসন, যদি তাদের হাতেই থাকে দেশকে গড়ায় তার, যে গড়ার কাছে উৎসাহ দিয়ে ও পথ দেখিয়ে জনসাধারণের নিজেদেরই প্রবৃত্তি করতে হবে, তবে শাসনের নীচে গড়ন চাপা পড়বে। শাসনকলের নৈব্যক্তিক ঢাকা ঢামাতে তাঁরা এত তলপত হবেন যে, জনসাধারণের ব্যক্তিগত, তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুখ অভাব-অভিযোগের ছোট সব কথা তাঁদের মনে স্থাপনা হয়ে আসবে। দেশের কর্মী বলতে মনে হবে ঐ কলের মজুর আমলা সন্ত্রাসার, তাদের কাছেই প্রকৃত কাজ কিছু আশা করা যায়। কলে দেশের জনসাধারণের মনেও তাদের উপর প্রজ্ঞা ও আস্থা ক্রমে হতে থাকবে। যেদর বৃহৎ গঠনের কাজ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ চোঙাতেই সম্ভব তার নিকে এঁরা অবশ্য দৃষ্টি দেবেন। মহাকরণের প্রকারেই প্রকারে নানা প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ কর্মচারী প্রধান মধ্য ও চরম বিশেষ্ট রচনা করবে, ভয়া-ধরনের বিস্তৃত হিসাব-নিকাশ তৈরি হবে, কিন্তু তার বেশির ভাগ স্বাধরপ্রাধর নথির তার বাড়ানো ছাড়া আর কোনো ফল ফলবে না, যেমন ব্রিটিশ আমলে ফলত না। কারণ কলনাকে কাজে করিয়ে তোলা কর্মচারীদের দায় নয়; আর বিশেষজ্ঞ হতে হাতেকলমে কাজ করতে জানা, হুতাং অস্ত্রকে যে কাজ করিয়ে নিতে জানা, বরফাব হয় না। বিশেষ্ট সেবার কৌশল জানসেই হল। তাতেই তারা অভ্যস্ত। এ আমলা-প্রশাসনের কাছ থেকে গঠনের কাজ আবারে শাসক-শিল্পের সামর্থ্য হবে না; কারণ তাঁরাই হবেন এবেয় করায়ত্ত; অভিজ্ঞতার অভাবে, এবং যে একাধ নিষ্ঠা সদয় অনভিজ্ঞকে অভিক্রম করে এ ব্যাপারে তার অভাবে। কংগ্রেসের বৈশ্বকল কর্মী দেশের স্বাধীনতালাভে দেশের লোককে পথ দেখিয়েছে নিজেদের জীবনে কাজে ও আদর্শে, তাদের উপর কংগ্রেসের নেতাদের হাতে রাষ্ট্রশাসনের এই ভণ কি ফল

ফলাফলে সে সম্বন্ধে গান্ধীজির মনের আশঙ্কা তাঁর জীবনকালেই ফলতে আরম্ভ হয়েছিল। নেতাদের প্রধান কাজ দেশের শাসন। সে তাহে এই কর্মীদের কোনো প্রকৃত স্থান, হস্তঃ তাক, নেই। কিন্তু নেতাদের হাতেই এখন শাসন তখন সে ব্যয়ে এবং শাসনের আত্মসম্বন্ধ যে গঠনের কাছে তাঁদের কর্তব্য তার মধ্যে একটি স্থান পাওয়ার লোভ ও চেষ্টা অনেক কংগ্রেসকর্মীকেই আকৃষ্ট করবে। কারণ ও দেশের কাজ পূর্বকার শুষ্ক বেশেই নয়, সরকারী শাসনের দ্বারা মর্গাধার কার। নেতাদের পূর্বাভাসের অল্পের হওয়াতে সুবিধাও একটি বেশি। এ প্রসঙ্গের হাজারে কচিং একজন মনন করতে পারে। বানপ্রস্থের পর এই গান্ধীজী কংগ্রেসকর্মীরা যে পূর্বজীবনের দেশপ্রেমের ভাষার লোকশাসন নৃতন জীবনে উচ্চ হারে স্বয়ংসমত পুথিরে নেবার কাড়া-কাড়িতে দেশের চরিত্র ও দুর্ব্যাকে ঘনত্ব করে তুলছেন ছোট-বড় কংগ্রেস নেতারা সরবে ও লাড়ম্বরে সেক্স বিলাপ করেছেন। যে অল্পগংগা কংগ্রেসকর্মীদের এই প্রসঙ্গের প্রস্তুত করতে পারে নি, তাঁরা আছেন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দিকচক্রবালের বাইরে। নেতারা তাঁদের চেনেন না, এবং তাঁদের সঙ্গে নেতাদের যোগ নেই, কারণ নেতাদের কর্তব্যে তাঁরা নিশ্চয়োন্নয়ন। দেশের যে কাজ কেবল তাঁরাই করতে পারতেন নেতৃত্ব ও উৎসাহের অভাবে সে কাজ তাঁদের সম্বন্ধ হচ্ছে না। কর্মীর দারুণ অভাবের দিনে তারা দেশের সর্বপ্রাণী কর্মী হতে পারতেন তাঁরা বেকার। যে নিশ্চিত কঠিন সমস্যার দিন ছিল অত্যন্ত সহজেই অম্মদের সে দিনে রাষ্ট্রনেতারা দেশের সর্বপ্রাণী কর্মীসংঘের কর্তব্যকে থেকে বেশেক ও নিজেদের বক্তিত করেছেন, কার দিয়ে ও কার করতে না দিয়ে। গান্ধীজী এখন কংগ্রেসের কাঠামো বলে সে প্রতিষ্ঠানের শাসন ও সেবাকে পূর্বক করতে চেয়েছিলেন সেটা সাংসারিক ব্যস্তবতাকে উপেক্ষা করে মহান আত্মার আত্মপ্রকাশের খোঁজ নয়। সে প্রস্তাব ছিল মানুষের চরিত্রের ও দেশের ব্যবস্থা অবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠাবান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের পরিকল্পনা। নৃতন অবস্থার নৃতন উপায় আবিষ্কার যে প্রতিষ্ঠার কাজ। অচিরেই অভিনবকে গভীরগতিক প্রাচীন কৌশলে আরম্ভের নিকষেণ মোহাভূতা ও মানসিক অচুতা বার পক্ষে সম্বন্ধ নয়।

গান্ধীজির রাষ্ট্রনায়ক পিত্তেণ্ডা এ পথে চলতে ভরসা করেন নি; নিজের হাতে পুণ্যতনকে ভেঙে নৃতনকে গড়তে সে সাহসের প্রয়োজন সে সাহস তাঁদের হয় নি। কারণ বোতা কঠিন নয়। গান্ধীজির দ্বব মন-কলের কংগ্রেসের উপর দেশের লোকের যে আস্থা ও প্রভা তার মূলে ঐ কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের দেশের স্বাধীনতার জন্য কষ্টবরণ, এবং দেশের লোকের প্রতি বৈতী ও তাদের সেবার ব্যর্থতাগ। রাষ্ট্রশাসন-পরিচালক কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় নেই সেক্স স্বাধীন ভারতবর্ষে এখন স্বাধীনতাবোধের জন্য দুঃখবরণ অগ্রসরোন্নয়ন তখন যদি কংগ্রেসের এক দলের কাজ হয় পূর্বের মত সাধারণ বৈতী ও সেবা, এবং অন্য দলের হাতে থাকে রাষ্ট্রশাসন তবে স্বভাবতই দেশের লোকের প্রভা ও আস্থা বাবে প্রথম দলের উপর, এবং শাসকদলের উপর সন্তুষ্ট ও অকৃত আত্মসম্বন্ধের মৈত্রে রাষ্ট্রশাসনের বিঘাট ও ঐক্য গতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ অন্য প্রাণীর তুলনায় শাসক-প্রাণীর প্রভাব দেশের লোকের মনে ক্রমে ক্রমে আশঙ্কা থাকে, যদি না শাসনের কৃপালতা ও অনসাধারণের

হিঁতে তার হুশাট আত্মবিকৃত্যের অভিরকালেই সেই প্রজ্ঞা ও আত্মা অর্জন করা যায়। সেইজন্য গান্ধীজিই রাষ্ট্রশাসক শিল্পের প্রয়োজন তাঁদের রাষ্ট্রশাসনের অহুকে কংগ্রেসের উপর দেখেই প্রজ্ঞা ও আত্মা, যে প্রজ্ঞা ও আত্মা কংগ্রেস অর্জন করেছে রাষ্ট্রশাসন হুশলতার ফলে নয়। সেইজন্যই স্বাধীন ভারতবর্ষেও কংগ্রেস দেশের সকল লোকের প্রতিনিধি, আবার রাষ্ট্রকর্মতালোকে গণতান্ত্রিক ভোটের সুময় কংগ্রেস গণিতিকাল দলের একটি দল। এবং এ অঙ্গপতিধে নিজেই মনে ও পরের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয় হুশাট-উপস্থিত পরিস্থিতি ও তার বিপর্যয়-হুশতার অহুহাত দিয়ে।

গান্ধীজিই প্রধান শিল্পের নূতন অবস্থার নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কারে এই অহুমত। ও প্রয়োণে অসাহসিকতা নিতুণ গ্রাম্য যে গান্ধীজিই জীবন ও কর্ম এই শিল্পের মনে নবজীবন সফল করে নি। তাঁদের জীবনে গান্ধীজিই জীবনের প্রভাব বাহু। কারও মনের গভন গান্ধীজিই মনের গভনের প্রায় বিপরীত। তাঁর জীবনকালে তাঁর দেশবাসী প্রায় অসৌক্যিই প্রভাবের কাছে অহুত নতিবীকার করতে হয়েছে। কোনো বড় ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ অমাত্তের সাহস হয় নি। তাঁর প্রতি দেশের বেশির ভাগ লোকের বিপরীত আত্মপতোয় স্বযোগও অনেক নিতে হয়েছে। তাঁর সূতায় পর কাছে প্রকাশ হচ্ছে অশোণিত মূল চরিত্রের, তার সোবে তার গুণে। কারও মন অনেকটা গান্ধীজিই মনের সম্মী। কিন্তু চরিত্রে গান্ধীজিই সূচতা ও বৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভার অংশের অভাবে সে মনের উপর গান্ধীজিই মনের প্রভাব পরিণতি পেয়েছে তাবাবিষ্ট কল্পনাবিলাসে, মনোমোহন উদার ব্যাক্য বা নিত্যকে চরিত্রার্থ করে। কাজ চলে গভাহুগতিক সংকীর্ণ পথে, যে পথে রাষ্ট্রনেতাদের কাজ চিরকাল চলেছে; তার মধ্যে গান্ধীজিই শিল্পের পরিচয় নেই। কারও মন এ চরিত্র গান্ধীজিই মন ও চরিত্রের প্রভাবে উৎসাহপ্রায় হয়েছে। চোখে পড়ার মত নিজের বৈশিষ্ট্য কিছু অবশেষ নেই; তাঁদের চরম দাফলাযোগ গান্ধীজিই কথা ও কাজের অহুরণে। উপস্থিত প্রসঙ্গে ও অবস্থায় সে কথা ও কাজ প্রাসঙ্গিক তি অপ্রাসঙ্গিক তাঁদের মনে সে বিভাবের দুয়ার বহু। গান্ধীজিই জীবন ও কর্মের বিশাল বেগবান প্রবাহকে তাঁরা নিজের মনে পরিণত করেছেন কঠিন বরফের অর্ধাট পঙ্কিতে; তার পরিচ্ছিন্ন অচল আনিতিক তপের নবল সত্ত্ব। গান্ধীজি তাঁর কর্মের গতিপথ কতবার পরিবর্তন করেছেন দেখিকে তাঁরা চোখ দিতে চান না। আর সকল পরিবর্তনের মধ্যে আশ্বর্ষের যে প্রবাহ তাঁর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানে কর্মকিনশে তাকে প্রযোগিত কোণল আয়ত্ত হয় না। যদি হত তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা ও মহাপুরুষদের চরিত্র-লেখকেরা হতেন পৃথিবীর বড় সব কর্মী। গান্ধীজিই এই শিল্পেরা গান্ধীসংঘে খেববানী। নূতন অবস্থাকে তাঁরা স্বীকার করেন না, নূতন উপায়কে গ্রহণ করেন না।

সংসারে গুরু পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু শিল্প মেলে অহু—এ প্রভাবের মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে কেশিত্ত্বা গুরু বাবা ও আচারের অহুরণে তুণ তার্য উপযুক্ত শিল্প নয়। শিল্পের সাধনা গুরু জীবনের দারাকে নিজেই জীবনে অহুর 'গাইর্প-লোহিং'-এর সাধনা নয়। গুরু জীবনের প্রভাবে শিল্পের মন ও চরিত্রের শক্তি অর্গলমুক্ত হয়, হয়ত নূতন পথে চলে, যে পথ গুরু জীবনেই পথ নয়—বেশন হাফককের বিবেকানথ শিল্প। কিন্তু সে শক্তি শিল্পের নিম্ন পক্তি, গুরু কাছে তার কথা নয়। তার বেগ ও গতিমাপ নির্ভর করে শিল্পের জীবনে সে শক্তির শক্তি জাওয়ার অহুরণে উপর। কবি বলেছেন, দুর্বে ক্রিষণে যদি থেকে আলো ঠিকবে পড়ে, মাটির ঢেলা থেকে নয়। প্রবীণের স্পর্শে লীপ

অলে, কিন্তু তেল-সলতে বীণের নিজেব। ডানের উপরে নির্ভর করে তার আলোর ঐচ্ছল্য ও স্বাধিবেব কাল।

গান্ধীজির সাক্ষাৎ-নিষ্কষের জীবনে গান্ধীজির চরিত্রের প্রভাবে শক্তির কোনো বিশাল ও বিচিত্র ক্ষুদ্রি দেখা যায় নি। নূতন ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক সমস্যার সমাধানের তাঁরা এমন নূতন পথ আবিষ্কার করেন নি যার নূতনত্ব ও কুশলতা মনে বিশ্বাস ও আনন্দ আছে; সে নূতন পথে গান্ধীজি কখনো না হাটলেও তাঁর পারের চিত্র দেখানে চোখ এড়াই না। গান্ধীজির স্পর্শে তাঁর নিষ্কষের মন ও চরিত্রে শক্তির পথমুক্তি হয় নি। যদি হয়ে থাকে তবে গান্ধীজির মাগে সে শক্তির পরিমাণ ছিল অতি অল্প।

১২

সেইসকল গান্ধীজির রাষ্ট্রনেতা-নিষ্কষের রাষ্ট্রীয় কাজ দেখানোই সঙ্গল হয়েছে যে কাজে নূতন কল্পনার প্রয়োজন হয় নি। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বহু বিচ্ছিন্ন শিখিল অংশকে কাঠামোর মধ্যে জুড়ে তাঁরা কাঠামোর আভ্যন্তরিক গড়নকে স্পৃহ করেছেন। সে শিল্পনের ক্ষত্র যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলির জনসমষ্টি প্রস্তুত ও উন্মূখ ছিল তাতে এ কাজের সার্থকতা ও কৌশলের মূল্য কিছুমাত্র কমে না। কিন্তু একরাষ্ট্র ভারতবর্ষের মূললব্ধ কাঠামোর কল্পনা পুণাতন। ইংরেজ রাজশাসন সে কল্পনা করেছিল এবং কল্পনাকে কাজে পরিণত করতে আবদ্ধ ক'রে রাজনৈতিক মতপরিবর্তনই তা থেকে বিরত হয়েছিল। এই বৃহৎ কাঠামোর রাষ্ট্রের সবল, হঠান, কল্যাণমুর্তিয় প্রতিষ্ঠায় নূতন কল্পনার প্রয়োজন। সে সূতি যে রাষ্ট্রনেতাদের ধ্যানেও আছে এ পর্যন্ত তার প্রমাণ নেই। রাষ্ট্রের কাঠামো রাষ্ট্রের কক্ষাল। কক্ষালের মতই বেহের আলস্য। কিন্তু রাষ্ট্রের কক্ষালকেই রাষ্ট্রের বেহ বলে ভুল করা মারাত্মক। অধিবিজ্ঞা ও শাসিতবিজ্ঞা এক বিজ্ঞা নয়।

গান্ধীজির শিষ্যদের পররাষ্ট্রনীতি বাচনিক প্রতিজ্ঞার মহীর্মান। ভারতবর্ষ এশিয়ার অশেষ-জাতির লোকের রাষ্ট্র। শেতজাতির পররাষ্ট্রনীতির ক্ষুণ্ণ সে আছে। তার পররাষ্ট্রনীতি পরদীক্ষক শেতরাষ্ট্রগুলির 'ভিন্নমেনি' হবে না। উদার মানবতার উপর তার প্রতিষ্ঠা। সকল রাষ্ট্রের প্রতি তার বৈদ্রী, সকল উৎপীড়িতের সে বদ্ধ। এই নীতিতে বাস্তবে এখন সূত্র' করতে হয় তখন দেখা যায় আমাদের রাষ্ট্রনেতার হাশে, চালে, বৌদ্ধিক সৌক্যে, অগ্রিম সত্যের অকথনে, প্রিয় অসত্যের ব্যক্তনায়, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় রাষ্ট্রের নেতাদের 'ভিন্নমেনি'র অগ্রকরণে ব্যর্থ। সে নেতারা বড় কথাই কেনবাশির তলার ও অশেষ চামড়ার নীচে নিজেদের শিষ্য সাংঘাতীর সূতি সহজেই বেধতে পান। সূতবাং নিরুবেশ প্রাণসার তাঁরা অক্লপণ। গান্ধীজির নিষেধ ও পথের সন্ধ্যা যে অশপকপাত সত্যনিষ্ঠা ও সত্যতাণ তাঁর অমৃতঘরেব লক্ষিত করত, পথের বনে জাগ্রত অসহস্রট শিষ্য—এ নীতিতে তার প্রাণস্পর্শ নেই। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতিতে ইউরোপেরিকার রাজনীতিজ্ঞেরা অধর্মর কবিরের ছায়া না বেধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

গান্ধীজির বেসকল শিষ্যেরা রাষ্ট্রশাসনে স্থান নেন নি, যাকে গান্ধীজির 'গঠনমূলক কাজ' বলে তাতে রত হয়েছেন, তাঁরা গান্ধীজির সূত্রের পথ থেকে আজ পর্যন্ত গান্ধীজি তাঁর জীবনকালে সে পথের

যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে বেধাবাত্র প্রণামের স্বপ্ননা করেন নি। অথচ এ কথা শ্রীষ্ট যে গান্ধীজি অনেক কাছের প্রাণের ও পরিমাপের উপদেশ করেছেন, উপদেশের অনেক কৌশলের নির্দেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পটভূমিতে। যে কাছ ও উপদেশের সফলতা সে অবস্থায় সম্ভব মনে করেন নি তার উপদেশও করেন নি। অনেক কাছের কোনো উপদেশ বেন নি, সে কাছের প্রয়োজন নেই বলে নয়, তার গুরুত্ব কম বলে নয়, কিন্তু তখন অল্প অনেক কাছের তার উপদেশ ও নির্দেশের প্রয়োজন বেশি মনে করে। কারণ স্বাভাবিকই তার অনেক কাছ ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতাশ্রুতির উপদেশের প্রেরণা; যদিও তার কোনো উপদেশের উপদেশ এমন ছিল না লক্ষ্যে পৌঁছানো ছাড়া বার অল্প হল নেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর গান্ধীজি অল্প দিন বেঁচে ছিলেন। এবং সে অল্প কয়েকদিনও কেটেছে মাহুঘের আকস্মিক নির্ণয় পত্রকে তার নিজের উপায়ে প্রতিরোধের চেষ্টায়। এই স্বাভাবিক আকস্মিকতার প্রশমনের পর গান্ধীজি কিছুকাল বেঁচে থাকলে যে অনেক নতুন কাছ ও পথের সম্ভাবন বিতেন, পুণ্যতন কাছ ও পথের সম্ভাবনার করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ গান্ধীজির গান্ধীবাদে আস্থা ছিল না, গান্ধীদর্শনে তিনি পণ্ডিত ছিলেন না। গান্ধীজির মত ও পথের এক অংশ ভারতবর্ষের লোকের ভারতবর্ষের এক বিশেষ অবস্থার উপদেশ; অল্প অংশ সকল দেশের ও সর্বকালের। কিন্তু এ সম্ভাবন আদ্যন্তেও অক্ষয় প্রাণে যদি মা নতুন অবস্থার নতুন বেধে পুনঃপুনঃ তার অবস্থার হয়। গান্ধীজির শিষ্যদের মধ্যে এ নবজাতকের ধাত্রী কারোও দেখা যায় না। তাঁরা গান্ধীজির কথা মতের মত আনুগত্য করেন, তাঁর আচার অচল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। গান্ধীজির জীবনের আগুনে জীবের জীবনে বহুবর্ষের শিখা জলে গুঁঠে নি। তার মালবশ্য ছিল না। সে নয় নব উদ্বেগবালিনী বুদ্ধি গান্ধীজির একনিষ্ঠ কর্মে বৈচিত্র্যের বিশ্ব জ্ঞানত শিল্পের জীবনে তার স্ফূর্তি নেই। কারণ, এর উত্তরাধিকারিণি নেই, কি সম্ভাবন কি শিল্পের।

গান্ধীজির জীবনকালের শিল্পের কথা বা হোক, এমন আশা হুশাসি নয় যে, গান্ধীজির চরিত্র-কথা যখন ভবিষ্যৎশিল্পের বিদ্যিত কল্পনার বস্ত্র হবে, যখন তাঁর জীবন সমসাময়িক পরিবেশের বহুতা থেকে মুক্ত হয়ে মহাকাশের পটে ক্ষুদ্রিত হবে তখন গান্ধীজির উপদ্রুত শিল্পের আবির্ভাব হবে। যে শিখা গান্ধীজির জীবন ও কর্মের বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গন করবে না। যার শক্তির প্রাচুর্য ও প্রতিভার লক্ষ্য গান্ধীজির জীবনশ্রুতির স্পর্শে প্রাণের গতিতে বেগবান হবে। মাহুঘের চরিত্রে মহত্বের নতুন সম্ভাবনা দেখাবে; মাহুঘের সমাধিবন্ধনে মৈত্রীর নতুন ত্রিভুজ স্থাপন করবে। সে শিখার জীবনে গান্ধীজির জীবনের আশীর্বাদ বর্ষণ হবে। এমন শিখারের দৃষ্টান্ত মাহুঘের ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়।

মাহুঘের ব্যক্তিত্ব গান্ধীজির চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্য। সমাজনিরপেক্ষ বুনো মাহুঘের নয়, যোগের আসনে একক ভগবতী মাহুঘেরও নয়। সমাজের মধ্যে সামাজিক মাহুঘের ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিত্বের জন্ম ও বিকাশ হয় সমাজের অন্তঃসব ব্যক্তির সঙ্গে আদানপ্রদান শ্রীতিসমতার সম্পর্কের বন্ধনে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব মাহুঘের ব্যক্তিত্ব, সমাজের জনসমষ্টির নয়। যে মাহুঘ সবার উপর দত্তা সে মাহুঘ ব্যক্তিগত মাহুঘ, মাহুঘের সমাজ নয়। যত্ন বক্তির মাহুঘ, হীনতা ব্যক্তির হীনতা। ব্যক্তির

মহৎ হীনতার চিন্তা না করে মহৎ সমাজ গড়ার সম্ভাবনার কল্পনা, কাজকে সম্বল করার কল্পনা। তাতে কাজ সম্বল হয়, কিন্তু কাজ হয় না। সেইজন্য বহুযোগী রাষ্ট্রচেষ্টার মধ্যেও গান্ধীজির মূর্তি নিবন্ধ থাকত কেবল চেষ্টার ফলের উপরে নয়, ব্যক্তির জ্বলন্ত-হীনতা বল-দুর্বলতার উপর। এটি একান্ত্রণীর মান্দ্যপন্থীর বহুনিশ্চিত সম্ভাবনাপ্রচেষ্টার অভাব নয়। সমাজের চরম মঙ্গল ও তার অশ্রিহার্য উপায়ে সচেতনতা।

ব্যক্তির উপর গান্ধীজির এই চরম মূল্যের আবেশ বাঙালির কৃষ্টির আদর্শের অন্তরঙ্গ। ঠিক সেই কারণেই গান্ধীজি মানুষের কাম্য চরিত্রের যে কল্পনা করেছেন তার শুদ্ধ অসম্পূর্ণতা বাঙালির মনকে পীড়া দিয়েছে। নিকট-আত্মীয়র তেজোবীজ তপস্বীরা বিবাহের মূর্তি মনকে যেমন পীড়া দেয়, কাব্য ও সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত—এদের বসন্ততা, জ্ঞানের নিঃসার্থক আকর্ষণে উদ্বিগ্নতা, জীবনে যে বিচিত্রের আশ্রয় আছে, জীবনকে বৈধিকচক্র থেকে মুক্তির যে আনন্দ দেয়—সে বার ও আনন্দ গান্ধীজির আদর্শ মানুষের জীবনে নেই। তার চরিত্রের শুদ্ধ ধৃঢ়তা, উপায় মৈত্রী, সব্বিহতে কর্মের অগ্রাধি—মনকে সত্যের নত করে, শ্রীতিতে পূর্ণ করে না। গান্ধীজি যে সমাজ ও মৈত্রীর সমাজ কল্পনা করেছেন তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সাময়িক মানুষের এই চরিত্র হল ভিত্তি ও আশ্রয়। কিন্তু সে সমাজে মানুষের এ রূপ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। এ হচ্ছে সৈনিকের বাহ্যাবলম্বিত জীবন। মৃত্যুর উদ্ভাবনা, আদর্শে পৌছবার আকৃতিতে এ জীবনে লোকের সাময়িক ভূমি থাকে; আর কোনো আকর্ষণ, অস্তিত্বের অভাব সে বোধ করে না। সে উদ্ভাবনা ও আকৃতি নিখিল হলেই এ জীবন আর লোককে ভূমি দেয় না। তার শীর্ণতার বিরুদ্ধে জীবনকে বিবল করে। মানুষের সভ্যতার অহৈতুক আনন্দের বা সব বড় সৃষ্টি জীবনে তার জোগান না থাকলে হালকা আনন্দের স্বতন্ত্র মানুষের মনকে ছোট ও উদ্ভ্রামল করে। সমাজের ভিত্তি চকল হয়, গড়নে ফাটল ধরে। এমন মানুষ অবশ্য আছে আদর্শের জন্য সংগ্রামের আকৃতি বাসের মনের স্বাধীনতা। তাদের সংখ্যা কম। সমাজ মানুষের আদিম সাময়িকতা তাদের মনে এই মঙ্গলময় রূপান্তর নিয়েছে।

যে ব্যক্তিকে গান্ধীজি চরম মূল্য দিয়েছেন তার কল্পনা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্যক্তিরে কল্পনা। ব্যক্তির মনের ও চরিত্রের বহুমুখিত্ব ও বহুভিগ্নবিশেষ তাতে স্থান নেই। মূর্তির স্থায়ী গড়ন, কিন্তু সকল মূর্তির এক গড়ন। গান্ধীজির চরিত্রকল্পনার মূলে ছিল তাঁর নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা, আর মানুষের সম্ভাব্য ক্ষমতা যে সংগ্রামের সব সংগ্রামে তিনি যৌবন থেকে ব্যর্থতার শেখানো। পর্যন্ত বৃত্ত ছিলেন তার অভিনব সংগ্রামবীর্যের উপযুক্ত সৈনিকের চরিত্রকল্পনা। সে চরিত্র বৃত্ত শ্রেষ্ঠ হোক, বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির অল্পকাল উপকরণের ঐকান্তিকতায় সে প্রয়োজন বর্তাই বড় হোক, এ চরিত্রে যে বিকলতাও মৈত্রী আছে, গান্ধীজি কি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না? এমন কল্পনা কি বাস্তব ভিত্তিহীন যে গান্ধীজির জীবনকাল যদি আরও দীর্ঘ হত, আর তাঁর জীবনকালে এ সংগ্রামের ভীততা কিছু কমত, তবে গান্ধীজি তাঁর মানুষের আদর্শে আরও উপাদান আনতেন? যে ব্যক্তির মানুষের জীবনের তাঁর চরম মাপকাঠি সে ব্যক্তিকে পূর্ণতা দিতেন? গান্ধীজি স্ববীজনাথকে বলতেন শুকসেব। তাঁর মূলের তাকেও বৌদ্ধিক সম্মান ও পৌষত্র ছাড়া আর কিছু সত্য নেই, এ কথা মনে করার সাহস হয় না। কিন্তু স্ববীজনাথ গান্ধীজির কিসে শুকসেব? তাঁদের দু'জনার সকল মানুষের উপর মৈত্রী, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসবীর্য তাঁদের মনে গভীর সাক্ষাত্যবোধ

এনেছিল। কিন্তু এতে স্ববীজনাথ গান্ধীজির গুরুত্বের ছিলেন না। বরং গান্ধীজির চরিত্রে এসেব অচল প্রতিষ্ঠাই স্ববীজনাথকে গান্ধীজির উপর পরম শ্রদ্ধাশীল করেছিল। এ বলনা কি অসংগত যে গান্ধীজি তাঁর আদর্শ-চরিত্রের কর্তব্য যে অসম্পূর্ণতা বোঝায়করতেন স্ববীজনাথের মধ্যে তাঁর পূর্ণতা দেখেছিলেন? স্ববীজনাথ বনি কেবল মহাকবি হতেন, কেবল অসাধারণ সাহিত্যিক অসাধারণ কলাকরতা ও কলাগুরু হতেন, গান্ধীজি কখনই তাঁকে গুরুসেব বলতেন না। তাঁর চরিত্রের আদর্শে অসীম অমুগাশী, কিন্তু তাঁর দিক্‌তা। তাঁর জীবনের ও আদর্শের পরিপূর্ণতার পূর্ণ সেই স্ববীজনাথকেই সমস্ত গান্ধীজি বলেছেন গুরুসেব। এ বলনা সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এ দুবের সনদেই হুঁ ও সবল, সাতা ও বৈজ্ঞানিক আনন্দনর সত্য পড়তে পারে। এ সনদ কঠিন। মাহুবেব ও তাঁর সমাজের সকল সনদাই কঠিন। কোনো সমাজে এর কথকিংপূর্ণ ভগ্ন বখন কখনো দেখা যায় মাহুবেব স্বভাব-চকসতা তাঁর নানা পুস্তির দুর্ঘট সমাজকে অচিরকালেই বিপদিত করে। তবুও বক্তব্যল হাকে মাহুবেব তা পরম সম্পদ। এর স্বাধিকের বৈধ্যে এর মূল্য নব। এর স্বপ্নও ‘জায়তে মহতো ভয়াৎ’— কাপুরুষের হীনতা ও ককালেব বিজ্ঞতার ভয় থেকে মাহুবেব সমাজকে বক্ষা করে।

টাচের কাজ

শ্রীমঙ্গলাল বসু

টাচের কাজ' করা তখনই সম্ভব হয় যখন চিত্রকর কথন-কোনো প্রত্যাদ হইতেও সব কোণসের কথা ভুলে যান; যখন তুলি-চালনার কাহা যেন তাঁর সহজাত ক্ষমতার মতো, second nature-এর মতো হইবে যার। এমন কি, বস্তুর বাস্তবিক রূপের ও রূপের কথাও তিনি ভুলে যান। অর্থাৎ, আঁকবার সময় রূপের গড়নের বা গতির সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো বিধা বা সন্দেহ থাকে না। তাঁর পক্ষে রূপ কথা নয়, রূপ হওয়া। রূপের পটে আঁকবার বিষয়টির ধারণা পূর্ণদ্বারা থাকলে, আঁকবার পটেও ছবিটি নিখুঁত ভাবে চুটে উঠবে; এমন মনে হইবে যেন পূর্বাধি আঁকাই ছিল, একটা কোনো বহনিকা স'বে গিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে উঠেছে। রূপের ধারণা ধূচ ও হুঁসির হয় কিরূপে? যেমন একটি গোল বল বা গোল হাঁহুলি, অথবা একটি চৌকো কাগজ বা চৌকো বাক্স— মনের মধ্যে চিত্রা কববার কালে টুকরো টুকরো ক'রে না ভেবে একেবারেই, এক মুহূর্তে, পুরোটা ভাঙা যায়। নিয়মিত অভ্যাস ও অভিনিবেশের ফলে রূপকল্পনার এরূপ সহজি, সম্পূর্ণতা ও ভিত্তিগতি অন্ত্যস্ত বিষয় নিরোধ সম্ভব। আগে থেকে বলিতে চ'কে না নিয়ে আলোনা সেওয়া অভ্যাস করলে, বাস্তবিক রূপের অথবা মূর্তির বা ছবির কেবলমাত্র তুলি দিয়ে নকল করলে, কখনো বা শুধু রেখা দিয়ে কখনো বা ধূপছায়ায় সমাবেশে গড়ন ছুটিয়ে তুলে অভ্যবের মূর্তির বা ছবির প্রতিভূতি বচনা করলে, অর্থাৎ নানারূপ কাজ ক'রে পেলিলে ও বিশেষ ক'রে তুলিতে ভালোতপ ধখল হলে, অন্তঃপর ভালো টাচের কাজ দেখা উচিত, নকল করা উচিত। তা হলে টাচের কাজে অধিকার আছে।

বস্তুর গড়নের ধারণা স্পষ্ট ও গুঢ় না হলে 'টাচের কাজ করব' ব'লে টাচের কাজ করা যায় না। আবার, টাচের কাজের কতকগুলি ধাণা নিরূপ অথবা তুলি-চালনার কতকগুলি চিত্রায়িত রীতি 'মুখ' ক'রে টাচের কাজে অগ্রসর হলে, সে কাজও বড়ো পাকাটে দেখায়, বর্ষকের পীড়াদায়ক হয় এবং রূপের দিক থেকে হয় কীচা।

অনেকে মনে করতে পারেন, টাচের কাজ করতে গেলে কালী বড় তুলি নিয়ে নানা কাঁচের শুধু হাত ভালোতে দেখা ধরকার। তুলির টান-টোনের বিষয়ে অনেক বই'ই আছে; তবু সে দেখে দেখা কখনোই ঠিক নয়, কল বড়ো ভালো হয় না। ঐভাবে শিখলে, আঁকিয়ের কাজে কাহাটাই বেশি ক'রে প্রকাশ পায়; বস্তুর বধ্যব চারিত্র বা গুণ প্রকাশ পায় না। যেমন হয়তো, গাহাড়ের ছবি হাতা দেখায় শু'পাকায় তুলেই মতো, পালকটা ভাবী দেখায় একটুকরা পাখরের মতো, ভালগাছে'র ভিত্তিকে মনে হয় পদ্মের ব্রগাল। আসল বস্তুর তাঁর, স্পর্শ (texture) ও তাবের অভাব হয়ে পড়ে। ফলে কাঁচটা অস্বাভাবিক ও কীচা হয়; উপলব্ধির সম্বন্ধ না থাকায় কেবল আঁকবার কাহাটাই দেখা যায়।

টাচের কাজেও ক্যালিগ্রাফি বা লেখাভনের ধরন আছে, কিন্তু ভাবভুক্ত হওয়া চাই। যেমন চাকার পিছন-পিছন রেখা পড়ে, চলন্ত জীব বা বাছুরের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া চলে, তেমনি মনের সঙ্গে সঙ্গে তুলি চলা চাই।

শিশুর চলবার ইচ্ছা হলে, বাব বাব উঠে পড়ে তার কাছদা আগনিই শেখে। চলার যোগ্য হলেও, পরে তার লেশোথেন চলতে পারে।

স্বয়ং মনে না বসলে, বাস্তবের পক্ষে হাত লাগা যুগ।

ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে নানা বিক থেকে নানা ভাবের পরিচয় হওয়ার পর, স্টাটি বা অস্থায়ীকরণ করার পর, ভালো টাচের ছবি দেখলে টাচের কাজের কৌশল আদর্শ ক'রে নিতে দেখি হয় না। তখন প্রাচীন বা আধুনিক সেখা কাজের নকল ক'রে হাত মশ্র করাও চলতে পারে, তাতে মোহ হয় না।

মোট কথা, টাচের কাজে পোড়াতোটেই কারবা সেখানেও লোভ সামলাতে হবে; বীরেছন্দে বস্তুর গড়ন ও গুণ বহু-তুলিতে আদর্শ করতে হবে; এই ভাবে বস্তুর গড়ন ও গুণের ধারণা দৃঢ় হলে এবং সেই সঙ্গে উপায়-উপকরণের কত দূর সম্ভাবনা ও কোথায় সীমা সেটাও জানা হয়ে গেলে, কখন যে ঠিক-ঠিক টাচের কাজ ভুল হয়ে যাবে তা বোকাই ধাবে না।

যাকে যাকে মনোনিবেশ ক'রে ব'সে, বেশি বিচার না ক'রে, ছিমা না ক'রে, বস্তুর যে তপ-গুণ শিল্পীর মধ্যে সহজে প্রতিভাত হচ্ছে তাতেই অতিরিক্ত যত্নে, বৈধ ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করা চাই। তার ফলে কাজ তামা ও সহজ হতে থাকবে। টাচের ছবি খাওয়ান হতে থাকলে আর কাজ করা উচিত নয়; হুতে হলে, তখন মন চকল হয়েচে। এক কালে বেশি ছবি করার লোভ দমন করতে হবে। সফাল-বেলা, মন এখন শান্ত থাকে, তখনই টাচের কাজ করার উপযুক্ত সময়। কাজে বসবার আগে মনকে কোনো-ক্রমে চকল হতে নিতে নেই। যদি মন চকল হয় সে সময় কিছুতেই কাজ আদর্শ করা উচিত নয়।

কাজে প্রবৃত্ত হবার আগে বস্তুর তপগুণের চিন্তা ও ধ্যান ক'রে নিয়ে, বাস্তবাত্মক হয়ে, ছিমাশূন্য হয়ে, কাজ করা চাই। তা হলেই আঁকবার বস্তুর গড়ন ও ভাব হুটটা প্রয়োজন কাজে আগনিই ছুটে উঠবে।

লক্ষ্যভেদকালে অর্জনের বড়ো, লক্ষ্যে স্থির তৎপর হওয়া চাই। এখানে লক্ষ্য বলতে ছবিও সুলেপন বা বসবস্ত্র।

টাচের কাজও ভালো, আর খ'রে খ'রে গড়নের কাজও ভালো। বেশি বা চীন বা বিলাতি ছবিতে হু বসবস্ত্রই কাজ দেখতে পাওয়া যায়। সকল প্রকার অসম্পন্নতাই অনেক উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রথমে বীরভাবে বস্তুর গড়নের ও গুণের দিকে দৃষ্টি রেখে, পরবেক্ষণ ক'রে ক'রে, এগোনোই ভালো। এগোনাখাড়ি কারবা সেখাবার মত ব্যস্ত হলে, শিল্পীর কাজ অপরিহার্য ও দুর্বোধ হয়। কলে শিল্পীর নিঃস্বপ্ন দিক বেঁকেও, কাজে প্রীতি না বেড়ে কমতেই থাকে। মনও বড়ো উজ্জ্বল ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। মানসিক দৃঢ়তার অভাবে কাজ বাব বাব অবল-বল করতে বা ছেড়ে দিতে হয়, সময়ও অনেক বেশি লাগে। অসম্পন্ন ভাবে, লোভে প'ড়ে, বিহ্বল মনে, কাজ না করাই ভালো। প্রথম মনে, আদর্শসাহিত্য হয়ে, স্থিতিমানে ব'লে, বীরভাবে আঁকাই সংগত।

প্রথমে শিল্পীর মনে প্রেরণা, তার পরে বিষয়বস্তুর গড়ন গুণ ও বাস্তবতার বোধ, বস্তুর সহিত

একান্ততা, আঁকাব কখন-কোনো বা ভূমি বাবহায়ে লঘাক্ বক্ততা-অর্জন— এইগুলি হলে তবে তথ্যেই শিল্পীর মনের প্রেরণা শিল্পে রূপায়িত হবে। টাচে হোক আর থ'রে থ'রেই হোক, আঁকাব কাম লক্ষ (spontaneous) হবে।

তালো টাচের কাম হল শিল্পীর উপলব্ধি এক-একটি অখণ্ডস্থল মূহূর্ত, সত্যোপেক্ষুটিত সূলের মতো। সূল শুকোবার পূর্বেই, তাম্রা থাকতে থাকতেই, শিল্পলক্ষীর অধ্যায়ায় শিল্পীকে সাক্ষিয়ে দিতে হবে। মসিকের মনে, প্রকৃতির উজ্জ্বল থেকে চয়ন করা জীবন্ত সূলের স্পর্শের মতো, অকৃতের এক-একটি কণার মতো তার প্রতীতি ; বিচার-বিশ্লেষণ-করা কৃত্রিম কল্পনাজগতের মতো নয়।

টাচের কাম হওয়া চাই নিঃশব্দ, অব্যর্থ, বিবাহীন ও অভিজাত*। শব্দকে এ মনে অসিহতে দ্ববহুতে আহ্বান। মরণবীচর-খেলা। বীরের সাধনা। ছেনেবেলা বা অলস মেয়াল নয়।

টাচের ছবি আঁকাব সময় শিল্পীর ভাব হবে বাধণাহের মতো ; কোনো তাত্ত্ব নেই, কায়ও কাছে কোনো জীববহিহি নেই। সন্ধলের প্রতি সাক্ষিপের ভাব, মনে কিছু বৈজ্ঞ নেই। মন মনে ভয়পূর হওয়াতে, টাচের ছবি হবে যেন প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের ইশারা ; বেশি বলার সময় নেই, প্রতীতি নেই, প্রয়োজনও নেই। একই ইশারাতেই তো প্রেমাস্পদের জয়যের দ্বায় উন্ম্যাটিত হয় ও মনের কথা নিঃশব্দে বলা হয়ে যায়।

* অভিজাত্যসূর্, অর্থাৎ যাকে হুঁকারিয়া নেই, গোব গাকবার জো নেই, মকতার ভাব নেই, বর্ণকের মন ভোলাবার প্রয়াস নেই, ইত্যদেব পূর্ণতা-হেতু না সম্ভব ও সম্ভব।





গীত ও স্বরলিপি প্রয়োজনবোধ

শ্রীঅমিয়নাথ সান্ডাল

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ গল্প-পল্প-কথোপকথনের শব্দরূপকে লেখরূপে পরিণত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল সন্দেহ নেই। ভগ্নভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্নভাবে মানবসংস্কৃতির উদ্বেগ হয়েছে; এবং প্রয়োজনের বশেই তার উৎকর্ষ হয়েছে। মনো-মাতার কতকগুলি সংস্কার নিত্য বা শাশ্বত। কিন্তু প্রয়োজনের বশেও অনেককিছু অভিনব সংস্কার নির্মাণ ও পোষণ করা সম্ভব হয়েছে। শব্দরূপকে লেখরূপে পরিণত করার ও ধরে রাখার সংস্কার এই দ্বিতীয় কৃত্রিম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

গীত ও শব্দরূপ। যে কারোই বা বেকশ কারণে গৃহাণমা শব্দরূপকে অক্ষর-চিত্রে পরিণত ও নিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়েছে, সেই বা সেজন্য কারণেই গীতরূপকে স্বরলিপিতে পরিণত ও নিবদ্ধ করার প্রয়োজন হবে থাকবে, অস্বাভাবিকতা ঘাটবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংগীতের ঐতিহ্যকে লক্ষ্য করে উল্লঙ্ঘন প্রয়োজন বা প্রয়োজনবোধের দ্বি-নির্ণয় করা যায়।

উদ্ধারিত শব্দরূপকে স্মৃতিতে ধরে রাখার ব্যবস্থা খুবই স্বাভাবিক। স্মৃতিশক্তি সহজে ও সাধারণভাবে অতীত বিষয়ের প্রবর্তন করে। অতীত বিষয়ের বিশেষ কোনো রূপ গ্রহণ ধারণ ও পুনরুৎপাদন করে দৃষ্টি। এবং উদ্ধারকার্যের সময়ে বহু বিভিন্ন প্রকাণ্ড প্রকৃতি রূপ একসঙ্গে উঠে আসতে পারে। কিন্তু উদ্ধারকারীর প্রয়োজনের বশে মাত্র বিশিষ্ট এক বা বহু রূপের পুনরুৎপাদনে উদ্ধার-সাধন করে দেখা। বহু প্রাচীন কালের ভারতে গুরুশিষ্য-দংঘ্য ও শাখোপদেশের গ্রহণসাধন বিষয়ে ঐ রকম স্মৃতি দৃষ্টি ও মেঘের চিন্তা হয়েছিল।

সেই সময়ের একসল লোক মনে করতেন, শব্দরূপের মধ্যে যেমন সাধারণ আছে, তথা প্রচলিত কথোপকথন, সেইরকম অসাধারণ শক্তিশালিত বা প্রভাববিশিষ্ট শব্দরূপও আছে, যেমন মন্ত্র। সাধারণ শব্দ সহজেই মনে থাকে, তবে কিছু বিকৃত হলেও যাবে নেই। কিন্তু অসাধারণ শব্দরূপ বিকৃত হলে, অতীতগত মূলপ্রসব করে না; এ কারণে এইসকল শব্দরূপকে স্মৃতিতে ধরা রাখার বশে রাখবার জন্য তাঁরা বিভিন্ন কোনল উদ্ভাবন করেছিলেন। উদাহরণ অসংখ্য। স্বরিত ছন্দ: ষটপাঠ ষটপাঠ প্রভৃতি ব্যাপারগুলির উদ্ভব হয়েছিল ঐকম প্রয়োজনের বশে সন্দেহ নেই। অস্বাভাবিকতা ঘাটবে, এই জাতীয় চিন্তা থেকে শব্দরূপকে অক্ষররূপে পরিণত করার ইচ্ছা উদ্ভূত হয় নি, কারণ প্রয়োজনই নেই। বিশেষ এই যে, শব্দরূপকে স্মৃতিতে ধরে রাখলে মাত্র উদ্ধারণ করার সময়ে ছাড়া তারো অন্তের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু লিখিত রূপ সর্বদাই স্মৃতির প্রত্যক্ষ। এখন যদি মনে করা যায়, অসাধারণ শব্দরূপ প্রত্যক্ষ করার জনসাধারণের অধিকার নেই এবং সমাজে বিশিষ্ট এক শ্রেণীরই সেজন্য অধিকার আছে, তাহলে এই বিশিষ্ট শ্রেণী কখনোই যন্ত্রণালিকে পূর্ণ অক্ষররূপে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এককথায় এই শ্রেণীর লোক শব্দের আক্ষরিকলিপিকরণের প্রয়োজন বোধ করে নি; অন্ততঃ এঁরা অক্ষরলিপির উদ্ভাবনের দাবি করতে পারেন না।

ঐকমল মহাভারতীয় লক্ষণের মধ্যে দুইটি ছিল, এবং মহত্ত্বটি দুই করে উচ্চারণ করা হত, এর মধ্যেই প্রমাণ আছে। মহাশক্তিটিকে যদি সাধারণ প্রত্যক্ষ থেকে গোপন করে রাখাই অস্তিত্বের হয়, তাহলে দুইগুলিও অনিবার্যভাবে স্তম্ভ বা বহুস্ত থেকে বাওঁয়াই কথা এবং এখনও তারা বহুস্তই থেকে গিয়েছে। 'বহুস্ত' শব্দের অর্থ এই যে, অনন্যকারী সত্ত্বের গোপনীয় কিন্তু নিত্যতে নিজ পৌরুষের মধ্যে অবস্থাই আলোচ্য। প্রাচীন ভারতের বৈদ্যবৃত্তী শিক্ষাকারীরা গ্রামে গীত ও অব্যাকার্য সত্ত্বের যে সাংকেতিক মন্তব্য সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি বীরভাবে আলোচনা করলেই দেখা যায়, বহুস্তজ্ঞানকে বহুস্তরূপে বক্ষা করা অর্থ কোনো গোপ্তবিশেষের প্রয়োজনে তাৎপৰ্য সংকলিত করা—এই দুটি আশাতবিকল্প মনোভাব প্রবল। এ বিষয়ে বিপর্যয় আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ এই শ্রেণীর বিবিধিধান করনোই স্বপ্নলিখিত প্রয়োজন গণ্য করে নি। বৃত্তি বৃত্তি ও মেধাপ্রতি দিয়ে গুরুশিষ্যগণসমূহের স্ববিভাগগুলির সত্ত্বের জ্ঞান ও প্রয়োগ প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। পরে কোনো অবনতির অবস্থায় বৃত্তি প্রকৃতি শক্তির ক্ষুদ্রতার কারণে এই শ্রেণীর জ্ঞানী ও কর্মী ব্যক্তিবৃন্দ আক্ষরিক-লিখিত সাহায্য নিয়েছিলেন, পতাক্তর ছিল না বলে। ঠিক কি বক্ষ্য আক্ষরিকলিখিত প্রবর্তন ছিল বুঝা যায় না। এবং হুপে হুপে এই লিখিত পরিবর্তন-সাধন হওয়াই স্বাভাবিক; একেবারেই, মাদুল পরিবর্তিত হয়ে বাওঁয়ার সত্যবদ্যও বাধ্য নেই; কারণ অবনতি ও গোপ প্রায়ই একত্রে আসে।

তবুও, ঐ বহুস্ত গীত ও স্ববিভাগের সত্ত্বের কিছুকিছু তথ্য পৌরুষ বাইরেও প্রকাশ হয়েছিল, অজ্ঞান করা যায়। বিশেষ করে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, মতবৈব বৃহদেই, বায়ুপুৰাণ, নারায়ণ সংগীত-মকরম ও সংগীতময়াকরে এমন সত্ত্বের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যা থেকে নিঃসন্দেহে অজ্ঞান হয়, ভবতত্ত্বের আবিষ্কারেরও পূর্বে বৈদিক যোগলক্ষিত বিশেষ গীতরূপ ও স্ববিভাগসম্বন্ধিত ছিল এবং বহুস্ত-ব্যাপারগুলির বহুস্ত ঐগণগত ছিল। ঐগণগতিক্যাল আলোচনা করে দেখা যায়, সর্বদাকালো বহুস্ত ও মধ্যমগ্রামের চৌধাণি দুর্দান্ত-তান দিয়ে মহাপ্রাণি নিশা হত। বায়ুপুৰাণে ত্রিগুণি পাদ্যগ্রামিক বিভাগ পাওয়া যায়। এগুলি বিশেষ বক্ষ্যের আভিচারিক ক্রিয়াতে প্রয়োজ্য ছিল এতদ্ব্যতীত প্রায়ও উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছে। এগুলিকে নিয়ে সর্বস্তম্ভ এক শ চৌধটি বিভাগ লভ্য হয়। যাত্রা এই বিভাগগুলিকে স্মৃতিতে বক্ষা করা অথবা স্মৃতির বর্ণে বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয় এবং স্ববৃত্তিমান লোকের পক্ষে কঠিনও নয়। অতএব, এই ভারতীয় মহাগীতের ঐগণগতিক ও প্রয়োগের পক্ষে গীতলিখিত বা স্বপ্নলিখিত প্রয়োজনই ছিল না। অধঃপ্রবর্তের স্বপ্ন-চিন্তা, চিত্তবিনোদন, অথবা বর্ণনাত্মক অতীতের অল্পকৃতি এই শ্রেণীর গীতের লক্ষ্য ছিল না; এই যেহেতু যে শিক্ষাকারীরা পুত্রকে ঐয়বর্মের উদ্দেশ্য বা প্রাপ্তির কোনোও সংকেত নেই। অর্থাৎ শিক্ষাকারীর উপদেশের প্রবক্তা বা সংগ্রহকর্তা বসন্তবর্গ গীতি ও ভবদ্বারা স্ববিভাগ বা পান-ক্রিয়ায় প্রসঙ্গ করেন নি। * * .

কিন্তু প্রাচীন ভারতে সংগীতবিষয়ে মাত্র পূর্বোক্তরূপ একমাত্র চিন্তা ও ব্যবহার ছিল, সমাধে অত্র কোনো শিল্পবর্ষ ছিল না একথাও স্মৃতিমূলক নয়। কারণ গ্রামাঞ্চল মহাতারত পুৰাণ এবং নাট্যশাস্ত্রে অত্রবক্ষ্যের শিল্পসম্বন্ধি ও সংগীত-চিন্তা পাওয়া যায়।

সমাধে এক শ্রেণীর ব্যক্তি যেমন যোগ-মহা-তপস্করী নিয়ে কালান্তিগাত কথাকে কতব্য

মনে করতেন, যোক বা চরম পুঙ্খার্ণবে অসাধক কাব্য রচনা ও শ্রীতবাহ্যনর বর্ণনীয় মনে করেছিলেন, তেমন অল্প মতের ব্যক্তিও ছিলেন ধাৰ্য্য কাব্য শ্রীতবাহ্যনর প্রত্নতিকে দেখে মনে করেন নি বরং এগুলিকে যথেষ্ট সমাদর করে দার্শনিক বৃত্তি দিয়ে অলংকার ও সংশ্লিষ্ট উপায়ে প্রত্নিত করতেন। অল্পমান করা যায়, কাব্যের বহল ও ব্যাপক চর্চা হয়ে পরিশেষে পূর্ণশিষ্ট সংস্কৃত ছন্দঃ ও শব্দের বিকার হতে থাকলে পরে মহর্ষি পানিনি আবির্ভূত হয়ে বিকার বা অবনতি নিরোধ করার উপায়করূপ পঞ্চাশ্রুতান উপদেশ করেছিলেন। অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রারম্ভেই অল্পমান হয় না; সংস্কৃতির বহুমুখী বিস্তার হয়ে উচ্ছ্বলতার সময়েই অল্পমান আরম্ভ হয়, এক্ষণ মতই সমীচীন। ঐদলনে সমাধে শ্রীতবাহ্যনরের ও নাট্যের ব্যাপক বহু-প্রসার ও উৎকর্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর্যায়ের ও উচ্ছ্বলতা আবির্ভূত হতে থাকলে পরে ভারতীয় নাট্যাশ্রুতান সম্ভব হয়েছিল, এক্ষণও অল্পমান করা যায়। এককথায়, মহামুনি ভারতের সাক্ষ্য-আবির্ভাবকালের পূর্বে থেকেই তাব্য নাট্য ও সংশ্লিষ্টের বহল চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল এবং যুগপ্রভাবে পূর্বে থেকেই কিছুকিছু উন্নয়ন গতিও দেখা দিয়েছিল; যাকে একেবারেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব মনে করা যায় না। ভারতীয় নাট্যাশ্রুতের প্রধান অধ্যায়ে এবং শেষ অধ্যায়ে ঐরকম উচ্ছ্বলতার উল্লেখ ও চৈতন্যমণ আছে।

অতএব মহামুনি ভারতের আবির্ভাবের পূর্বে কাব্য ও সংশ্লিষ্টের বিশেষ সমৃদ্ধি হয়েছিল, এক্ষণ অল্পমান করা যায়। নাট্যাশ্রুতের মধ্যে রসরূপকপ্রদর্শে যে সূক্ষ্ম বৃত্তিভিত্তি বিশ্লেষণ দেখা যায় তা থেকে প্রমাণ হয় সেই সময়ে ও তার পূর্বে কাব্য ও নাটকের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়ে গিয়েছে। এখন বলা এই যে, সেইসকল কবিতা ও নাটকে কাব্য বৃত্তিতে ধরে রাখত; শ্রীতিকাব্য, কাব্যবহুশ্রীতি, রসবহুশ্রীতি কে কত দুঃস্থ করবে; অসংখ্য অল্পস্বরসম্বর্তকে কে ধারণ করে রাখবে। সাধারণ সামাজিক মাহাত্ম্যের গন্ধে ঐতিহ্য ও মেধাবী হওয়া খুবই কঠিন কথা। এবং ধারা নিহৃত উন্নত, অল্পমান, বৈদিকছন্দ, বটগাঠ প্রভৃতি দিয়ে বৈদিক তথ্যগুলি বৃত্তিতে ধারণ করতেন তাঁরাই সমাধে সাধারণ কাব্য, শ্রীতি ও শ্রীতিরূপ চর্চা করে কঠিন বা ভয়ঙ্কর করে রাখতেন এক্ষণ মনে করার কিছুমাত্র স্বেচ্ছা নেই; কারণ প্রয়োজনবোধই ছিল না। এই কারণেই মনে হয়, ঐসকল চতুর্ধর্ষ-নির্বিশেষে শিল্পপ্রচেষ্টা, জ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতির সম্যক আলোচনা ও সমৃদ্ধির সময়ে অক্ষরলিপি উদ্ভাবিত হয়েছিল প্রয়োজনের তড়ানায়। অধিকন্তু, একই সময়ে সমাধে একশ্রেণীর লোক আক্ষরিকলিপি ব্যবহার করতেন না, এবং অল্প লোকে তাবের প্রয়োজনে কোনো আক্ষরিকলিপি ব্যবহার করছে— এক্ষণ হওয়া অসম্ভবও নয়, বিচিত্রও নয়। বরং, ভারতে এককালীন একেবারেই লিপিশুদ্ধি ছিল না এবং অকস্মাৎ একদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মী বা কোনো আক্ষরিকলিপির প্রবর্তন হয়ে গেল, এইরূপ হওয়াই অসম্ভব বোধ হয়।

প্রায় হতে পারে, মহামুনি ভারতের সময়ে বা তার পূর্বে নাটক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সমৃদ্ধি হয়েছিল তাব কোনো প্রমাণ আছে কি? এর উত্তরে বলা যায়, শৌর্য্যাদিক আধ্যাত্মিক, সামান্য, মহাত্ম্যভিত্ত প্রভৃতির মধ্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, অল্পত নিবন্ধন আছে। এগুলিকে প্রমাণের সাধারণ ভিত্তি মনে করা যায়। এবং ভারতীয় নাট্যাশ্রুত নামে অল্পমানীয় বৈজ্ঞানিক শিল্পশাস্ত্রই সেই সমৃদ্ধির বিশিষ্ট প্রমাণ। নাট্যাভিজ্ঞান ও শিল্প প্রয়োগের অসংখ্য বিষয়ের বর্ণনা ছেড়ে দিয়ে যাত্র

শ্রীত ও স্বরবিভাগ সম্বন্ধে বেশকল প্রয়োজনীয় পরামর্শের আলোচনা আছে তাহের মূলরূপ ও সংক্ষিপ্ত-সারগুলি আলোচনা করলে বুঝা যায় সমৃদ্ধির পরিমাণ কিরূপ এবং প্রয়োজনবোধ কতখানি দৃঢ় ছিল। প্রয়োজন ও প্রয়োজনবোধের আভাস থেকে অহুমান করা সম্ভব হয়, সে সময়ে আক্ষরিকলিপি ছিল, এমনকি শ্রীতের স্বরলিপি ছিল।

ভরতমূর্তির সময়ে সাধারণভাবে কত রকম ছন্দ ব্যবহৃত হত মাত্র তখনই আশ্চর্য করতে পারি যখন বেথি, নাট্যের উপযোগী এবং সংকৃত ছন্দের মধ্যে থেকে ভরতমূর্তি মাত্র একাধি রকমের ছন্দকে নির্বাচিত করেছেন এবং বলেছেন, ছন্দ অসংখ্য; তবে এইগুলিই নাট্যের পক্ষে প্রাপ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অসংখ্য হলেও একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। আমরা যে ছন্দকে 'মহাকাল্য' বলে জানি, নাট্যশাস্ত্রে তার নাম 'শ্রীংগা'। তা ছাড়া প্রাকৃত বা অপভ্রংশেরও নিবর্ণন প্রকৃতি আছে।

ভরতমূর্তির সময়ে সংগীতশাস্ত্রে বা লোকায়তরূপে কত রকমের স্বরবিভাগ বা রাগ ছিল তখনই মাত্র আশ্চর্য করতে পারি যখন বেথি তাহের মধ্যে থেকে তিনি তিন শ তির্যক্তরাশি স্বরবিভাগকে নাট্যোপযোগী ও উৎকৃষ্ট বলে নির্বাচন করার সংকেত উপদেশ করে গিয়েছেন। এগুলি আবার শুদ্ধ বা তাৎপিকরূপ (category)। এগুলির উপরূক্ত মিশ্রণ দ্বারা কত রকম হতে পারে হিসাব করেই বলা যায়। উক্ত তিন শ তির্যক্তরাশি বিভাগকে শুদ্ধার প্রকৃতি আটটি নাট্যরূপ এবং নির্বেদ প্রকৃতি তেত্রিশটি সঙ্গীতবিভাগের উল্লেখকরূপে প্রয়োজনসামান্য ব্যবহারের অহুমানী গ্রাম, সন্ধি, জাতি, সাধারণ প্রকৃতিতে বিভাগ করা হয়েছে প্রয়োক্তার সুবিধার জন্য। এগুলি ছাড়াও ভরতমূর্তি উপদেশ করেছেন, কাব্যক্ষেত্রে ও নাট্যের ইতিবৃত্ত অহুমানী বেদাহুভর্তী সামিক, আটিক প্রকৃতি বিভাগ এবং কীরাত প্রকৃতি জাতিসকল সমাজের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি অশুদ্ধি অনিয়ত বিভাগও প্রয়োজন হতে পারে। অহুমান করা যায়, ভরতমূর্তির সময়ে বেদাহুভর্তী বহুত স্বরবিভাগের মূলরূপগুলি সাধারণ সংগীতশাস্ত্রের কীরাত হয়েছে। ত্রৈতাঙ্গের প্রথমকালে মহামূর্তি ভরত আবির্ভূত হয়েছিলেন এইরূপ শ্রোত সিদ্ধান্ত নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে ভ্রাতৃতীয় নাট্যশাস্ত্রবোধের আচাংসিদ্ধির প্রমাণ থেকে অহুমান করেছি ঋগ্বেদপূর্ব নান্যক এক হাজার বৎসর অন্তীতে ভরতমূর্তি আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহর্ষি পানিনির সময়ে ভারতীয় সম্রাজ্যের দুই পাখা ছিল এবং তার মধ্যে তিনি প্রাচ্যপাখ্যার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

মহামূর্তি ভরতের সময়ে অথবা তারও পূর্ব থেকে 'নাগরী গাছ' নামে একটি মূল সাংগীতিক সম্রাজ্য ছিল এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতি নামের একটি বায়ালসম্রাজ্য ছিল, এর প্রধান পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রে। মহামূর্তি উক্ত নাম ও জাতির প্রচাংগ উল্লেখ করে একাধিকবার উল্লেখ, নিকট ৩৭ বীকায় করেছে। 'নাগরী গাছ' -বিষয়ে অন্ত শ্রোত সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ থেকে অহুমান করেছি, ভরতমূর্তির সময়ে নাগরী গাছ অহুমানী কীরাত এক হাজার শুদ্ধ-নির্মল-সংকীর্ণ রাগবিভাগ এবং তৎসংক্রান্ত রাগবিভাগের 'পুংজীনপুংকভেদ'তর ছিল। নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যসংগীতের পক্ষে এই শেষোক্ত তর ও তথ্যের প্রয়োজন হয় নি বলে মহামূর্তি এককল তর ও তথ্যের উপদেশ করেন নি।

তা ছাড়াও মহামূর্তি ভরতের আবির্ভাবকালে এমন এক শ্রেণীর শ্রীতব্যবহার ও বীণাবাদন-মুদ্রা পোষি বা সং ছিল যারা প্রাচীন বেদাহুভর্তী গভতি, নাগরী শ্রোত গভতি অথবা ভারতীয় সংগীত-

পদ্ধতির চেয়ে লোকায়ত সংশ্লিষ্ট-মতই গ্রাহ্য করেছিলেন। অর্থাৎ একই সময়ে বাস করে মূল একই সংস্কার ও লোকজ্ঞানের আশ্রয়ে থেকেও এরা সাংস্কৃতিক মত হিসাবে বৈদিক মূহনামধতি এবং নারদীয় পাছর্ষকে অগ্রসরণ না করে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ শ্রীতবাস্তবত্ব বিধরে আপন-আপন প্রত্যক্ষ লোকায়ত অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক মূহন। বহুব্রবাসী ; নারদীয় পাছর্ষ বহুব্রবাসী না হলেও বিশিষ্ট দার্শনিক ভাবের আশ্রিত ছিল। লোকায়তবাদী পূর্ণরূপে empirical ও pragmatic ছিলেন; এবং এদের একত্বানি হাত নাড়িকনের দিকে প্রদর্শিত ছিল। সর্বকালেই মনস্তত্ত্বশিষ্ট সমাজে লোকায়তগণী দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তির সম্ভাবনা এবং যথোপযোগ্য সমাদরও হয়েছে। বিশেষ করে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতমুনি সংশ্লিষ্ট ও নাট্যশিল্প বিধরে আগ্রহ বা শাখাপ্রবাহের পরই লোকপ্রবাস বা লোকব্যবহারের প্রামাণ্য উপদেশ করে গিয়েছেন।

মহামুনি ভরতের সময়ে সংশ্লিষ্টে লোকায়ত পথা ছিল তার প্রমাণ আলোচন করার বিশেষ কারণ এসে পড়ে। কারণ, একমাত্র তা থেকে বুঝা যায় সংশ্লিষ্টের তাত্ত্বিকালিক ও সর্বতোমুখী সমৃদ্ধি ছিল, ভরতমুনি লোকায়ত মতকে বহুই প্রজ্ঞা করতেন এবং শ্রীতবাস্যপ্রচার বিধরে যথার্থই প্রয়োজনবোধ ছিল কি না এবং কতখানি ছিল।

নাট্যশাস্ত্রের মতে নাট্যপ্রয়োজের অধিকারে পূর্বরূপ ও নাট্যব্যাপার স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বরূপ বা ধ্বনিকার বহিষ্কৃত সাধারণ শ্রীতবাস্যব্যাপারগুলিকে বহির্গীত বলা হয়েছে; এবং নাট্যের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ মূল নাট্যবিধরে সংশ্লিষ্ট শ্রীতবাস্যকে সামান্যতম অন্তর্গীত বলা হয়েছে। এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে যা-কিছু সাধারণভাবে উপযোগী তাকে 'শ্রীত' শব্দে হুচিত করা হয়েছে। এদিকল কথা নাট্যশাস্ত্রের প্রথম পাঠটি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। পরে, উনত্রিশ অধ্যায়ে, উল্লঙ্ঘন শ্রীতব্যাপারের সংশ্লিষ্ট বীণাবাদ্য ও পদ্ধতি প্রদর্শন করে মহামুনি উপদেশ করেছেন, যথা—

ত্রিবিধং বৈশবঃ বাহ্যঃ কর্তব্যঃ শ্রীতঃপ্রঃ তঃ ॥

তথঃ তথাহুগত মোদমনেককরণসংস্কৃতম্ ॥ ১০২

লহতালবর্ণনমতিশ্রীতাক্ষরভাবকঃ তদম্ ॥

শ্রীতঃ চ ধ্বনুগঞ্জনহুগতমিত্যুচ্যতে বাহ্যম্ ॥ ১০৩

আবিহুকরণবহলঃ উপমুপরিশাদিকঃ ক্রতলহঃ চ ॥

অনপেক্ষিতশ্রীতার্থঃ বাহ্যঃ চৌক্যঃ বুধৈর্জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৪

এর সরলার্থ এই, শ্রীতঃশ্রিষ্ট তিন প্রকার বীণাবাদ্য তন্ত্র অর্থাৎ বীণাবাদনতন্ত্রবিধের কতবা (বা প্রয়োজ্য); যথা, তব অহুগত ও তব। (এদের মধ্যে) অনেককরণসংস্কৃত, লহ-তাল-বর্ণ-প-ব-তি-শ্রীতাক্ষরভাবক বাহ্য তব (নামে উল্লিখিত)। এবং যা দিগে শ্রীতব্যাপার অহুগমন করা উচিত, তাকে অহুগত বলে। এবং বুধবিগের জানা উচিত যে আবিহুকরণবহল, উপমুপরিশাদিক ক্রতলহ, তথা শ্রীতান্নিরপেক্ষ বাহ্যই তব।

এখানে তব প্রকৃতি তিনরূপ বাহ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যাত্র প্রথম স্লোকের প্রথমার্ধই আলোচ্য।

তঃ, অর্থাৎ বাহ্যের বিশেষত্ব তাঁদের দ্বারা বা তাঁদের পক্ষে কর্তব্য বা করণীয়, তিনরূপ

বাহ্য। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? অবশ্যই বৈশ্ববাব্য বা বীণাবাদ্য বিষয়ে ধারা ইতিপূর্বেই পরিজ্ঞাত বা বিশারদ। এখানে ধারা বীণাবাদন সম্বন্ধে মাত্র ঔপন্যাসিক অংশ (theory) জানেন তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না; ধারা বীণাবাদনকার্যে দক্ষ কুশলী তাঁদের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, 'কর্তব্য' নম্ব দিয়ে প্রয়োগ না বস্তুত কার্যই হুঁত। ধারা বীণা বাজাতে জানে না তাদের বস্তু কিছুই জ্ঞান হোক তারা মাত্র ঐ জ্ঞান দিয়ে বীণা বাজাতে পারে না। এককথা, 'ভরজ' ও 'কর্তব্য' এই দুটি শব্দ দিয়ে পূর্ণসিক্ত বীণাবাদন কুশলতা বা অভ্যাসই বুঝায়।

প্রদত্ত, সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে কোথাও গান-বাদন-নর্তনে অনভ্যস্ত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিরে প্রাথমিক শিক্ষা ও অভ্যাসের জন্য উপদেশ করা হয় নি। নাট্যশাস্ত্রে 'music made easy' বলে কোনো প্রকরণ নেই। অতএব 'তজ্জ' শব্দের ধারা এমন ব্যক্তিকে হুঁত করা হয়েছে যিনি ইতিপূর্বেই বীণাবাদনে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাৎপৰ্য এই নাট্যশাস্ত্রে বীণাবাদ্যের প্রয়োজন মনে করা হয়েছে; সেই প্রয়োজনের বশেই বীণাবাদকের প্রয়োজন। বীণাবাদক অর্থে ইতিপূর্বেই বীণাবাদনে দক্ষ। এই বাক্য দক্ষ ব্যক্তিকে নাট্যসংগীতে নিয়োজিত করার প্রাক্কালে নাট্যোপযোগী বীণাবাদ্যের তত্ত্ব ও স্বরূপ উপদেশ করা হয়েছে।

সেই 'তজ্জ' বা বীণাবাদনদক্ষ ব্যক্তি যখন ইতিপূর্বেই অভিজ্ঞ ও দক্ষ ভাবে তাকে আবার 'কর্তব্য' উপদেশ করা কেন। তিনি তদবধি জানেন। তা নয়; তিনি অল্প বাক্য পদ্ধতি বা বীতিতে বীণাবাদন করতে পারেন, সেই দ্বিধাবে তিনি দক্ষ। কিন্তু বাক্যমাণ নাট্যোপযোগী সীতসঙ্গীত যে বীণাবাদ্য তার স্বরূপ প্রকৃতি তিনি জানেন না। এ কারণে তার বস্তু দক্ষ ব্যক্তিকে নাট্যোপযোগী বীণাবাদ্যের স্বরূপ উপদেশ করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, তিনি ইতিপূর্বে সামান্য-নাট্যোপযোগী বীণাবাদন জানেন অথবা তারতী। নাট্যসঙ্গীতের অতিরিক্ত স্বরূপ-কোনো লোকায়ত সঙ্গীতের অমুখবর্তী বীণাবাদনপদ্ধতি অবগত আছেন। সে ক্ষেত্রেও তারতী। নাট্যপদ্ধতিবিশেষের প্রসঙ্গভুক্ত যে সীতব্যাগাত, বা পূর্বেই বলা হয়েছে সেই সীতব্যাগাতের সংশ্লিষ্ট বীণাবাদনপদ্ধতি তাঁকে বিশেষতঃ জানতে হবে এরকম স্মৃতিগ্রাহ্য নিয়েই ভরতমুনি ঐ উপদেশ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হয়, ভরতমুনি তজ্জ শব্দের ব্যবহৃত প্রয়োগ করলেন কেন? যাহা ছদ্ম স্বাক্ষর থাকিলে তিনি ওরূপ করেছেন বলা যায় না। কারণ দেখা যায় নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে এমন অনেক স্লোক বলা হয়েছে যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যর্থতা বন্ধ করতে গিয়ে চম্বোভব হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র কাব্য নয়, শিল্পশাস্ত্র। আরও এই যে, প্রবন্ধলেখক ভরতমুনির উপদেশের মধ্যে কোথাও অনাবশ্যক শব্দের প্রয়োগ অবগত নয়।^১ অতএব ব্যবহৃত প্রয়োগের মধ্যে কিছু সংকেত ও সার্থকতা আছে।

সংকেত ও সার্থকতা, বলা ভরতমুনির সময়ে তারতী। নাট্যসঙ্গীতের অতিবিস্তৃত এবং নূনসঙ্গে তিন বাক্য বিভিন্ন পদ্ধতি বা মতের বীণাবাদনসম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ছিল। ব্যবহৃত দিয়ে নূনত তিন বুঝায়; এবং এইরূপ বক্তব্যের পথে যদি প্রসঙ্গক্রমে কখনও চাহ বা তারও অধিক সংখ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ

১ নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে অধিক প্রাক বা মত আছে। সিদ্ধান্ত-বিচারের দাঁকনি দিয়ে এগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয়, লোকায়ত স্বতন্ত্র বীণাবাদন ব্যাপার ও পদ্ধতি ছিল। বলাই বাহুল্য, এই ব্যাপার বা পদ্ধতি কোনো পুরানিক সম্প্রদায়কে অগ্রবর্তন করে নি। ইতিপূর্বেই বলছি, কোনো বিশিষ্ট দার্শনিক-মতবাদ বা ideology না হেনেও যাত্র প্রত্যক্ষ ও সামান্য অহুমানের উপর নির্ভর করে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এবং লোকায়ত হলোই যে কোনো শিল্প গ্রহণের অব্যোধ্য হ'বে একদম চিন্তা প্রাচীনত্বের মনে স্থান দাঁবে নি। স্বরবিজ্ঞান সম্বন্ধে এর উদাহরণ, মতামতের নশিবেশপ্রবর্তিত যামলব-মুছনা। যামলবমুছনা, অর্থাৎ সপ্তকে যাত্র যারোটি বর স্বীকার করে তার উপর ঐশ্বর্যমিত্তিক ভিত্তি রচনা করা। সাধারণভাবে লোকসংগীতে যারোটি অব্যে প্রয়োগই থাকে। নারায়ণ গাছের বান্ধি প্রতি দিয়ে যে সূক্ষ্মতর স্বরপ্রত্যাবনা করা হয়েছে সেগুলি ব্যাপার লোকায়ত সংগীত গ্রহণ করতে অক্ষম, অহুত্বের অক্ষমতার কারণে। কিন্তু, যাত্র এই কারণেই এই লোকায়ত মতকে হয়ে প্রতিপন্ন করা যায় না। এবং মহামুনি ভরত যে লোকায়ত সংগীতকে শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণ নাট্যশাস্ত্রেই আছে এবং একাধিক বার উপদেশ আছে। তার মধ্যে একটি, যথা "নোক্তা বেচ যত্র তত্র লোকগ্রাহ্যস্ত তে বৃন্দঃ। লোকো বোদ্ধাত্মাধ্যাত্ম প্রযোজ্যঃ ত্রিবিধঃ মতম্"।

এই অহুমানের সার্থকতা দেখা যাক। নাট্যের কার্বে উত্তম শিল্পীর প্রয়োজন। শিল্পী-নির্বাচনের সময়ে তার সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠার চেয়ে কার্যকরতাই বিচারের যোগ্য। নাট্য ও গাছের ব্যবহার ব্রাহ্মণ-কত্রির প্রকৃতি বর্ণবৈষম্যমূলক চিন্তা নেই; এর ইচ্ছিত আছে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে। ফলে, শিল্পীনির্বাচনের পক্ষে সকল দুরারই খোলা; এবং এ-ব্যাপারে বন্ধ স্থপনী ব্যক্তিই অধিকারী, তিনি ব্রাহ্মণই হন বা আর-কিছু হন। 'তজ্জৈঃ' শব্দের প্রয়োগ দিয়ে ভরতমুনি নারায়ণ পদ্ধতি, বোধাত্মবর্তী পদ্ধতি এবং লোকায়ত পদ্ধতি তিনটিরই বখাবোধ্য মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রথম হতে পারে, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বীণাবাদন নাট্যের বা গাছের সহায়তা করতে যাবেন কেন; নাট্যব্যাপারও নটনগীতগঞ্জিষ্ট। ধর্মশাস্ত্রে নটনগীতের ও তাদের সংস্কারের নিষেধ করা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায়, ভরতমুনি আবির্ভাবের সময়ে নাট্যের অধ্যাত্ম ছিল 'না' নিষ্কর; নচেৎ অনধ্যাত্মের অবকাশে একমুখ মুনি ভরতের সমীপবর্তী হয়ে নাট্যের উপদেশ শুনে যেতেন না। আরও এই, ভরতমুনি সময়ে সংগীত ও নাট্যশিল্পের সত্যের সন্ধানের কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপব্যবহার আবিষ্কৃত হয়ে গিয়ে থাকলেও অনসমাজের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা আবিষ্কৃত হয় নি; ফলে, তখনও বর্ণভেদগত দুর্ভাগ্য দেখা দেয় নি। তখনকার সময়ে অর্থাৎ ভারতীয় নাট্য-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও সত্যের সময়ে সাধারণসমাজ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণসমাজের অবস্থা স্বিকল্প ছিল এসকল বিষয়ে কিছুকিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। বাহুল্য হবে বলে এখানে তার আলোচনা করা গেল না।

এখন গীতব্যাপারের অন্তর্গত পদার্থ বিষয়ে তখনকার সংগীতজ্ঞদের প্রয়োজনবোধ কি হকম ছিল আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্তর্গত অর্থাৎ নাট্যের ব্যক্তির সংগীত গীতকে ক্রবা ও কাব্যবদ্ধ নামে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ক্রবা অর্থাৎ বসবস্ত গীতের পর ও স্বরবিজ্ঞান দিয়ে কোনো গানের উদ্দেশ্য করা হয় লক্ষ্য। এ হকম উদ্দেশ্য স্বীকার করে ভারতীয় গাছের মধ্যে গীতরূপ রচনা বিষয়ে (theory of musical

composition) আবার যে বিশিষ্ট জ্ঞানাহতবলমূলিত শিক্ষান্ত পাই তার তুলনা নেই; কারণ আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর সাংগীতিক ইতিহাসের মধ্যে অল্প কোনো গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বা স্রষ্টাশ্রমবোধিত শিক্ষান্ত সম্ভব হয় নি। সমস্তটি এই রূপ — যে কোনো গীতি বা পদকে গান করে গীতরূপে ধ্যাতব্য অভিব্যক্ত করতে হলে কি বন্ধন অথবা বিধি তাকে গান করা উচিত। গীতির ভাবমূল্য বা বসন্তোক্তনার সঙ্গে স্বরবিভাগের কোনো নিষত্ত ও হুমকি সম্বন্ধ আছে কি না; যদি থাকে, তাহলে সেই নিষত্তি বা নিষত্তি কিতপ। মহামুনি ভরত পূর্বপ্রাজ্ঞদের অগ্রদূত বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন গীতি ও স্বরবিভাগের মধ্যে একটি শুভ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটি স্বাভাবিক, অর্থাৎ কৃত্রিম নয়। এবং এই শুভ সম্বন্ধকে সংগীতরূপে প্রচলিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি মূল নানবীর গানধর্মের অংশবিশেষ সংকলন করে সূচকরূপে উপদেশ করে গিয়েছেন। গীতি ও স্বরবিভাগের নিষত্ত সম্বন্ধবিষয়ে মহামুনি ভরতের গাঢ়প্রস্তাবনা আজ পর্যন্ত অগতে এক ও অবিচলিত শিক্ষান্তসমুচ্চারণেই থেকে গিয়েছে, অর্থাৎ ভরতমুনিই একমাত্র theory of musical composition প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েছেন। ইউরোপীয় সংগীতরূপেও এখন পর্যন্ত এজন্য প্রস্তাব আবির্ভূত হয় নি; যদিও অনেক দিন ধরে কতকগুলি পরীক্ষা চলেছে।

এই প্রস্তাবের অস্বাভাবিক প্রতিপত্তিকে বাইশটি ভ্রুতি, তিনটি সপ্তক বা স্থান, বহুত্ব ও মধ্যম নামে জ্ঞান, চৌবাশি প্রাথমিক সূচনা, পঁচিশটি স্বরবিভাগ জ্ঞান, আঠারোটি প্রকরণ জ্ঞান, তিন শতাধিক মৌলিক স্বরবিভাগ, চার বহুত্ব স্বরবর্ণ, তেরিটি স্বরালংকার প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষিত শিক্ষান্ত গ্রন্থ হয়েছে। বলা বাহুল্য এগুলি স্থূল শিক্ষান্ত। অল্প বিধে গীতি ও পদবিষয়ে ছন্দ হল ভাব উচ্চারণ ও অলংকার বিষয়ে নানাবন্ধনের স্রষ্টাশ্রম-পুণ্ডরীক এবং পরীক্ষাসহ শিক্ষান্ত গ্রন্থ করা হয়েছে। এবং গীতি ও স্বরবিভাগের শুভ-সম্বন্ধবিষয়ে বাসী-সম্বাদী-বিবাহী-অগ্রহাযী ও গ্রহ-মংগ-জ্ঞান-অপজ্ঞান ব্যাপার ধ্যাতব্য প্রস্তাবিত হয়েছে।

মহামুনি ভরত অথবা ভারতীয় নাট্যসম্রাজ্যের গীতবিষয়ে জ্ঞান, অগ্রহতব-সুন্দরতা ও প্রয়োজন-বোধের বিশদবর্ণনা দেওয়া গেল। প্রয়োজন ও প্রয়োজনবোধই (necessity) বড় কথা। কারণ, প্রয়োজনবোধ হলে তবে আবিষ্কারের কথা গঠে।

এখন, ভরতমুনিব সময় প্রাককবাদকমাত্রই ভ্রুতিব ছিল এজন্য যেন করার মুক্তি পাওয়া যায় না। বিশেষ এই যে, ভরতমুনি উত্তরোত্তর কালের মেন্যাপাণের কথা বলেছেন এবং সমাজের বর্ণপ্রভেদ স্রষ্টাশ্রমের অবনতির তথ্যও দিয়ে গিয়েছেন। ঋতভেদসম্বন্ধিত মৌলিক তিন শতাধিক স্বরবিভাগ শ্রুতিতে ধারণ করা অসম্ভব বলে মনে হয়। অতএব এইসমস্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শকে বলা করার উপায়ও নির্ণীত হয়েছিল সম্ভব নেই। এ থেকেও বড় কথা এই যে, উক্ত ব্যাপারগুলিকে চরমশিক্ষান্তরূপে গ্রহণ করার পূর্বেই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। শুধনকার, অথবা কোনো কালের, শ্রুতি-মোহ দিয়ে এসকলের খুঁটিনাটি পরীক্ষাই অসম্ভব।

এসকল কথা ভেবে দেখলে আদ্যবা অজ্ঞান করতে পারি, সে সময়ে কোনো-এক বন্ধনের বা

বহু দশকের স্বরলিপিগ্রন্থ ছিল। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে আচার্যকল্প, জ্ঞানী ও অল্পভরী ব্যক্তির মনে প্রয়োজনবোধ হইবে অথচ সেই প্রয়োজনবোধের অহুযায়ী কোনো উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করেন নি। এতদ্বারা বলা যাইতে পারে যে, কখনও কখনও পণ্ডিত বংশের ধরে ঐকল তথা পরীক্ষা করে দেখে এখন বলতে পারি যে, সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রায়শঃগত ও অতুলনীয়। অথবা, প্রয়োজন অল্পতর করেও আলস্তের কারণে উপায় উদ্ভাবন করতে অপর্যাপ্ত হয়েছিলেন, এতদ্বারা অহুমান করা নাট্যশাস্ত্রের সত্ত্বের পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। প্রথমত বলা যায়, ভ্রতরত্নির সময় চিত্রাঙ্কনশিল্প ও বর্ণবোজনশিল্প ছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে সময় আক্ষরিকলিপিও ছিল।

সেই প্রাচীনকালের প্রয়োজনবোধ বাহু মিরে আধুনিক নীতিশিল্পীর প্রয়োজনবোধ পরীক্ষা করা যাক।

পানবাঙ্কনার পক্ষে কড়ি-কোমল মিরে মাত্র বারোটি বইই প্রয়োজন। নীতির বরয়োজনা হয় সামান্য অল্পতর ও সংস্কার মিরে। হাস্যশিল্পী বিলাসধানি বাগের আলাপের সময় অল্পতরমিতিক বিশিষ্ট-ভাবে প্রকাশ করতে থেকেও তাকে সাধারণভাবে কোমল অল্পতর বলেই বর্ণনা করেন। পুরিয়ারাপের বৈবতস্বটি সোহিনী বা ভূশালীয়ারাপের বৈবত থেকে একত্রটি কোমলতর হলেও স্বরলিপিতে তার কোনো নিরূপণ নেই; কারণ প্রয়োজনবোধ নেই। অলংকারের চাকপ্রয়োগ ও তাঁদের ভেদ অল্পতর সাদা দেখে না বলে অলংকারের বিশেষ চিত্রা ও নিরূপণ পাওতা যায় না। ইউরোপীয় স্বরলিপিগততি দেখলে বোকা যায়, তাতে ভরতোক্ত স্বরলংকার ও বর্ণলংকার সর্বত্র ছোটলিঙ্গ অলংকারের মধ্যে মাত্র পাঁচটি অল্পতর হইবে। ইউরোপীয় শিল্পী এই কয়টি প্রয়োজন অল্পতর করে বলেই স্বরলিপির মধ্যে এদের সংকেত থাকে। আবারের ভারতীয় শিল্পীরা সকলেই এই পাঁচটির অস্তিত্ব সন্দেহ অবিহিত নন—স্বরলিপিতে এদের নিরূপণ দূরের কথা।

এই বহু সামান্য প্রয়োজনবোধের কারণে যদি স্বরলিপিকরণ উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে প্রাচীন শিল্পপ্রতিভার পক্ষে স্বরলিপি উদ্ভাবন না করে নিশ্চেষ্ট থাকা কি করে সম্ভব হয়।

প্রথম, প্রাচীনকালে যদি কোনো বহু স্বরলিপি বা সংকেতলিপি থাকত তাহলে সংস্কৃত-বিষয়ক বা অল্প জাতীয় প্রাচীন গ্রন্থে তার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন। উত্তরে সামান্য ভাবে বলা যায়, মাত্র অল্পতর মিরে অনন্ত অহুমান করা সংগত হয় না। ইং, এ পর্বত সংস্কৃতসাহিত্যের গ্রন্থে 'সেবনাসরী' 'সেবনাসরী' লিপি 'ব্রাহ্মী' বা 'ব্রাহ্মীলিপি' শব্দগুলি কোথায় ও কতবার উল্লিখিত হইবে প্রাধান্য করার যোগ্য। লিপি বা অল্প কোনো বস্তুর ব্যবহার থাকলেই যে সেই সেই কালের লিখিত গ্রন্থে তাঁদের উল্লেখ থাকবে এমন কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই! অল্পতর, কোনো বস্তুর উল্লেখ না থাকলেও অহুমান প্রয়োগ করে যদি সেই অল্পলিখিত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় তবে সেই সংগত অহুমান অহুমানেরই বস্তুর তাৎকালিক অস্তিত্ব ছিল স্বীকার করতে হয়। এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত নীতিবিষয়ক বস্তুরগুলির মধ্যে প্রয়োজনবোধই অহুমানের প্রথম সোপান। বস্তুর জ্ঞান বা অল্পতরের প্রাচীন না হলে প্রথমই থাকত না।

অতএব, বস্তুরবিচার ছিল। বস্তুরবিচার ও তাঁদের দৃষ্ট ভেদগুলি সঙ্গত বা ব্যক্তিগত বৃত্তিতে

ধরে রাখা অসম্ভব; অতএব শ্রুতি ছাড়াও অন্ত-কোনো উপায়ে সেন্সলগ বস্তুকে ধোঁয়াবভাবে বক্ষণ করা হত। সম্ভবত্বকে গ্রামোফোনের বেকর্ডের মত ধরে বক্ষা করা চলে, এবং সেখানশে পরিণত করে বক্ষা করা চলে। এই দুটি উপায়ে মধ্যে প্রাচীনকালে কোনটি হওয়া সম্ভব বা অসম্ভব এতদন বিচার করে বলা যায় যে গীতলিপি বা স্বরলিপি ছিল কিন্তু গ্রামোফোন-জাতীয় হয় ছিল না।

অবশ্য ঐ গীতলিপি বা স্বরলিপির নিমর্শন পাওয়া যায় না। তার কারণ এই যে, মটাদশ্রমায় বা পাছর্বে উৎকর্ষ নিরোধে ক্রমশ অবনতি ও ব্যবহারিক অবলোপ হযেছিল। সাম্প্রদায়িক অবলোপের অর্থ প্রয়োগ বা ব্যবহারের সংকেত মূল হওয়া। এর একটি দৃষ্টান্ত আধুর্বেনের চবক সম্প্রদায়ের অবলোপ। ঠেব বিজ্ঞানের একটি কথা এখানে খাটে, বধা অবনতি বা degeneration-এর নূর্বে 'latest to evolve, first to go' অর্থাৎ যেটি সকলের শেবে উত্থত হয় সেটি প্রথমে অধুর্গন করে। প্রাচীন সংগীতের সৃষ্টির আলোচনা করে দেখা যায়, ভারতীয় গাছর্বে রসবন্ধ বা ক্রবা গীত এবং কাব্যবন্ধ গীত তথা আত্মবক্ষিক স্ববিস্তারগুলিই চরম উন্নতির বৃচনা করে। অবনতির নূর্বে ঐ দুটিই সকলের আগে ধ্বংস পড়েছে। ফলে এদের সংশ্লিষ্ট গীতলিপি বা সংকেতকোশল ও মূল হয়ে গিয়েছে। স্বরলিপির অধুর্গন হতে থাকলে ক্রমশ পূর্বেকার সামান্ত্র বা আদির তথটি দেখা যেওয়ার কথা। এই তথটি পাওয়া যায় মতঙ্গশ্রুতি বৃহৎশ্রী গ্রন্থে। এর মধ্যে স্র ব গ ম প্রভৃতি কালমালা ইতত্তত বিকিপ্ত-ভাবে দেখা যায়। মতঙ্গের সময়ে ভারতীয় গাছর্বলম্প্রদায়ের ব্যবহার লোপ গেরেছিল বলেই তিনি অবলুপ্ত সভ্যতার উপর বেশী ও মার্গ চিন্তা বিয়ে অভিনব শিদ্ধান্তসৌধ রচনা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থতির একটি বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য হয়। এখন যেমন সকলেই সব-কিছু শাস্ত্র বা বিজ্ঞান বিষয়ে এর প্রণয়ন করার অধিকার দাবি করে, তখন সেবকম ছিল না। সে সময়ে মাত্র জ্ঞানী বিশেষজ্ঞ আচার্যবৃন্দই শাস্ত্র প্রণয়ন করতেন। এঁদের বৃষ্টি একাত্তই তত্ত্ব অর্থাৎ categorical principle এবং শাস্ত্র সভ্যতার প্রতি নিবন্ধ ছিল। বিশিষ্ট শ্রুতি বৃত্তি যোগ্যক্তির অধিকারী হয়ে এঁরা প্রথের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা ও প্রতিভার বলে মাত্র সেই জাতীয় জ্ঞান ও পর্যর্কের অধুর্গন করতেন যে জ্ঞান ও পর্যর্কের কোনো কালে বিনাশ নেই। এবং যা-কিছু মাত্র আছে, কাল থাকে না, যা-কিছু যোগ্যকালমাত্র ও কচিত্তবে সর্ববাই পরিবর্তনশীল এ বকম অনাদি অনন্ত কালের কণবিক্ষণী অতিক্রতা ও বস্তুগতকৌ সৌম মনে করেই এগুলি শাস্ত্রে নিবন্ধ করতেন না ও সেখানশে নিবন্ধ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। ফলে এঁদের মত জ্ঞানী ব্যক্তি বন্ধন সংগীতের শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন তখন গীত বাস্তব নৃত্য নৃত্যানাট্য প্রভৃতি বিষয়ে তাবিক পর্যর্ক বস্তু রূপ ও প্রয়োগই এঁদের লক্ষ্য ছিল। এঁদের বচিত গ্রন্থে যদি গীত বা বাস্তবশের স্বরলেশ বর্ণনা না থাকে, কোনো স্বরলিপির উল্লেখ না থাকে তাহলেও এঁদের দোষী করা যায় না। এবং তা থেকে প্রমাণও হয় নূর্বে এঁরা লিপি বা স্বরলিপির প্রয়োজন বোধ করেন নি।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্র - জীবন ও -সাহিত্য সংক্ষেপে তথ্য ও তথ্যসম্ভার আলোচনা

এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিয়তম পরকে আপন করে নিতে পেয়েছেন— চলিত কথার থাকে আমরা তাঁর গান ভাঙা বলি— তার পথিধি কত বিস্তৃত, এবং তা'তেও কিয়তম অপরূপ কাবিত্বী দেখিয়েছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা সংগীতমহলে করি। রবীন্দ্রসংগীত উপলক্ষ্যে সেই সাথ পূর্ণ হল।

গান ভাঙা দু'রকমে হতে পারে— এক, পদের দ্বারে নিম্নের কথা বসানো; দুই, পদের কথার নিম্নের দ্বার বসানো। এক্ষেত্রে পদের দ্বারে নিম্নের কথা বসাবার দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়। পদের কথার দ্বার দেবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; যদিও একেবারে নেই, তা নয়। এই প্রথম স্রোষ্টিকে আমি সুবিধার্থে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি: ১, অ-বাংলা ভাষার গান ভাঙা; ২, বাংলা ভাষার গান ভাঙা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতগুলির কথার সম্ভাব্য বাদ দিয়ে শুধু দ্বয়ের দিক থেকে আলোচনা করলেও আমাষের হিন্দু-সংগীতের একটি বিপুল রচনাগারের পথিচর ও ইতিহাস পাওয়া যাবে। আমাষ বে ভাঙা গানের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তারও অধিকাংশ এই ভাঙারেই সজ্জিত। কবি নিম্নে যেখানে যে ভালো স্থিতি গুনছেন, অথবা অন্ত লোকে বেশবিসেষ থেকে যে-সব গান আহরণ করে তাঁকে এনে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিকেই তিনি পূজার বেষীতে নিবেদন করেছেন বললে অত্যাধিক হয় না। মাঝোৎসবে নতুন নতুন গান সরবরাহের তাগিদ তার অন্ততম কারণ হতে পারে।

১

পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্ণকল ছিল বোম্বাই প্রদেশ, তাই সেই প্রদেশের নানা ভাষার গান ভাঙার নবুনার কবাই আমাষের প্রথমে মনে পড়ে। বিবাহের অনতিপূর্বে তিনি কারওয়ার নামক বোম্বাইয়ের বে স্থম্বর বন্দরে আমাষের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একমল নর্তকী গান শোনতে আসে, মনে পড়ে। তাবের কাছে কয়েকটি কান্নাত্তী ভাষার গান শুনি ও শিখি, যা পরে তিনি 'ভাঙেন'। সেইগুলির দৃষ্টান্তই প্রথমে দিচ্ছি, কারণ আমাষের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে বিশেষ গানের মধ্যে এইগুলিই প্রথমে প্রসিদ্ধ। তবে বলে রাখা ভালো যে, উদাহরণগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সামান্য ক্রমে চোঁটা করা হয় নি।

মূল । সখি বা বা

ভাঙা । বড় আশা করে

মূল । পূর্ণ চন্দ্রাননে

ভাঙা । আলি শুভদিনে

মূল । চারি বর্গা পর্বত

ভাঙা । সকাহরে গুই কান্দিছে

মাস্তাজী যদিও ও-মকলের একটি প্রধান ভাষা, এবং আমি তার তিন-চারটি গান যে না শিখেছিলাম তাও নয়, তবু কেন জানিনে, রবীন্দ্রনাথের মাস্তাজী থেকে ভাঙা কোনো গান মনে করতে পারছি নে।

গুজরাটী দ্বন্দ্বের প্রাচুর্যেই বসে। অর্থাৎ যদিও একটি ত্রন্দ্বসকীতের (“কোথা আছে প্রভু”) মাধব ‘গুজরাটী ভজন’ লেখা আছে, কিন্তু তার মূল কথাগুলি আমি জানিনে। তবে ঐ শিরোনামের সাক্ষ্যের দ্বারা ভাঙা গানটির উল্লেখ করে গুজরাটের সঙ্গে সন্ধ্যা স্থাপন করছি। এটি এখন চলিত না থাকলেও আমরা ছেলেবেলায় খুব শুভ্র। এ গানটিতে হৃদের বিশেষ চটক না থাকুক, বেশ একটি বীর শাস্ত্র তার আছে, যা ভজনের উপযোগী। যেখানে কথাই প্রাণ, সেখানে হৃদের অলংকরণ তাকে চেপে না বেঁটাই সংগত; সেইজন্য ধর্মগীতের সঙ্গে টল্লাব চালের চেয়ে ঝগরের চালই প্রসঙ্গ মনে হয়। ঝগরন গীতগুলোও এই মত সমর্থন করেন।

আর-একটি ভজনের হৃদয় সরলা দেবীচৌধুরানীর ‘শতগানে’ গুজরাটী নামাঙ্কিত আছে বলে গায়ন করে এই পর্বেই কেগছি। সেই হৃদে বসানো দ্বিবেশনাথের “অখিল ত্রাণপতি” গানটি হৃদয় ত্রাণদামাধে বেশি পরিচিত; কিন্তু তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি গানে ঐ ভজনের হৃদয় বিরোধে—“এ কি অন্ধকার এ ভাবতত্বনি” “নমি নমি ভারতী” (রাষ্ট্রীক-প্রতিভা); “দাদে যে অনন্তগানে” (কাল-সুগম)। এ সরল স্রুটিও ভজন বা ধর্মগীতের উপযোগী।

মাস্তাজী ও মহীশূরী। মাস্তাজী হৃদের অশোকাকৃত প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষিত হয়। তার একটি কারণ আবার মনে হয় কার্ণোপলক্ষে সরলা দেবীর অনেককাল মহীশূরে অবস্থান ও সেখান থেকে হৃদয় হৃদয় গান আনয়ন, যথা “এ কী লাভগো পূর্ণ প্রাণ”; তার মধ্যে “আনন্দলোকে” গানটিই বেশি হয় সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, যদিও তার মূল কথা জানিনে। এই সহজ হৃদয় হৃদয় গানের বিশেষ উপযোগী। আবার “সংগজ্ঞান” নামক বিখ্যাত বৈদিক স্লোকে এই স্রুটিই একটু ইতিবিশেষপূর্বক সরলাবিধিই বিরোধে ও সামান্য স্বরসজ্জি লাগিয়ে কত দড়ায়ে গান করিয়েছেন, তা হৃদয় একালের অনেক নাও জানতে পারেন। আরও বেশি সেকালে গেলে “নমামি মহিষাহুর্মহিষিনি” নামক মাস্তাজী ভজন-ভাঙা “ভজো যে ভজো যে ভবধণ্ডনে” গানটি আমাদের কালে খুব চলিত ছিল; এটি দ্বিবেশনাথের ভাঙা। আবার বেশকালপায়ে সমসাময়িকের কাছে ঘেঁষে এলে যেখা যায় আমরা মাস্তাজী হাই না-হাই, মাস্তাজী আমাদের কাছে এগেছে। অর্থাৎ শাস্ত্রনিকের মতনই একজন মাস্তাজী ছাত্রের কর্তার হৃদয় হৃদয় মাস্তাজী গান রবীন্দ্রনাথ হৃদয়রতর ভাবে তেড়েছেন, তা এখানকার অনেক আমাদের চেয়ে ভালই জানেন। যথা “বেবনা কী ভাষার” “বাছে কল্প হৃদে” ইত্যাদি।

“চিরসখা ঘোরে জেঁড়া না” এবং “চিরবন্ধু চিরনির্ভর” গান দুটির হৃদয়ও মহীশূরী বলে প্রসিদ্ধ। “প্রণয়ামি অনাদি-অনন্ত সনাতন পুঙ্খ” গানটি মাস্তাজী ভজন থেকে স্রোতিবিশ্রনাথ তেড়েছেন। তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের আমলে গেলে “জয় দেব” “হার একি হেরি শোভা” প্রভৃতি হৃদয় হৃদয় ভজন-ভাঙা গান পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবী বা শিখ ভজন। শিখ ভজনও আমাদের হৃদয় হৃদয় পেতেছি। তার মধ্যে সবচেয়ে

স্বন্দর "বাঁজে বাঁজে রমা বীণা"। আমার মনে হয় এটি ভাঙা গানের বাঁজা— এই হিসেবে যে, দত্তদ্বয় সত্ত্বয় কম পরিবর্তনে' বিশেষভাবে অবশেষে পরিণত করা হয়েছে, যেন একই বর্ণমূত্রার ঐশিষ্ঠ আর ত-শিষ্ঠ। অবশ্য মূল গানের ("বাঁজে বাঁজে রমা বীণ বাঁজে") ভাবাই উাকে সে স্বরোপ দিয়েছে। কিন্তু যদিও বীণার কবি যে তিনি মূলের প্রত্যেক কথা অম্লবাক্য করেছেন মাত্র, তাহলেও প্রত্যেক কিত্তিমোহনবাবু কাছে শুনেছি যে শুধু প্রথম কবির কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, বাকি দুটি কবি তিনি পূর্বাশর সংগতি বেধে নিয়েই সংযোজন করেন। অবশ্য তাঁর কাহিন্যবী বা শিল্পচাতুরী এতই বহুশ্রদ্ধা যে, আমাদের মত লোকের অন্তরে চোখে আঁদুল দিবে সেটা যেখানে বাঁধা অনেকটা প্রবীণ ধরে দূর্বের আলো দেখাবার মতন। তবে প্রবীণেরও প্রয়োজন আছে, নইলে বীণালি হবে কিসে ?

এই শিশু-ভঙ্গনেরই আর-একটি বচকাল আসে আমাদের কাছে এসেছিল, বী পুত্রে ভা

১ এ প্রথম আর-একটি পৃষ্ঠায় ১০২-চৈত্র-সংখ্যা এখানে থেকে উদ্ধৃত করছি—

। বিধী আশিতি ।

অনুভব ওজনবাহার পিত

[মূল]

এ হরি প্রবাহ, এ চবি প্রবাহ
ভেঙে চকণ'পরি গিয়া নব' ।

সেবক জনকে সেব সেব পয়,
শ্রোবী জনকে শ্রোব শ্রোব পয়,
স্থানী জনকে বেনন বেনন ।
স্থানীজনকে আনন এ ।

বদা কন্যার' সখিল সখিল,
বিধি বিধির' উল্লিখ উল্লিখ,
সখিতা সখিতা চকণ চকণ,
সখার সখার নদী' এ ।

চৌধুর প্রবাহ বইয় বিজয় বীণ ।
ভেঙে প্রবাহের উদার এ ।

[অনুবাদ]

এ হরি প্রবাহ, এ হরি প্রবাহ,
নতক নহি তব চকণ-পরি ।

সেবক জনকে সেবার সেবার,
শ্রোবক জনকে শ্রোব-বহিবার,
স্থানীজনের বেননে বেননে,
স্থানীর আননে প্রবাহ যে ;

নতক নহি তব চকণ-পরি ।
কাননে কাননে প্রায়স ভাবন,

পার্লতে পার্লতে উত্তর উত্তর,
নদীতে নদীতে চকণ চকণ,
সখারে সখারে নদী' যে ।
নতক নহি তব চকণ-পরি ।

চকণ পুথি আসে নির্জল বীণ,
'তব প্রবাহবিজয় উদার করে,

নতক নহি তব চকণ-পরি ।—প্রবাহপ্রবাহ গীত

ভবে এ অনুবাদটি বান্ধলেই অবশেষে হতেছিল কি না, আমাদের ঠিক জানা নেই ।—মূলগানটি বাংলাদেশেই একসময় এত প্রচলিত হতেছিল যে, তার আর 'আকস্মিক' অনুবাদটি গান হিসাবে মূলগানটির পাশাপাশি প্রচলিত না হওয়াই সম্ভব ।—
প্রবাহপ্রবাহের কোনো প্রাচ্য এ অনুবাদটি এখানে স্থান পায় নি ।—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

মানি নে; এবং আশ্চর্যের বিষয়, সেটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে অহুবাদ করেছেন। গানটি এই—

মূল । গগনোন্মে খাল রবিচন্দ্র ধীপ বনি
তারকামণ্ডল অনক যোতি রে ।
ধূপ মলয়ানিল পবন চড়ব করে
সগল বনবাঞ্ছি ফুলত জ্যোতি রে ।
ক্যাখনি আরতি হরি হো ভবখণ্ড তেরি আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত তেরী রে ।

ভাঙা । গগনের খালে রবিচন্দ্র ধীপক জলে
তারকামণ্ডল চবকে যোতি রে ।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চায়ব করে,
সকল বনবাঞ্ছি ফুলত জ্যোতি রে ।
কেহন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত তেরী রে ।

কেউ কেউ ফুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের। এই আক্ষরিক অহুবাদ যে এত অবিকল করা সম্ভব হয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় শিখরের গুরুমূবী ভাষা কতটা সংস্কৃত-বেঁধা। দাকে শাজাবী ভাষা বলা যায়, তার নমুনা রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-ভাঙা গানের মূলে পাওয়া যাবে।

আর-কোনো বংশী ভাষা থেকে তিনি গান ভেঙেছেন বলে মনে করতে পারছি নে। তাই এবার যে ভাষা নিত্য প্রবেশী হলেও ঘটনাচক্রে আমাদের মাঝার থাম পাবে কলে নিত্য আপনার করবার প্রাপ্যত চেষ্টা করতে হচ্ছে, সেই ইংরেজী বিমাতৃভাষার গান ভাঙার হু-একটি নমুনা দিয়ে প্রথম অধ্যায় শেষ করছি।

কবি প্রথমজীবনে বিলাতপ্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রথমদিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলতী প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা, ‘বান্দীকি-প্রতিভার’ ও ‘তলে-দগদগ’র। “কালী কালী বল যে আদ” নামক ভাকাতলের কালী-বন্দনার স্রব একেবারে সগরীরে একটি ইংরেজী গান থেকে তোলা; সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee, এবং তাতে একজন মাখিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন।

মূল । Nancy Lee
মূল । Ye banks and braes
মূল । Robin Adair
মূল । Go where glory

ভাঙা । কালী কালী
ভাঙা । জলে জলে ঢলে ঢলে
ভাঙা । সকলি জ্বালো
ভাঙা । মানা না মানিলি;
মরি ও কাহার বাছা;
জন্মে দরাদর

মূল । The British Grenadiers	ভাঙা । তুই আর যে কাছে আর
মূল । ?	ভাঙা । ও যেখনি যে তাই আর যে ছুটে
মূল । Auld Lang Syne	ভাঙা । পুরানো সে দিনের কথা
মূল । Drink to me only	ভাঙা । কতবার জেবেছিছ [অচলিত]

কাল-মুগ্ধার অনেক গানই ইংরেজী বা স্কট ও আয়ারিশ স্বরভাঙা। Go where glory waits thee—হুগ্গি Tom Moore-এর *Irish Melodies*-এর অন্তর্গত। কবীশ্বের জীবনীকারেরা জানেন, তাঁর অল্পবয়সে তাঁদের বলে সুখ-এর কবিতার এক সময় খুব চল ছিল। এই গানটির স্বর আশায় বড় দিগ্টি ও কলন লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই দেখেছিল, কারণ বাস্তবিক-প্রতিভা ও কাল-মুগ্ধা দুই নাটোই বনসেবীবেশ করণভাবাসক্ত দুটি গানে এই স্বর মিলেছেন। আর-একটি বর্ষাঙ্গীতে মিলেছেন—“ওয়ে বয়ামর”, বা হৃদয় এখনকার লোকে ভুল জানে না। এই হুগ্গি আশায় তো মোটে বিস্ময় লাগে না।

দুঃখভাবে ধরলে হৃদয় বর্ষাঙ্গীতে বৈদ্যাতিক প্রভাব আয়ো দেখানো যেতে পারে; তবে এও ঠিক যে অস্ত্রান্ত ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি তিনি খুব বেশি বিশেষায়নার ভ্রোতে গা ভাসিয়ে সেন নি; বয়ামরই বসেই তিন্তির উপর মজাগত বৌলিকতা স্থাপন করেছেন। কোনো-কোনো উত্তেজনাপূর্ণ গানে তিনি বিশেষতী ‘কোরাল’ বা গানের প্রত্যেক কবির শেষে একটি দুখ্য সমবেত কর্তে গাবার পদ্ধতি অঙ্গরগণ করেছেন, যথা “অনগনমন”-র ‘অর হে অর হে’, কিংবা “মাতৃমন্দির”-এর ‘অর অর নবোতম’ ইত্যাদি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণাত্তও বিরল। আর-একটি বিশেষতী স্বরবৈশিষ্ট্য—যাকে বলে চার্মনি বা স্বরসঙ্গি—সেদিকেও তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। যদিও তাঁর কাণের কেউ কেউ এদিকে কিছু কিছু চোটা করেছেন; কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের অভাবে সে চোটা ছেলেবেলামাত্রেরই পর্বেদিত হয়েছে। তিনি তাদের এ পেলায় ধোণ না বলেও তাদের নিরস্ত করার চোটা যে করেন নি, এতেই তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়। এবং যদি এর পরে কোনোকালে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য হন তো তিনি থাকলে স্বর্গেরে তাঁর কর্তে অঘমালা যিতেন, এটুকু বলতে পারি।*

মনে করেছিলাম, হিম্মী ভাষা থেকে ভাঙা গানের একটি আলাদা বিভাগ করব, কারণ হিম্মী ভাষা একাই এক-শ*। কিন্তু সেগুলি এতই সংখ্যাবহ যে, আমি এই সংক্ষিপ্ত পত্রটির মধ্যে তার অবতারণা করা সম্ভব মনে করলুম না। সেকালের ও মধ্যকালের বর্ষাঙ্গী-সঙ্গীত হিম্মী থেকে এত ভাঙা হয়েছে যে, তার আশোচনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তবে আশায় বক্তব্যের সম্পূর্ণতাপান এবং বর্ষাঙ্গী-সঙ্গীতরসজ্ঞের কৌতুহল নিবারণার্থে পত্রিণিতে তাঁর হিম্মী থেকে ভাঙা গানের একটি স্বতন্ত্র তালিকা বহুতর সংগ্রহ করতে গেলেছি সংযোজন করে দেওয়া গেল; যার যেমন মনে পড়ে, যদি এই জাতীয় হিম্মী গানের আরও নাম ও কথা বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ বা আমাদের কাছে পাঠিয়ে সেন, তাহলে তালিকাটি ক্রমশঃ সুসম্পূর্ণ হবার আশা করা যায়।—হিম্মী গানের প্রথম লাইন মাত্র বিশেষ, অঙ্গলঙ্গি-স্বর শৌর্যার্থে তার উৎপত্তিস্থানও বহুদূর নির্দেশ করে দেওয়া হল। সুবে তালে

উচয়বিধ গান শোনবার সৌভাগ্য হইবে, তাঁরা দেখিবেন যে এর মধ্যেও তিনি যৌলিকতা দেখিয়েছেন।

২

আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবর বাংলা ভাষা থেকে জাঃ গান। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বাউল গানই বেশির ভাগ চেয়েছেন। কিন্তু আমি একটিমাত্র— বাঃলায় থাকে বলে রূপসংগীত— আমি, যা তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শলাভ করবার সৌভাগ্য পেয়েছে। এটির সঙ্গেও আমার ছেলেবেলাকার স্মৃতি জড়িত, কারণ এটি বোধহয় আমার বাইরের লোকের কাছে দেখা প্রথম গান। সে বাঃলাী ভহলোকটির নাম পূর্বক তুলে দেখি, কিন্তু এই গানের মধ্যে তাঁর অনাবী স্মৃতি রয়ে গেছে। নীচে সেটির উল্লেখ করছি—

মূল । চাঁচর চিকুর আধো

ভাঃ । বেখেছ প্রেনেব পাশে

এ গানটির কথা ও হৃদের বাঁধুনি ভালো। আর-একটি লক্ষ্য করবার বিবর এই যে এর মধ্যেও তিনি নিজের দেখিয়েছেন, অর্থাৎ দুই ভাগের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছেন— যা মূল হইবে ছিল না।

বাংলা গানের হৃদের সম্পর্কে এখানে রামপ্রসাদী হৃদের উল্লেখ না ক'রে আমি থাকতে পারছি নে। এই একটিমাত্র হৃদ-রচনাতেই এমন ঐক্য, ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে তখনদেই পারছি নে। এই একটিমাত্র হৃদ-রচনাতেই এমন ঐক্য, ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে তখনদেই পারছি নে। এই একটিমাত্র হৃদ-রচনাতেই এমন ঐক্য, ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে তখনদেই পারছি নে। এই একটিমাত্র হৃদ-রচনাতেই এমন ঐক্য, ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে তখনদেই পারছি নে।

বাউল হৃদের চর্চা, ও বলতে গেলে তাকে জাঃ তুলে নেওয়া, রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অঙ্গ, তা আগেই বলেছি। এ স্থলে তাঁর কণ্ঠকটি বিখ্যাত বাউল-ভাঃ সংগীতের উল্লেখ ক'রে এ পর্যন্ত শেষ করব—

মূল । হবিনায়ে দিহে জনত যাতালে

ভাঃ । হকি তোব ডাক শুনে কেউ

মূল । আমি কোথায় পাব তারে

ভাঃ । আমার সোনার বাংলা

মূল । মন-মাস্তি সামাল সামাল

ভাঃ । এবার তোমার মন পাও

আমি এই বলে আরম্ভ করেছিলাম যে, পরের কথাই নিম্নের স্থব সেবার পূর্ণাঙ্গ ববীন্দ্রসংগীতে বিরল হলেও, একেবারে হুস্পাশ্য নয়।

বস্তুতঃ আমি, বিভাগটির “এ ভরা বাসর” এবং গোবিন্দদাসের “স্থানি বাসে” এই দুটি ব্রজভাষ্য গানেই কেবল তিনি স্থব দিয়েছেন।

অবশ্য সংস্কৃত বেনগানে এবং পালি বৌদ্ধমতে স্থব সেওয়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বেনগানের মধ্যে “বসেখি প্রসূরব্রিৎ” “ব আত্মনা বলমা” “শৃণু বিবে” “তবীন্দ্রবাণ্য” এই চারটিই এখন প্রচলিত। কিন্তু “এবার প্রদাসনে গাদি”, “বীরাব্রজ মহিরা” এই দুটিতেও স্থব দিয়েছিলেন আমি; ব্রজসংগীতে এর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু আমিই গোপ্যভবের উদ্বর্তনের কোন নিয়মাহুদ্যে এর স্থবগুলি একেবারে বিশ্বস্তির অন্তর্গত গুলিয়ে গেছে। কেউ যদি সেখান থেকে উদ্ধার করে দিতে পারেন ত বড়ই বাঞ্ছিত হবে।

পালি স্নোকগুলি ঐশ্যাসিধের যোষের ‘ববীন্দ্রসংগীত’ পুথকে এবং স্থবগুলিও তাঁর কাছে পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি ঐনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে (“ববীন্দ্রসংগীত-মিত্রাসা”, গীতবিত্তান বার্ষিকী, ১৩১০) বেশপূন, ববীন্দ্রনাথের পরের কথাই স্থব সেবার আরও কয়েকটি উদাহরণ আছে, যথা—

“মিলে সবে ভারত সন্ধান”, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর*

“বৃকসে নাহি নারী কি চার”, অক্ষয়কুমার বড়াল

“গান জুড়েনে গ্রীষ্মকালে”, সুহৃদায় চার

আর-একটি পরব গানে তিনি আংশিক ভাবে স্থব বসিয়েছেন, যেটি একাই এক-শ’; সেটি হচ্ছে বক্তৃতাশ্রবণ বনামগজ সর্বজনবাস্ত “বন্দে মাতরম্” গান। সেইটি গাইয়ে আমি আজকের আসের ভঙ্গ করব। শু্যু তাই নয়, আপনাদের সেই স্থব ধরিয়ে দেব যার রেশ কানের তিতর দিয়ে নগমে নিয়ে আপনারা কয়েক বটায় মগোই সেই মহীতান ময় উচ্চারণ করতে লম্বা হবেন, তাঁর বলে স্বাবীনতার দিঃস্থায় অনায়াসে উন্মাদিত হয়ে যাবে। এখনো বেন বিশ্বাস হয় না যে আমাদের সেই স্বতন্ত্রতা ব্যতীতই পরিবর্তন হতে চলেছে, সেই স্বতন্ত্রতা সন্নিহিত হয়েছে। কিন্তু যদি হয়ে থাকে তো এই গান তা’তে অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছে, সে বিবরণে সন্দেহ নেই।†

১০ই আগস্ট ১৩১১

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

* প্রবন্ধলেখক ‘নতবাণী’ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এটির দূর ববীন্দ্রনাথের মেরা কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। এ বিবরণ ঐশ্যাসিধের যোষ ‘জ্যোতির্বিজ্ঞান’ের ‘জীবনকৃতি’ (১০৭০) পৃষ্ঠা থেকে এই কথা প্রায় প্রতি আমার পুষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

“সত্যেন্দ্রনাথের পাও ভারতের দ্বার ... কিন্তু সেলায় দরবে বিহীন এই গানটিতে একটা চলিত বাধার দ্বয় দশাষ্টা বিভাজিত— সে দ্বয়ে বেন প্রথম মোঃ ছিল না। পরে শ্রীঃ দ্যাদ্যাদ্য দ্বিতীয়ের কর্তৃপক্ষ গানটির বেন একটা সোয়ান দ্বয় বিমলিসেব, সেই দ্বয়েই ইহা এবং ঐত দ্বয়।”—পৃ ১০১

† পারিষদিকভাবে ববীন্দ্রনাথের পরমোক্তাংশ-বার্ষিকী উপলক্ষে অগ্রদূত ববীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সাহায্য।

ଅବସିଷ୍ଟେ ॥ ଦିବ୍ୟତାତ୍ତା ବ୍ୟୋମ୍ବସନ୍ନୀତେର ତାଳିକା

এই ভাষিকা গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর ব্যাখ্যাগাথ্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রবক্তা ব্যাখ্যাগাথ্য, শ্রীকৃষ্ণ মনোমত ব্যাখ্যাগাথ্য, শ্রীমদ্বৈকান্তদেবতার দ্বিতীয় ও শ্রীমদ্বৈকান্তদেবতার যোগ আখ্যায়িক প্রভৃতি সহায়তা করে কৃতজ্ঞতাপাণে আবৃত রয়েছে। শ্রীমদ্বৈকান্তদেবতার দ্বিতীয় কায় (যেও) সহযোগিতা দেয়।

ধারা	ধারা	ধারা	ধারা
১। অল্পবেল আগিছ	কোন যোগ্যি ভগো	বেহাগ, কাঁপতাল	ইন্দিয়া †
২। অন্ততের সাগরে	মৈ তো না জাঁউ	কাবোশ, ধামার	সদীতমতী
৩। অল্পভরা বেরনা	তনমননন ত্ব পতবাবে		
৪। অদীম আকালে অগণ্য	সকল স্তপ প্রকাশ	মাকেকদারা, চৌতাল	গীতসুন্দার(২)
৫। অদীম কালনাগরে	সারনা বিভ্রামেরী	ভৈরবী, কাঁপতাল	সদীতমপ্রকাশিকা
৬। অহো! আশ্চর্য্য একি	দারা ত্রিমু তানা না	বেহাগ, জিতাল	
৭। আইল আশি প্রাণসখা	খোল অব খুঁমট পট	কেনারা, আড়াঠেকা	
৮। আঁখিভল মুছাইলে	খিন হুঁয়ো ঘোরে	মাকেকলি, জিতাল	ইন্দিয়া
৯। আছ অল্পরে তির্যিনি	কৈলে অব খরো বীর	কাফি, চৌতাল	
১০। আছ ব্রি আইল প্রিয়তম	ফুল বহি কলির্না মধুন	সাহানা, জিতাল	গীতসুন্দার(২)
১১। আশি এ আনন্দ সন্ধ্যা	বহর বজাও বংশী	পুঁহরী, তেওরা	গীতপ্রবেশিকা
১২। আশি কমলমুহূদল	মনকী কমলদল	মিলবাহার, জিতাল	সদীতমপ্রকাশিকা
১৩। আশি বহিছে বসন্ত পবন	আছ বহত ব্রগছ পবন	বাহার, তেওরা	সদীতমতী
১৪। আশি যব জীবনে নাহিছে	অব ঘোরি পাখোলা বাজেছ	আড়ানা, জিতাল	সদীতমতী
১৫। আশি যব মন চাহে	ফুলি বন বন ঘোর	বাহার, চৌতাল	সদীতমতী
১৬। আশি ঘোর ধারে	হো হো ঘোরে দার	বেশ, শকমদওয়ারি	ইন্দিয়া
১৭। আশি হেরি সংসার অন্ততমর	এরি শরমেবর	বেলাবরী, চৌতাল	-
১৮। আনন্দধারা বহিছে কুবনে	লাগি ঘোরে ব্রমক	মালকোশ, জিতাল	ইন্দিয়া
১৯। আনন্দ বহেছে আশি	আছ রচো কবতার	হাখীর, চৌতাল	সদীতমজিকা(২)
২০। আমারে কর জীবন ধান	ইছা অগ কুট	পতরা, চৌতাল	সদীতমজিকা(২)
২১। আশি দীন অতি দীন		মাকেকলি, কাঁপতাল	
২২। একি এ ব্রমব শোভা	বাহু রে মমর বাহু	ইমনকুশালি, জিতাল	কঠোমুদী
২৩। একি হরব হেরি কাননে	মনকী কমলদল বোলির্না	বাহার, জিতাল	সদীতমপ্রকাশিকা
২৪। এত আনন্দধারা উঠিল	আছ ব্রমবে	বাহার, ধামার	সদীতমতী

। এই জালিকার যে যে গানের বিপরীতে 'ইন্ডিয়া' উল্লিখিত হয়েছে, সেসব মূল দ্বিতীয় গানের সম্পূর্ণ কথা ইহুলা ইন্ডিয়া স্টেডোফোরাবো। কারণ পাঠ্যগ বাবে ।— সম্পাদক, বিজ্ঞানভবী পত্রিকা

এ পরবাসে যবে কে যায়	ও বিজ্ঞা বেজবু ওয়ালে	সিদ্ধ, মধ্যমান	
এ ভায়তে বাধ	এ বতির্ঘা ঘোষা	হুইট, চৌতাল	সদীতচক্রিক(২)
এ মোহ আধরণ খুলে দাও	খুইট পট খোলি	ইমন, আড়াঠেকা	সদীত প্রকাশিকা
এই বেলনা সংব মিলে	চতুষ্টয় বস সন	ইমনকলাপ, ত্রিতাল	সদীত মজরী
এই বে হেরি শো মেবী	মন্সকী কমলদল খোলিরা	বাহাব, ত্রিতাল	সদীত প্রকাশিকা
এগ পরভেদ অলম মহিমা	বাজে কনন কনন বাজে	জোনপুরী, ত্রিতাল	
৩১। এসেছে সকলে কত আপে	হুঁন শবন পুহবাই	হাখীর, চৌতাল	সদীতমজরী
৩২। ঐ শোহাইল ত্তিবিব রাতি	ভোমতানা নানা নানা	আলাইয়া, ত্রিতাল	ককৌদুহী
৩৩। ও কেন ভালোবাসা	কোন পরভেদ	সিনু, খেমটা	
৩৪। ওঠ ওঠ যে বিফলে		বিভাস, চৌতাল	
৩৫। ওরে ডাই স্বপ্নন লেপেছে	এবিমা সব বন অম্বা	পরম-বাহাব, ত্রিতাল	আনন্দসদীত*
৩৬। কামনা করি একান্তে	প্রথম কর শিকার	বেশকার, চৌতাল	ঐতহুয়াস(২)
৩৭। কার বাণি নিশিভোরে	ঘোরে কান ভনকবা	গাফারী, ত্রিতাল	আনন্দসদীত*
৩৮। কার মিলন চাও বিবরী	তহু মিলন যে পরবর	ঐরাপ, তেওরা	ককৌদুহী
৩৯। কি করিলি মোহের ছলনে	অবধি ন খোড়ি বহি	জামন, হুঁরি	সদীত প্রকাশিকা*
৪০। কি ভয় অভয় বাঘে	নিভর ভয় নিমাই	শম্বা, স্বাপতাল	ঐতহুয়াস(২)
৪১। কে বসিলে আছি	যে পরিবা তাঁতে	সিদ্ধ, মধ্যমান	সদীতবিজ্ঞান*
৪২। কেননে কিবিদ্যা বাও	বাবরে কি সমসাপ	ভৈরবী, চৌতাল	ইন্দিয়া
৪৩। কে যে ওই ডাকিছে	ভারি ভক বামত	আলাইয়া, বাহাব	সদীতমজরী
৪৪। কোথ য়ে উধাও হল	বোল যে পানিহার	বিজ্ঞামদার, ত্রিতাল	
৪৫। কোথা হতে বাজে	বাজে রহী সখি	হুইট, ত্রিতাল	সদীতমজরী
৪৬। কোলাহল ছাড়িয়ে	কাছ ন কর ঘোণে	দরবারী চৌকি,	
		চিবাতেতাল	
৪৭। বেগার সাখী বিষায়বার	মহাবালা কেবতিয়া	পৌরমদার, চৌতাল	সদীতমজরী
৪৮। গুন ঘন ছাইল	ইন্দ্রকী অসাবরী	হাখীর, চৌতাল	সদীতমজরী
৪৯। গুন ঘন বনে	আলি বি, পরমত	কানাড়া, ত্রিতাল	ইন্দিয়া
৫০। বোরা স্বজনী এ	বাজে কননন বোরে পারেলিয়া	সিদ্ধ, স্বাপতাল	* সদীতমজরী
৫১। চরণধনি গুনি	দুন্দী ধনি গুনি	বেহাগ, ত্রিতাল	
৫২। চরাচর সকলি মিছে মায়া	দায়া ত্রি তানা না		

২ আখি ১০২৫

৩ জা ১০২৬

৪ আখি ১০১১

৫ জা ১০০৪

৫৩।	ভিরিবিল নব মাধুহী	নব ভবন নব বাঘ	নইমরাব, চৌতাল	ঈতদ্বন্দ্বদ্বার(২)
৫৪।	জগতে তুমি রাজা	অচল বিরাজ	কানাকা, চৌতাল	
৫৫।	জর জর প্রাণে নাথ	অব তেবি বাকিবাকি চিত	সিদ্ধুড়া, জিতাল	ইন্দিয়া
৫৬।	জর তব বিচিত্র আনন্দ	জর প্রবল বেগবতী	কুমারবনী সাংঘ, তে ৬৩	সদীতমজরী
৫৭।	জর বাঘবাঘেশ্বর		কুশালী, তালকেশ্বর	
৫৮।	জাগ জাগ যে জাগ	প্রথম পরবর মিশারহি	তিলককামোদ, তে ৩৭	সদীতমজরী
৫৯।	জাগে নাথ জোগতা রাতে	মাছু দক খেলত হোরি	বেহাগ, ধামাং	সদীতমজরী
৬০।	জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল	উচি চিত বন	বিভাগ, চৌতাল	ঈতদ্বন্দ্বদ্বার(২)
৬১।	জাক মোবে আশি	ক্যা কক ন মানেবী সখিরি	পরজ, জিতাল	সদীতপ্রকাশিকা
৬২।	জাকি তোমাবে কাতরে	তু'হি ভজ ভজ যে	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	
৬৩।	জাকিছ কে তুমি	হারে ভক বামন	খাখাং, ধামাং	
৬৪।	জাকে বার বার জাকে	মোহে কৈসে নিকি লাগি	কেনারা, জিতাল	সদীতচন্দ্রিক(২)
৬৫।	জুবি অমৃত পাণ্ডারে		ললিত, চৌতাল	
৬৬।	তব অমল পরল হল	তুয়া চরণ কমল 'পর	আশাবরী, জিতাল	ঈতপ্রবেশিকা
৬৭।	তব প্রেমপ্রদারসে মেতেছি		পরজ, জিতাল	
৬৮।	তবে কি কিরির		বেশটোড়ী, চিনাতেতাল	
৬৯।	তাহার প্রেমে কে জুবে		ঠৈবো, একতাল	
৭০।	তাহাবে আরতি করে	জগজন ধ্যান ধরত	বড়হংসগাংন, চৌতাল	
৭১।	তিমির বিতারকী কাটে	ক্যান্দলে কাটোদি	বেহাগ, জিতাল	ইন্দিয়া
৭২।	তিমিরমর নিবিড় নিশা	প্রবল হল মেঘ	মেঘ, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী
৭৩।	তুমি আপনি জাগাও মোরে	জাগো মোহন প্যাংবে	ঠৈবো, জিতাল	
৭৪।	তুমি জাগিছ কে	তুম নমন বে	গোড়, চৌতাল	ঈতদ্বন্দ্বদ্বার(২)
৭৫।	তোমা লাগি নাথ	তুম বিন রহো	পূর্ববী, চৌতাল	কঠকৌদুর্দী
৭৬।	তোমার বেধা গাব বলে	কর কলনগুহা	মন্ডাব, জিতাল	আনন্দগদীত*
৭৭।	তোমারি ইচ্ছা হটক পূর্ণ	মেয়ে গিরিধর গোপাল	ভৈবরী, একতাল	
৭৮।	তোমারি পেছে পালিছ	আম ভ্রাম মোহলিমে	খাখাং, একতাল	ঈতগদিত
৭৯।	তোমারি মধুর রূপে	ভেবো হি নমনবাণ	বিশিট, চৌতাল	কঠকৌদুর্দী
৮০।	তোমার বড়নে মাগিব হে		মেনখাখাম, ঝাঁপতাল	
৮১।	দাগ হে হৃদয় ভরে ৭১৩	প্যালা দুবে ভরি মেয়ে	হামকেনি, জিতাল	সদীতমজরী
৮২।	ধাড়াও মন অনন্ত ত্রাণও	এহি অব আনন্দ	ভীমগলাই, হৃদকাক সদীতচন্দ্রিক(১)	
৮৩।	দিন যায় বে দিন		শিলু, মধ্যমান	

১৪। দুখ দুখ করিলে	বাজত বীণ	হামকেলী, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী
১৫। দুহায়ে বলে আছি প্রভু	মৈত্রেয় ন জাঁউ	কামোদ, ধামার	
১৬। বেথা বধি মিলে	শিখা বিন কৈসে	বেদ্যাবলী, ত্রিতাল	
১৭। সেতাবিবেক মহাশেব	শেবন শেব মহাশেব	বেগনিতি, স্ববীকতা	সদীতমজরী(২)
১৮। নব আনন্দে জাগো আছি	অবব থবে বনবীশরী	টোড়ি, ত্রিতাল	
১৯। নব নব পঙ্কবয়সি	মনমথ তন বহে	বাহার, চৌতাল	
২০। নয়ান তালিল জলে	পানিহা বোলেহে	ভাম, একতাল	সদীতমজরী
২১। নাথ হে, প্রেমপথে	বলনা যে চুনবিহা	হুহাকানাকা, ত্রিতাল	সদীতমজরী
২২। নিকটে দেখিব তোমারে	আহু আইল ভোব কি	হামকেলি, ত্রিতাল	
২৩। নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন	আড়ান, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী(২)
২৪। নিশিনি চাহ যে	আহু মনচাবন যোগি আরে	যোগিহা, আড়ানেকা	সদীতমজরী(১)
২৫। নৃতন প্রাণ ধাও	গোতন মধ যাত	নাচারীটোড়ি, ধামার	সদীতমজরী(১)
২৬। পায় এখন কেন অলসিত	রথ দুগত সো গাবে বজাধে	ললিত, হুহাকতা	সদীতমজরী(১)
২৭। শিশানা হাথ নাহি বিটিল	শইয়া জাঁউ-জাঁউ নাহি বোলেদি	ভৈবরী, ত্রিতাল	
২৮। পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ত্রম	কল্যাণ, চৌতাল	
২৯। পেয়েছি অভয়দ	ঈশ্বরী নাম জপ	খট্ট, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী(২)
১০০। পেয়েছি সন্ধান তব		গোড়গাহ, চৌতাল	
১০১। প্রচণ্ড গর্জনে	প্রচণ্ড গর্জন	কুশালী, স্ববীকতাল	সদীতমজরী
১০২। প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদি শিব শক্তি	সোহিনী* স্ববীকতাল	সদীতমজরী(২)
১০৩। প্রথম কারণ আদি কবি	প্রথম মজন করে বৈঠে	জলবেলাবল, চৌতাল	ইন্দিয়া
১০৪। প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদনগর বগারে	ভৈবরী টোড়ি, চৌতাল	সদীতমজরী(১)
১০৫। কিয়ানো না দুখধানি	কহো ন ঐসী যাত	হাবীর, ত্রিতাল	
১০৬। বন্ধু হহো হহো সাধে	সখৈ চলা, বিহা, হাওরে	ভৈবরী, কাকী	
১০৭। যহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ	দুসর যোগ-দুখ ধলনী	নিশাসাগ, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী
১০৮। বাজ্ঞাও তুমি কবি	আরে কতুগতি	বাহার, স্ববীকতাল	সদীতমজরী
১০৯। বাণী তব ধার অনন্ত	বেগী নিরন্তর কুমদ	আড়ান, চৌতাল	সদীতমজরী
১১০। বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত জিতম এ	ভীষণগী, তেওরা	সদীতমজরী
১১১। বিমল আনন্দে জাগ রে	সো নহি মারেবে বোরি রে	পান্ডারী, ত্রিতাল	
১১২। বিশ্ববীণা যবে	নাদবিজ্ঞা পরব্রহ্মদ	শচর্যভণ, তালকেবতা	ইন্দিয়া
১১৩। বীণা বাজ্ঞাও হে	বীণ বাজ্ঞাই রে	পূবী, ধামার	সদীতমজরী
১১৪। ভক্ত হৃদি বিকৃণ	শঙ্কু হব মহেশ	ছাবানট, স্ববীকতাল	সদীতমজরী

* ইন্দিয়াসে সোহিনী হারিনী বলিল উত্তর আছে, কিন্তু উহা বীণক পক্ষ হইবে।

১১৫।	মধুররূপে বিরাখো	কৌনরূপ বনে খো	তিলককানোদ, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী
১১৬।	মন আগো মঙ্গললোকে	আগো মোহন গ্যায়ে	ভৈরোঁ, জিতাল	
১১৭।	মন জানে মনোমোহন	জান সব অগজ্ঞন	নট, চৌতাল	
১১৮।	যশিরে মন কে	হৃদয় লাগি রয়ে	আড়ানা, একতাল	সদীতচন্দ্রিকা(২)
১১৯।	মন অগনে দ্বারী	আজু ব্রজমে পেঁইয়া	বাহার, ধামার	সদীতমজরী
১২০।	মহারাজ এলি সাথে	বেবে চুন্দ বল সাথে	বেহাগ, ঝাঁপতাল	সদীতমজরী
১২১।	মোহে বাবে বাবে কিয়ালে	মোহি নহি লগন লাগি রে	নটমজার, একতাল	সদীতমজরী
১২২।	রাখো রাখো রে জীবনে	জান না মোকি এরি মা	ভ্রাম, জিতাল	সদীতচন্দ্রিকা(২)
১২৩।	রিমু কিম্ব দন দন বে	রিমি কিমি রিমি কিমি	মজার, জিতাল	
১২৪।	শক্তিশ্রুণ দেব তাঁর	শগুহব তিনগ্রাম	ইমন, চৌতাল	সদীতমজরী
১২৫।	শাক্তি কর বরিষণ	শতু হর পদধূপ	তিলককানোদ, হরফাক্ত	সদীতমজরী
১২৬।	শাক্তি সদ্ভূত তুমি	হো নয় হর	চৌতি, চিমাতেতাল	
১২৭।	শীতল ভব পদদ্বারা	বাছুরী মোরী	ইমনকল্যাণ, একতাল	সদীতমজরী
১২৮।	শুভ আসনে বিরাম	কহবেব ত্রিনয়ন	ভৈরো, আড়াচৌতাল	সদীতমজরী
১২৯।	শূভ গ্রাণ কানে		সিদ্ধ, একতাল	
১৩০।	শূভ হাতে ফিবি হে	কমলুয় বরখে	কাতি, হরফাক্তাল	সদীতমজরী
১৩১।	শোন তাঁর হৃদ্যবাণী	ভদ্রদ্বারা ভদ্রবাণী	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	কঠকৌমুদী
১৩২।	স্নাত্ত কেন গুহে পাথ		পূর্ববী, জিতাল	
১৩৩।	সখা সাধিতে সাধাতে	সখি তরসে তরসে	মিষ্ট, খেদুটা	
১৩৪।	সখি আধারে একেলা ঘবে			
১৩৫।	সত্য মঙ্গল প্রেমঘর তুমি	দুট চুর্চন দূর করে দেবী	ইমনকল্যাণ, ভেওরা	সীতহৃদয়া(২)
১৩৬।	সবে আনন্দ করে	হৃদ আনন্দ করে	মেওগিহি-বেলাবলী,	
			আড়াচৌতাল	সীতহৃদয়া(২)
১৩৭।	সবে মিলি পাও রে	সব মিল পাও	দেখখেয়, চৌতাল	সীতহৃদয়া(২)
১৩৮।	সংগে তিমির থাকে	অজ্ঞান ভমনিকরে	দমসিদ্ধ, কাণ্ডালি	কঠকৌমুদী
১৩৯।	সংসারে কোন ভয় নাহি	ভ্রামকো দরশন নাহি	ইমনকল্যাণ, আড়াচৌতাল	সদীতমজরী
১৪০।	সাধাব তোমায়ে হে	তুলিসি গোবারণ	নটকিঙ্গ, ধামার	সীতহৃদয়া(২)
১৪১।	হৃদয়ী নিশিধিন পরায়ী	দারায়ী দারায়ী	নটমজার, জিতাল	সদীতমজরী
১৪২।	হৃদয়াগর তাঁর	আরো কান্ডন বড়ো মান	দারকীকানাড়া, ধামার	সদীতমজরী
১৪৩।	হৃদয় বহে আনন্দ	পদ্য শিব দিনাকী	ইমনকল্যাণ, হরফাক্তাল	সদীতমজরী
১৪৪।	হৃদয় তনি আশি	কোন গাইন আগাও	পদ্যভাব, আড়াচৌকা	কঠকৌমুদী
১৪৫।	হৃদয় যদি ভাঙিলে		দারবেলি, একতাল	
১৪৬।	হৃদয়ী তুমি এল আশ	শাই তো ন মাওরে আশ	বেহাগ, চৌতাল	সীতহৃদয়া(২)

১৪৭।	হায় কে দিবে আর সাধনা	তানানা ত্রে ত্রে	বেশ, ত্রিভাল	
১৪৮।	হিয়া কীশিছে হুখে কি দুখে	সখি কা পত বাক্যে	অয়ময়ন্তী, দামাধ	
১৪৯।	হিয়া দ্বারে পোপনে হেরি যে	শিখা বিশেষ পয়ে	তৈয়ো	
১৫০।	করনন্দনবনে	উকৃত বন্দন নব	ললিতাগোয়ী, স্বপ্নতাল	ইন্দিয়া
১৫১।	করম বাসনা পূর্ণ হল	মিছা বে দ্বাহসে	জি'জি'ট, মধ্যমান	
১৫২।	করম বেয়না বহিরা		সিদ্ধ, তেওরা	
১৫৩।	করমশিখরে, প্রাণাশীশ		বেহাগ, ত্রিভাল	
১৫৪।	হে মন তাঁরে বেশ	এ মনকে ধাঁধ	বেলাবলী, জগৎ	দ্বিতীয়সার(২)
১৫৫।	হে মহাপ্রবল বলী	হে মা প্রবল বলী	মিত্র কানোড়া, জৌতাল	ইন্দিয়া
১৫৬।	হে সখা মন হুয়ে রহ	এ সখি অব কৈলে কক	ছায়াট, একতাল	

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

ঐতিহ্যবাহিনী বংশোদ্ভূত

যে আশ্চর্য্য সাহিত্যিক নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখে। অন্যভাবে বক্তব্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ একান্ত প্রভাভরে 'জীবনমুখি'তে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সেই কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম মাত্র আশ্চর্য্য অরণ্যে রাখে। তাঁহার জীবনের সান্নিধ্য উপকরণ তাঁঁর আদর্শ যেভাবে পাইতেছি, তিনি সত্যিই সাহিত্যগতগ্রাণ ছিলেন— বংশের কাকাল ছিলেন না। ইহার লক্ষণবিশিষ্ট বাংলা কথাচিত্রের অস্তিত্ব প্রেরিত রচয়িত্রী— পরমেশ্বরী চৌধুরী সন্তোষ ও আশ্চর্য্য বিশেষ অবহিত ছিলেন না। এই সাহিত্যিক সম্পত্তি তুমি নিজেরই দানে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, তাঁহারই কালে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সাহিত্যিকের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইয়াছেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কিছু কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া রবীন্দ্রচন্দ্রের পোষ্যে আছে। তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির খবর আমি কেহ বড়-একটা রাখেন না।

বংশ-পরিচয় : শিক্ষা

অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম ১৮৫০ সনে, আশ্চর্য্যের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশে। তাঁহার পিতার নাম— মিহিরচন্দ্র চৌধুরী, সে-বংশের একজন এটর্নী। অক্ষয়চন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ সন্তান; অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন।

অক্ষয়চন্দ্র বিলম্ব বয়স্কিশিক্ষা ছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কৃত্রিমের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব দিতেছি :

ইং ১৮৬২	এন্ট্রান্স	কলিকাতা প্রাক্কলন।
১৮৬৪	এফ. এ.	দ্বিতীয় বিভাগ
১৮৭০	বি. এ.	ঐ
	এফ. এ.	ঐ
১৮৭৫	বি. এল.	দ্বিতীয় বিভাগ
১৮৭৮, ১৫ এপ্রিল	এটর্নী	ঐ

বিবাহ

চোরবাগানের বহু-বংশের শশিকৃষ্ণ বহু অবস্থাবিশিষ্টে ভাগ্যপরীক্ষার ১৮৬৩ সনে প্রবাস-জীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মস্থল ছিল লাহোর। কয়েক বংশের পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সন্ন্যাস এফ. এ. পুরীকোষীর্ণ অক্ষয়চন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যা পরমেশ্বরীর বিবাহ দেন। এই বিবাহ অস্বস্তি হইল— ২২এ ফাল্গুন ১২৭৭ (২২ মার্চ ১৮৭১) তারিখে। অক্ষয়চন্দ্র তখন তরুণ কবি ও মোড়ার্নাংকো ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

১ পরমেশ্বরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐন্দ্রবিজয়লাল বহু আবারে লাহোরিয়াছেন— "আছে কেমন ধারার ভাষায়। ১৮৭১ সালে বিবি। কিসে সমস্ত ধারার যে লেখা আছে তাতে দেখা যায় অক্ষয়চন্দ্রের তখন ২১ বৎসর বয়স, এফ. এ. পাস।"

ঠাকুর-পরিবারের সংস্পর্শে

অক্ষয়চন্দ্র আর বরদ হইতেই (আনুমানিক ১৮৬৪ সনে) জোড়ারশাকো ঠাকুর-পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে জীবন-বৃত্তিতে প্রকাশ :

“জোড়ারশাকো বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি বর্ষপাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। গ্রীষ্মক অযোগ্যমান্য শাক্‌চাঁদী ব্রাহ্মবর্ষে এহু পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হৃদয়ীর্ণ বলা করিয়া বিতম্ব উভারগঙ্গাকারে সম্বন্ধে পাঠ করানো হইত। যেখানে এক সময় গুরুদহানয়ের পাঠশালা বসিত, হুগাঁপুলা হইত, সেই পূজার শালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মূৰ্ছিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালার কতকগুলি বাহিরেই ছেলেও পড়িতেন আসিত। তন্মধ্যে গ্রীষ্মক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার দৃষ্টি পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষর ছিল।

“ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাড়ীর লোকসেই ‘Poet’ ‘Poet’ বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুনাইতেন। একটু ঠাক পাইলেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে সেথিত আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে যেথা হইলে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আহার নিদ্রা স্থলিমা ঘাইতেন।”—‘জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে জীবন-বৃত্তি’, পৃ. ৫০

১৮৬৬, ১১ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তি দিন বেঙ্গগাছিয়ায় আশুতোষ দেবের উদ্যানে চৈত্রমেদার (পরে, হিন্দুদেয়া) দ্বিতীয় অধিবেশনে জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে “উদ্যোখন” নামে এবং অক্ষয়চন্দ্র “ভারত” নামে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। কবিতা দুইটি দেলার কার্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাই বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে ও অক্ষয়চন্দ্র— উভয় বন্ধুতে মিলিয়া অবাধে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চা করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র ইয়া তবলা বাজাইতে ভালবাসিতেন; অনেক সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে বেলা বাজাইতেন, তিনি তবলায় লব্ধ করিতেন।

১৮৭৫ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে ‘সর্বোজিনী বা চিত্তোর আক্রমণ নাটকে’র জন্য ববীজ্ঞানার্থে “জন্ম জন্ম চিতা! দিগুণ, দিগুণ” গানখানি রচনা করিয়া দিয়া কৃত্তিষের পরিচয় দিয়াছিলেন :

“সর্বোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই আমরা যথিকে প্রদোশন দিয়া আমাদের সহ-শ্রেষ্ঠে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় (চৌধুরী), বনি ও আমি। পরে জানকী বিলাত দাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কর্ণহুয়ারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্যচর্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীতগণ পাইলাম।” পৃ. ১৫১

‘ভারত’র সম্পাদকীয় চত্রে

বিবাহের পর অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শব্দহুয়ারী পিতার সহিত আবার সাহায্য চলিয়া গিয়াছিলেন। বছর-পাঁচেক পরে তিনি কলিকাতায় স্থায়ী কাছ আসেন; অক্ষয়চন্দ্র তখন মানিকতলা

শ্রীতে একটি ক্ষুদ্র বাণীতে অবস্থান করেন। এই সময়ে 'ভারতী' প্রকাশের জরুরী-কল্পনা চলিতেছে। ১২৮০ সালের প্রাৰণ (১৮৭৭, জুলাই) মাসে 'ভারতী'র উদয় হয়। ইহার ত্রিবিহাপনার মূলে ছিলেন—জ্যোতিবিশ্বনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্রের পটী শব্দকুমারীও 'ভারতী'র সম্পাদক-মণ্ডলীতে একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। "ভারতীর ভিত্তি" গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :

"আমি পঞ্চাব হইতে আসিয়া গুজিলান যে একখানি দাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছে। একটি হৃদয়ে রক্তের বাস হইল 'ভারতী'র জাগরণ।...সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর জাগরণ শইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'ঐহাংকে' [অক্ষয়চন্দ্রকে] শইয়া বিহারিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে হাইতেম এবং সেখানে হইতে জোড়ালীকো কিরিয়া হাইতেম। কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ঐমানকীবাবুর বাসভাগানস্থ বাড়ীতে হাইতাম—সেখানে ন-বোঠাহুদাও, নতুন বো [জ্যোতিবিশ্বনাথের পটী], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। ঐমতী শব্দকুমারী বোবী তখন শেখশিয়ার পাঠ করিতেন। ...মকলে মিলিত হইলে ভারতীর ক্ষত্র রচিত নতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনাতে বাড়ী কিরিতে রাত্রি ১০:১১টা বাজিয়া হাইত।...

"পূজনীয় ঐহুত্র বিশ্বেজ্ঞনাথ ঠাহুর মহাশয় হইলেন ভারতীর সম্পাদক। প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও 'ঐহাং' রচনা কিছু না কিছু প্রকাশিত হইতই।...ভারতীর বোহারকের অভাব কখনও হইত না; বাহিরের প্রবন্ধাদি বহু একটা আবস্তক হইত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে, অহুহভাবশত: ঐহুত্র জ্যোতিবাবু সত্রীক বীর্ধকালের ক্ষত্র ঠানাবে জলবারা করিলেন, তখন 'ভারতী' পত্রিচালনার সম্পূর্ণ ভার 'ঐহাং' উপর দ্রুত হইল। অনেক সময় বেখিয়াছি প্রবন্ধের ক্ষত্র গ্রেসের লোক বসিয়া বহিরাছে, 'তিনি' তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে 'ঐহাং' কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ ও দ্রুত রচনা বোধ হয় ভারতীর ক্ষত্রই প্রথম রচিত হইয়াছিল।" ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' কাতিক-মাস ১৩২১)

অক্ষয়চন্দ্র 'ভারতী'র সহিত ক্ষিত্রণ খনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, জ্যোতিবিশ্বনাথের নিয়োজিত উক্তি হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যায় :

"প্রথম বর্ষের 'ভারতী'তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল।...মক্ষর তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং জম্ম-ভাবের শৃঙ্খল বিস্তরণ করিয়া এক-একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অতিমানে কি প্রভেদ?" ইত্যাদি। লোকের এ সব তখন খুবই ভাল লাগিত।" 'জ্যোতিবিশ্বনাথের জীবন-স্মৃতি, পৃ. ১৪২

অক্ষয়চন্দ্রের একটা বিশেষত্ব—তিনি মোটেই নামের বা শব্দের কাঞ্চাল ছিলেন না, সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই ঐহাংকে পাইয়া বলে নাই। এই ক্ষত্র বেখি 'ভারতী'র ('সাবনা'রও বটে) পৃষ্ঠায় স্মৃতিত ঐহাং অবিকারণ রচনাই স্বাক্ষরবিহীন; আধিকার দিনে সেগুলি চিনিয়া লওয়া ক্ষত্রটন।

সঙ্গীতরচনা

অক্ষরচত্র সঙ্গীত রচনাতেও হুশ্ট ছিলেন। জ্যোতিষিন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-কৃতিতে বাহা বর্ণিতাছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

“এই সময়ে আমি শিয়ানো বাম্বাইয়া নানাবিধ সুব-রচনা করিতাম। আমার দুই পাৰ্শ্বে অক্ষরচত্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেশিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুব-রচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই সুবের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বলিয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুব তৈরি হইবা মাত্র, সেটি আরও কয়েক বার বাম্বাইয়া ইহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষরচত্র চক্ষু মুদ্রিয়া বক্স শিগাৰ টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক দ্বারা অল্পস্বভাবে সুবপ্রবাহ বহিত, তখন বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহজ্ঞানপূত হইয়া চুকটের চুকবাটি, সমুদ্রে বাহা পাইতেন এমন কি শিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া মিমা হাক ছাড়িয়া, “হয়েছে হয়েছে” বলিতে বলিতে বলিতে আনন্দস্বীর্ণ মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। যদি কিছু বরাবর শাস্ত-ভাবেই তাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাকল্য কটিন লক্ষিত হইত। অক্ষরের বস্তু শ্রী হইত, বস্তু রচনা তত শ্রী হইত না।...বর্ষহুয়ারীও অনেক সময় আমার রচিত সুবের গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমারে তেমনা মহলের আবহাওয়া তখন শিবাবাণি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।...”

“এক দিন জ্যোতিষাবুঝা করেক জন বন্ধুবান্ধব সহ স্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ বড় জল তুলান আরম্ভ হইয়া সমস্ত সঙ্গীতাবধানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাযের কিছু সেহিকে ক্রোধও ছিল না। জ্যোতিষাবু সুব-রচনা করিতেছিলেন, ও অক্ষরবাবু ক্রমাগত তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান রাখিয়া যাইতেছিলেন। ইহাযা গানবান্ধব একেবারে বাহজ্ঞানপূত হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, ‘পরে ‘মানতক’ নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ‘মানতক’ প্রথম জোড়ালোকো বাজীতে অভিনীত হয়।” ‘জ্যোতিষিন্দ্র-নাথের জীবন-কৃতি,’ পৃ. ১৪৫-৪৬

এই গীতিনাট্যখানি ‘মানতক’ নামে—‘মানদরী,’ ১৮০২ নকে (-ইং ১৮৮০) প্রকাশিত হয়। ইহার অবিকাল গানই অক্ষরচত্রের রচিত।

অক্ষরচত্র “সৌভিক প্রেমায়ি বিশ্বক” গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রেমীর তেরটি গান ১৮০৪ সালে (ইং ১৮৮১) প্রকাশিত জ্যোতিষিন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ‘স্বপ্ননিপ-পীতি-মাসা’র আছে; ইহার দুইটি আমার ‘জ্যোতিষিন্দ্রনাথের জীবন-কৃতি’তেও (পৃ. ১৪৫) স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গীতিনাট্যেও অক্ষরচত্রের রচিত গান বিশিষ্ট আছে। তিনি ‘জীবন-কৃতি’তে লিখিয়াছেন—“স্বাভাবিক-প্রতিভার [বা ১২২২] অক্ষরবাবু কয়েকটি গান আছে।” ইহার একটি “বাগদাস পদ্যমূলে প্রথমি গো ভবদারা।” তাঁহার ‘দারার খেলা’ গীতিনাট্যে “যে গো, সখি, যে, পরাইয়ে পদে” গানটিও অক্ষরচত্রের রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।

রচনাবলী

অক্ষয়চন্দ্র দ্বারা তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুইখানিতে তাঁহার নামই ছিল না। এগুলির প্রকাশকাল সহ তালিকা :

১। উদাসিনী (গীতিকাব্য) : সংখ্য ১২০০ (২-২-১৮৭৪)। পৃ. ১০৮।

২। সাগর-সঙ্কমে (গাথা) : শকাব্দা ১৮০০ (২০-৮-১৮৮১)। পৃ. ৬৬।

১২৮৪, অগ্রহায়ণ-মাস সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে।

৩। ভারত-গাথা : ২৪ মাস ১০০১ (৮-২-১৮৯৫)। পৃ. ৭৮।

পৃষ্ঠা : (প্রথম প্তবক)—আর্য্যপূর্ব, আর্য্যবিহব-পূর্ব, বৌদ্ধপূর্ব, পাঠানপূর্ব, মোগলপূর্ব, বঙ্গপূর্ব, দার্বাট্টা পূর্ব, ঈশ-পূর্ব, মহীপূর্ব-পূর্ব।

(দ্বিতীয় প্তবক)—ইংরাজ পূর্ব—বিদেশী বণিক, ইষ্ট-ইন্ড কোম্পানী, কর্ণাট বৃদ্ধ, ইংরাজ শাসন-পূর্ব, ক্রাইস্ট হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত, কল্লনা-চিত্র, শিগাহী-বিশোহ, উপসংহার।*

আমরা মালিকগণের পুষ্ঠায় অক্ষয়চন্দ্রের ব্যাকবিত এই কয়টি কবিতার সন্ধান পাইয়াছি : (ক) মাঘবদ্যলতী : 'জ্ঞানাত্ম' পৌষ ১২৮২। (খ) অভিমামিনী মিত'বিনী : 'ভারতী' অগ্রহায়ণ, ১২৮২ (ইহা ১৮৮০ সনে প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীতে' "নির্ব্বোধের যন্ত্র-ভঙ্গ" কবিতার সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। (গ) 'অক্ষয়'—পাঠে : 'ভারতী ও বালক' আশ্বিন ১২৯৪। (ঘ) প্রকৃতি-মন্দিরে : ঐ আষাঢ় ১২৯৮। (ঙ) জ্ঞানিন : সাধনা, পৌষ ১২৯২। (চ) প্তব-গান : ঐ আশ্বিন-কান্তিক ১৩০১। (ছ) বন্ধু-বিরোধ : 'ভারতী' বৈশাখ ১৩০২। (জ) ভারত : ঐ চৈত্র ১৩১০ (ইহা ১৮৬৮ সনে অমুদ্রিত চৈত্রমেলার দ্বিতীয় সাপ্তাহিক বিবরণ হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

রচনার নিদর্শন

অক্ষয়চন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলি বর্তমানে দুস্ত্রাপ্য। শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীকান্ত দাসের এছাণ্ডাবে এগুলি সবই বক্ষিত আছে। রচনার নিদর্শন-সংগ্রহ এগুলির কোন কোন স্থল নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :

‘উদাসিনী’

৪৪ সর্গ : পৃ. ১০-১১

যে ভেলা নির্ভর ক'রে, দুস্তর ভব সাগরে, চারি দিক পুস্তাকার, ধূ ধূ করে পাড়াবায়,
অনি গো বিবেচি শাঁড়ায়। হতাশে হতাশ গ্রাণ ঘন।
সহ্যা ভাসাবে বলে, অতল অলুপি-তলে, ভরষর বেগ ধরি, কল্লনা শরুতা করি,
মর হ'ল অদূর্বে আবার। বিতীথিকা কবে প্রবর্ধন।

* ২ শ্রীঅম্বিকুল বহু কানাইদাসেন, "অক্ষয়চন্দ্রের আশ্রম একটী ঘোট কাব্য ভাণ্ডা হব, বন্ধুত্ববন্ধের বিতরণের হতে।
ভায় যে কি দাব ছিল, আর কোন্ বহুর আদি ভাঙ্গলভাঙ্গ মোগে হাশে, কিছুই বলে বেই, ওহু মনে আছে তার এখন লাইনটু—
'ভাণ্ডার ভাণ্ডার দুটোই চির'।"

কোন দিকে নাহি স্থল, গর্জয়ে গভীর জল,
অর্ন্তনাম শূন্তেতে মিশায় ।
আভয়েতে অছকণ, সন্মানে শিহরে মন,
ভাবনার ছিন্ন ভিন্ন প্রায় ।

‘সাপের-সঙ্গদে’

১ম পর্ব : পৃ. ৯-৭

নেহারে দুঃখ দামিনীর পানে,
দামনবরীয়া ভঙ্গী বালা,
খিঁচিয়াব শব্দ, পড়িয়াছে খনি,
আখো-কোটো ভগ্নে সাগর আলো ।

হেথায় হোথায়, সাগরের বাহ,
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভায়েতে গলিয়ে, পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন ছুটি ।

আ-নাভী মগন সাগর সলিলে,
কোণিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়,
ঢল ঢল ঢল, জলধি কবল,
টল মল করে প্রোভের বাহ !

সরলতা সনে বাবুদী মিনায়ে,
চাকতার তুলি ধরিয়ে করে,
সকল সখি মরি তুলি ছুটি বেন,
এঁকে কে ঘিরেছে নয়ন পরে !

পলকে পলকে বিজলী বলকে,
অথবা যবুর হাসির ছটা,
ভগ্নের সাগরে অগ্নিতে চেউ,
লহরী লহরী তুলিছে বটা ।

লহরী লীলায়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে বায়
উজল রশ্মির উজল ছায়া,
কবিত্ত তরঙ্গ হিম্ম-বরণ
হ’য়েছে প্রাণ সাগর কাহা !

হ’য়েছে প্রত্যাহত,—বৃহল পবন
সাগরের সনে করিছে বেলা,
পথে ঘাটে আর নাহিক আশ্রয়,
আলোকিত এবে সাগর-বেলা ।

ভাষা ভাষা বাঁধা চিকন-মেঘেতে
পূরব আকাশ হ’য়েছে লাল,
গগনে উড়িছে সাগর-কণোত,
বেলায় বেলায় হৃদয় পাল ।

হেথায় হোথায় বাঁধা ছিল তবী.

পাল তুলে গাছা ছাড়িল সব,
যাবিরা ধরিল হুঁসে সাতী-পান,
বাতাসে উৎসে সেই সে সব ।

‘ভারত-পাখা’

৭. ১৪

কিছু কাল আধ্যাত্ম আছে পাতিম্ব,
 নবী দিবা রক্ত-পাখা আর নাহি বধ।
 নিচে গেছে বৎসপ্তি, ঘুচে গেছে জ্ঞান,
 বৎসপ্তিতে করে কৃতি হুঁশে চায়বাস।
 বাজারে বাণেশ বস্ত্র প্রচুর রাখাল
 চরায় কক্ষরে নাটে গো-মহি-পাল।
 বাক্যে বাসে হিন্দুদের পার্শ্বের ঘুম—
 ঘিনে নাহি কর্ণকাষ, রায়ে নাহি ঘুম
 দেবালয়ে শাণ্ড-কটা বাজে অনিবার,
 গঙ্গা-বন্দনার ঘাটে দাত্তের বিচার।

অগ্নি আছে নিম্ন কোবে, ঘরে কোলে ঢাল,
 নিম্নিয়ে রাজস্ব করে আধ্যাত্মীপাল।
 কয়ে কয়ে ছিল বটে সময়-উৎপাত,
 তা কিন্তু কদিক মাত্র, নহে মর্যাদাত,
 কত দিন খেয়েছিল ভটিকার বেগ—
 সহসা পশ্চিম-কোণে বেধা মিল মেঘ!
 কহ গো, ভারতলক্ষি! লুকাব কোষায়,
 আর তো এ আধ্যাত্মে লাকা হ’ল দায়।
 অমৈত্যা আধ্যাত্মা এবে, কেবা লয় স্তম্ভিকি,
 দিক্‌দ্বীর ‘মাদুন’ ভই মারিতেছে উকি।

সূত্র

যাত্র তিন দিনের অস্থখে অক্ষয়চন্দ্রের সূত্র হয়। তাঁহার সূত্র-তারিখ— ২০এ ভাদ্র ১৩০৪
(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)।

উপসংহার

ববীন্দ্রনাথ ‘জীবনবৃত্তি’তে তাঁহার “বাল্যবয়সের সাহিত্য-নীতিমাত্রা” অক্ষয়চন্দ্র সখকে রে
 প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :

“বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মত একজন অক্ষয়চন্দ্র ব্রহ্ম সৃষ্টিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র
 চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিষাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সে সাহিত্যে
 তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অস্থখ্য ছিল। অপর দিকে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবশব্দকর্তা, কবিকঙ্কণ,
 রামপ্রসাদ, ভাষ্যচন্দ্র, দক্ষাচন্দ্র, রামবদ্র, নিধুমান, শ্রীধর কবচ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অস্থখ্যের সীমা
 ছিল না। বাংলা কত উর্দু গানই তাঁহার মুখ ছিল। সে-গান ঘরে বেহুয়ে যেমন করিয়া পাবেন,
 একবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া বাইতেন। সে-সখের স্রোতাধা আগতি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অস্থর
 থাকিত। লক্ষ লক্ষ ভাল বাজাইবার সখকেও অস্থবে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না।
 টেবিল ইউক, বই ইউক, বৈধ অবৈধ বাহা কিছু হাতেও কাছে পাইতেন, তাহাকে অস্থত্র টপাটপ লক্ষে
 অনিত করিয়া আসর-পরিষ করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার নক্তি ইহার অসমাপ্ত উপায়
 ছিল। প্রাণ গুরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইহার কোনো বাধা ছিল না এবং ঘন খুলিয়া গুণগান করিবার
 বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে আনিতেন না। গান এবং বগকাব্য লিখিতেও ইহার ক্রিয়তা অসমাপ্ত
 ছিল। অস্থচ নির্মের ঐই-লক্ষ রচনা সখকে তাঁহার লেশমাত্র মম্ব ছিল না। কত ছিন্নশয়ে তাঁহার
 কত শেলিলের লেখা ছড়াছড়ি বাইতে, সেখিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সখকে তাঁহার কথতার

যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔষাসীক ছিল। ঔষাসিনী নামে ইহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে [ব্রহ্মা ১২৮১] যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহার অনেক গান লোককে পাহিতে গুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

"সাহিত্যতোষণের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেষ্টা অনেক বেশি দুল্লভ। অক্ষয়বাসুদেব সেই অপরূপ উৎসাহ আশ্রয়ের সাহিত্যব্যবশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

"সাহিত্যে যেমন তাঁর ঔসর্গ বহুদূরেও তেমনি। অপরিচিত সভার তিনি ভাষ্কর-তোলা যাচ্ছেন হতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতবের মধ্যে তিনি বয়স বা বিভাবৃদ্ধির কোনো বাহুবিজ্ঞাপন করিতেন না। বালকদের মনে তিনি বালক ছিলেন। দাম্পত্যের সভা হইতে বখন অনেক দূরে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাহাকে প্রেক্ষিত্য করিয়া আশ্রয়ের ইচ্ছাধরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও যেতিয় তেমনে বিটুমিটে আলোতে আশ্রয়ের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা সমাইয়া তুলিতে তাহার কোনো হুঁচকি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উদ্ধৃতিত ব্যাখ্যা গুনিয়াছি, তাহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজেই লেখা তাহাকে কত গুনাইয়াছি এবং সে-লেখার মধ্যে যদি সাংস্কৃতিক কিছু গুণননা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাহার কাছে কত অপরূপ প্রশংসাপাতি করিয়াছি।"



০ "ইহার সত্য জন্মভূমি সর্বদাই পড়ি। গুনিয়া আলোচনা করিয়া আশ্রয় শুকনকার 'বঙ্গদর্শন' নামে অলঙ্কার ইহার লেখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল।"—প্রমুখিনি

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭



বিষয়সূচী

‘দুরেশবান্ধীর ভাষা’র স্বপ্ন	স্ববীজনাথ চাকুস
গোটে বিশতবাবিধী	
মহানবীখী গোটে	ঐনলিনীকান্ত গুপ্ত
গোটে ও তাঁর বেশকাল	ঐ অন্নদাশঙ্কর রায়
গোটে ও স্ববীজনাথ	ঐ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গোটে ও অবাচীন কালের সাহিত্য	ঐ প্রমথনাথ বসি
কল্যাণ-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান	ঐ ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবণত্বে	
কবিগুরু গোটে	ঐ জীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
লম্বুগুরু। ইমানীং। ইজ্জতিতের পাতা	ঐ কানাই সাবিত্র

চিত্রসূচী

মহাকবি গোটে
স্বর্ণকুমারী দেবী
কামিনী রায়

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিদ্যী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

৭ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়।

বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—

জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, কাতিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও

বৈশাখ-আষাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক

টাকা। বার্ষিক মূল্য (রেজিস্ট্রী ডাকে) ৫৫।।

বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪৫।।

৭ প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাসিক

পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হইত, তাহার

প্রথম, ষষ্ঠ ও একাদশ সংখ্যা পাওয়া যায়

না, বাকি নয় সংখ্যা পাওয়া যায়। এই

নয় সংখ্যা একত্র ২৫।।

৭ তৃতীয় পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষের

সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে। প্রতি সেট

হাতে লইলে ৪২, রেজিস্ট্রী ডাকে ৪৫।।

৭ চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পাওয়া যাইবে। প্রতি সংখ্যা হাতে

লইলে ১২, রেজিস্ট্রী ডাকে ১৫।।

প্রথম বৎসর প্রকাশিত যে সকল রচনা এ বৎসর
অধ্যাক্ষের মৃত্যুর দশ মাস পরে এবং অধ্যাক্ষের
আশ্রম সংস্কারের সম্পূর্ণ জন্য ও চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট
পুস্তিকার জন্য প্রস্তুত।

কর্মাদ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা

৬৩ বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলিকাতা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে বিপথে

গল্পের বই। উপহারোপযোগী সং

মূল্য আড়াই টাকা

আলোর ফুলকি

গল্পের বই। শ্রীমদলাল বনু অঙ্কিত

মলাট ও মুখপাত।

মূল্য দুই টাকা

বাংলার ব্রত

মৃত্যু সংস্করণ। সচিত্র

মূল্য আট আনা

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

মূল্য আট আনা

সহজ চিত্রাঙ্কন

মূল্য এক টাকা

৭ রানী চন্দ্র সহযোগে ৭

জোড়াসাঁকোর ধারে

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

ঘরোয়া

মূল্য আড়াই টাকা

৭ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ভারতশিল্পে মূর্তি

সচিত্র।

মূল্য আট আনা

বিশ্বভারতী

৭ মফস্বল হইতে অত্যন্ত বিখ্যাত।

৭ বিশ্বভারতী কার্যালয়

৬৩ বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলিকাতা ৭

৭ কলিকাতা বিক্রেতাস্থ।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বহিম চাটুজে স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী শিল্পভবন

৬৩ বহিম চাটুজে স্ট্রীট, কলিকাতা



মহাকাবি গ্যোটে
আত্মনৈতিক আটকিত বয়সকাল
১৭৮৬-৮৮

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বিশাখ-জাম্বাঢ় ১৩৫৭

‘মুরোপযাত্রীর ডায়ারি’র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথগুণি

বঙ্গ ১৪ অক্টোবর ১৮২০। Gibra শৌচন পেল। ডবানক দুই হস্তে। Gibraltarএং পাচড় ঘেবে অনেকটা চেখে ফেলেচে। দুটি Sisters of Mercy alms for the poor বলে সকলের কাছে জিৎ চেয়ে চেয়ে বেড়াছিল— আমি তাদের একটি অর্ধ কর্ণমুখা নিমুখ— একটা আশ্চর্যভাবে আমার মুখের বিকে চেয়ে দেখলে— অধিকাংশ ইংরেজসম্মান পাণ্ডুলুনের পকেটে হাত তুলে এমনভাবে গাড়িয়ে হইল যেন ক্রোশ তিনেকের মধ্যে যার কোন জনমানবের স্পর্শ নেই।

(মাহুকের সবলতা দুর্বলতা লম্বা ডাবতে ডাবতে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে উদয় হল। নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ক্রমিকাল অবশি মানবশক্তির চেয়ে অধিকতর পরিণত ও বলিষ্ঠ। মানবশক্তি একান্ত অসহায়। ছাপশক্তির চন্দ্রার আগে পড়তে হয় না— মাহুকে সহস্রবার পড়তে হয়। মাহুকের জীবনের প্রসার সীমার এইমতে আনন্দকাল থেকেই তারা শুরু লম্বা— মাহুকের জীবনের পরিধি বহুবিকীর্ণ, এইমতে সে বহুকাল পর্যন্ত অপরিণত দুর্বল। যে সকল মাহুকের অত্যন্ত অবিচলিত সচ্ছন্দ, প্রসং strong will, তারা কখনো ভয়ে পড়ে না, চিরদিন শক্তভাবে চলে, তাদের জীবনের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য প্রদরতার ব্যাঘাতজনক করিম সীমাবদ্ধতা আছে— তাদের জীবনের পরিণতি অতি নিম্নই বহু হয়ে যায়। Instinct ঠিক লম্বা চলে কিন্তু বুদ্ধি ইতস্ততঃপূর্ণক প্রমের মধ্যে গিয়ে যায়— Instinct লম্বাদের এবং বুদ্ধি মাহুকের— Instinctএর প্রমাণান লামাত্র সীমার মধ্যে— বুদ্ধির শেখলকা এ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়নি। আবহবর্তকের আকর্ষণ অতি সাবধানে আমাদের ছবিখার বাস্তা গিয়ে নিয়ে যায় স্বার্থপরতার মধ্যেই তার সীমা— সৌন্দর্য ও ভালবাসার আকর্ষণ আমাদের সহস্রবার লম্বা ফেলে দেয়, অঙ্গলগনে নিম্ন করে কিন্তু তার সীমা কোথায় কে জানে। অন্যন্তের নিকে যায় বাস্তবিক আকর্ষণ আছে সেই আপনাকে লম্বা লম্বা দুর্বল বলে মাহুতব করে— ক্ষুদ্র সীমা ও সীমার অধবক্ষ্যতার মধ্যে তার জীবনের বাস্তবিক বিলাস, সে বহুটুকু লম্বা লম্বা করে ততটুকু করে ওঠে, বহুটুকু চাখ ততটুকু আদায় করে নেয়। সেই সবল— তার সবলতা সেখে আমবা আপাততঃ হিংসা কবি কিন্তু চিরকীকুনের faceএ একদিন হস্ত তাকে আদায় অবহেলে ছাড়িয়ে যায়। মানবলক্ষ্যন বলে বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা, বহুকাল আদায় পড়ি বহুকাল আমবা তুলি, বহুকাল আমাদের শিখতে যায়— অন্যন্তের সন্ধান বলে

এতকাল ধরে আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পথে পথে আমাদের হুঃখ কষ্ট শতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য— সেই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ— তাতেই আমাদের বলে দিতে এখনো আমাদের বুদ্ধি ও বিকাশের শেষ হয়নি। বৈশ্ববর্ষই যদি মানুষের শেষ হত তা হলে মানুষের মত অপরিসীমতা প্রাপ্তিসংসারে কোথাও পাওয়া যেত না— আমাদের এই অপরিসীমত পুনরাবর্তিত ইহজীবনই যদি আমাদের শেষ হত তাহলেই আমরা একান্ত দুর্বল সন্বেহ নেই। কিন্তু পৈশবের দুর্বলতাই যেমন প্রকাশ করতে তার উন্নততর ভবিষ্যৎ আছে— তেমনি মানুষের এই দুর্বল ইহজীবনই তার ভবিষ্যৎ উন্নততর জীবনের সূচনা।

পৃথিবীর কত পতিত কত অপরানী, পৃথিবীর কত বলিষ্ঠত্বের সাধুর চেয়ে প্রকৃতপক্ষে মহৎ এবং কৃপান কংপোহুত তা চিরজীবনের হিসাবে ক্রমশঃ ব্যক্ত হবে।

Natural Selection-এর নিয়ম মানুষ পর্য্যন্ত এগিয়ে একরকম বদ্ধ হয়ে গেছে— তার শেষ ফল কি ভাল করে বুঝে ওঠা যায় না। দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্য্যপ্রেম অনেক স্থলে আমাদের প্রাকৃতিক জীবনের হানিধনক। শিল্পচর্চার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়— অনেক বড় বড় শিল্পী বিশ্বের হানিধনকষ্ট এবং জীবনের ক্ষতি স্বীকার করে শিল্পচর্চা করেছে— এবং এইরকম করেই অল্পে অল্পে শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে— Natural Selection-এর নিয়মে এর কোন কারণ পাওয়া যায় না। জীবনের ক্ষতির মধ্যে দিয়েই উন্নতি এ কেবল মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষণতে দেখা যায়। বিজ্ঞান সম্মতি মানুষের কাছে লেগেচে কিন্তু তার আরম্ভকালে কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ জ্ঞানসমূহা থেকে ধন বিবিধ পরীক্ষিত হ্রুপ্তি এবং প্রাণপণ স্বীকার করে বহুকাল ধরে মানুষ বিজ্ঞানের চর্চা করে এসেচে তার কারণ কি ? ছুয়ের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মের প্রতি মানবমনের অসীম আকর্ষণ— এমন কি অনেক স্থলে তা জীবনালম্বিকের ও ছাড়িয়ে ওঠে। আমাদের বা প্রকৃত মহত্ত্ব তা এই Natural Selection নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনালম্বিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরা প্রাণ সমর্পণ করে জ্ঞান পেয়েছি ধর্ম পেয়েছি শিল্প রচনা করেছি। সভ্যতার সন্বেহ মানুষের মধ্যে ভালবাসা যে ক্রমে বাড়চে তা অনেক পরিমাণে তার অকারণ হুঃখজনক, এবং তার জীবনরক্ষার বিরোধী— কিন্তু তাই কোন নিম্নাঙ্গনগে আমরা উত্তরোত্তর তাকে এত উচ্চ আসন দিচ্ছি ?

পৃথিবীতে কোন একটা সীমারে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে থেবে থাকবার গো নেই— তাহলেই আবার হুঃ করে শিঁড়িরে পড়তে হয়। আপনাকে কোন এক স্থানে বদ্ধাধ রাখতে হলেও অবিশ্রাম চেষ্টার আবশ্যক। আমরা ভারতবর্ষীয়ে। সেই চেষ্টার বাইরে এসে পড়ে বা পেরেছিলাম তা উত্তরোত্তর হারাচ্ছি। Australia-র Apteryx পাখীর মত আমাদের ডানা ক্রমশঃই সর্পী হুঃ এসেচে— কিন্তু এখনকার জীবনসংগ্রামের মধ্যে পড়ে আবার কি সেই ডানা আমরা ফিরে পাব ? কিংবা আত্মরক্ষার উপযোগী আয় কোন বকম নতুন ইঞ্জির উদ্ভূত হবে।

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞা প্রাচীন সভ্যতা প্রাচীন প্রাণ ধর্মির ভিত্তিকার পাথরে কলসার মত সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে বহুপুণের উত্থাপ এবং আলোক প্রস্ফুর আছে— কিন্তু আমাদের

কাজে তা পোষ অঙ্ককারময় শীতল, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অহংকারের পুণ। অগ্নিনিধি যদি না থাকে তাহলে গবেষণাধারা পূর্ণকালেই যথোপযুক্ত থকবে বতাই প্রাচীন পন্থাপনিত তুলে মান না কেন তা নিতান্ত অকৰ্ণ্য। বরঞ্চ ইরোপীয়েরা তাকে ব্যবহারের যথোপযুক্ত পাবে কারণ তাদের হাতে সেই অগ্নিনিধি আছে—আমরা তাকে নিয়ে কেবল খেলা করব কিন্তু তার বস্তু ব্যবহার করতে পারব না। বর্তমানকালে প্রাচীন আধুনিক নিয়ে আমরা যে একমুখ খেলা আরম্ভ করেছি তাই সেপে আমার মনে এই কথা উদ্ভূত হল। আমরা মনে করছি পুনর্বার মস্তকের পতঙ্গাঙ্গে টিকি প্রচলিত করে এবং হবিভ্যাস খেয়ে আমরা প্রাচীন আধুনিকতা হব। এদিকে ইরোপীয়েরা আমাদের শত্রু থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও শব্দবিজ্ঞান উদ্ধার করতে আমরা যে দায় হয়ে বসে নেবেদ্বীপ টিকি আশ্বালনপূর্বক তাদের পরম দুর্ঘ বলে বিক্রম করছি।

আমি আর একজন সহবাসীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা হল। সে নতুন ভাষ্যবর্ণে আছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজের আচরণ সম্বন্ধে তাকে অনেক কথা বহন। সে বলে English people are very selfish, they can be very nice and all that so long as their self-interest is untouched but—

আমি তিনার টেবিলে একটা মস্ত ছোয়ান মোটা আদুল এবং ফুলো গোকগুলা গোণা তার হৃদয়ী গার্ববস্ত্রীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালায় পন্ন করছিল—হৃদয়ী উল্লেখ করলে—পাখাওয়ালায় পাখা চান্ডেই ঘূমায়—গৌরাক বলে তার উপায় হচ্ছে লাভি কিম্বা গার্লি—এবং তাই নিয়ে উভয়ে মিলে ঘেঁটে চলেতে লাগল। আমার এমন অন্তর্দাহ হচ্ছিল বলতে পারিনে। এদের এমন সভ্যতা যে এদের যেকোনো পর্যায় বহাযাযা নেই। এইরকমভাবে দ্বারা সর্বদা কথা কর তারা যে অন্যায়সে পরম দুঃখের সঙ্গে আমাদের দেশের গরিব দুর্ভিক্ষ বোকারাদের খুন করে কেন্দ্রে তার আর বিভিন্ন কি? আমি তা সেই অপমানিত পরমলিত আত্মের একজন—কোন লক্ষ্যই কোন্মুখে আমি এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে পাই এবং ভ্রমভার বহুবিকার করি! আমার নবপরিচিত বন্ধু আমার গালে বসেছিল তাকে আমি বলছি “আমরা এই ভাবি আত্মতা মনে হয় তোমাদের বেয়েয়ে মনেও হয় নেই?” সে বলে “Our women are quite callous & indifferent where it is fashionable to show pity they perform their part beautifully well—where it is just the other way they show an amazing lack of the so-called womanly quality.” এদিকে সভা করে সম্মিত করে চালা তুলে হাসানারোদেয় সঙ্গে দ্বারা করে থাকেন অথচ উপস্থিতক্ষেে বোঝানে তাঁদের চোখের লামনে একান্ত অসহায় দুর্ভিক্ষের প্রতি সবলোয় উৎসাহিত চলেতে দেখানে দ্বারা উদ্ভেদ নেই এবং তাই নিয়ে এইরকম নিরঙ্ক নিষ্ঠুর বর্ধরভাবে আশ্বালন! ইংরিজি ভাষা আমার ভাষাতাতি আসে না—বিশেষতঃ মন মনে অত্যন্ত দুঃখ হয়।—আমি বলে বলে মনে মনে ইংরিজি বানাতে লাগলুম—A gentleman is a gentleman whatever inconveniences he may have to put up with. And I think it is a gross act of cowardice to hit a fellow who can't return you blow for blow. Yes admittedly we are a weaker people and you are very strong with your brute strength.

—But muscular superiority is not a thing to be particularly proud of. Perhaps you will say "Arn't we your superior in any other respect?" Well, you may be for aught I know but certainly you don't show it when you strike a weak helpless poor man. And for what? Imagine a miserable creature who has been working all day with perhaps only one meal in the early morning, gives up his night's rest for the chance of earning a few more pice, and can you wonder that he should doze off to sleep and couldn't keep himself awake even to save his life? And Pankhapulling is the sovran remedy for insomnia. If ever you are troubled with sleeplessness just take your punkhawalla's place and pull your own punkha.—It will do you more good than any medicine in the world. If the author of Vice Versa could write a story reversing the positions of the punkhapuller and his master it could be made a source of infinite amusement and I hope of instruction to the Anglo-Indian.

You always try to set our social shortcomings against our political aspirations and say, the people who have early marriage is not fit for self-government. We may with greater justice say, people who bully their weaker fellow-beings, who habitually ill-treat their servants who have not the power to retaliate, who indulge in barbarous exercise of brute power whenever they imagine themselves perfectly secure, are not fit to govern any nation. Of course, moral retribution comes very slowly, but surely—it very often has no immediate means of revenge like the cowardly kick that ruptures spleen, but it is all the more thorough and unrelenting in its action. Even if these repeated insults do not arouse our miserable people from their lethargy and goad them to take God's revenge in their own hands, this unbridled exercise of tyranny is sure to react on your national character; this growing habit of revelling in the wild display of gross physical power will be one of the potent sources of your national downfall. It will undermine the true love of freedom on which your greatness rests—and maltreated humanity will thus have its awful revenge by depriving you for ever of the only source of all real powers.

What I cannot understand is how your ladies, who are ever ready with their noisy demonstrations of pity where their pity is very often superfluous and even harmful, do not feel for the wretches who are treated in such heartless manner by their husbands and brothers before their eyes. We thank God that our early marriages and myriad other social evils have not produced such utter heartlessness in our women.

যাহোক আমার বুদ্ধি বতই বাড়তে লাগল চোর ততই দূরবর্তী হতে লাগল। তাহা সত্য নানা স্বপ্ন গিরে গুলি আমি আর কিছু বলবার সময় পেলুম না—কেবল নিম্নলিখিত আক্ষেপে রত গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইংরিজি শিক্ষার অভাব আর স্বপ্নে। এমন মহত্ব করিনি। কোন কিছু শিক্ষা সত্ত্বে আমার নিজেকে এমন stupid বলে মনে হয়! কিন্তু বজা দেখেচি এক একজন লোকের সঙ্গে এক একটা বিষয়ে আমি বেশ বলে যেতে পারি। Stupidদের সঙ্গে যখন আমার আলোচনা চলত আমি নিজে আশ্চর্য হয়ে যেতুম—বেশ শুদ্ধিবে বলতে পারতুম। কিন্তু যখন excited

হয়ে ওঠা যায় এবং এখন ভালরকম করে বলা বিশেষ আবশ্যক হয় তখন অনেকগুলো কথা একসঙ্গে উঠে কর্তৃত্ব করে নেয়— শুদ্ধিহে নেবার সময় পাওয়া যায়না। এই অবশ্যে কিছু বলে নিতে পারবুম না বলে আমার নিজের উপর এমন বিরক্ত বোধ হচ্ছে। আমি সত্যিই এমন stupid, অথচ আমার বুদ্ধি নেই একথা বলতে পারিনি— ঘরে বসে বসে অনেক বুদ্ধি ছোটো, কিন্তু ঠিক আবশ্যকের সময় কোনটাকে তেঁকে পাওয়া যায়না।— Cabinএ ফিরে এসে Connollyর কাছে আমার মনের আবেগ ব্যক্ত করতে লাগলুম। আমি বলুম It makes me feel wild— সে বলে I can quite understand your feeling— বলে অনেককণ দুঃস্থনে কথা হল। তার পরে ছাতে গিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গেও এই নিয়ে আলাপন করে মন বরফিং ঠাণ্ডা হল। এমন সময়ে একজন Lady এসে আমাকে গান গাইতে তাকে নিয়ে গেল— Good night— chantez— Ave Maria গাইলুম— আমার গলায় তপ্তে খুব প্রশংসা পেয়েছি। আমাকে একজন মিউজাস্য করলে কোথায় আমার শিক্ষা— আমি বলুম মগ Professor আমার pieceএর কাছে। তার পরে “অলি বারবার”টা গাইতে হল— খুব ভাল বয়ে।

বৃহস্পতি [১৫ অক্টোবর]। সেই হুন্দরী যেটি বাঁকে আমার খুব ভাল লাগে আমি দেখছিলাম ক’দিন ধরে সেও আমার সঙ্গে আলাপ করবার অনেক চেষ্টা করছিল কিন্তু আমার stupidity বশতঃ আমি খসি মিহিনি— সে কাল রাত্তিরে আগনি এসে বলে Aren't you going to sing?— আমি কেবল বলুম Yes বলে গান গাইতে গেলুম। আর সকালে তার সঙ্গে আলাপ করলুম। তার মুখে এমন একটি প্রশান্ত গভীর স্মৃতি earnestness আছে— এমন হৃদয় চোপ নাক এবং ঠোঁট— আমার ভাবি ভাল লাগে। আমার বোধ হয় আমাকেও তার মন লাগেনা। একজন Australian মেয়ে আর আমার সঙ্গে আলাপ করলে— তার সঙ্গে প্রায় ঘন্টার্থেক ধরে গল্প চলছিল।— ক্রমেই গরম পড়চে— আর পরিষ্কার দিন— হার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই বলতে What a lovely morning! আমি বলছি Isn't it! দৃষ্টিতে আফ্রিকার উপকূল একটু একটু দেখা যাচ্ছে। আমাকে বাগবার Quoits খেলতে অনুরোধ করেছিল— আমি অনেক করে এড়ালাম— এরা সকল বিষয়েই gambling ধরেচে।

আমার নববন্ধুর সঙ্গে ইংরাজ সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। Anglo-Indian মেয়েদের জ্বরহীনতার প্রশংসা বলছিল “এখনকার মেয়েরা বড় জ্বরহীন হয়ে গেছে— মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে একটা ideal আছে কিন্তু উত্তরোত্তর ক্রমশই তাতে অঘাত লাগচে।” বলছিল, ছোট ছোট বিষয়ে দেখা যায় একজন মেয়ে একটা গাড়ির ঘোড়াকে বড় হুগলি করে ঘুরিয়ে বেড়াতে পারে একজন পুরুষ তেমন পারেনা। তাদের সমস্ত জ্বর অসীম কাপড়চোপড় সাজসজ্জার মধ্যে অহিনিষি এত ব্যস্ত থাকে যে বাস্তবিক কোন রকম অস্ববিধাজনক বা অস্বাভাবিক বাসায়তনিক ধর্মের কাত করা তাদের অনিচ্ছায় হয়ে আসচে। চারতরফায়ে প্রতি দয়া প্রকাশ করার মানে অস্বিগে লজ্জা কথা— চক্ৰকীড়ক পারিষোয় মধ্যে প্রবেশ করা— কালানের বিকচাচরণ করা— হুতরাঃ তা সেতির সঙ্গে অলম্বব। থাকে বলে luxury of sentiment— আশ্রয়দত্ত অশ্রবর্ষণ— হুশোভন দয়া তাই তাদের স্বভাববিন্দ।— লোকটা বোধ হয় কোন মেয়ের কাছে আঘাত লজ্জা করেচে, খুব দেন অস্ববোধনার সঙ্গে কথা কছিল।— আর এক সময়ে কথায় কথায় বলছিল তার এক ছোট বোন Boyদের সঙ্গে বেশি বেশি, তার ভাইদের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব— আমি মিউজাস্য করলুম কেন বল দেখি? আরো অনেকের কাছে ঐ

কথা শুনেছি। সে বলে— I suppose girls find their brothers much nicer than their sisters. Sisters are so spiteful to each other. বস্তুনিষ্ঠ মেয়েদের বিরুদ্ধে মেয়েরা যেমন তীব্র হতে পারে এমন আর কেউ নব। — "However I have my ideal of a woman somewhere in my heart—a fellow must have something of that kind—but I have given up all hopes of meeting her in the region of Reality."— লোকটাকে আমার বেশ লাগে— খুব অল্প বয়স— গড়াগড়না ভালবাসে— মন খুলে কথা বলে— আমার সঙ্গে খুব মনে পড়ে। শেখটাই সব চেয়ে স্বাভাবিক। এ লোকটা কারো সঙ্গে ঘেঁষে না। একলা একলা বলে বলে বই পড়ে এবং ভাবনাক হাঙ্গ।

ডিনারের পর আর আবার নাচ আরম্ভ হল। বানিকটা ঘেঁষে আমার মন বিগড়ে গেল। আমি একটা বোর অঙ্ককার কোণে বসিবার উপর বসে নানা কথা ভাবছিলাম— মন লাগছিলনা— সমুদ্রে অঙ্ককার স্রাতি এবং অঙ্ককার সমুদ্র— থেকে থেকে Phosphorescence ছেউয়ের মাথার উপরে অস্তিরেণা একে ব্যক্তি— এমন সময়ে বীরেং সেই Australian মেয়েটি আমার পাশে এসে বসল এবং অল্পে গম জুড়ে গিলে। ক্রমে নাচ বন্ধ হয়ে গেল। সে আমাকে বলে— চল Music Saloon-এ গিয়ে আমরা গানবাতন করিগে। সেখানে গিয়ে গান আরম্ভ করে বেগুলা গেল— ক্রমেং লোক জড় হতে লাগল। আর আমাকে ব্যবহার করে অনেক স্রাস্তির পর্যন্ত গাইয়েছে। Ave Maria এবং আর দুয়েকটা গান বেশ সীতিনত ভাল করে গিয়েছিলুম। বিস্তর অপরিচিত মেয়ে জানলার ভিতর থেকে মূখ বাড়িয়ে আমাকে বহল সাধুবার দিবে গেল। আর ভাবে বোধ হল আমার গান এবং বাস্তবিক ভাল লেগেছে— Indian-এর গান বলে কেবলমাত্র বিশ্বাস নহ— এইমাত্র Connolly এনে আমাকে বলে গেল I say Tagore you sang awfully well this evening। আমি আগে বেরকম গলা চেপে গাইতুম এখন বেগুতি সেটা জারি কুল। — Then [you'll] remember me বলে একটা গান গাইলুম আমার নব-বন্ধুর সেটা জারি ভাল লেগেছে— বোধ হয় তার ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন যোগ আছে। Brindisiতে জুড়ি লগুন লোক উঠে— আমাদের Cabin-এ আর দুটা berth আছে সে দুটোতেও লোক লাগে— জন-অবধি বিদন চিহ্নিত হয়ে বাছি। Connollyর সঙ্গে যেমন মনে গেছে এমন বোধ হয় কারো সঙ্গে সঙ্গাবনা নেই। একরকমে ভাল— এইরকম করে experience লাভ হয়। — যে মেয়েকে আমার বেশ লাগে তার নাম Miss Long— সে Indiaতে বিয়ে করতে যাচ্ছে— একজন কার সঙ্গে engaged। তিন Australian বোনকে বন্ধ লাগেচেনা— তার প্রধান কারণ, আমাকে তারা বিশেষ করে বেচে নিচ্ছে, এবং মন বেগতে না, এবং বেশ Piao বাজায়— সেদিন একটা স্বর বাজাছিল আমার খুব পরিচিত— সেটা নিয়ে Park St-এ থাকতে প্রায় parody করতুম— বোধ হয় কি একটা Cavatina কিবা Estudiantina কিবা Dames de Seville কিবা ঐরকম একটা বিদিনিজি বাগার— কিন্তু পরিচিত বলেই আমার জারি ভাল লাগল। Australian মেয়েদের নাম Misses Bayne.

আমি যখন সেখনি অধিকাংশ ইংরেজ পুরুষ তাদের নবদেী স্বকীয়দের ছেড়ে এই অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের সঙ্গলাগার বাস। সকলেই বলে They are very nice। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন বল সেবি— তারা বলে— They are so unaffected, childlike, they are not at all smart। বাস্তবিক ইংরেজ অল্প বয়সী মেয়েরা বন্ধ সেবি smart। বন্ধ চোখমূখ নাড়া, বন্ধ নাকমূখ কথা, বন্ধ বস্তুর হাসি বন্ধ চোখাচোখা ভাব— কারো কারো-বহত লাগে ভাল কিছু সামরণ লোকের পক্ষে একান্ত আভিমনক, — মেয়েদের বেশ unaffected simplicity এবং earnestness সেখলে বেশ একটু আদার পাওয়া যায়— বার্ষ হারী খুব অহতব করা যায়।]

গোটে দ্বিশতবার্ষিকী

মহামনীষী গোটে

গোটে মাহুদী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতীক। সেই সংস্কৃতির পূর্ণতা যেমন তেমনই তার পরিণতি, অর্থাৎ তার মন্ব বা শেষও এই মনীষীর মধ্যে লাকার হয়েছে। গোটে মাহুদের সেই চেতনা, সেই চেতনার প্রবেশ বা চিরন্তন চায় ক্রমগতি ক্রমবৃদ্ধি। কলতঃ মানবায় মাঘত কববার বা কিছু থাকতে পারে, কোতুল ঠাংহুকা শূদ্রা বত বহল ও বিচিত্র হতে পারে, তাই নিযেই তো মাহুদের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ব। গোটের স্তই ফাউন্ট এই পূর্ণ মাহুদী মাহুণ। গোটে নিযেও সেপি একাধারে কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক—এখন বিবধ বুঝ মাহুই মাহুে বা তাঁর চেতনার পরিণতির মধ্যে আসে নি এবং তার উপর তাঁর জ্ঞানপ্রভা প্রতিফলিত করে তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন নি। কৰ্মক্ষেত্রেও তিনি যে দক্ষতা সেগান নি তা নয়। রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসনেও তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ রয়েছে। এত বহুদুদী প্রতিভা এবং প্রতি ক্ষেত্রে এত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিভা আমাদের শ্রবণ করিয়ে দেয় এক লেওনার্দো(Leonardo da Vinci)র কথা। তবে উভয়ের পার্থক্য রয়েছে, কোথায় তা পরে ব্যাখ্যানে বলছি।

গ্রীক জাতি একটা সত্যতার দৃষ্টিপাত করেছিল, তার চরম এবং শেষও এই মাহুদী মনীষীর মধ্যে। গ্রীকের হল মানস-প্রতিভা, বুদ্ধিগত সংস্কৃতি, বলেছি মাহুদের “মাহুদী” প্রকৃতি। অতুত্ব জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, অতুত্ব চলবার আকাঙ্ক্ষা—আমাদের বৈদিক কবিরা মাহুদের যে বৃত্তিকে লকা করে দিয়েছিলেন এই অপরূপ মন্ব “চইহবেতে”, মাহুদের অতুত্বের অনির্লীণ আশুদা, এই নিত্যসন্নিহিত মতি, তাই ত মাহুদকে মাহুদ করেছে, টুতর প্রাষ্টীর চক্রগতির পর্যায় থেকে তাকে তুলে দরেছে এই উচ্চতর অগ্রগতির পর্যায়। মাহুদের এই যে আশুদা, গোটে তার তিনটি মূলধারা নির্দেশ করেছেন : গোটের ফাউন্ট এই ধারাময়ী, এই ত্রিভোজা। দিয়ে গঠিত চরিত্র।

প্রথমতঃ মানস আলো, বুদ্ধির চিন্তার বিচার বিতর্কের বেলা—বিশুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়। দ্বিত্বিনিদ নিযে আলোচনা, তাদের প্রকৃতি কি দর্শ কি কৰ্ম কি তার গবেষণা, বস্তুর আদি কি মধ্য কি মন্ত কি তার একটা মানচিত্র অচন—এই সব নিযে মন্তিকের বৃত্তি : এই বৃত্তির লঘাক অতুত্বলনের ফলে মাহুণ যে স্তরির মধ্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে, জীবদগতে প্রাণল লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। তবুও বলতে হবে এই যে জ্ঞান তা বেশির ভাগ জিনিসের বোলদেরই পরিচয় দেয়, জিনিসের অতুত্বের বাক্তী এবিক দিয়ে মেলে না। একটা অপরূপ বুয়ে সেছে, জ্ঞানেরই বিষয় তা, কিন্তু মানস আলোর বাহিরে তা, তর্কবুদ্ধি তাকে ধরতে পারে না। তা ছাড়া, বিশুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয় মাহুদকে ধর্ষিত করে হবে, মন্তিককে বিপুল করে হবে মটে, কিন্তু অস্ত্রল অধ হয় পলু। অনেক সময় বেশি অতিরিক্ত জ্ঞানের ফলে—বহনা ভ্রতেন—যে অতুত্বপাতে মাহুণ বিমান বা গতিত হয়ে উঠেছে সে অতুত্বপাতে কৰ্ম্ম, মূল অগতে মল সূবর্ষ হয়ে উঠতে পারে নি। মাহুদের মধ্যে রয়েছে আর-একটি নিতৃত্ত গর, তাতে বেশ প্ৰমত্তর জ্ঞান কিন্তু সেই সখে নিবিড়তর প্রবলতর সার্বর্ষ। এ হল শুধু বিচার অগণ, মাহুদের চেতনার দ্বিতীয় ধারা। প্রথম ধারাকে যদি বলি

জ্ঞান, এই দ্বিতীয় দ্বারকে তবে বলব বিজ্ঞান। কারণ এটি হল বিশেষ বিবিধ ও বিপুল জ্ঞান। আর মূল বিজ্ঞানের মতই এ বিজ্ঞান শেষ ভিনিসের কল-কবজার খবর, ভিনিল যে বলের চাপে চলে এবং যে নিরব অঙ্গসংগ কবে চলে তা আমরা জানি এই বিজ্ঞানের কলে; ভিনিসের উপর আমাদের কৃত্ত্বও আসে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জোরে। মনের বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া রয়েছে হৃদ-ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসংযোগের জগৎ। শক্ত্যৌক্তিক প্রকৃতি আর তার অন্তর্গত যে জীব-মস্ত যে পদ্ম-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ তা হল অন্যতর মূল দেহ; কিন্তু এই মূলের শিঁচনে রয়েছে হৃদ-বৃত্ত, যা হল বিশ্বের অন্তঃপরীক, যাতে রয়েছে গৃহতর গাছতর শক্তিসব, দ্বারাই অন্তরাল থেকে অহুপ্রাপিত করে পরিচালিত করে এই মূল-মূলের জগৎ— মূল ত হৃদয়ের অথ বা বাহন মাত্র। আর এখানেই রয়েছে হৃদয়ের নায় যেওনা হয় বন্ধ বন্ধ জিন দান। প্রেত শিশাচ দেবদলব পর্যন্ত। 'কাউন্ট তাঁর বাহ্যজ্ঞানের জগৎ শেষ করে এগিয়ে চলছেন আরো। এই অনবরতহলের শক্তিময় কিন্তু বিশদমূল জগতের মধ্যে; বিশদমূল, কারণ, অজানা অচেনা অস্ত্র ধরনের এ জগৎ; তারপর এখানকার শক্তি শক্তিমাত্র ত বেটেই, তাতে রয়েছে আবার বিকোহরকের আকর্ষিকতা ও প্রচণ্ডতা, রয়েছে একটা অনিশ্চিত পরিণতি, কল্যাণের দিকে হোক কি অকল্যাণের দিকে। কিন্তু মানব চেতনা, মাহুষের বাসবর প্রবৃত্তি তাকে এখানেও থামতে দেয় না। বাহ্যজ্ঞান কেবল নয়, অন্তর বা গুহ্যবিজ্ঞানও নয়, মাহুষকে সূর্য্যাক্ষ দিয়ে, বেঁচেয়ে আবেগ দিয়ে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে হবে— নতুবা পূর্ণ পূর্ণতা মাহুষের লাভ হবে না। মাহুষের ভোগস্বত্বই ত রূপগ্রহণ করে মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ পায় তার স্বভাবের সার্বাণ্য ও সার্বিকতা। সম্যক ভোগ ছাড়া জীবন নাই, জীবনের রসে জ্বরিত নয় যে চেতনা। তা শুধু শত্রুর মত, বচ জোর গ্রহণকার মত; তাই ত কবি বলছেন (খনিও পরতানের মূখ দিয়ে)—

Grey, my dear friend, is all theory,

And green the golden tree of life.

কাউন্টের জীবনে মার্গারেট-বাহিনী যে একটা হৃদয় কবিত্বময় করণ শ্রেষ্ঠাভ্যাস তা নয়, এ হল দেহের মধ্যে কর্ণারহনে তার সবগ্র প্রাণধারার, তার অন্তর ও হৃদয় জীবনগতির মূর্ত্ত প্রকাশ। ফলতঃ এই ত সেই ক্ষেত্র, সেই রম্যান সেখানে হয় অন্তিম বৃত্ত; পরতানের হয় অথ কি পরাভাষ, মাহুষ হারায় কি পায় তার স্বভাবাত্মা।

কারণ এখানেই মাহুষের সাক্ষাৎপরিচয় তার মূল বাগটির মধ্যে। 'মাহুষের যে প্রবেশ অগতির জন্তে, উর্ধ্বগতির জন্তে, সূর্য্যবাপী গতির জন্তে, তা হল আগলে প্রাক্কর আশ্রয় ধর্ম্ম, অন্তঃপুরুষের দান, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষ্য যে অথ যে স্তর বা অংশ সেখানে হতে উৎসারিত। কিন্তু আর-একটা দিক আছে মাহুষের— এবং প্রকৃতি ও জগতেরও— হৃদয়-দানের কামনা, অঙ্গলিঙ্গার বৃদ্ধা, তামসপ্রবেগের পরাধার। উর্ধ্বের, আলোকের, প্রশান্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নাস্তিক এই অঙ্গ— মাহুষকে তা টেনে নিয়ে চলে অঙ্গপরতনের মধ্যে, চিরন্তন নিরন্তর অতলে, পরতানের আপনায় আলিঙ্গনের, মধ্যে। এই যে চতুর্ধ— বিশরীত অর্থে সূর্য্য— অখন্ড পদ, পরতান স্বয়ং প্রতিক্রিত সেখানে, তার সমস্ত আশা ভরসা মাহুষের এই পরতলের হৃদ্য দিয়ে অন্তরে প্রবেশ। এই বৈধর্ম্ম, নির্ধন কঠোর, মনে হয় চিরন্তন— মাহুষের জীবন বিধা জিন্ন তাতে, প্রতিক্রিতে কতবিকৃত। তাই ত কাউন্ট বলছে—

Two souls, alas, dwell in my breast the one clings to the world
the other lifts itself to the realms of an exalted ancestry.

এই ক্ষণের সীমানা, এই যৈতের হাত থেকে উদ্ধার কিভাবে কোন দিকে? একবার ঘনন যাহুকের দুই ঠোঁটের গিঁথে পড়েছে বাহিরের দিকে, অগোচরিক বেরনি পা বাড়িয়েছে সে শয়তানের প্ররোচনায়, কি তার দণ্ডে সজ্ঞা করে, তেরনি তাকে ঘের শিঙিল গিঁথে গিঁথে পড়তে হয়েছে, ক্রমে বড়ের বেগে ছুটতে হয়েছে অব্যর্থভাবে অসঙ্গতভাবে নিরালোকের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে, অজ্ঞানের অসঙ্গততার মধ্যে, বহুতী বিনষ্টের মধ্যে (Walpurgis' Night)।

গ্যোটের সীমানা। পৃষ্ঠীয় সীমানা। যাহুকের আশ্রয়স্থল কলুষিত, পাপ তার বেহুশজাগত। নিম্নে কখন নিম্নের কৃত্রিম নিম্নে সে উদ্ধার করতে পারে না। তার উদ্ধার সম্ভব ভগবৎপ্রদানে। এটিকে আমরা তবে বলতে পারি পৃষ্ঠীয়স্তরের পঙ্কজতর। শয়তান মানব আত্মাকে গ্রাসিত করে তার প্রাণের, নরকের চূড়ার অবধি নিয়ে এসেছে—নিষ্কৃতি কি? প্রবেশ করতে হবে কি হবে না? কর্মবল বলে প্রবেশ করতে হবে—শয়তানের নিম্নের বিলাস এবং প্রত্যাশা তাই, এমন কি আত্মারও পক্ষ। অঙ্গগতি তার বৃত্তি আর নাই।

তবে যাহুকের একমাত্র পুণ্য বা স্মৃতি আছে; ভগবানকে ভালবাসা তার পক্ষে সহজ ও সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু সে যাহুকে ত ভালবাসতে পারে, যাহুবী ভালবাসা দিয়েও সে যদি সত্যকার ভালবাসা উল্লেখ করতে পারে, তবে তার আর ভয় নাই। যাহুবী প্রেমের সে অধিকার সে পার্থক্য আছে মনে হয়, প্রাকৃত আত্মাকে নিরঙ্গমনোদ্বৈতকে উদ্ধার করতে পারে—শয়তানের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। যে কামনাবোধ নরকের দ্বার নামে লালিত, যাকে হাতিয়ার করে শয়তান যাহুকে নিম্নের দাবী করে টেনে নিয়ে চলেছে অব্যর্থ অশ্রুতনের শেষ সীমানা—শেষ সীমানা দেখা গেল সেই বহুই হয়ে উঠেছে উদ্ধারিত। কি যাহুর বলে শেষ গুণে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

✓ কাউন্টের প্রথম ভাগে বেরনিক পতন হল যেন একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়ে। প্রেমের সত্য সত্যই হয় হল কি? প্রেমিককে তবে স্পর্শ করতে পারলে না নরকের রাজ্য, প্রেমিককেও নয়? দ্রিক হতে ফিরে গেল শয়তান? দ্বিতীয় ভাগে কবি সীমানাটা ফুট করে ধরলেন। যাহু, যাহুকের আত্মা নিরঙ্গমী হয় না শয়তানের জীবনব্যাপী যুগব্যাপী ভেটো লবেণ। “যে যাহু সত্য সত্যই ভালবেসেছে যাহুবী ভালবাসা দিয়েই, সেই ভালবাসা তাকে রক্ষা করেছে নিষ্ঠুর—ভালবাসা যে বেদনের জন্মদান করে, যে অঙ্গধারা উৎসারিত করে, তা সকল পাপ, সকল ক্রটি দুই মুখে শুদ্ধ করে দেয় যেন (গ্রীক বতে ইলেকট্রিক ধর্ম যা), অসুস্থদের মঙ্গলার্থে বৈতরনী অতিক্রম করবার ক্ষমতা শয়তানের নেই। একদিক দিয়ে প্রেম স্বর্গীয়, সর্বব্যবহার সর্বত্র। মার্গায়েট পার্থিব প্রেম, কিন্তু তার স্বর্গীয় প্রতিরূপ হলেন। স্বর্গীয় প্রেম আর ভগবৎপ্রদান একই। সে এসে তার যাহুকে শয়তানের আগর-এলা থেকে উদ্ধার করে নিলে মানবাত্মাকে।

ফলত: গ্যোটের বতে শয়তান মূলত: ভগবানের বৈরী নয়, ভগবানের সমান একজন বিরোধী শক্তি নয়। শয়তানও ভগবানের সৃষ্ট, এমন কি ভগবানেরই শক্তি, বলা যেতে পারে ‘বাসা শক্তি’। তার কাজ হল ‘যে আত্মার পুরাণে যাকে বলে শত্রুভাবে সাধনা—ভগবানের দিকে গতি যাতে হয় প্রবলতর তীব্রতর ক্রিয়াকর্ম—প্রাকৃত জীবনের চরম, যাতে নবজীবনের আরাধ্য হয়

নিসংস্কেহে। পরতান মানবাত্মাকে গ্রাস করছে ততখানি নয় বতখানি সে করে আত্মহত্যা হারাকিরি, সে নিজেই বলছে—

I ascend the witch mountain for the last time ; and because my own cask runs thick, the world also is come to the dregs.

চর্যবানের উপর ঐতিহ্যবাহুকে ভগবানের দিকে চালিয়ে নেয়; ষ্টিক ভেতমনি আবার সংসারের কু-স্বাভিষ্যাতও তাকে অস্ত্রের মধ্যে, বৈদ্যুতিক স্রবের মধ্যে চিরকাল ভুত হয়ে থাকতে দেয় না। পরতানের তাকনা, অক্লান্ত্যবাহু বাহুকে ধামতে দেয় না, তবোত্তম নিরাজিত্য হতে দেয় না, ক্রমাস্ত তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। পরতানকে ভগবান ঘিরেছেন এই শব্দাঙ্গত প্রবীর কায়।

গোটে বাহুঘের ঘিরেছেন ক্রমগতির, চিরন্তন স্বাভাব্য অর্থ্য চির-অন্তিমের ইতিহাস। বাহুঘ চায় আলো, আরো আলো—চায় শক্তি, আরো শক্তি—চায় আনন্দ, আরো আনন্দ। বাহুঘ চায় অনন্তকে অধিকার করতে। কিন্তু কোথায় কি বকবে এই চিরদীপ্ত আশুচায় হবে চরিতার্থতা, পরিপূর্ণতা? গোটে চলেছেন সাধারণ বাহুঘের পথে, সাধারণ বাহুঘের চেতনা ও ভূতি নিয়ে—তার বতখানি প্রদার বা পরিকল্পিত হতে পারে তাকে আশ্রয় করে—তার অতিরিক্ত কিছু ধরে নয়। মানবীয় মানসিক চেতনা দিয়ে, তাকে ধরে বতদূর বতদিকে এগিয়ে চলা যায় এবং সে ভাবে বা কিছু লতা কাবা অধিনত করা যায়, গোটে ঘিরেছেন তার চিত্র। কিন্তু অনন্ত সান্তের যোগদল নয়, সান্ত থেকে দায়ে চলে চলে কখন অনন্তে পৌঁছান যায় না, অনন্তকাল ধরেও নয়। শেষে প্রদারের পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাউন্ট বলছে :

Where shall I seize thee, Infinite Nature ? Ye breasts, where ? /

প্রকৃতিকে অধিকার করবার, সমগ্রভাবে তাকে আলিঙ্গন করবার রহস্য কি? প্রকৃতির কৈশর হতে হলে প্রকৃতির উর্দ্ধে উঠতে হবে—বাহুবী চেতনা অতিক্রম করে একটা অতিবাহুবী চেতনা অর্জন করতে হবে। কাউন্ট নিজেই তার এই অক্ষমতার কথা বলেছে, কি করণভাবে—

In vain have I scraped together and accumulated all the treasures... not a hair's breadth higher.

উপনিষদের বলছে দুটি বিজ্ঞার কথা, এক পরা আর এক অপরা। গোটে স্বয়ং রহস্যের অপরাধকে নিয়ে, তার প্রায় অপরাধকে ধরে পরায় দিকে বা পরায় মধ্যে পৌঁছান। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অপরাধকে জানতে হবে, জানতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু পরাবিজ্ঞার পথ জিন্ন জব্বি জিন্ন, তাকেও অধিকার করতে হবে, তবে তার ধারণা চলে। সে পরাবিজ্ঞা সাধারণ জানে, তর্কবুদ্ধির মধ্যে নাই, তা বিজ্ঞান বা দৃশ্যভৌতিক বিজ্ঞার মধ্যেও নাই, তা নাই জীবনের বাস্তব কর্ণে বা স্থল উপভোগে।

গোটে তা অসম্ভব করেছিলেন। কিন্তু সে মহত্বের করতে হইবে পরায়ত্ববিজ্ঞা দিয়ে তার সম্ভাব্য ষ্টিক তার বেলে নি। এই যে মানবীয় বেহ-প্রাণ-মন দিয়ে গড়া উর্বনাকের জাল বা জটিলগাফার জট, তা কেটে বের হয়ে আসতে তিনি পারেন নি। জালকে টেনে টেনে কুণ্ডলিত করে চলেছেন, জটকেও প্রগারিত বিপুল করে গিয়েছেন, কিন্তু এ কীত্তির নাম আনন্দ নয়। এ কীত্তির পরিণতি বিনষ্ট—*mole rat sua*—নিজের ভাবে নিজে ভেঙে পড়া। ফলতঃ গোটে

বলতে চান মাহুদী জীবনের অব্যর্থ দ্ব্যভাবিক পরিণামই একটা নিশ্চয় বার্ষ্যতা, গতির বেগ নিয়ে চলে গেবে এক পাখাপ্রাচীরের উপর, ধ্বংস মনে হয় হৃৎ অধিক ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই কিছু। অবস্থার ধ্বংস এই চরম তীব্রতা তখন ঘটে এক অবতন—মাহুদের উদ্ধার সেই এক পথে। অস্থিরে ভগবৎকল্পার এক অহেতুক প্রকাশ, গোটে একবার এই আশ্বাসের উপর ভর করেছেন। *

বলেছি, ভগবৎকল্পা গোটের কাছে এসেছে প্রেরণে, নারীপুষ্টি নিয়ে। কৃত্রিম পথসাদান্য যথা—Intermediary বা Paracleteএর কথা আছে, মানবাত্মাকে ভগবানের কাছে পৌঁছে যে দেয়। মাহুদ নিয়ে নিজের উদ্ধারসাধন করতে পারে না, ভগবানও রয়েছেন অতি দূরে তাঁর কৃষ্ণ পদম স্পর্শতার মধ্যে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেন মাহুদের কাছে, মাহুদেরও সে হয় দূত ও দিশারী। বোয়ালি এই ভাবে তার প্রেমিক হাতকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। গোটেও বলছেন সেই সনাতনী নারীপুষ্টির কথা, যার নিবিড় স্নেহ তার ঐকান্তিক তীব্রতায় ছোবেই পুঙ্খকে উদ্ধার করলে প্রকৃতির প্রাকৃত কবল থেকে।

গোটের মীমাংসায়—সাধারণতঃ সকল প্রশস্তির সাধনাতেই—বেথতে পাই মাহুদী আশুতা বা তৃষ্ণা আর ভগবৎকল্পা এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে একটা ফাঁক—কাব্যকারণ দূরে থাক, একটা সাক্ষ্যভোগ সম্বন্ধও উভয়ের মধ্যে বৃষ্টি নাই। ভগবৎকল্পা আকস্মিক অহেতুক, তা অবতন ঘটায়, অপ্রত্যাশিতকে বাস্তব করে। বর্তমান দৃশ্য আর আশ্রয় যে অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি সেখানে এ মীমাংসা বা উদ্ধারের পথ আমাদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। আস্র আশ্রয় একটা পথ মীমাংসা এসে পৌঁছে গেছি, এর পরে বেন পথ বন্ধ। এগিয়ে চলবার আর অবকাশ নাই। মানন-চেতনার চিন্তা-কুস্তির পরাক্রান্ত হলেছে আশ্র, তা নিয়ে গিয়েছে অশুভ্র সব আশ্রতনে—কিন্টোকেলিসের ভাষায়—

The march of intellect which licks all the world into shape

has even reached the dévil. ✓

তাই আশ্র আশ্রয় বেন অস্থিম ধশার মসহাব অবস্থার বলে আছি এক অবতনবতন—পজীসৌর হঠাৎ আবির্ভাবের ক্ষণে।

এ জিনিস যে সম্ভব নয়, তা বলছি না। কিন্তু তাতে রহস্তের সব কথা বলা হয় না। মাহুদকে ছির আছে এক দূত গুণীয় দেখা, অকাটা নিয়তির গান—মাহুদ তাকে কেটে পার হয়ে যেতে পারে। তার এই উত্তরণ-সিদ্ধির সঙ্গে ভগবৎপ্রসাদের বিরোধ কিছু নেই। বরং এই হল ভগবৎপ্রসাদের সার্বক করার সজ্ঞান প্রণালী। আশ্রয় যাচ্ছে বললাম গুণী, প্রাচীন অধিগা তাকেই বলেছেন “হিরণ্যর পাত্র”—মানসপুষ্টির প্রোজ্ঞাল ধবনিকা—যাতে সভ্যতার মুখ ঢেকে রাখে। এই হিরণ্যর পাত্রকে পরিবে দেবার কি অভিজ্ঞান করবার সাধনা ঘোটে নিতে পারেন নি—তিনি অজ্ঞানের (অর্থাৎ অজ্ঞানের) মধ্য থেকে কেবল আজ্ঞান করেছিলেন—পতিতোদ্ধারিত ভগবৎকল্পাকে। এ হল সেই অর্ধভক্তের উচ্চা—De profundis clamavi—“অতলে গড়ে আছি আমি, সেখান থেকে তোমার ডাকছি, যে ভগবান।”

আমি লেখনার্থের কথা বলেছি গোড়ায়। গোটের মত ইনিও ছিলেন মহামদীবা, মাহুদী প্রতিভার সমগ্রতার প্রতীক। তবে গোটের মধ্যে যে জিনিসটি ছিল বিরল ও দুর্লভ—মাহুদীতাবের

অতিক্রমণ—লেওনার্দ্ধের মধ্যে তা অনেকখানি সঙ্গ ও মিলত। লেওনার্দ্ধের চেতনায় রয়েছে কেমন এক আনন্দের সৌকর্যের আবেগ বা ছন্দ, গোটে সকল প্রদান সম্বন্ধে এইকি মাছুই রয়ে গেছেন। গোটে মাছুবের উচ্ছ্বসী আশা আকাঙ্ক্ষা আশুহার আবেগ—লেওনার্দ্ধে সহস্র উচ্ছ্বাসিত প্রশান্ত উল্লাস। অথবা গোটে এগারের আলো, তীর সন্ধানী আলো—লেওনার্দ্ধের মধ্যে রয়েছে ওপারের সৌম্য সৌন্দর্যের ছায়া।

মানবসত্যতার বিকাশের ক্ষমতা দুই প্রকার বিকৃতির আবির্ভাব হয়। এক মাছুবের মাছুবী-ভাবে আকৃতি নিয়ে, নীচে হতে উর্দ্ধের দিকে চলেছে যে জীব—গোটে এই পথ্যাবের। আর এক হল তারা যারা এগিয়ে যেন উপরের থেকে, সেখানকার সহস্র সিদ্ধি নিয়ে এই ভূতলে, যত্নের মধ্যে অমৃতের আলো তারা বিতরণ করে বহুক্ষেপে—লেওনার্দ্ধে এই পথ্যাবের। এ ধারণা ধারা আবার উর্দ্ধতন বা উর্দ্ধতম হয়ে, ধারা শেষেছেন পূর্ণভাবে আত্মার গুণী তাঁদের নাম হল গুণী। কবিতা গোটে উপর বলা যেতে পারে প্রকৃতির পূজারী। গুণী হলেন পুরুষের পূজারী, পুরুষ অর্থ প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রকৃতির বতবানি পূর্ণাঙ্গ গোটে চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছিল অন্তর তা আত্মা বৈশিষ্ট্যে দেখি না এ কথা সত্য। তবে তাঁর কবিতার এবং মানব-চিন্তারও নিকট আকৃতি ছিল অচিৎ ছেড়ে বা হয়ে চিন্তকে লাভ করা : বসেছি সে সিদ্ধির সন্ধান তিনি পান নি। তার মতে নির্ভর করেছিলেন একমাত্র অহেতুক ভগবৎকল্পার উপর। আত্মা আশা করি ভগবৎকল্পা তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করেছিল, মুক্তি ঘনি না দিয়ে থাকে তবে ঘিরেছিল নাহি।

শ্রীনিবাস কান্ত ভট্ট

গোটে ও তাঁর দেশকাল

গোটে বয়স বন চরিত্র তখন ইউরোপের ইতিহাসে এক গুণাত্মক যত্ন। যত্ন—করানী ছিল। গোটে ব্যক্তিগত জীবনেরও একটা অধ্যায় শেষ হয়ে দায়। এই ঘটনার জন্তে নয়, অথচ এর সঙ্গে একটা প্রসঙ্গ সন্দেহ ছিল। সমগ্র জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন মানা অমৃত হস্ত নিয়ে বাণ।

ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ আছে, যে ঘটনা ঘটবে তার ছায়া পড়ে তার পূর্বে। করানী বিশ্ববের ছায়া কেবল ফলে নয়, ফলের বাইরেও পড়েছিল বেশ কিছু কাল আগে। জার্মানীতে এই ছায়াপাতের মুগটাকে বলা হয় কলকাসটার ফল। এর নেতা ছিলেন আর কেউ নয়, গোটে স্বয়ং। তাঁর বাইশ-তেরিশ বছর বয়সে লেখা 'গোটে' নাটক ও তেইশ-চল্লিশ বছর বয়সে লেখা 'গেটের' উপন্যাস জার্মানীতে যে কলকাসটার পুনরাবর্তন করে তা কেবল জার্মানীতেই আবদ্ধ থাকে না। ইউরোপের সর্বত্র 'গেটের' এর অর্থহীন হয়। তা পড়ে বহু লোক আশ্চর্য হয়ে। তত্ত্বের প্রাণে তখন এক অকৃত্রিম অশ্রুতি। তার মনে কত কী করবার আছে, না করতে পারলে তার জীবন কৃপা, অথচ সমগ্র অর্থহীন নয়। সদয়ের মতে সর্বত্র করতে হবে। সর্বত্র করতে করতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত হবে। তত দিনে বল বয়স চলে যাবে। কে করবে সর্বত্র!

গোটে হ্যাতো এই জ্ঞান থেকে মুক্ত হবার জন্তে আশ্চর্য হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করল,

ঔর ভাগ্য। জালিন বছর বয়সে তিনি ডাইমারের সামন্তগাছার অধীশথে নিযুক্ত হন। রাজকাষের হাদির তাঁর অশান্ত অন্তরকে প্রশান্তি দিতে না পারলেও নিত্যা নৃতন প্রধানে ব্যাপৃত রাখল। তাঁর প্রয়াসের বিফল ছিল কবি ও গনি। অল্প কোনো ভাগ্যবান হলে অবিলম্বে বিবাহ করতেন। উপদ্রুত যুগলখীর অভাব ছিল না। কবি কিন্তু সে দিকে উদাসীন। গার্ডেনে একটি ছোট বাগানবাড়ীতে। ওটি যদি না পেতেন তা হলে অধীশথ স্বীকার করতেন না, তাইবার থেকে চলে যেতেন। ঐ তপোবনে তাঁর একমাত্র সখী ছিল তাঁর মালী ও একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন বিশ্বপ্রকৃতি। সঙ্গিনীও সঙ্গে আলোচনের ভাষা হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাঁকে তন্ময় করে রাখল।

এইভাবে কেটে গেল দশ-এগারো বছর। বিব্রবের ছাত্রা পড়ছে বেশে বিদেশে। কড়কাশটার হুগ দরানে চলছে। লোকে আশা করছে গোটে থাকবেন হুগের পুরোভাগে। তিনি কিন্তু নীচে নীচে পেছিয়ে পড়লেন। তেমন লেখা আর তাঁর হাত দিচ্ছে যেতোষ না। দিন রিন তিনি নিজেই সংগত ও অন্যাসক্ত করতে লাগলেন। অথচ সজ্ঞাসীরা যতো নয়। ইপথে তাঁর বিশ্বাস ছিল, মতঃপুলকদের তিনি প্রভা করতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতের উপর তাঁর আস্থা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কদাচী বিব্রবের নেতাদের সমানধর্মী। রূপা-ভুলভেদ্যদের সংগোত্র। শাইয়িশ বছর বয়সে যখন তিনি ইতালী দ্যাগা করেন তখন তাঁর জীবন মানা বিশদ্রীত বক্তির সংখ্যাত্তে মোলায়মান ও বিচ্ছিন্ন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি কড়কাশটার হুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোন্‌ স্থানে নোড়র ফেলবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। বিজ্ঞানসাধক হিসাবে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞান তো মানুষের সৌন্দর্যনিপাতা যেটাত্তে পারে না। সামান্যিকতা তিনি পরিহার করেছেন, ভুলভেদ্য ও রূপের যতো তিনি অবদান। কিন্তু এমন কোন্‌ পাখী আছে যার নীড় নেই, সঙ্গিনী নেই, লক্ষ্যন নেই? স্বাধীনতা ভালো, কিন্তু অতিমাত্র স্বাধীনতা ভালো নয়।

বছর দুই পরে যখন তিনি ইতালী থেকে ফেরেন তখন তাঁর শাহিত্যের আদর্শ ছিল হয়ে গেছে। কড়কাশটা এর পর থেকে তাঁর বাইরে। তিতরে তাঁর প্রবেশ নেই। জানালায় পড়গড়ি ও সানী তুলে দিয়ে তিনি নির্মিত্ত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের যতো তাঁর সৌন্দর্যের আদর্শ ক্লাসিক। যথেষ্টদু ও স্বকাল্পে রোমান্টিক আদর্শ তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। কিবা বলা যেতে পারে তিনিই পেছিয়ে যেতে যেতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমে পৌছে গেছেন। আর কেউ এমন করে পিছু হটে নি। অথচ বিজ্ঞানে তিনি সবচেয়ে আধুনিক। তখনকার দিনে বিবর্তনবাদের উদয় হয় নি। গোটেই তাঁর পূর্বহঠা। বিজ্ঞানের অজ্ঞাত বিভাগেও তাঁর মান সেকালের পক্ষে বিশ্বব্রহ্মর। কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো মতবাদই চিরস্থায়ী হয় না, তাঁর বেলাও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

ইতালী থেকে ফিরে তিনি সঙ্গিনী গ্রহণ করলেন। জেগীর বাগা ছিল বলে হোক বা ঘর্ষের প্রতি অন্যাস্থা ছিল বলে হোক বিবাহের অস্থায়ন ঘটল না। হযতো এ ক্ষেত্রেও তাঁর উপর রূপের প্রভাব পড়েছিল। পৃথিবীকেই গৃহ বলা হয়। গৃহ শেষে তিনি স্থিতি পেলেন। অথচ সামাজিক রাহুৎ হলেন না। সমাজ থেকে যেমন দূরে ছিলেন তেমনই দূরেই, বোধ হয় তাঁর চেয়েও দূরে, রইলেন। ও দিকে ভিউক দিলেন তাঁকে রাজকীর রত্নমন্ডের পরিচালন ভার। খিঘেটার তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। এবার স্রবোগ দ্রুটল ইচ্ছাযতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার।

এসব নিয়ে ঘনম তিনি নৃশঙ্কল ও পাশ্চ তখন এলো কিনা কয়সী বিগ্রহ। আর পাচ-পশ বছর আগে আসতে কে বারণ করেছিল! এমন অকস্মাৎ আসবে বলে কেন নোটিস ছিল না! যেহেতু সেখি কী রাক্ষস অচরিত! রাহুও একটু শান্তি ও নৃশঙ্কলার দ্বাৰা পাবে চল্লিশ বছর বয়সে, তাও বয়সে নেই। গোটে অতীত বিবর্তিবোধ করলেন। কয়সী বিগ্রহ লম্বা উর আগন্তিক প্রথম কথা হলো ওটা শান্তি ও নৃশঙ্কলার পরিপকী। কুলে গেলেন যে জার্মানীর স্বত্বাশপটীও আইন বাঁচিয়ে চলবে বলে অস্বীকার করে নি। মোট কথা, লুই করতে পারবে না বলে কেউ কেউ স্বাভাবিকতা করেছিল। লুই করতে করতে কেউ কেউ বোকাপড়া করেছিল। অনেকের বেলায় সে বোকাপড়া আগোসের পথে পড়ে। গোটের বেলায় তা হয় নি। ওর জীবনযাত্রা আর ধন ধন অভিজাতের মতো ছিল না। ওর দৃষ্টিভঙ্গীও কিউজাল মূগের নয়। বেদন পঞ্জির বিক্ষেপে বিগ্রহ তাদের চেয়ে তিনি নিষ্কটর ছিলেন বেদন পঞ্জির অধিকুলে বিগ্রহ, তাদের। ওর হী জনগণের স্বত্ব, যেমন 'এগার্ট'এর স্বত্ব। ওর প্রকৃতি-আগাধনা বিগ্রহী নামকনের ধর্ম। ওর 'হেরমান ও গ্রোভোভেতা' নতুন পরনের সোকাগহিতা। বিগ্রহের পূর্বে প্রতি কচকাপটা মূগের নাটক উপস্থাপন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিক্ষেপে ওর বিস্তার ঘোষণা। বিগ্রহের পূর্বে প্রতি 'স্বত্ব-সম্পর্কবলী' সামাজিক বিধিনিষেধের চেয়ে মানবমানবীর স্বাধীন সম্পর্কেই বড় স্থান দিয়েছে। 'ফাউন্ট' নাটকের জীবনদর্শন যে স্বাভাবিক ও অনাসক্ত কর্মযোগ সে তো বিশ-পতাবীর মধ্যভাগেও পুরাতন হয় নি।

কয়সী বিগ্রহের পরবর্তী পচিশ বছর ইউরোপের জীবনে যেমন রোমান্টিকের তেমনি হুঃপে ধম্মে তরা। দৃষ্টিগ্রহের দ্বারা বিপর্যত ইউরোপ কবিকে হুঃপে পাগল করে তুলত, যদি না থাকত ওর বিজ্ঞান সাধনা ও ব্রাহ্মিক মার্গ। আপনাকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে তিনি একপ্রকার বাণপ্রয় অবলম্বন করেছিলেন। সেটা এক হিসাবে চল্লিশ বছর বয়স থেকেই, কিন্তু বিশেষ করে চল্লিশের পর। নেপোলিয়নের পতন হলে ধন বিগ্রহ-প্রতিবিগ্রহের মূগ শেষ হয়ে যায় তখন গোটের জীবনের দ্বিতীয় পর্ষা সারা হয়। তখন বাইরের ভগ্নে শান্তি আসে, নৃশঙ্কল স্থাপিত হয়। জানালায় শান্তি-বড়বড়ি বড় করে রাখার বরকাত থাকে না। পতীর লম্বা লম্বা ইতিহাসে বিবিধ হয়েছিল। ওর দৃষ্টির পর কবির ধর্ম-স্বত্বের 'ওর মেন উক্ত-ব-স্বত্ব' পুস্তক। বাগানবাড়ী থেকে ইতিপূর্বে উঠে আসা হয়েছিল বলেপূর্বে। গোটের জীবনের অবশিষ্ট সন্তোষে বছর বে-কোনো একজন লম্বা স্বাভাবিকতার পাঠ্যবাহিক ও সামাজিক জীবনের লম্বা তুলনীয়। নানা মিলনে থেকে তন্ত্বে আসতেও ওর ধর্ম নেতে। আরাম ও লজ্জের অত্যা ছিল না। সোকে বলত, 'ইওর একসেলকী'। লম্বা মিলেছিল 'কন গোটে'। এই বয়সেও ওর প্রকৃতিপূজার বিরাম ছিল না, ওর ব্রাহ্মিক মার্গে ছিল অপবিত্যাক্ত, কিন্তু একটু তবাক্ত ছিল।

নেপোলিয়নের কয়সী কোজ বার বার জার্মানী আক্রমণ করায় জার্মানদের প্রাণী একাবোধ নতুন করে উজ্জীপিত হয়। এ বোধ যে কোনো কালে ছিল না, তা নয়। বরং বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ও বোহেমিয়া দ্বাৰায় প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত সংযুক্ত থাকায় জার্মানীর সাম্রাজ্যিক জীবনে একা ছিল না; কিন্তু সংস্কৃতিতে, স্বাধীনতা, স্মৃতিতে জার্মানবাত্তেরই একটা মিলনভূমি ছিল, যদিও সেখানেও প্রোটেক্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকের ভেদভূমি ছিল। এবার সাম্রাজ্যিক জীবনকেও এক হুঃপে বাঁধবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইংলও ও ব্রাহ্ম সাম্রাজ্যিক একোকে দমন দিবিজয়ী হয়েছে, ফ্রান্সের লম্বা স্বাভাবিকতা করেছে, অর্থে ও

সামর্থ্যে তারা অগ্রগণ্য। জার্মানী তাদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও সব বিষয়ে পশ্চাত্তর শুষ্ক রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে। জার্মানী যদি এক রাষ্ট্র হতো, জার্মানরা যদি এক নেতন হতো তা হলে কি নেপোলিয়নের হাতে বার বার লাঞ্চিত ও পরাজিত হতো ?

এখনি করে গ্রানালিগনের বহুপাত হয়। সারা শতাব্দী ধরে এর মরহুম চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা এর পরিণাম দেখেছি। গ্রানালিগনের সঙ্গে তথাকথিত সোশ্যালিস্টের মিশিত হয়ে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারও পরিণাম লক্ষ্য করেছি। গোটে গোটো থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, ফ্রান্সীদের প্রাণবেশ প্র্যাদিস, ইংরেজদের লগুন। জার্মানদের প্রাণবেশ কিন্তু ভিয়েনা নয়, বার্লিন নয়— জার্মানীর প্রাণ বহুবেশিক। ফ্রাঙ্কফোর্ট, লাইপৎসিগ, নিউনিক প্রভৃতি ও ভিয়েনা-বার্লিনের মতো প্রাণবন্ত। জার্মানীর মতো বেশকিছু ইংলেণ্ডের মতো নেতন করতে গেলে তার শতাব্দীর মূলধ্বংসি হারিয়ে বাবে। প্রাণধারার ঐক্যই আসল ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য তা নয়। গোটেই কথা যদি তাঁর সেপ মনে রাখত তা হলে তার মাঝে এ কথা হতো না। কিন্তু তখনকার দিনের জার্মানরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে গালমন্দ দিয়েছিল, তার পরেও তাঁকে ঠিক বোঝে নি, এখনো তুল বোঝে। তিনি তাঁর বেশকিছু, তাঁর জাতিকে কারো চেয়ে কম ভালোবাসতেন না; কিন্তু তাঁর নেতনবিরোধিতার কদর কথা হলো এই বলে যে তিনি বিশ্বপ্রেমিক, তাই আর সকলের মঙ্গল চান, স্বদেশের চান না। তিনি নেপোলিয়নের ভক্ত, তাই স্বদেশের বিষয়ে সাদা মেন না, ছেলেকে দুঃস্থ পাঠান না। তিনি ফ্রান্সী জাতির স্তম্ভস্থ, জার্মান জাতির নিম্না ছাড়া প্রাণশো করেন না। অর্থাৎ তিনি গোটেই, কিন্তু গোটেইট নন।

গোটেইর শেখাবীখন তাই অবিশ্রিত শাস্তিগ্রহ ছিল না। শিলারকে তাঁর শেখাবাসী মাথার তুলে নিয়েছিল। শিলারের জনপ্রিয়তার একাংশও গোটেইর ভাগ্যে ছোটে নি। তিনি জানতেন যে তাঁর লেখা সকলের জন্তে নয়। সকলে যেদিন বুঝবে সেদিন অবশ্য সকলের হয়ে, তার সেবি আছে। সেইজন্তে জনপ্রিয়তার প্রত্যাশা রাখেন নি। কিন্তু বন তিনি আজীবন পেরেছিলেন। স্বদেশে বিবেশে—সব দেশে। নেপোলিয়ন তাঁকে সেখা বলেছিলেন, একটা মাহুৎ বটে। বিবিষয়ী তাঁর 'ভেট্টর' পড়েছিলেন সাত বাধ। মুখ্যজ্ঞান সময় ফেলব বই নেপোলিয়নের সঙ্গে যেত 'ভেট্টর' তার একটি।

গোটেইর দুজার পর এক শতাব্দীর উপর কেটে গেছে। এখনো তিনি জনপ্রিয় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর বন তাঁকে অশিশাল পর্বতের গ্রীক দেবতাদের সঙ্গে আসন দিয়েছে। আর-কোনো জার্মান সাহিত্যিক এ সন্মান লাভ করেন নি। রাষ্ট্রে ও শেক্ষণিকারের পর্বততী ও টলস্টয়ের পর্বততী আর-কোনো ইউরোপীয় সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য নন। ইউরোপের বাইরে একালে একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুল্য। হাজার বছরে সারা পৃথিবীতে যে পাচ জন অবদ সাহিত্যিক অবতীর্ণ হয়েছেন গোটেই তাঁদের যথামণি। যথায় পাওরের মতো তিনি সবাস্যসী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ফাউস্ট', শ্রেষ্ঠ উপজাল 'জিল্লেম্ বাইস্টার' ও অজস্র প্রেমের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্বতীর্ণ।

কিন্তু তাঁকে যে অশিশিমান হলো হয় এ শুধু তাঁর সাহিত্যসামান্য জন্তে নয়। এ তাঁর জীবন-দর্পনের জন্তেও। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন বাহির থেকে, ভিতর থেকে, উপর থেকে, তল থেকে। দেখেছিলেন মাহুৎবের চোখে, প্রকৃতির চোখে, দেবতার চোখে। তত্ত্বত্ব করে দেখেছিলেন, নেতি নেতি

করে দেখেছিলেন। যেটো বৈদ্যনাথের সেটিকে দেখানো হয়েছে দেখেছিলেন, তার আশেপাশের লোক
মিলিয়ে দেখেছিলেন, লম্বাঘের মধ্যে স্থাপন করে দেখেছিলেন। দুটির ভিত্তি। তার মতো আর কেউ
করেন নি সর্বতোভাবে। পাছ পাতা ছল প্রকাশিত হাট পাতা কতাল কয়েকটি গ্রন্থ তারা দেখে বাস
দেখা কণ স্পর্শ কিছুই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে ছিল না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্পর্শ, ব্যক্তির
সঙ্গে সমাজের স্পর্শ, নারীর সঙ্গে নৃত্যের স্পর্শ, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজ্ঞার স্পর্শ, প্রকৃতির সঙ্গে মাহুতের
স্পর্শ, এমনি কত রকম স্পর্শ তার দুটির বিষয় ছিল। তার ধ্যানের বিষয় ছিল অজ্ঞান প্রগতি, যার
মূলে অবিরাম পরিভ্রম পরীক্ষা ও পরিচয়। কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে থাকলে প্রগতির পথ রুদ্ধ
হয়ে যায়। তা সে বতই পুরাতন, বতই পরিচিত, বতই প্রিয় হোক। মনে হবে চরমহীনতা, আসলে
বেদনার পর বেদনার অভিজ্ঞতা।

আজ কি তাঁকে আমাদের দরকার আছে, এই উত্তর পৃথিবীতে? প্রগতির পথ ধরে কংসের
প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। সূচা মানব। বিজ্ঞান আমাদের বন্ধু নয়, যেমন ফাউন্টের বন্ধু নয়
মেকিন্সটোকেন্স। গোটে পাঠ করে কী আমাদের সাধনা?

এই উত্তর নানা পাঠক নানা ভাবে দেখেন। একজন পাঠক হিসাবে আমার উত্তর দিই।
করাদী বিদ্যাবের পরবর্তী অধ্যায়ের মতো কণ বিদ্যাবের পরবর্তী অধ্যায় এখন চলছে। এ অধ্যায়
করবে শেষ হবে, কে হারবে, কে জিতবে, গোড়ের মতো আমাদেরও অজানা। তার দুটো যদি অমূল্য
করি তা হলে বাইরের দল অশান্তি হবে অজ্ঞের আমরা প্রকৃতিই থাকব, আত্মই থাকব, ধানই থাকব।
এ অধ্যায় এক দিন শেষ হবেই। তত দিন যদি বেঁচে থাকি তা হলে বাইরেরও শান্তি আসবে। তত দিন
বেঁচে আছি তত দিন সাধনামতো বাইরের শান্তির ক্ষেত্রেও চেষ্টা করব। গোড়ের ক্ষেত্রে জাতিপ্রেম ছিল;
কিন্তু জাতিত্বের তিনি মানতেন না। তার জন্য উচ্চ শ্রেণীতে, কিন্তু বিবাহ নির শ্রেণীতে। যথ: অভিজাত
হবেও জনগণের সঙ্গে তার সাদৃশ্য। মাহুতের দ্বারা হিংসা ধর্ম এক দিনের ক্ষেত্রেও তার মনে ঠাই পায় নি।
তার কেমনো দল ছিল না। না ব্যক্তিগত জীবনে, না সমষ্টিগত জীবনে। বহু অত্যাচার তার জীবদ্দশায়
ঘটেছে। তার ধর্ম তিনি বেদনাবোধ করেছেন। কিন্তু মাহুতকে তার ক্ষেত্রে স্থগা করেন নি। হিংসার
বদলে হিংসার কথা ভাবেন নি। তার মতো আমাদের অজ্ঞকরণ নির্মল হোক, নির্বিঘ্ন হোক। তার দ্বারা
মনে আমরাও পাই। বস্তুতঃ যুগে তিনি ছিলেন অগ্রযত্ন। আমরাও যেন থাকি।

অগ্রযত্নের ক্ষেত্রে তাঁকে করতে হয়েছিল এক হাতে বিজ্ঞানচর্চা, আরেক হাতে ক্লাসিকচর্চা।
একসাথে প্রকৃতির আদ্যমতা তথা শাস্ত্র সৌন্দর্যের উপাসনা। এই দুই ভিত্তিই এখনো আমাদের পথ
প্রশান্তি প্রদান করতে পারে। তা হলেও আধুনিক সাহিত্যিকের চিত্ত সাধনা মানে না। দিনের পথ
দিন যে প্রান্তে থাকে অবিরাম করে চলেছে সে প্রান্ত কি গোড়ের মতো অলিখিতানকেও আত্মল করে নি?
আমরা কি কেবল নীরব শাস্ত্রীয় মতো প্রেম বাব, পরে সাক্ষ্য দেব? আমরা কি কোনো অবস্থায় হতক্ষেপ
করব না, কতক্ষেপ করব না? এই নিজের স্বতন্ত্রতা কি পূর্বোচিত? এ কি অস্বাভাবিক নয়?

গোড়ের কাছে এই উত্তর আশা করা যাবে না। তার ক্ষেত্রে যেতে হবে টেলস্টের কাছে,
স্বাভাবিকের কাছে।

অরবিন্দের দ্বারা





গর্থে ও রবীন্দ্রনাথ

১

“Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichters Lande gehen.”

‘কবিকে যদি জানতে হয়, কবির স্বদেশে না গেলে নয়।’— হাইনারের ‘গ্রামকবি’ গর্ঠের নিষেধই এই উপদেশ। বতই সত্য হোক না কেন, বিদেশী রসশিখারদের পক্ষে বতই নিষেধ এর তাৎপর্য। আমাদের স্বদেশের কবিতার উন্নয়নের পথ বৎসরের একটি কবিতায় প্রতি লক্ষ্য সমাধা করেছেন এই সংকটের :

“বিদেশী ফুলের বনে আমাদের ফুলের ফটে থাকে,
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার মন্ত্রকুনি,
আম্রার আনন্দক্ষেত্রে তার স্বাতীর্থতা
অবহিত পার অভ্যর্থনা।...”

মূল স্বর্ন ভাবের পাঠ না করা পর্যন্ত গর্ঠে-কাব্য আমাদের অধিকাংশের কাছেই অজানা। হৃদয়ের পথদ্রষ্টক তো বটেই ; তবু সেই কাব্যের প্রতি স্বপ্নের উদার স্বেচ্ছার্থনাটি আমাদের মধ্যে আছে তার ক্ষমিকা রচনা হয়, কবির ভাব্য, ‘আম্রার আনন্দক্ষেত্রে’। সেইখানে আমরা মন্ত্রকুনি করি স্বর্ন মহাকবি গর্ঠের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের স্বাতীর্থতা। সে-স্বাতীর্থতা অনাগলে পরাকৃত করে হৃদয় বেশকালের দুর্লভ আবধানকে।

গর্ঠে-সাহিত্য বিচার-বিবরণ করে বুঝে দেখার মতো জ্ঞান ও বিজ্ঞা স্বর্ন করতে হলে সাধারণ একটি মাস্থের সবত্র জীবন কেটে দ্বার-কথা—এত বিপুল ও বিভিন্ন উন্নয়নই রচনা। তার ওপর রয়েছে দেশ-বিদেশের সাহিত্যসমালোচক ও জীবনীকারদের অল্প গবেষণাপূর্ণ রচনা। শেক্সপীয়ার ছাড়া পৃথিবীর অন্য আর কোনো কবিসাহিত্যিকের সম্বন্ধে এত অধিক সংখ্যক পত্রিকা, পুস্তিকা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ইত্যাদি লেখা হয়েছে কি না সম্ভব। গর্ঠের নিজস্ব রচনার বৃহৎ পরিমিতির নির্ণয় ইতালীর মনীকী বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce) যা করেছেন তার গ্রন্থের উপসংহারে, তা একজন অবিশ্বাসীর মতো বেন অনেকটা রহস্যময় ; কারণ সেখানে তিনি গর্ঠে-কাব্যের প্রাণবন্তর সত্যানী। তবু সেই সংকীর্ণ বিষয়গুচ্ছ প্রবিশদযোগ্য। ক্রোচে বলছেন যে, এক হিসাবে বলা চলতে পারত, গর্ঠে উনবিংশ শতাব্দীর যুরোপীয় সাহিত্যের প্রবন্ধ পঞ্চিত্ব :

Goethe, the initiator of all the literary forms of the nineteenth century, of the systematized poem (*Faust*), of the autobiographical-sentimental novel (*Werther*), of the novel of educational development (*Meister*), of the historical novel and drama (*Goetz and Egmont*), of the novel of passionate and moral casuistry (the *Wahlverwandtschaften*), of the Utopian novel (the *Wanderjahre*), of neo-classical tragedy (*Iphigenie*), of pseudo-Homeric poetry (*Hermann und Dorothea*), of the revival

১ The last great representative in the line of “Court poets”—Croce.

of the ancient myths (*Achilleis, Helena*), of the lyric in the manner of the folk-song (the *Lieder*), of ballads tragic and gnomic (the *Bräut von Corinth*, the *Zauberlehrling*), of poetry with an oriental tinge (the *Divan*), of the impassioned lyric in free verse (*Händlers Sturmlied, Seefahrt*, etc.); even one might say, of the esoteric lyric, a series of saltatory impressions connected by some deep and unexpressed ideal thread (as in the *Harzreise*); and even, if one wishes, the initiator of "free phrases", which the "Futurists" of to-day think they have invented (see any portion of the *Campagne in Frankreich*); not to mention all the separate motives which he has created and which have produced and continue to produce a large progeny, from Faust and Prometheus to Wagner and Mephistopheles, from Iphigenie, Margarete and Mignon to Marianne and Philine.

—Goethe, pp. 200-201.

কিন্তু ক্রোচের বিচার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়শেষে যেমন থাকে নি; অবশেষে বরং তিনি উলটো কথাই স্বপ্ন করতে চেয়েছেন যে,

✓ Every poet is an initiator, but every poet initiates something which ends with him, because the beginning and the end are his own personality. (p. 203) ✓
অর্থাৎ, সব কবিই এক হিসাবে পথিক, আবার পথিক নবও বটে। যে-পথ তারা নিয়ে নির্ধারণ করেন তার শুরু এবং শেষ তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য; কারণ তাঁদের কোনো অঙ্গুষ্ঠার উত্তরসারক যদি স্বার্থ কবি হন, তবে তিনিও নিজস্ব নিজের প্রতিভার মতুন পথ গড়ে নেন। আর যিনি শুধুই কেবল তাঁদের অঙ্গুষ্ঠার তিনি তো কবি নন, অঙ্গুষ্ঠারই মার। তাঁদের হিঙ্গার দ্বারা নিষ্ফল। পৃথিবীর বিরাট ও জটিল সাহিত্যলোকের পৃষ্ঠায় ক্রোচে সৃষ্টি করে আবিষ্কার করেছেন এমন একটি অখণ্ড মানসবৃত্ত, যা বহু হুপ্রগত থেকে, কোথাও স্পষ্ট কোথাও-বা অজ্ঞানে, সর্বগ্রন্থ বিস্তৃত হয়েছে মানবমনের আধুনিক হুপ্রগতির, ইংরেজিতে থাকে *modern spirit* বলা যেতে পারে।

আমাদের মতো বিবেচকদের পক্ষে হয়তো গহ্বরে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা, এই সমগ্রতা যেতে চেষ্টা করাই অধিক সমীচীন। সেখানে নিজের কাব্যকীর্তির চেয়ে তাঁর কবিত্বের এক বহুতর সার্বভৌম বস্তু বিকশিত হয়েছে; সেখানে তিনি ঐটি দুর্বোধ্য হয়েও বিশ্বমানবিক; আধুনিকতার উৎসবের আদিকবি হয়েও সেখানে তিনি নিত্যকালীন কাব্যপ্রেরণার রৌহোজ্জ্বল স্বর্ণপ্রতীক।

২

হরীন্দ্রনাথের মতে, কবিতা প্রধানতঃ দুজাতের—একদল শুধুই সাহিত্যজগতের কবি, অল্পদল হলেন বিশ্বজগতের। বটে কেন না আমাদের হোক, বিদেশীয় হয়েও আমরা আমাদের অস্তরের গভীরে উদ্ভাসিত করেছি যে, পৃথিবী শুধুমাত্র সাহিত্যজগতের কবি নন, তিনি বিশ্বজগতের কবি। পূর্বম সৌভাগ্য আমাদের যে আমরা কবি হরীন্দ্রনাথকে অনেক কাছের থেকে জানি। তা না হলে 'বিশ্বজগতের কবি' বলতে কি বোঝায় তার কোনো স্পষ্ট ধারণাই আমাদের হত না। হরীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সন্দেহ আমাদের বাস্তব জ্ঞান ও কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে যুগের দুর্বোধ্য এই বিশেষ

কবিপ্রতিভাকে জানতে ও বুঝতে, যেমন সাহায্য করেছিল গর্স্টের সহজে জান ও পারণা তাঁর স্বদেশের একজন সত্যপরলোকপন্থ মনীষীকে দ্বীপপ্রতিভার তামসর্ষ বুঝতে। হেরমান্ কাইজার্লিং (Hermann Keyserling) দ্বীপপ্রনাথ সহজে বুঝেছিলেন, এবং বিশেষ ক'রে তাঁর স্বদেশবাসী জর্মনবৈদ্য, পারণা স্ট্রাই ক'রে ছুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেছিলেন :

Rabindranath . . . is the great model of the full-grown ecumenic Indian of centuries to come. In this he should mean much the same to India as Goethe has meant and means to Germany.—*The Golden Book of Tagore*, p. 127.

তাঁর এই সূচিস্থিত উক্তিটিকে একটু পালটে নিলে আমরাও বোঝে যে বলতে পারি যে, গর্স্টের মধ্যে বৃত্তি পরিগ্রহ করেছে ভবিষ্যৎ জর্মনজাতির নতনতাত্ত্বীপাদের বলিষ্ঠ সার্বভৌম স্বরূপ। সে ভাবে দেখলে ভারতের ইতিহাসে দ্বীপপ্রনাথের যে মূল্য জর্মনির ইতিহাসে গর্স্টের অনেকটা অমূল্য মূল্য।

অমূল্য জীবিত সন্মানস্বরূপ জর্মন মনীষী অ্যালবার্ট হাইটল্ড-এর ভারতীয় বর্নন ও সাংস্কৃতিক বিবরণ বিখ্যাত গ্রন্থখানির ইংরেজি অমূল্য *Indian Thought and its Development* (Hodder & Stoughton, 1936) যখন দ্বীপপ্রনাথকে পাঠান, সঙ্গে তিনি একখানি পত্রও লেখেন। তাতেও দেখতে পাই ওই একই ধরনের তুলনা :

.. Let me tell you on this occasion the great love I have for you and your thought. When I call you in this book the Goethe of India* that is because, in my opinion, you are as important for India as Goethe was for Europe. (Dated Gunsbach, près Munster, Alsace, France, 15 August, 1936) "

দ্বীপপ্রনাথ কে ? না, ভারতবর্ষের গর্স্টে।— এই হল হাইটল্ড-এর মতো মনীষীরও তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিচার। আমরাও এই নজিরে গর্স্টকে Rabindranath of Germany, অথবা 'জর্মনির দ্বীপপ্রনাথ' বলে যদি কল্পনা করি তবে খুব জ্ঞান কল্পনা করব না; অথচ আমাদের পক্ষে 'লোম্বো'-রামোয়ার কীতিমান বীকের মতো অতি নূরের এই জর্মন-কবিদ্বর্গকে আমাদের মনোমুগ্ধের অত্যন্ত নিকটের স্ব'রে প্রতিবিম্বিত দেখতে পাব।

মুনিখ থেকে ডয়েশ অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট থিওডর ফন্ উইন্টারস্টাইন (Theodor Von Winterstein, President, Deutsche Akademie, Munich) দ্বীপপ্রনাথকে প্রজ্ঞা নিবেদন করেছিলেন ১৯৩১ সালে কবির সপ্ততিতম জন্মদিনের মহাশী উৎসব উপলক্ষে। তাঁর স্বদেশের কবি গর্স্টের বাণীই তখন তাঁকে সাহায্য করেছিল দ্বীপপ্র-কবিপ্রতিভার নিগূঢ়তম সত্যটিকে অমূল্যবান করতে। অজ্ঞাত নানা কথার মধ্যে তিনি বিশেষ ক'রে লিখেছিলেন :

Goethe's immortal words 'eternal urge and unceasing exertion' [ewig strebend sich bemühen] * have been actually realized in this man [Rabindranath]

২. *ঐতিহ্য*, Chapter XV : *Modern Indian Thoughts*, p. 249.

৩. *Rabindranath Through Western Eyes* by A. Aronson, p. 131, footnote No. 2.

৪. 'কটিট' দ্বিতীয় অধ্যায়ের নূর লেখকদের সত্যের বিরোধিতা দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয়তঃ :

Wer immer strebend sich bemüht

(Whoever strives without resting).

and it is a very significant accident that, soon after Rabindranath's seventieth birth-day anniversary, the world is going to celebrate the hundredth death anniversary of the great German poet.—*The Golden Book of Tagore*, p. 267.

এইসব জর্মন গৃহে-সমত্ববাদের মনীষার অমূল্যরূপে আমাদের আমাদের কবিগুরুর অনব-
বাস্তব ইংরাজি অর্থে প্রয়োগ করে সত্য প্রণাম নিবেদন করতে পারি জর্মন কবিকুলগুরুর উদ্দেশে।
“বনেগ-আম্বার বাঈনুতি তুমি”—রবীন্দ্রনাথের অতি অশূর এই কবিত্বনা আশ্চর্য সার্থকতার পরিচু-
ক'রে তোলে গৃহের আদিপ্রাণোচ্ছল কবিত্ববনের ধান-সুগন্ধীর সর্বশেষ পরিণামটিকে। তার
ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানবাবিকী উপলক্ষে উপস্থিত থাকতে পারলে পূর্ণত জর্মনের বর্তমান দুঃস্বপ্নের গটমুদিকার
কবিত্ব গৃহটিকে স্বরণ করে অব্যর্থ এক নূতন অর্থবাহিনী রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই বলতে পারতেন :

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান থাকে
হেরিছা তোমার হুতি, কর্ণে যায় বাজে
আম্বার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গঙ্গীর নির্ভর বাঈ
উদার বৃত্তার।

দুই ধরে মূলশূর ‘কাউট’ মহাকাব্যখানি ‘মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত’ ভিন্ন আর কি? আরও
তার বড়ই থাক না কেন নিরাশার বেদনা, ‘চিরপ্রাণ আশার উল্লাস’ সর্বত্র নিঃখলিত তার শেবাংশে।
বে ‘উদার বৃত্তা’তে মানবপথিক কট্ট-এর কাহিনীটির পরিসমাপ্তি তার চরম পরিণামে উদাসীনকে
নির্ধোষিত হয়েছে মানব-‘আম্বার বন্ধনহীন আনন্দের গান’।

ব্যক্তিগত অনেক পার্থক্য দবেও রবীন্দ্রনাথ ও গৃহের কবিত্বগিরিতে একটি কেন্দ্রগত মিল
লক্ষ্য না করে থাকা যায় না। যৌবনে গৃহে নিম্নে বর্ণনা করেছিলেন ‘ধরিত্রীকোলের সন্তান’
(*das Weltkind: the Child of the World*) বলে,—মনেকটা ‘বহুস্বরা’র কবি রবীন্দ্রনাথের
মতো। “বন্ধিৎ প্রফেট, বাবে প্রফেট, ধরিত্রীর সন্তান মাক্যানে”^{*}—আমাদের তবজানীর বেশে
রবীন্দ্রনাথের যৌবনও কি কাটে নি এমনি তবোই এক ত্রিশ শূর অবস্থায়? বহুই মহত্ব না হোক,
দুঃস্বপ্ন-আলোড়নমুখর পীড়োচ্ছ্বাসের কথা নিয়ে কেটেছে উভয় কবিত্বই জীবন সেই আদিপর্বে।
তৎপূর্বের বেসনামনক ‘হৃদয়-অরণ্য’বাগ ও ঘটেছিল উভয়েরই জীবনে, তাও লক্ষ্য করেছি তাঁদের
আত্মজীবনীতে। অতঃপর এক অস্বপ্নি বিবর্তনের সামল-ইতিহাসটিই এঁদের দুজনের জীবনের সব
চেয়ে অস্বপ্নী কথা। গৃহে তার পরিণত বয়সের একটি কবিতার “হৃদয় তৎকেন্দ্র” আবেশে যে আত্মশ্রিচয়
দিয়েছেন তা নিখ্যা নয় : জীবনের প্রকাতলয়ে উদার লীলার তুমি নয় ছিলে যৌবনের উন্নত সঙ্গীদের
নিয়ে, আত্মরিক কোন্ প্রবৃত্ত প্রভাবে। ‘বয়সের পর বয়সের সোপান বেয়ে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হলে তুমি

* *Prophete reits, Prophete links,*

Das Weltkind in der Mitten.

—গৃহের মাক্যানী *Dichtung und Wahrheit* [Poetry and Truth] এরই তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় ৩৫৫।

খানগোকে, দেবতুল্য শাব্বিলোকে [die Weisen, Göttlich-Milden]।* এ সেই লোক
জীবনব্যাপ্তে রবীন্দ্রনাথ যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, “অকূল শান্তি, পেণায় বিপুল বিরতি”
“যার গভীর গভীর বোন-বহিমা” কে-লোকে নিত্যবিগমিত। গ্যোটে কবিত্ববনের এই নিপুণ
পরিবর্তনটিকে কোচে বলতে চেয়েছেন ethical transition, এবং আলোচনার সুববোধে খুব জোর
দিয়ে তিনি এই নৈতিক বিবর্তন সম্বন্ধে বলেছেন, The fact of cardinal importance for the
artistic development of Goethe (p. 17)।

কবিত্ববনের এই বিকাশ ও বিবর্তনের ফলেই সেতুবন্ধন ঘটেছে উভয় কবির
জীবনের গভীরে তাঁদের কাব্যলোকের সঙ্গে খানগোকে, সে পরম লগ্নে আমাদের কবির
‘অতুলনীয় ভাষায়’ “অবশেষে এক হয়ে গেছে যার আমার জীবন, যার আমার দুবন”।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কবিত্ববনের সে-কহিনী বলে যেন যার শেষ কিছুতেই করতে পারতেন
না। গ্যোটে সে-তুলনায় অনেক নীরব; অল্পত স্নাই বাখ্যা করে বলেছেন যেন কম। তাঁর
দীর্ঘজীবনের সীমান্তে এসে তাই গ্যোটে যখন বলেন :

I have never affected anything in my poetry [Ich habe in meiner Poesie nie
affektiert]. I have never uttered anything I have not experienced, which has not
urged me to production (March 14, 1830).*

যতাবতই আমারের তখন মনে গড়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ আত্মজ্ঞান :

“জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক বিখ্যাতের করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো
বিখ্যা কখনো বলি নে—সেই আমার জীবনের লবস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।”—ছিন্নমুদ্র,
৮ মে, ১৮২০

“গাহিতো ধাতু পূর্ণম্ আমি যাহা বিবার যোগ্য মনে করিযাহি তাহাই দিয়াছি, লোকে
যাহা মাঝি করিয়াছে তাহাই পোষাগাইতে চোঁকা করি নাই।...যাহা আমার তাহাই আমি অস্ত্রকে
দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ হুবিহার পথ আমি অবলম্বন করি নাই।”—আত্মশ্রুতি, পৃ ৩৯

এ কথা অল্পত স্বীকার করতেই হবে যে, গ্যোটে বা রবীন্দ্রনাথ— দু'জনের কেউই আমাদের
যতো ‘জীর্ণ অগতে অগ্রগণ্য করেনি’। দুকূলমাবী প্রাণশক্তির প্রসঙ্গ তাকুনাদ তাই যবনের জীর্ণ
সংকীর্ণ সীমারেখা চূর্ণ করে বিশ্বনাথ-অগতের উজ্জ্বল উদার প্রাণে এসে তাঁরা ঠাঁকিয়েছিলেন ;
উভয়েই অধোবদনে লজ্জা করেছিলেন আপন যবনবাণীদের জুড় যবনের অল্পত বিস্তারবাণ-বর্ণণ।

* Dann achte schloßest du von Jahr zu Jahren
Dich näher an die Weisen, Göttlich-Milden.

* —H. Zeit-Stilllicher Divan.

—এই দুই গ্যোটে বিখ্যাত Das Göttliche (The Godlike) কবিতাটি অনুদান করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ ও গ্যোটে
এতদার মৌলিক প্রভাবটিকে আলোচ্য কবিতাটিতে স্পষ্টই করা গড়ে।

১ ‘আত্মশ্রুতি’ গ্রন্থখানি বিশেষভাবে জ্ঞায।

২ Goethes Gespräche mit J. P. Eckermann (1823-1832), অথবা ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ Conversations of Goethe with Eckermann (Everyman's Library).

এই প্রসঙ্গে গব্বের পরিণত বয়সের কিছু কিছু বাস্তব চিন্তা একেব্রমান্-এর সঙ্গে তার কথোপকথনের^১ থেকে উদ্ধৃত করা গেল। উভয় কবির মধ্যে এই ক্ষেত্রেই মনে হয় সবচেয়ে অধিক ঐক্য।—

“জাতীয়-সাহিত্য [Nationalliteratur] শব্দের আর আর কোনো অর্থ হয় না। বিশ্বসাহিত্যের যুগ সারিকটবর্তী হয়েছে [die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit] ; আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য প্রাপণ বয়স করা যাতে সে-যুগ সম্বন্ধ এগিয়ে আসে।”—জানুয়ারি ৩১, ১৮২৭

“মানবের সঙ্গে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এমন একটি সঙ্গীত চিত্র বা সত্যকে ভালোবাসে, এবং যেখানেই তার দেখা পায় না কেন তাকে শোষণ করে আপনায় করে নেয়।”—ডিসেম্বর ১৬, ১৮২৮

“মোটের ওপর বলতেই হয়, জাতিতে জাতিতে ছেব [dem Nationalhass] এক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। যেখানে সভ্যতার সর্বনিম্ন স্তর [untersten Stufen der Kultur], সেখানেই সেখানে এর সক্রিয়ততা ও উচ্চ-করতা সবচেয়ে অধিক। কিন্তু এমন উচ্চ স্তরেও ক্রমশঃ পৌছান যায় যখন এর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায় : সেখানে আমরা পড়াই, কতকটা যেন, ভগ্নভেদ সমস্ত জাতির উর্ধে [über den Nationen]।^২ সে অবস্থায় যে-কোনো প্রতিবেশী মানবগোষ্ঠীর আনন্দ অথবা বেদনা নিজেদেরই বলে অনুভব হয়।”—মার্চ ১০, ১৮৩০

“একজন মানুষ বা নাগরিক হিসাবে কবি তার স্বদেশকে অবশ্যই ভালোবাসবে, কিন্তু তার কবিস্বভিত্তির ও কাব্যকীর্তির স্বদেশ হল ভগ্নভেদ বা কিছু হ্রস্বতর মত ও মননময়, [aber das Vaterland seiner poetischen Kräfte und seines poetischen Wirkens ist das Gute, Edle und Schöne] কোনো নির্দিষ্ট প্রদেশ বা দেশের সীমায় আবদ্ধ নয় ; তাকে যেখানেই সে যেতে পারে, সবলে অধিকার করবে এবং নিজের মতো করেগড়ে নেবে।”—মার্চ ১৮৩২^৩

“মার তা ছাড়া, স্বদেশপ্রেমের কি অর্থ ? দেশস্বর্গ [patriotisch wirken] বলতেই বা কি বোঝায় ? কবি যদি নির্যোগ করে থাকে তার জীবন মায়াময় বস্তু-সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নানা সংকীর্ণ চিন্তা বা বিচারের দ্বীপকরণে, নিগ্রালোকিত মানবচিত্ত আলোক বিকীরণে, তার কৃতি ও দলবোনের কলম মোচনে, স্বদেশবাসীর জন্ম-মনের উত্তিসাধনে, তবে তদতিরিক্ত আর কি-ই বা সে করতে পারে ? কেনন করে সে সেবে এর চেয়ে অধিক স্বদেশপ্রেমের প্রাণ ?”—মার্চ, ১৮৩২^৪

মনে মনে ভাবি, গব্বের শেষের এই বাক্যগুলি কি তার বিবিধপ্রত্ন পূর্বদেশীয় অল্পবয়সী উদ্বেগে উচ্চারিত ভবিষ্যৎবাণী ! দ্বীপপ্রনাথ ও তারতবার্ষিক প্রসঙ্গে পাঠ করলে তার বাক্যের অর্থ আমাদের নিকট আরও অনেক গভীর, অনেক বেশী সত্য বলে প্রতিভাত হয়। একেব্রমান্-এর কাছে বলা তার আর-একটি শেষবাণী এই উপলক্ষে উদ্ধৃত না করে পারলাম না।

১. ফ্রান্সীয় : রোম্যান্টিক রোলাঁ (Romain Rolland) প্রণীত ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রকাশকী সঙ্গ্রহ *Au-dessus de la Mêlée* (1915) C. K. Ogden কৃত ইংরেজি অনুবাদ *Above the Battle* (Allen and Unwin, 1916)।

২. জীবনব্যাপে ‘এবাণী’ (উৎসর্গ) কবিতা ফ্রান্সীয় :

সব ঠাই মোহে বস আছে, আমি সেই বস ঘর দু'খিল,

কেন কেন মোহে লে আছে, আমি সেই লে লস দু'খিল।

Geben Sie acht, der Politiker kird Der Poeten aufzehren :
politician will devour the poet!—Later in March, 1832.¹¹

‘স্বপ্ন দেখো, হাটকরাঁ গ্রাস করবে কবিকে!’ ত্রিকালবন্দী কবির মুখের এই সাধনানোক্তি কালের ক্রুর পরিহাসে অগতে ক্রমশঃ কী ভয়ংকর ভাবেই না ব্যক্ত হতে চলেছে। গ্যোটে-রবীন্দ্রনাথের মতো অস্ত্র আর-এক মৃত্যুকোনো বলিষ্টকবিসম্মতিভা ছাড়া কে রোগ করবে সর্বগ্রাসী দুঃস্বপ্ন এই বস্তু!

গ্যোটে-সাহিত্যের এই দুঃ-ঊষায় বিশ্বদত্ত প্রকৃতিটি ভরতেই ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ক্রোড়ে তাঁর গ্রন্থের কৃষিকাতে নিষেধ জীবনের নিভৃত একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত দরমের সঙ্গে। গুট প্রথম বিশ্ববাস্যুচ্চের বেদাঙ্কুর বংশসহস্রলিতে গ্যোটের রচনা তিনি পূর্ববার পাঠ আশ্রয় করেন। তিনি বলেছেন যে, তাতেই তিনি তখন লাভ করেছিলেন গভীরতম সাধ ও সাধনার বাণী তাঁর হৃদাশ্রয় প্রাণে।¹² সে পরম দুর্দিনে বিশ্বের অস্ত্র আর কোনও কবি তাঁকে অহুত্ব তরঙ্গ বা সাধন। দিতে পারতেন কি না সম্ভব।

৩

হৃদ ‘প্রভাব’-মহানী রম বে-লম্ব সাহিত্য লবানোচ্চকের, গ্যোটে পরম বিরক্তির সঙ্গে তাবের আখ্যা গিরেছিলেন ‘ফিলিস্টাইন’ (die Philisterei)। তিনি বলতেন, গভীরতম ভাবে বা তবের রাখে ‘আমার-তোমার’ (Mein und Dein) ভেদাভেদ বিচারের কি কোনো অর্থ আছে? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন গ্যোটের দৃষ্টি অহুত্ব ছিল, ঠারাই কবির নিকটে এসেছেন তারাই সে কথা খুব ভালো ক’বে জানেন। ‘বাক্যকৌতুক’ গ্রন্থের ‘রসিকতার ফলাফল’ লেখাটি অনেকেরই হৃদতো এই প্রশ্নের মনে পড়বে—‘গোবিন্দবাবু অগভীর প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ‘সম্মার্জনী’ সাম্প্রতিক পত্রের সেই ‘মকাতা মুক্তি’ : “ইনি গবের ভাব অন্যায়সেই নিষেধ বলিয়া চালাইয়াছেন। এক স্থলে বলিয়াছেন ‘অস্থিলেই মরিতে হয়’—এই চরৎকার ভাবটি যদি পণ্ডিত সকেটিংগের গ্রন্থ হইতে চূরি না করিতেন তবে লেখকের যৌলিকতার প্রশংসা করিতাম।”

কে প্রতিভাবান লেখক কোথায় কার কাছ থেকে পেলেন তাঁর মানস-পরীক্ষের কতখানি অহুত্ব, গ্যোটে মনে করতেন নিতান্তই হাতকর এ ধরনের সম্মান। “আমরা তাঁর চেয়ে গ্রন্থ করলেও পারি কোনো-একজন হৃদ যোমান মানুষকে [einen wohlgenährten Mann] যে, সে কর গভা হাঁড় জরুর বা ভেড়া খেয়েছে [den Ochsen, Schafen und Schweinen fragen] তাঁর পরীক্ষের শক্তিসাভ করার সঙ্গে।”—অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গ্যোটে স্বয়ঃ এই কথা একদিন (ডিসেম্বর ১৯, ১৮২৮) বলেছিলেন একেদুবান-কে।

১১ হুগার জনতিভাল পূর্বের উক্তি। গ্যোটের দৃষ্টি হয় ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে।

১২ “During the sad days of the World War I re-read Goethe's works and gained deeper consolation and greater courage from him than I could have gained perhaps in equal measure from any other poet.”—Goethe, p. xviii.

অন্তঃ "রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র উপরে পোটের স্বয়ং সঙ্গীতবাহী কিছু ছাড়াপাত,"^{১০} "প্রতিভার প্রতিপোষ কাব্যে কাজিন্টের প্রভাব,"^{১১} কিংবা নিজের স্বল্পভঙ্গ কবিতার গুণের 'মহম্মদের গান' (Mahomeds Gosing) কবিতার স্থগতীয় সানুতলক্ষ্য,^{১২} ইত্যাদি প্রমাণহীন নানা নিম্নলিখিত ভাবে প্রবেশ না করে গুণের জীবনী, রচনা ও চিন্তাভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষেপ-বোধযোগের কথা বলাসাধা খালোচনা করাই আমরা সযতীন বিবেচনা করি।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ষখন যাত্র বছর সত্তরো ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (১৮৮৫) কার্তিক সংখ্যায় তিনি প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী (পৃ ২৮২-২৯৮) এক প্রবন্ধ লেখেন গুণে সম্বন্ধে। প্রবন্ধটির নাম 'গুণে ও উৎসাহের প্রাথমিকগণ'। গুণে তাঁর আত্মজীবনীতে যে-কয়জন প্রাথমিক কবি বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে শুধু কেবল সেই কয়জনের কথাই সংক্ষেপে বলেছেন, এবং তাও অনেক ক্ষেত্রেই গুণের নিম্নের উক্তির সরল অনুবাদের মত দিয়ে। প্রবন্ধটির স্থানাংকটুকু উদ্ধৃত করা গেল :

"গুণের বোধের বিশেষ পরিচয় নিম্নের আবৃত্তক নাই। যিনি জর্জান-সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অলম্বার স্বতন্ত্র—যিনি "কই" নামক নাটক লিখিয়া মানব জীবনের স্বতন্ত্র শিখা পথ্য কাপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনি প্রথমে ইউরোপমণ্ডলে আবার পশ্চিমের আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন,^{১৩} তাঁর আর নূতন পরিচয় কি দিব?—কিন্তু তিনি অধিতীক্ষণে স্বতন্ত্র ও বহুদলী ইহাও জীবনে কতদূর হুৎ বয়স ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আর উদ্ধৃতি করিতেছি—"^{১৪}—ভারতী ১৮৮৫, পৃ ২৮২

কিন্তু এই একটিনা প্রবন্ধের সাহায্যে গুণে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ঔৎসুক্য অনেকটা প্রদানিত হলেও গুণে-সাহিত্য গুণের তেমন কোনোই স্থানই দাখ্য লাভ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বিলাতযাত্রার (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮) পূর্বে আবেশাবাসে ও বোম্বাইতে মাস ছয়েক কাটিয়েছিলেন। "বাহিবাগে তবের বাসা ;...মেঘদাসা আশালতে চলিয়া বাইতেন ;...একটি বড়ো

১০ কাজী আবদুল ওহুদ এন্ড 'কবিতা পোট' এর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮। 'স্বয়ং সঙ্গীতবাহী' অথবা Die Fehleerwandtschaften (The Elective Affinities)।

১১ 'জল' পত্রিকা, ১০ তার ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ।

১২ এই কবিতাগুলিকে লেখার উক্তি তুলিয়া:"Truly remarkable is the song which the prophet sings, magnificent in its lyrical flight, celebrating the increase, the spread and the triumph of his doctrine in the future, under the image of the brook (যদি কবিতা অনুবাদে den Felsenquell) which gushes out from the rock, and through the flowering fields, never stopping and welcoming many other streamlets, widens out to a regal river and flows into the ocean."—Goethe, p. 104.

১৩ জটীন সাহিত্য (১০১৫) গ্রন্থের 'বহুদল' অধ্যায়ের আরম্ভে তুলিয়া। গুণের বিখ্যাত 'পশুদল' (Sakoulala) প্রাক্টর রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবভারত' গ্রন্থে সংকলনের (১০১০) 'জটীন ভাব'। কবি ও কবি' বিভাগে ১০ পৃষ্ঠায় উক্ত। কবিতাটিতে সেখানে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব আদ্যকল্প "৪" পাথর আছে।

ঘরের মেঝেদের খোশে খোশে মেঝেবাহার বইগুলি লাজানো ছিল। ইংরেজিতে নিত্যনতুন কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন তিক্তনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া সিলাম।^{১৭} স্বীয়-
স্বস্তির স্বস্তি আমি পাতুলিগিতে তিনি আর একটু বিশদ করে লিখেছিলেন : “ইংরেজিতে আমি
যে নিত্যনতুন কাঁচা ছিলাম বিলাত কাঁচাবার পূর্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল।
মেঝেবাহারে বলিলাম, ‘আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।’
তিনি আমার সম্মুখে টেনে (Hippolyte Adolphe Taine) প্রকৃতি গ্রন্থকার-রচিত ইংরাজি ভাষা ও
সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার চূড়ান্ত বিচারনাম না
করিয়া অজ্ঞান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি,
আ্যালো ভ্যাক্সন ও আ্যালো নরান সাহিত্য-সম্বন্ধী আমার সেই প্রবন্ধগুলিও ভারতীতে বাহির
হইয়াছিল।^{১৮} কিন্তু উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া যুরোপীয় সাহিত্যের তিনজন স্বানামধন্য কবির প্রদয়
কাহিনী নিয়েও তৎকালে বালক রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ‘গেটে ও তাহার
প্রণবিনীগণ’ সেই প্রবন্ধমালাই অন্তর্গত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের আ্যালো-ভ্যাক্সন, আ্যালো-
নরান প্রকৃতি আদিগুণের পুরাতন-চর্চার অবকাশে বৃহত্তর যুরোপীয় সাহিত্যলোকের থেকে দাড়ে
শিত্রাকী গেটে ও তাহার প্রণবিনীগণের এই যে রবীন্দ্রনাথের রচনা-রচনা প্রথম প্রবেশ, এই স্বাক্ষরনার
মূলে ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থে উল্লিখিত “এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা” বোঝাইয়ের সেই মহতী মহিলাটি
নেই তো, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “বিনি স্বকৃষ্ণকে ক’রে মেঘে এনেছিলেন তার শিকা বিলেত থেকে” ?
অতপূর্ণ তরুণরক্ত ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে সময়ে কবিকাহিনীর আদান-প্রদান হওয়াটা খুব অসম্ভব নয়
বলেই মনে হয়। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের মানসলোকের ‘কবিকাহিনী’ উপহার দিয়েছিলেন,
আমরা জানি। তার পরিবর্তে পাণ্ডুরঙ-কক্স তাঁকে তার বিদেশীয় বিচার ভাণ্ডার থেকে হস্তান্তর কিছু
বাস্তব কবিকাহিনী উপহার দিয়ে থাকবেন। দাড়ে এবং শিত্রাকী সম্বন্ধে প্রবন্ধ হুজিৎ^{১৯} উভয় কবির
কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের অনেক দীর্ঘ অংশ রবীন্দ্রনাথ বাংলায় কাব্যানুবাদ করে দিয়েছিলেন।
‘গেটে’ প্রবন্ধে তার দ্ব্যতিক্রমটি আমাদের লক্ষ্য করা কঠিন : প্রবন্ধটির শেষের দিকে লিলির গানের
একটিমাত্র ছত্র ছাড়া অন্তর আর কোথাও তিনি গুহ্যের কাব্যের সঙ্গে নিজের পরিচয়ের যে তাৎপ
প্রমাণ দেন নি। অবশ্য, প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি একথাও বলে নিয়েছেন, “দাড়ে ও শিত্রাকীর প্রেম
প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থক্য অর্থাৎ সাধারণ।...গেটের ভীষনে এক-একটি প্রেম-
আখ্যান শেষ হইলে, আমরা তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দাড়ে বা শিত্রাকীর স্ত্রী কবিতা
লিখিতেন না।” বলা বাহুল্য এই উক্তি অর্থ-সত্য। ‘কবিকাহিনী’ কাব্যের নির্মাণ আবেশবাদী
ভাববিলাসী বাসক-কবিকে বস্তুর গুহ্যের উপমা-অলংকারবিহীন বাস্তবমুখী কাব্য তখনো তেমন গভীর-
ভাবে আকর্ষণ করে নি।

১৭ প্রাথমিকভাবে ‘আলোবাহার’ পরিবেশে।

১৮ প্রাথমিকভাবে, নতুন সংস্করণ : ‘প্রণবিনীগণ’ অংশে উল্লিখিত।

১৯ ‘নিরাকীর্ণ’, দাড়ে ও গীতার কাব্য ; ভারতী, ১২৮৪ ভাগ, পৃ ২১১-১১২।

‘শিত্রাকী ও দাড়ে’ ; ভারতী, ১২৮৪ আদিত্য, পৃ ২২২-২২৩

লিউইস্-এর পৃষ্ঠে-জীবনী^{১০} থেকে তাঁর প্রবন্ধটির মাল-মশলা প্রদানতঃ সংগ্রহ করে থাকলেও কিন্তু কিছু বাইরের বিবরণ যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, তা আমরা তুলনা ক'রে দেখেছি। পৃষ্ঠের প্রথমিনীর সংখ্যা একাধিক। প্রেমিক পৃষ্ঠের জীবনের নিম্ন বৎ একটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, সেইটাই তিনি তাঁর প্রবন্ধে ছুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। আমাদেরও লক্ষ্য করবার বিষয়, তখন থেকেই পৃষ্ঠে-কাব্যের চেয়ে পৃষ্ঠে-চরিত্রের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের অধিক কৌতূহল এবং আকর্ষণ। পৃষ্ঠের প্রণয়ী-জীবনে 'ফ্রেডেরিকা'র (Friederike Brion) স্থান লক্ষ্যেই মনে করেন সবার উর্ধ্ব, উক্ত বিষয়গাত্ত কাহিনীর উপসংহারে পৃষ্ঠের আবেগপূর্ণ মূল্যবান যে-মন্তব্য, তাঁর রবীন্দ্রনাথকৃত বঙ্গানুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :

"প্রাথমিক আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল—আনবেণ আমাকে পরিচয় করিয়াছিল—কিন্তু এই গ্রন্থে আমি নিজে মোহী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর ছদ্মবেশ অতি পত্নীত্বের স্থান পর্যন্ত আহৃত করিয়াছিলাম। অত্বেকায়তন অত্বেকায়তন সেই অতি আরাধ্যদায়ক প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মাত্ৰমধ্যে ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাহ্নে কাহ্নেই অস্ত্র সোকেব উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।"^{১১} —ভারতী ১২৮৫, পৃ. ২২৬

এই মহিলা আত্মীয় অবিবাহিতা ছিলেন, এবং শোনা যায় কারও কাছে বলেছিলেন, 'যে ছদ্ম পৃষ্ঠকে ভালোবেসেছে, সে আর অস্ত্র কাউকে ভালোবাসতে পারে না।'

আলোচ্য প্রবন্ধটির আরম্ভাংশে রবীন্দ্রনাথ পৃষ্ঠের আর একটি মূল্যবান উক্তির ভাবানুবাদ দিয়েছেন, এবং সেটি তিনি সম্ভবত লিউইস্-প্রবন্ধে বাহির থেকে সংগ্রহ করেছেন, বিশেষ ক'রে বেনিয়ার (Bettina Brentano) মন্তব্য অংশটি। পৃষ্ঠের মানসচরিত্রের একটি নিম্নভার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত সেই উক্তিটিতে :

"গেটে বলেন, বালাকালে তিনি ফুলের গাশপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিন্তু সে সম্বন্ধিত আছে—গাশপড়ি গাশপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা তাঁরই উপর কিঞ্চে প্রযুক্ত আছে।"^{১২} বেনিয়ার তাঁহার প্রথমিনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন রবীন্দ্র ছদ্ম লইয়াও গুপ্তে সেইরূপ কবিয়া দেখিতেন।"^{১৩}—ভারতী ১২৮৫, পৃ. ২৮২

১০. *The Life and Works of Goethe by George Henry Lewes (1855)*। দুই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের সন্ধিগত সত্যল *The Story of Goethe's life (1873)* জীবনাব্যয় ব্যবহার করেছিলেন। কবির সম্বন্ধে "Rabindranath Tagore" নামাঙ্কিত পুস্তক প্রবাসি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে।

১১. তুলনীয় : Gretchen had been taken from me; Anchen had left me; but now, for the first time, I was guilty; I had wounded, to its very depths, one of the most beautiful and tender of hearts. And that period of gloomy repentance, here (of the love which had no invigorated me, was agonizing, insupportable. But man will live; and hence I took a sincere interest in others.—*The Story of Goethe's Life*, Book III, Chap. I, p. 70.

১২. শ্রাব্ধবীন্দ্রের সেখানে অঙ্গিত John Oxenford কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি তাঁর অন্তর একটি প্রকাশন ১৮৫১, সেখানে Anchen নামটির ইংরেজি রূপ 'Annette' আছে।

১৩. তুলনীয় : From my earliest years I felt a love for the investigation of natural things. . . . "I remember that as a child, I plucked flowers to pieces to see how the leaves were inserted into the calyx, or even plucked birds to observe how the feathers were inserted into the wings.—*Truth and Poetry*, Part I, Book IV, Oxenford's translation.

আবাস্যাকালের এই বিশ্লেষণমূলী পর্ববেক্ষণ-মতটি গৃহ্যের সমগ্র মানসিক চরিত্রের একটি অতি বিশিষ্ট অঙ্গ। এইই প্রেরণা জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর মনোযোগ ও লেখনীকে বিজ্ঞানের নানা বহুস্তরয ব্রাজ্যে ও বহল পরিমাণে আকর্ষণ করেছে, সে কথা কারো অবিদিত নেই। এই বিজ্ঞানী-গৃহ্যে লক্ষ্যে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত 'সাপনা'-পর্বে লোকেশ্রনাথ পালিতকে লেখা (১২২৮-২৯) পত্রাভ্যাসের মধ্যে এক জায়গায় অতি সুস্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন :

"গেটে উদ্ভিদত্ব লক্ষ্যে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদবৃত্ত প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায় নি, অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে-সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলঙ্কিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে আছে।"^{২০}

এই মন্তব্যটির উৎপত্তি যে গভীরতর বিশ্বাসের থেকে সে লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বলেছেন, "পর্ববেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিত্তাঙ্গীল মানুষ পর্বন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" এ হল তবের সাজোর তর্ক, মতভেদের দৃষ্ট অবকাশ এর মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া, গৃহ্যের সুবিপুল বিজ্ঞানচর্চায় মধ্যেও যে সর্বত্র একটি বৃহৎ কবিরূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সে লক্ষ্যে আলোচ্য পত্রাভ্যাসের সময়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা খুব সজ্জ্বত পরিহার ছিল না। আচার্য রূপবীন্দ্রস্বরের আবিষ্কার কে-প্রেরণায় একসা তাঁর সমবেশনী কবিরূপ রবীন্দ্রনাথকে উদ্ভূত ও উৎসাহিত করেছিল, গৃহ্যের আবাস্যাকালের ধর্ম্য প্রকৃতিটি জানতে গেলে সে-ক্ষেত্রেও কবি সেই একই ধরনের প্রেরণা লাভ করতেই বলে আমাদের বিশ্বাস। গৃহ্যের জীবনে বিজ্ঞানের তত্ত্ব-সম্ভার বিশ্বপ্রকৃতিতে নিগূঢ় একটি সামন্ত ও যুগের ঐক্য-সম্মানের প্রবল এক আনন্দিক আশ্রয় থেকেই উদ্ভূত। এই প্রসঙ্গে একজন পাক্তাতা মনীষীর নিয়োক্ত উক্তিটি প্রণিপাতযোগ্য।—

From first to last, in his nature-study, be it noted, Goethe's attitude differed from that of the ordinary man of science. His interest in such discoveries as he made was not for themselves, but for the light they cast on the processes of nature as a whole. His persistent endeavour was to attain a conception of the *Kosmos* which would satisfy both his intellect and his heart.^{২১}

এই লেখকই অন্তর্যায়ের আলো করে ধরিবে দিচ্ছেন গৃহ্যের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ ও কবি স্বরূপের অন্তর্নিহিত আত্মীয় সম্বন্ধটি :

Kant's conception "that a work of art should be treated as a work of Nature and a work of Nature as a work of art" was, however, no new revelation to Goethe. . . It was his deep conviction that to the production of a poem and to the making of a scientific discovery the same faculty was needful—the imaginative reason. For him, therefore, there was no incongruity between the labour that went to the creation of *Faust* and the labour that resulted in the discoveries of the

২০ "পত্রাভ্যাস (২)," 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিচিতি অংশে উল্লিখিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম বর্ষ, পৃ ৪১০।

২১ *Life of Goethe by F. Hume Brown; Vol. I, p. 274-75.*

metamorphosis of plants, of the intermaxillary bone, and of the relation between the skull and the vertebra. **

গষ্ঠে ও হবীজ্রনাথের পরিণত বয়সের কবিমানসের মধ্যে যে একটি ঐক্যলব্ধ দেখা যায় তার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে; উপরের উদ্ধৃতিগুলির এবার তুলনা ও বিচার করলে অন্যথাসেই ধরা পড়বে; কোথায় তাঁদের কবিপ্রকৃতির অন্তর্গত নিয়ত পার্থক্যটি। তাঁদের উভয়ের উচ্চ-উষায় কবি-মানসের শেষ ঐক্যতীরে পাশ্চাত্য ও পূর্ববেশের কবি পৌছেছিলেন, এক হিলাবে বলতে হয় বিপরীত-স্থায়ী দুইটি কবিপ্রকৃতির স্থায়ী বিবিশিষ্ট বেধে। একদা তাঁদের উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পূর্বে শিলার (C. F. Johann Schiller) তাঁর কবিবন্ধুর বিষয়ে বলেছিলেন,

His [Goethe's] philosophy is not wholly to my liking ; it draws too much from the sensible world, whereas I draw from the soul. ** আশ্বাসের তাই যেন হয় কবিপ্রকৃতির এই বিপরীত-স্থায়ীতা কিছু প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভৌগোলিক বিভেদের উপরে নির্ভর করে না। বস্তুত এ ভেদ মানব সাধারণের স্বভাবগত 'বহির্মুখী' অথবা 'অন্তর্মুখী' প্রবণতারই অনেকাংশে পরিচায়ক।

৪

হবীজ্রনাথের সাহিত্যজীবনে তাঁর প্রথম বিলান্তবাহ্যার বংশর, ইংরেজি ১৮৭০ সাল, বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ বংশরতই বহুই দুর্বল সময়ক্ষেপে হোক না কেন—তার বয়সের অল্পশ্রুতে দুর্বলই বা সম্পূর্ণ বলি কেনন করে?—হবীজ্র-কবিমানসও বেরিয়ে পড়ল যুরোপীয় সাহিত্যরাজ্য ভ্রমণে। এ কথাও কিন্তু স্মরণ রাখা কঠোর যে, সে-ভ্রমণের প্রণয়ন বাহন জিরদিনই ছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, এবং সে দূর্তাগা ভ্রমণে একা হবীজ্রনাথের কেবল নয়, মধিকার ভ্রমণতবাসীরও। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজে খুব খাতি কথাই বলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে :

"আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। যুরোপের যে-সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্যাদা সংজ্ঞার সাধনায় পরিষ্ফুট হইয়া উঠিতেছে সে-সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এইমাত্র সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"—জীবনস্মৃতি, 'ভ্রমণস্মৃতি' পরিচ্ছেদ।

হবীজ্রনাথের বহুভাগ্য এই সময়ে বাস্তবিকই বৃথক পরিমাণে অল্পকূল হয়েছিল। বিলাতে গিয়ে তিনি সহপাঠিক্সে পেয়েছিলেন তারক পালিত মহাশয়ের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে; ভারতে ফিরে অনতিকালের মধ্যেই গেলেন প্রিয়নাথ সেন ও স্বীকৃতোষ জৈনদীকে। এঁদের মধ্যে প্রিয়নাথের সম্বন্ধ জীবনস্মৃতিতে হবীজ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "সাহিত্যের সান্ত সমুদ্রের নাবিক তিনি। সেই ও বিশেষ প্রায় সকল ভাবের সকল সাহিত্যের বড়ো হাতার ও পলিতে তাঁহার সদাসর্বদা

২৫ Life of Goethe by P. Hame Brown; Vol. II, p. 413-14.

২৬ Ibid, p. 412.

আনাপোনা।" আন্তোনিও সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "করাগি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে উচ্চতর বিশেষ বিলাস ছিল।" বস্তুত প্রিয়নাথ সেনেরও মূখ্য ক্রোড় ছিল এই করাগি সাহিত্যেরই দিকে। ফলে, প্রাধান্যতঃ রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্য, ভিক্টর হ্যাগো, থিওফিল গোট্‌ফ্রে (Theophile Gautier) প্রমুখ করাগি সাহিত্যিকের রচনা, এবং 'কিন্তু ইতালীয় রচনা'।^{১৭} যুবক রবীন্দ্রনাথকে সহজেই বেশি আকর্ষণ করে। তাঁদের সে-যুগের সাহিত্য-অলোচনায় তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই হয়। পরবর্তী যুগে প্রমুখ জেহুদী মহাদেশের সাহিত্য-সম্প্রদায় ফ্রান্সিস ও রবীন্দ্রজীবনে অমূল্য করাগি সাহিত্য খোঁজাই চড়েছিল, সে কথাও সর্বজনবিদিত। এই পটভূমিকার সঙ্গে মিলিয়ে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত লোকেন পাণ্ডিতকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানির সেবাংশ বর্ণন পাঠ করি তখন বেগুটেও আশ্চর্য হই না। সেখানে তিনি সত্যকালীন ইংরেজি (১৮২০-২২ খ্রীষ্টাব্দ) আধুনিক সাহিত্যে 'অধিনিমিত্ত প্রকৃতি'র প্রতি ক্রোড়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "আমার একটা অল্প সংখ্যক আছে যে, সত্যকে যে অবস্থায় হস্তদ্বারা শাস্ত্রা সম্বন্ধ তাকে তার চেয়ে ঢের বেশি পাবার চেষ্টা করে, তব্বিনেতা তার চারদিকে বিস্তার বিখ্যা অনুশীলন করে তোলে। ইংরেজেরও হস্তো সে-যোগের কিঞ্চিৎ অংশ আছে।"^{১৮} এই কথা মন্তব্যটিকে 'একটা প্রাইভেট প্রসঙ্গভূমিকা যাত্রা' বলে লক্ষ্য করবার চেষ্টা তিনি সেখানে করে থাকলেও, আমাদের মনে হয় এই মনোভাবই রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি তাঁর অগ্রবর্ণের অভাবের মূল কারণ করে দাঁড়ায়। সে যুগের কাব্য 'প্রভাত সংগীত' ও 'কড়ি ও কোমল'ের 'অনুবাদ'-কবিতাগুলিতে বা 'বিশেষী ফুলের গুচ্ছে' তাই আমরা করাগি বহুকবি ভিক্টর হ্যাগোর সাক্ষ্য অনেক বারই পাই, কিন্তু গুচ্চে, হাইনে প্রমুখ রবীন্দ্র কবির কাব্যেই দেখা একটাবারের মাত্র পাই না।^{১৯}

এই ধরনের অনুগ্রহের—অথবা হস্তো বলা সমীচীন অনুগ্রহ—আবহাওদ্বারদ্বারা রবীন্দ্রনাথের রচনা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে কিন্তু বাস্তবিকই অস্বাভাবিক হতে হয় তাঁর উল্লেখও অগ্রবর্ণের মধ্যে। ইংরেজি ১৮৮৪ সালের রবীন্দ্র-বাক্য সংকলিত *The Dramatic Works of G. E. Lessing / Bohn's Standard Library / 1878*, থেকে শুরু করে "Rabindranath Tagore / July 1892" বাক্য সংকলিত প্রথম বই 'কউল্ট'-এর হেগার্ড-কৃত পঞ্চাশবাবের ১৮২২ সালে প্রকাশিত সংশোধিত নৃতন সংস্করণ^{২০} পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্যের সেবা থান করছে বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ বা তিনি সে-যুগে কিনেছেন ও পড়েছেন বলে বিশ্বাস্যতঃ, রবীন্দ্রজীবনের গ্রন্থ-সংগ্রহে আজও দেখা যায়, তা নিতান্ত নগণ্য নয়।^{২১}

১৭. উদাহরণ : 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' (১) প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত ; পাণ্ডুরাম দাসবাজার পত্রিকা ১৯২২, পৃ. ১৪।

১৮. রবীন্দ্র-জীবনী, অষ্টম বহু, পৃ. ৪৭৬।

১৯. অলোচনা-অনুবাদের অধিকাংশই ভারতীয় ১৮৮৭ (ইং ১৮৮২) সালে বাহির হয়।

২০. 'বহু লাইব্রেরি' (Bohn's Libraries) গ্রন্থসংকলিত বইটির পরিচয় নিম্নলিখিত আছে :
Goethe's Faust, Part I. The original text, with [Abraham] Hayward's Translation and Notes, carefully revised, with an Introduction and Bibliography by C. A. Buchheim, Ph.D., Professor of German Language and Literature at King's College, London. [April-May, 1892.]

২১. 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্যোট'—গ্রন্থোচ্চল সেন ; 'সেন' পত্রিকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৮৭ সালের ২৪ বৈশাখ, কবির জন্মদিনে স্বর্ধুমানী দেবীর পুত্র, ভাগিনেয় জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল মাতুল রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন *The Poems of Heine / Translated by Edgar Alfred Dowring, C. D. / George Bell and Sons, / 1884*, গ্রন্থখানি। সেই একই বৎসরে “যেহ বোঠান” জন্মদাননিবী দেবীকে তাঁর জন্মদিনে, “১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৪” [২৭ জুলাই ১৮৮৭] তারিখে “হরি” অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বসু উপহার দেন *Henry Irving Edition / The First Part of Goethe's Faust from the German / by John Anster LL.D. / with an introduction / by Henry Morley LL.D. / Illustration by J. P. Laurens, / London, George Routledge and Sons / 1887*, সচিব পোডন-সংস্করণ গ্রন্থটি। *George Bell and Sons* এর *The Dramatic works of J. W. Goethe (1880)* গ্রন্থখানি ইতিপূর্বেই ক্রয় বা সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবতঃ পুর্বেয়োগিত *The Dramatic works of G. E. Lessing* এর দৃষ্টি বই হিদাবে। স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, উক্ত নাট্যসংগ্রহে ‘ফাউস্ট’ নাটকটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

অতএব, ১৮৮০ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাগত্বর্নের কয়েক বৎসরের মধ্যে, ইং ১৮৮৪ সাল থেকে জর্মন সাহিত্যের ইংরেজি অহুযাং রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন শুরু করেন। সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্য চিন্তা ও নৃতিকির চায়াপাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর সমসাময়িক ও কিয়ৎপরবর্তীকালের কাব্যে, এবং বিশেষ ক’রে গদ্য-প্রবন্ধসিঙিতে ও চিন্তায় এই সময় থেকে সূচিত হইতে থাকলেও, তাতে কিছু জর্মনিক প্রভাব বিশেষ ক’রে নজরে পড়বার কোনো হেতু নেই। বলা বাহুল্য ইংরেজি চিন্তা ও সাহিত্য তখনো তাঁর মানসবায়াজের রাজ্যসনে।^{১২}

১৮৮৭ সালে জন্মদিনে উপহার-প্রাপ্ত ‘হাইনে’র অহুযাং কাব্যখানি (*The Poems of Heine*) পাঠ ক’রে মূল জর্মনভাষা শিক্ষা করার উৎসাহ জাগে রবীন্দ্রনাথের, সে কথা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। সেই প্রাসঙ্গিক উক্তিটুকু আমরা অনতিবিলম্বেই উদ্ধৃত করব। এখানে শুধু লক্ষ্য করা দরকার যে, গদ্য-কাব্য পাঠ তাঁকে জর্মনভাষা শিখতে উৎসাহ করে নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিকথিক বক্ততঃ আকর্ষণ করেছিলেন জর্মনির অন্ততম শ্রেষ্ঠ ঐতিকথিকি; রবীন্দ্রনাথের কাছে গদ্যে তখনো প্রধানতঃ নাট্যকার, তাঁর ঐতি ও গাথা কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যোগ হয় কোনো দিনই যথেষ্ট ভালো ক’রে ঘটে নি। হাই হোব, অবশেষে শুরু হল তাঁর জর্মন ভাষা শিক্ষা, ১৮৮৭ সালের পরবর্তী কোনো এক সময়ে। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের তখন যোগাযোগ ঘটে যায় এক জর্মন মিলনরি মহিলার সঙ্গে : তাঁর সাহায্য গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বেশ কয়েক মাস ধরেই উৎসাহের সঙ্গে জর্মন শিক্ষার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ত্রুট প্রয়াসে বাধ সাধল কবির প্রণয় উপস্থিত বুদ্ধি ও সতেজ কল্পনাপ্রসঙ্গি,— তাবা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অধ্যবসায় ও মনোযোগ দক্ষা কুরা তাঁর পক্ষে ক্রমেই কঠিন হতে লাগল, কারণ জাভাজান বাস্তবিক তাঁর যে-পরিমাণ ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি ও অনেক গভীর বিষয়

১২ তুলনীয় : হিবিং এসক (১৮৮৩) : আলোচনা (১৮৮৪) : কৃষ্টি ও কোমল (১৮৮৫)—“আমি তখন কৃষ্টি ও কোমলো কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আবার সেই সকল মেযার তিনি (আন্তোয় প্রাণী) কল্পাসি কোনো কোনো কথি কাষের কিল দেখিতে পাইতেন।”—হীলনবতি উইল : হিবিং (১৮৮৭) : সমালোচনা (১৮৮৭) : পারিবারিক স্মৃতিলিপি [১২২৪-১৯০২] ও পক্ষকৃত (১৮৯৭) প্রভৃতি রচনা তুলনীয়। হুগো-প্রবাসী পত্র (১৮৮৫), বা হুগোয় কাঠির ভাগি (১৮৯১, ১৮৯৩) এর দৃষ্টি উল্লেখের অপেক্ষা চাযেনা।

ও তার তিনি আশ্রমে কতকটা বেন হাথড়ে হাথড়ে গুকে ফেলাতে লাগলেন। এই দুর্বল ভাবাজ্ঞানের উপরেই বোলো-আনা নির্ভর করে, এবং নিজের কল্পনা ও উল্লসিতবুদ্ধির মাথা ঘেলে দিয়ে জর্নালিস্টদের হাতের তার সেই যে স্বপ্নে উড়ে চলা, বিশেষ শিক্ষয়িত্রী তার সম্পূর্ণ রহস্য পরতে না পেরে ভাবলেন সত্যিই বুদ্ধি তার ভাবাজ্ঞান পাকা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের অব্যবহিত্তে এবার উদ্ধৃত করা যাক তার জর্নালিস্ট-শিক্ষার এই কোহুশল উদ্বীপক বিবরণ :

I also wanted to learn German [ইতিপূর্বে লেখক বলেছেন, when I was young I tried to approach Dante.] and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language,—which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকলেন না। অন্তঃপর সদর উৎসাহে ক'ণে দিলেন তিনি গর্টে-সাহিত্যে :

Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*. I believe I found my entrance to the palace, not like an intimate who has keys for all the doors but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dark to me.

রবীন্দ্রনাথের এই অত্যন্ত মূল্যবান আত্মোক্তিটির প্রতি সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রভাসচন্দ্রের মৃণোপাখ্যায় তার ‘রবীন্দ্রজীবনী’র পরিবর্তিত সংস্করণে (১৩৭৩)। সেখানে কিন্তু তিনি উদ্ধৃতিটি করেছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ বাধ্যতাক্ষর ও যে. এইচ. মুইরহেড (S. Radhakrishnan and J. H. Muirhead) সম্পাদিত *Contemporary Indian Philosophy* (১৯৩৬) গ্রন্থের ‘The Religion of an Artist’ (p. 31) নামক রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধটি থেকে।** বস্তুতঃ এ উদ্ধৃতি ১২৩৯ সালের বহু পূর্বকার ; ১২২৪ সালের যে মাসে চীন-প্রবাসের সময় গেটিকে শহরে লেখানকার সাহিত্যিকদের এক ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথ মূল বক্তৃতাটি সর্বপ্রথম দেন।**

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ১৮২০ সালের ১৬ অগষ্ট তারিখে তার দ্বিতীয়বার বিলাত দ্বারা অব্যবহিত পূর্বে, ১৮২২-২৩ ফুটবলের মধ্যে জর্নালিস্ট-শিক্ষার এই বিফল প্রয়াস করেন। প্রথম জৌদুহী মহাপন্থকে শিলাইবা খেঁকি লেখা ৩ জুন, ১৮২০ তারিখের এক পত্রে তিনি লিখেছেন :

“জর্নাল *Faust* অল্প অল্প ক’রে পড়তে চেষ্টা করছি। ভূমি-ধাঁকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ দক্ষ পড়া দুই মাসে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা

৩৩ ‘রবীন্দ্রজীবনী’, পরিবর্তিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৩। পৃ. ১১, ৪৮, ১৭৫-১৭৬।

৩৪ *Talks in China* (1925), p. 67-68.

নাথেরেবের কৈকিয়ত প্রত্যাদের বরখাশ এসে পড়লে জর্জান ভাষা বুকে গুঁঠা কি রকম ব্যাণ্ডার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।”

‘Properly speaking, I do not know my Goethe’—এটি রবীন্দ্রনাথের বিনয়বচন বটে, বহুলাংশে সত্য উক্তিও বটে। কলে রবীন্দ্রনাথিহিতো। পৃষ্ঠের প্রভাব সন্ধান করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদেরই সম্ভাবনা অধিক, বিশেষতঃ সেই সব রচনার দ্বার মূল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন কবিত্ববোধের নিপুণত্বের তত্ত্বেরই একটি সর্বিপেষ প্রতিবিম্ব ন্যায়। তবে এ কথাও সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পৃষ্ঠের ঠাণ্ডা প্রতিভার সমগ্রতার বুকে নিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার পক্ষে শেষ পর্যন্ত কোনো বাধা ঘটে নি, ভাষাগত এই বাইরের বাধা সর্বত্র। তাঁদের উভয়ের ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার মধ্যে অনেক বিশেষ থাকলেও, গোত্রগত একটি বৌদ্ধিক মিল সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথমাবলীর অল্পসময়ের মধ্যে কয়েক ভাষাচার তাই মিলেই দেখতে পাই তিনি পৃষ্ঠের লেখার স্থানে স্থানে প্রাপের গভীর সত্য পেয়েছেন।

পৃষ্ঠের সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পত্রের রবীন্দ্রনাথের ঘটে নি; কিন্তু এ কথাও দেখেছি তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, *With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust.*

পৃষ্ঠের ‘কাউন্ট’ মূল জর্জানভাষা পড়ায় চোঁচা যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কয়েক বৎসরেও পরিত্যাগ করেন নি, তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আমরা পাই তার “July 1892” তারিখের স্বাক্ষর সংবলিত ‘কাউন্ট’ গ্রন্থের খণ্ডের ইতিপূর্বে উল্লিখিত হের্ডার-কৃত পদ্মাহ্বান গ্রন্থটি থেকে। বইটিতে বার পৃষ্ঠার মূল জর্জান পাঠ ও ডান পৃষ্ঠাতে তার ইংরেজি আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া আছে। গ্রন্থের মধ্যে আরম্ভের দিকে NACHT অথবা Night Scene স্থানে স্থানে কবির ইচ্ছাকৃত চিহ্ন এখনো বহন করছে বলে মনে হয়। কাউন্ট-এর কবির ‘প্রভাব’ বলব না, তবে নিজের আদর্শ ও কল্পনার তার কোনো কোনো আদর্শ ও কল্পনার ‘সদ্য’ যে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে পেয়েছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ কবির পুরাতন চিরিগহের কয়েকটি প্রাদম্বিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

সুইডা থেকে ১৮৯৫ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের একটি চিঠিতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে কবি লিখেছেন :

“ব্রতধাপনের বস্ত্রা তীব্রবাপন করলে দেখা যায় অল্প, হৃদয় প্রচুর হয়। ...Goetheর একটি কথা আমি মনে ক’রে রেখেছি, সেটা মনেতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল জন্মের অভিভোগ নয়, বাইরের স্বথস্বাচ্ছন্দ্য ভিলিপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত বস্তু বিদগ্ধ তখন নিজেদের ভালোবাসায় পাই।” —‘ছিন্নপত্র’

কলা প্রয়োজন, ‘কাউন্ট’ গ্রন্থের খণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠে (কাউন্টের ‘পাঠাগার’ বা STUDIERZIMMER পৃষ্ঠে), কাউন্টের চতুর্থ উক্তির দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন। ইশোপনিষদের ‘বা যুগ’

বস্ত্রের আদর্শ ও জাগ্রত প্রেরণায় আত্মীয়ন রাখন হইবেলেন যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণে গভীর লাড়।
তো আগবেই গহ্বের এই Thou shalt renounce রয়ে ।

প্রায় সমসাময়িক আর-একটি গল্পে গহ্বের কল্পনায় লাড়া ও সাথ পাবার স্বর রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিবেচন; সে চিঠি দলচালন আদ্যের চোখে গড়ে না, অথচ মনুয়া তান সেই ইচ্ছিতইহু ।
কবি ওয় 'চিহ্ন' কাব্যের অনেকগুলি কবিতার বিবরণে আলোচনা করে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দীর্ঘ এক পত্র লেখেন শিলাইঘর, কুমারবাণি থেকে, ৬ চৈত্র ১৩০২ [১৮২৬] তারিখে । তার মধ্যে এক জায়গায় লিখেছিলেন :

"তুমি যে লিখিয়াছ, 'উর্বা বহুকাল পরে একটা কবি-কল্পনামেট পাইয়াছেন' সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে । পৌরাণিক উর্বা নাম অবলম্বন করিয়া আরি বাহ্যকে কল্পনামেট দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কল্পনামেট দিয়া আনিতেছেন । সেটে বাহ্যকে বলেন The Eternal Woman—Ewig Weibliche, আরি তাহাকে উর্বা সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাচলি দিগাহি ।"^{১০}

রবীন্দ্রনাথ তখন 'কাউন্ট' পড়েছেন, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি । অতএব বলাই বাহুল্য, এই 'অনন্ত-নারী'র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ শেষেছিলেন 'কাউন্ট'-বিত্তীয় খণ্ডের উপসংহারে হৃদয়গাত Chorus Mysticusএই নিরোদ্ধত সর্বশেষ ছুটি ছন্দে :

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

১৮২০ সালের কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ মূল 'কাউন্ট' ছাড়া গহ্বের 'একরমান-এর' সহিত 'আলাপ' (Goethe's Gespräche mit Eckermann) গ্রন্থটিও মূলভাষায় না হোক, অল্পবাদে পড়েছিলেন বলে মনে হয় । জীবনস্মৃতির 'ভরজবর' পরিচ্ছেদে "আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার মিশ বছর বয়সের একটি গল্পে গান্না লিখিয়াছিলেন," বলে যে চিঠিখানির অংগমাত্র তিনি উদ্ধৃত করেছেন সেটি ১৮২১ সালের কাছাকাছি লেখা হবার কথা, অর্থাৎ তাঁর গহ্ব-সাহিত্য গহ্বের পূর্বোক্ত পৃষ্ঠটির আরম্ভে । উক্ত চিঠির সম্বন্ধেই চমকদেওয়া ব্যক্তিটি গহ্বের উক্তিও একটি ছন্দেই পদে লাড়তে আত্মক রকম বিলম্ব ঘায় । আমাদের মনে হয় সম্ভব পাঠ করা গহ্বের প্রথমটি অর্থগেতন মুহূর্তে প্রবেশ করেছে কবির নিম্নের লেখায় । ছন্দ ছুটি তুলনার্থে নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :

Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn :
eighteen, all my country was eighteen too. (February 15, 1824).

—Goethe's Conversations with Eckermann.

"মহা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আদ্যপাশের সকলের বয়স কেন আঠারো ছিল ।"^{১১} —জীবনস্মৃতি, 'ভরজবর'

১০ 'চিহ্ন' মূল সংস্করণ, প্রথমটির আদ্যের পৃ ১২৭-২৮ প্রত্যয় ।

১১ রবীন্দ্রনাথের কবিতাখণ্ডে 'ভরজবর' পৃষ্ঠি-কল্যাণবির হার বিভাগে গহ্বের কবিতাখণ্ডে 'হের্ট' (Werther) প্রত্যয় সহিত তুলনা করা গেল ।

গৃহে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনীয় বয়সে বৎসরের সংখ্যা পর্যন্ত হবই একই হওয়ার উপরে বর্ণিত পক্ষেত্বের উদয় হয়েছে আমাদের মনে।

আমোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তবুও আমাদের মূল বক্তব্যটিকে হারালে চলবে না। গৃহে-সাহিত্যের মধ্যে প্রধানতঃ ‘ফ্রিট’, এবং তৎসঙ্গে তাঁর ‘আত্মজীবনী’ ‘কথোপকথন’ ও ‘উক্তি সংগ্রহ’ (Sprüche, অথবা Sayings) ** রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি অম্লবাদের সাহায্যে পাঠ করেছিলেন, তাঁর বছর বইশ-তেইশ থেকে শুরু করে বছর তৌলিশ-পয়ত্রিশ (১৮৮৪-১৮৯০) বয়সের মধ্যে। কিন্তু গৃহেই জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টা ও আকর্ষণের বর্ষা পরিমাণ গৃহে-সাহিত্যে তাঁর সাক্ষাৎজ্ঞান দিয়ে করা চলে না। উভয়েই ব্যক্তিত্বপ্রধান বলিষ্ঠ জাতের কবি; কাব্যরচনা ও জীবন-রচনা উভয়ের কবিশ্রুতিভার অস্বাভিচারে ভিত্তি, অর্থাৎ উভয়েই কেবলমাত্র কথোপকথন নয়, জীবনশিল্পীও; উভয়েই আলোর প্রেমিক, অনন্তজীবনের প্রেমিক, বিশ্বমানবতার প্রেমিক; উভয়েই ব্রতশাপনের মতো ক’রে তাঁদের স্রষ্টা কবিরাজ্যে বাপন করেছেন ঐকান্তিক নির্ভর। তাই যেখানে পাই গৃহে সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বালক-বয়সের মূল্যবান দৃষ্টি পরিণত যেখানে ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর জীবনকাহিনী রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ পাঠ করেছেন, রেচাক্ষরদের পাঠ করতে উৎসাহিত করেছেন, এবং তাঁর আকর্ষণ কবিশ্রুতির সহিতভেদের স্রষ্টা করেছেন তাঁর জীবনের বৃহত্তর পরিপার্শ্বিক ও ঘটনা-সংস্থানের পর্যালোচনা ক’রে। নিষেধ শাস্ত সীমায়িত জীবনের সঙ্গে গৃহেই জীবনের তুলনা ক’রে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো এমনকি নিঃশব্দ বোধ করেছেন আপন প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে। কখনো হয়েছে বা নিষেধ নিবৃত্ত জীবনে জর্জন মহাকবির বলিষ্ঠ জীবন থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে থাকবেন। প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বোধের লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পুরাতন পত্রের প্রাথমিক অংশ এই দ্বয়ে উদ্ধৃত করলে আমাদের বক্তব্য অনেকটা পরিষ্কার হবে মনে হয় :

“গৃহের জীবনীতা” ** তাঁর ভালো লাগতে ? একটা জুই লক্ষ্য ক’রে দেখে থাকি, পেটে যদিও এক হিসাবে খুব নিশ্চিত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মাস্তুরের সংগ্রহ শেত, মাস্তুরের মধ্যে বসে ছিল। সে যে রাজসভার থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল—জর্জনীতে তখন খুব একটা ভাবের বদল আদর হয়েছিল—হেজের, স্নেগেল, ফোন্ট, শিলার, কাষ্ট, প্রকৃতি বড় বড় চিত্রাঙ্গুল এবং ভাবুকগণ সেনের চারিদিকে জেগে উঠেছিল—তখনকার মাস্তুরের সংস্পর্গ এবং বেশব্যাপী ভাবের আবেশান খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হস্তভাষা বাঙালী লেখকেরা মাস্তুরের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাতে সর্বদাই সস্তোর খোয়ায় দিয়ে বীড়ির সাথতে গাহিনে—নিষেধ মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়।...গৃহের পক্ষেও যদি শিল্পের বন্ধন আবদ্ধ ছিল তাহলে আমাদের মতো

** ‘গৃহের উক্তি সংগ্রহ’—পাঠ-সংগ্রহ (১৯১১), পৃ ১২৭-৩২ উদ্যয়। অন্তিম উক্তি-সংগ্রহ সোম হুইট্রি নাম।

৩৩ The Story of Goethe's Life by G. H. Lewes (1873); ইতিপূর্বে ২০ লক্ষ্য পাল্লিকার উল্লিখিত প্রবন্ধটি হওয়াই সম্ভব।

সোক্রেস গকে একজন বার্থ খাটি ভাবকের প্রাণদলারক সব 'বে কত অবশ্যক তা আর কি করে বোঝাব।' ১০ —শিলাইমহ, ১১ অগস্ট [১৮২৪]

"আমি আলো ও আকাশ এত ভালোবাসি। গেটে হরবার সময় বলেছিলেন More light—আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি More light and more space।" ১১ —বোয়ালিয়ায় গবে, ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৪

"কাল সন্ধ্যাবেলার গেটের উপর চাউন্সনের একটি প্রবন্ধ" পড়ছিলাম—তাহে দেখছিলাম গেটে ছই বৎসরের মধ্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যভোগ করে কি এক নতুন প্রাণ এবং নতুন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা লক্ষ্যে পড়ে যে একটি বিশদীর্ণ শাস্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মত কারাবাসীর চিত্ত বিমুগ্ধ হয়ে ওঠে—মনে হয়, বা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায় নি—শিক্ষা এবং সাধনার অনেক ব্যক্তি আছে; মনে হয়, যদি গেটের মত ওড়ানুট আমার হত, যদি এই বাংলা দেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এদেশে মানবশ্রুতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত বাধ থাকত—তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কুপাশায় বীন। যদি পারি ত আমিও একদময়ে মগতে বেরিয়ে পড়বু—এই আমার নিত্য ইচ্ছা।" ১২ —পতিসর, ২৪ নভেম্বর [১৮২৪]

"...সন্ধ্যাবেলার ঘরে আলো জ্বালচে, গোরলে ধোঁয়া দিচ্ছে—ছুটি গ্রাম ছুটি নীড়ের বত নিশ্চয় হয়ে যাচ্ছে—আমি গড়গড়গড়গড় তুল দিয়ে তাইমার রাজসভায় গেটের কীটিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নাগর নবীতাবৎ পতিসর, বোটের মধ্যে আমি—আর কোথায় বিচিত্রকর্ম সংহ্ল তাইমার রাজসভায় রাজকবি গেটে!" ১৩ —পতিসর, ২২ নভেম্বর [১৮২৪]

নাগর নবীতাবের সেদিনের সেই কবি বাস্তবিকই একদময়ে উপায় বিশ্বনাগরিকতার প্রেরণায় উদ্ভূত হয়ে অবশেষে বেরিয়ে পড়লেন বৃহত্তর বিশ্বজগতে। ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে পুস্তকের বদলে গিয়ে তিনি বহু রাজসম্মান ও সম্মান ও লাভ করলেন,—কে বলবে তখন মনে পড়েছিল কি না যৌবনের এই

১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ ২২২

১১ গ্রিগর, পৃ ২২৭

১২ *New Studies in Literature* by E. Dowden [1896]

এই প্রবন্ধ দুইখণ্ড : পদ্ধতিবিদ্যায় এবং যদিও একেলা

সবীহীন অবস্থায় পুস্তক সন্ধ্যাবেলা

কবিতায় পড়ি। পদ্ধতিতে দেখা

১৩ সন্ধ্যাবেলায় তব : পড় হই দেখা

সৌন্দর্য কাহারে বলে—আমি কী কী বীজ

কবিতাকলায় : পেলি, পেটে, কোলবীজ

কার কেন্দ্রেই। —জিমা, 'সুন্দর'

১৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ ২৫৭

১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন-আশ্বিন ১৩৫৩, পৃ ৪

'ভাইমার রামশতাব্দীর রামকবি'টিকে। গৃহ্যেই জন্মগতী ফাফোট-এও বরীভ্রনাথ গিয়েছিলেন সন্ধান পাই, কিন্তু জাইমার-এ যোগ্য হয় নহ। গৃহ্যেই প্রতিভাও কোথাও কিছু দেখতে গিয়েছেন বলে শুনি না। এ রহস্যের সমাধান পাই এই জেবে যে, তখনকার সে-বরীভ্রনাথ ভো আর গৃহ্যে থাকে বলতেন Das Weltkind (The world-child), সেই খ্রিস্টীয় দুলাল কবিসাহিত্যিক মাত্র নহ; তখন তিনি গৃহ্যেই ভাষাতেই, Prophete বা প্রোফেট। World-Child গৃহ্যেই সচেষ্ট ছিলেন বা সাক্ষ্যকার ঘটে নি তাই সেদিনের সেই প্রোফেটের।

১৯৩২ সালে উদ্ভাষিত গৃহ্যেই দুলালভাবিকী অমুঠান উপলক্ষে আয়োজন সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ গেলেন বরীভ্রনাথ World Goethe Honouring [Welt-Goethe-Ehrung] শব্দের মূলপত্র Prof. Ch. H. Kleukens-এর কাছ থেকে। ১৯১১-১৯১২ তারিখে শাস্ত্রিনিকেতন থেকে তিনি পত্র লিখলেন তাঁকে

Dear Sir, I gladly consent to become a Patron of the World-Goethe-Honouring which you are organising in Germany. I feel proud to associate myself with your project and thus render my homage to the undying memory of Goethe. **
কিন্তু শেক্সপীয়ার-বর্ষগ্রন্থের ভিত্তে ইতিপূর্বে যেমন সময় কাব্যপুঞ্জালি রচনা করেছিলেন তেমন কোনো প্রেরণা সেদিন তিনি অমুঠান করেন নি মনে হয়। তখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন পায়ত্র ভ্রমরের উদ্দেশ্যে। কবি হাঙ্কিলের বেশ জানিয়েছে সাময় আমন্ত্রণ সেদিন বরীভ্রনাথকে, যে-হাঙ্কিল একদা গৃহ্যেই শেষকীর্তনের কাব্যে ** বৌদ্ধের ঘোষার আগিয়েছিলেন। †

শ্রীনিবালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্যোটে ও অর্বাটীন কালের সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্যের সহিত অর্বাটীন কালের সাহিত্যের একটি ঐক্যবিশিষ্ট প্রভেদ আছে বৃত্তিতে শাস্ত্রীয়, কিন্তু কোথায় সেই প্রভেদটা, কেন সেই প্রভেদ সেখা দিল বৃত্তিয়া ওঁটা লম্বা নহে। কিন্তু তৎসংঘেও মঙ্গল পাঠক হাতেই অমুঠান করিতে থাকে যে দুইয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য বিদ্যমান। বশেষ হইতে বিশেষে আগিয়া পড়িলে আবহাওয়ার একটা পার্থক্য অমুঠান হইতে থাকে—এও অনেকটা সৌন্দর্যময়। প্রাচীন সাহিত্যের আবহাওয়া অর্বাটীন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বতর। কিন্তু আবহাওয়া বলিতে অশ্লষ্ট ও ব্যাপক একটা কিছু বোঝায়, নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। নির্দিষ্টভাবে দুই সাহিত্যের প্রভেদ বোঝা এবং বোঝানো নিরন্তর কঠিন।

কালিদাসের শব্দভাষা আর গ্যোটে'র 'ফাউন্ট' দুইই মহৎ কাব্য, কিন্তু দুয়ের আবহাওয়া কি বতর নহ? আবার গ্যোটে'র 'ইতিপাস' নাটক ও শেক্সপীয়ারের 'হামলেট' দুইই মহৎ কাব্য, কিন্তু

** ভ্রাতৃত্ববন্ধন-সম্রাট শেক্সপীয়ারের কল্পিত উদ্ভূত।

*** West-östlicher Divan অথবা West-östlicher Divan [1817]

† জর্জ হুগ পার্সে প্রভৃতির অমুঠান ও দুলাল কবি বিশ্বভারতী বিশ্বভারতের অধ্যাপক কল্পিত মহৎ কবি আগিয়া সর্বত্রই

দুয়ের আবহাওয়া যে স্বতন্ত্র ! আবার একদিকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্য লওয়া থাক আর-একদিকে রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি ধীর্ঘাকার কবিতা, মনে করা যাক, মানস দুন্দরী দুইই বহু—কিন্তু দুটি কাব্যলগ্নতের এক দেশের অধিবাসী নয়। এমন উদাহরণ আরও লওয়া বাইতে পারে কিন্তু বাহ্যলো প্রয়োজন নাই।

উপরের উদাহরণগুলিতে যে পার্থক্য অস্পষ্টভাবে অল্পদৃষ্ট হয়, তাহাকে পূর্ণতার অভাব বলে। বাইতে পারে। জানি, পূর্ণতার অভাব বলিতে ষাট কিছু বোকার না, কিন্তু যেখানে মূল প্রভেদটাই অস্পষ্ট, সেখানে তাহার সংজ্ঞা অস্পষ্ট না হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রাচীন সাহিত্যের প্রগণ স্তম্ভ পূর্ণতা, বা নিখুঁত ভাব। অর্বাচীন সাহিত্যে তাহারই অভাব অস্বত্ব করি।

প্রাচীন কালের মহাকবিগণের রচনায় বা মহাকাব্যে এই পূর্ণতার ভাব বিন্যাস এমন নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর রচনাতেও এমন একটি নিখুঁত নিটোলতা আছে যাহা অর্বাচীন কালের সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

‘বেবা রেখসি বেতসতরুতলে

চেতঃ সস্বৃক্ষ্যতে মে’

বা তাকোর সেই বিখ্যাত অনাথর আপল সখ্যীয় কবিতায়^১ প্রকৃতিসত্ত্ব পূর্ণতা দেখা যায়, অর্বাচীন কালের মহাকবিগণের কাব্যেও তাহা সহজপ্রাপ্য নয়।

পূর্ণতা ও পূর্ণতার অভাব দুই ভিন্নকালের সাহিত্যে এতই স্বাভাবিক, প্রাচীন কালের সাধারণ কবির রচনাতেও সুলভ আর একালের মহাকবিগণের রচনাতেও এমন দুর্বল যে—এ দুটি লক্ষণকে ভিন্ন-কালের কবিসের প্রতিভার লক্ষণ না বলিয়া দুই ভিন্ন কালেরই লক্ষণ বলিতে ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রাচীন কালের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতার ভাব ছিল অর্বাচীন কালে যাহা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। আর এই দুই কালের কাব্যে এই দুই ভিন্ন লক্ষণ যেন স্বতঃই সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের সীমাবোধটা কোথায় ? কালের পরিবর্তন হৃদয় সীমানা মানে না, মূলতাবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আবার বিবাস নায়েকে এবং তাহার মহাকাব্যকে দুই কালের সীমারে ফেলা বাইতে পারে। ‘ভিতাইন কমেভি’তে প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের ভিন্ন লক্ষণ বর্তমান। কাব্যশাস্ত্র অর্বাচীন কালের অহুগত প্রাকৃত ভাবায় লিখিত, যদিও যান্ত্রে গোড়ার দিকের আটটি সর্গ প্রথমে ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাষান্তর অর্বাচীন কালের উপক্রমণিকা। ভিতাইন কমেভির নিখুঁত পূর্ণতা প্রাচীন কালের কথা স্বরণ করাইয়া দেয়। অত্রদিকে অর্বাচীন কালের কাব্যের প্রধান লক্ষণটিও বর্তমান, ‘ভিতাইন কমেভি’তে দৃষ্টান্তে পাই, কেবল কবিত্বশে নয়, কাব্যের নায়কত্বশে। প্রাচীন কালের কাব্যে এমন কখনই ঘটিতে পারিত না। প্রাচীন কালের কাব্যে আর লুকলকেই পাই কবিত্ব ছাড়া, অর্বাচীন কালের কাব্যে আর কাউকে পাই বা না পাই কবিত্ব পাইবই।^২ ঠিকি কব্যের মধ্যে অনিচ্ছা ফেলিয়া দ্বৈত অর্বাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কাব্যের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অর্বাচীন কালের

^১ “As the sweet apple reddens on a bough's end, at its very end; the gatherers have forgotten it; nay, they did not forget but could not reach it.”

সঙ্গে তবু একটু প্রভেদ দেখা যায়। দাঁতের নিজেস্ব স্বভাব ব্যক্তিক্রমেই বর্ণনা করিয়াছেন, কবি-দ্বায়ে ও কাব্যের নায়ক-দ্বায়ে বেন স্বভাব ব্যক্তি। অর্ধাচীনতার কালের কবিরের হাতে এমন সংযত আত্ম-অস্বীকৃতি শাওদার আশা নাই।

আগে বলিয়াছি যে, অর্ধাচীন কালের সাহিত্যে অপূর্ণতার ভাব বিস্তারিত, আবার এখন বলিলাম যে এই কালের সাহিত্যে কবির ব্যক্তিক্রম অস্বাভাবিক। এবারের বিচার করা আবশ্যিক—এ দুয়ের মধ্যে কোনো দৃষ্টি সম্পর্ক আছে কি না। এখানে গোটার কাব্য আমাদের প্রধান সহায়, কারণ উহার কাব্যে অর্ধাচীন কালের বলিয়া কথিত এই দুটি লক্ষণই পূর্ণবাহার বিরামিত। গোটার গদ্য ও পদ্য রচনা স্বকীয় মহাব সবেও (হাদনান এও জরোখিয়া এবং ছোট ছোট লিরিকগুলি ছাড়া) পূর্ণতার অভাবেই বেন বিশিষ্ট; আবার উহার সমস্ত রচনাই গোটার ব্যক্তিক্রমের দ্বারা আবদ্ধ। যে দুটি লক্ষণকে অর্ধাচীনকালের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছি—গোটার কাব্যে তাহাদের প্রকাশ আত্যন্তিক। এ বিষয়ে গোটার রচনা অর্ধাচীন সাহিত্যের সব চেয়ে বড় শিক্ষার ও সতর্কতার স্থল; গোটে অর্ধাচীন সাহিত্যের চরম দৃষ্টান্ত।

২

অর্ধাচীন কালের কবিগণ ভগবতের মানবও হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। কিম্বা এই ধারণাটাকে আর-এক আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। ভগবৎপরিধি যথিবার প্রত্যক্ষে উহার নিজেদের ব্যক্তিক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানেই প্রাচীন কালের ও অর্ধাচীন কালের কবিগণের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। প্রাচীন কালের কবিগণের ভগবৎপরিধি পরিমাপের হ্রস্ব ছিল সৈব-বিধান। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তাহার নিকষ ছিল সৈববিধান। অর্ধাচীন কালের হাতে একমাত্র নিকষ আপন ব্যক্তিক্রম। প্রাচীন কালের সাহিত্যে যে পূর্ণতা দেখা যায়, আধুনিক কালের সাহিত্যে যে অপূর্ণতা দেখা যায়—এবার তাহার কেন্দ্র হুঁতে পারা যাইবে। ব্যক্তিক্রম স্বত্ব বিধানই হোক না কেন ভগবৎপরিধি পরিমাপের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়, হ্রস্ব বাটো হইবেই, আর যে পরিমাণ বাটো হইবে, সেই পরিমাণে ভগবৎ কবির অন্যতম থাকিবা যাইবেই—ইহাই অপূর্ণতার মূল কারণ। বও জীবনকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে বাধ্য নাই, কিন্তু স্বভাবের মধ্যেও পূর্ণতার আভাস স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণতার রূপ যদি কবির অস্বীকৃতি হয়, তবে কিভাবে সে পূর্ণতার আভাস দান করিতে সমর্থ? অর্ধাচীন কালের ষওকাব্য নিত্যই বও, শুধু তৃতীয়ার চক্রকলার উজ্জলতা যেমন সম্পূর্ণ চক্রমণ্ডলকে আভাসে প্রকাশ করে, অর্ধাচীন কালের বও কাব্য তেমন করিয়া আভাসে পূর্ণতাকে দেখাইতে অসমর্থ; এই অসামর্থ্যেরই অপর নাম অপূর্ণতা।

প্রাচীন কালের কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিক্রমে বিধান করিতেন না, তাঁহারা সৈববিধান রূপ হ্রস্ব হাতে ভগবৎপরিধি পরিমাপে স্বেচ্ছাভীর্ণ হইয়াছিলেন। সৈববিধান ব্যক্তিক্রমের চেয়ে অনেক প্রশস্ততর, বাস্তবিক তার চেয়ে আর কিছু বড় বলনা করা যায় না। এই কারণেই প্রাচীন কালের কবিরা ভগবৎপরিধি পরিমাপে সমর্থ ছিলেন—তাঁহাদের কাব্যের পূর্ণতার ইহাই প্রকৃত কারণ। এই জন্যই প্রাচীন কালের অধিকাংশ কাব্যের নায়ক সেবভাগ্য। যেখানে সেবভাগ্য প্রত্যক্ষতঃ নায়ক নহে, সেখানেও

তাহারা অগ্রতর্য গ্রহণ নাহয়গৌরী। অর্থাটন কালের কাব্যের নাথক নাহয়। অধুনিক কালের নাহয়
মর্ত্য হইতে বেধগণকে নির্ধাতিত করিয়াছে।

হুই কালের মধ্যে আরও একটু প্রভেদ আছে। ইতিমধ্যে অগং অনেক মণি, অনেক বৃহৎ
হুইয়া পড়িয়াছে। হোনার যে অগংকে ও জীবনকে আনিতেন গোটের অগং ও জীবন তাহার চেয়ে
বৃহত্তর, অটিলতর; তাহাতে যে অগংকে ও জীবনকে আনিতেন দ্বীপ্তনাথের অগং ও জীবন তাহার চেয়ে
অটিলতর, বৃহত্তর; তাহাতে হুইয়ের ন্যূনতা আরও বেশি ধরা পড়িয়াছে। হোনার অগং-পরিমাপের
পক্ষে কবির ব্যক্তিগত যদি অধেখই হয়, তবে গোটের অগং-পরিমাপের পক্ষে তাহা আরও বেশি অধেখই।
অথচ কবির হাতে তাহাকে পরিমাপের আর কোনো হুই নাই, কলে অসুপ্ততা অবগ্রন্থাবী।

এই প্রসঙ্গে দুই কালের শিল্পাধর্ষ দেখে কিছু বলা হইতে পারে। দুই কালের শিল্পাধর্ষে কিছু
ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে। অর্থাটন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আধর্ষ সৌন্দর্যপট্ট প্রাচীন কালের শিল্পের
লক্ষ্য বা আধর্ষ ছিল পূর্ণতা নহি। প্রাচীনদের পূর্ণরূপ সৃষ্টি করিতেই বলিয়া তাহা আশনিই স্বন্দর হইত;
অর্থাটন কবিগণ পূর্ণতাকে অগ্রাঙ্ক করিয়া সৌন্দর্যপট্ট করিতে চান বলিয়া তাহা স্বন্দরও হইয়া উঠে না।
পূর্ণতাই স্বন্দর, অসুপ্ততাই অস্বন্দর; আবার পূর্ণতাই সত্য, কামেই পূর্ণতা—সত্য—স্বন্দর। অর্থাটন
কালের অনেক কবি তবত: একথা জানেন, কিন্তু কার্যত: এই আধর্ষকে অসুপ্তরূপ করিতে পারেন না,
আবার অনেকই এ কথাকে আদৌ স্বীকার করেন না। সেবোক্ত বল সাহিত্যে অগং-রীতিকে অসুপ্তরূপ
করিয়া যান, ইহাই সাহিত্যে ‘রিয়ালিষ্ট’; কিন্তু তাহারা কুলিয়া যান যে চারবিকে আশনি অতিপ্রত্যক্ষতার
দ্বারা ‘রিয়াল’ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়— তাহাই একমাত্র ‘রিয়ালিষ্ট’ না হইতেও পারে; বরত: তাহা
রিয়ালিষ্টই মুখ্যে যাত্র। মুখোলাটা রূপ, মুখোলা-খোলা মুখেই স্বপ্ন; সে স্বপ্নের সংসার তাহারা
রাখেনও না, রাখিতেও চান না।

তবেই তিনটি পথের পাণ্ডুরা গেল। প্রাচীন কালের কবি, দৈববিধান দ্বারা অগং-পরিমাপ হুই;
পূর্ণতা দ্বারা শিল্পের লক্ষ্য; তবত: ও কার্যত: যিনি এই আধর্ষকে অসুপ্তরূপ করেন। অর্থাটন কালে
পাই দুইটি পথের ১ ব্যক্তিবৈব বিধান দ্বারা অগং-পরিমাপ হুই; সৌন্দর্য সৃষ্টি দ্বারা শিল্পের লক্ষ্য;
অথচ পূর্ণতার সংবাদও তাহারা রাখেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক তাহাকে অসুপ্তরূপ করিতে অসমর্থ।
তৃতীয় পথের আছে সেই বল ব্যক্তিবৈব বিধান ছাড়া আর কিছুই দ্বারা মানেন না, জানেন না;
পূর্ণতাকেই দ্বারা তবত: ও কার্যত: স্বীকার করেন; অতিপ্রত্যক্ষকে ‘রিয়ালিষ্ট’ মনে করিয়া দ্বারা
তাহার মানচিত্র অতিত করিতে অসমর্থ। ইহাদের মানচিত্র অস্বন্দরকারী বলাও উচিত নহ, যেহেতু
মানচিত্রও সূত্রতার লক্ষণ সে— ইহারা সূত্রতার আশিনি, সূত্রেই যাহা পাইতেছেন অটিল করিয়া
হাইতেছেন, সে প্রাচীণ কোনো কালেই কোনো সময়তবে পৌছিতে না, কারণ তাহাদের মনে সূত্রতার
আধর্ষেরই যে অস্তাব। ইহারা ই অর্থাটন কালের ‘রিয়ালিষ্ট’।

৩

গোটে দ্বিতীয় পথের লক্ষ্য। নিঃসন্দেহ তিনি অর্থাটন কালের কবি, অর্থাটন কালের কাব্যের
প্রধান লক্ষণ অসুপ্ততা তাহার কাব্যের প্রধান গুণ বা দোষ। কবি গোটে, বৈজ্ঞানিক গোটে, রাষ্ট্রনীতিক

ও রাষ্ট্রশাসক গোটে জানেন যে জগৎ কি হৃৎ, জীবন কি মটিল। এ বিষয়ে তাঁহার জানের পরিমি তাঁহার সমকালীন অধিকাংশ লোকের চেয়ে অনেক অধিক। অর্থাৎ হেন জগৎ-জীবনের পরিমাণে তিনি উচ্চতর, কিন্তু বিষয় সতট এই যে একমাত্র ব্যক্তিত্বের পূত্র ছাড়া অপর কোন পূত্র তাঁহার হাতে নাই।

ফাউস্ট কালের কবাই ধরা দাক। ফাউস্ট অবশ্য মানব, কিন্তু মেক্সিকোফিলিস মাছুষ নয়, তাহা ছাড়া 'প্রোলোপ ইন হেভেন' অধ্যায়ে যৎ লর্ড ও দেবভূতগণ আছে, নাটকের অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে; এজন্য অবস্থার মনে করা অসম্ভব নয় যে বৈববিধানকেই এই নাটকের পরিমাণ পূত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়, বরং বৈববিধানের অন্তর্নিবেশিত এই নাটকে সূচিত হইয়াছে। ফাউস্ট যোগ্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা অগৎ-পরিমাণে উচ্চতর। আত্মমস্তকের প্রভাবে তাহার অগৎ বহু বাড়িয়াছে, নিজের ব্যক্তিত্ব-স্বত্বকে তত সে টানিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের দ্বারা অগৎকে বেঁধে দিতে পারে নাই। এই প্রচেষ্টায় মেক্সিকো তাহাকে উদ্ধার দিয়াছে; বলিয়াছে, তোমার ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়ান, আরও বাড়ান, সেখা বেঁধে দিতে পারো কি না! 'লর্ডের' সহিত দেখায়েছি কবিরা সে ফাউস্টের কাঁধে আসিয়া ভর করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ সে লর্ডের অভিশ্রাবের বিরুদ্ধে কিছু করিয়াছে কি? নাহয় যে অসম্পূর্ণ নয়, 'লর্ড ইন হেভেন' এবং 'গ্যান অন আর্থ'—মিলিয়াই যে পূর্ণতা—ইহাই কি প্রকৃতীকরণ, ট্রাজেডির দ্বারা মেক্সিকো প্রমাণ করে নাই? ফাউস্টের ট্রাজেডি কি? অগৎ পরিমাণের পক্ষে মাছুষের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট নয়—ইহাই কি তাহার ট্রাজেডি নয়? আমার তো মনে হয় গোটে ইহাই বোঝাইতে চাহিয়াছেন। তবে আবার গোটেকে অর্ধজীবন কালের কবি বলি কেন? বলি এই জন্য যে ব্যক্তিত্বের বিধান যে যথেষ্ট নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু অপর কোন বিধান, বৈববিধান, তাঁহার আদর্শের মধ্যে ছিল না। এখানেই কবির ট্রাজেডি, আর সে ট্রাজেডি ফাউস্টের চেয়েও গুরুতর। ফাউস্ট ব্যক্তিত্বের বিধানকেই যথেষ্ট ও একমাত্র বলিয়া জানিত। গোটে জানিতেন, ইহা যথেষ্ট নয়; কিন্তু অপর কোনো বিধানও তাঁহার জানা ছিল না। কেন ছিল না সে, অনেক কথা। যে-কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে-কালে বৈববিধানের চূড়ান্ত মহিমার বিশ্বাস করিত না। এখানে কালের ধর্ম গোটেটির ধর্ম।

এই অন্তরেই আগে গোটেটির জীবন ও কাব্যকে অর্ধজীবন কালের শিলা ও সত্যকতার সূত্রাক্ত বলিয়াছি। তিনি ব্যক্তিত্বের বিধানকে জানিতেন অথচ জানিতেন যে ইহা যথেষ্ট নয়; তিনি পূর্ণতার তত্ত্ব জানিতেন অথচ সৌন্দর্যবস্তুর লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সত্যের সংবাদ রাখিতেন অথচ বিপুল্য পৃথিবী সমস্ত তথ্যকে সূড়াইয়া লইয়া সত্যের পূর্ণ দৃষ্টিতে উপনীত হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তবে ও কার্যে সমর্থ্য করিতে না পারিলে যে পরম দুঃখ অসহ্য হইয়া সেই দুঃখ ছিল গোটেটির জীবনের, আর সেই দুঃখের সমষ্টিই তাঁহার রচনা।

পরবর্তী কালের স্মৃতিভোগ্য উপরে গোটেটির প্রভাব সত্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথাই উল্লেখ করিলে চলিবে।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে সেখা দায় যে প্রত্যেক যুগ এক একখানি স্ফটিকের

আপনার প্যামপারগা, মাথাআকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত সম্ভাবনাকে চূড়ান্তরূপে দিয়া থাকে। সে যুগের অল্প সময়ের জন্যে এই মহাগ্রন্থের পড়ার বই আর কিছু নয়। কিংবা পাখানদীপনকে যেনন মূল মনীতে মিলিত হইয়া তাহাকে স্বীকৃতকায় করিয়া তেঁহকে প্রত্যেক যুগের মহাগ্রন্থের সত্যিকার গ্রন্থের লক্ষ্য সেইরূপ। গ্রীক ভগবতের এইরূপ মহাগ্রন্থ চোখেরের কাব্যময়। ইউরোপের পুণীচ মহাযুগের মহাগ্রন্থ দাঁড়ের 'হিটলার কমেডি'। আমাদের দেশের প্রদর্শক রামায়ণ, মহাভারত ও রামচরিত-বানসের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরবর্তী কালের পক্ষে গোটে কয়েকটি গ্রন্থ এখনি মহাগ্রন্থ। 'টলিডাড' 'ওডিদি' 'হিটলার কমেডি'র সত্যিকার তুলনায় 'কাউন্ট' নীমতর ও অপর্যন্তর কিনা সে প্রশ্নে তুলিয়া লাভ নাই। আমাদের বিখ্যাত, পূর্বোক্ত মহাগ্রন্থসমূহের তুলনায় কাউন্ট নিচুই নীমতর ও অপর্যন্তর। কিন্তু সে নীমতা ও অপর্যন্তর কারণ গোটে যুগের মধ্যেই নিহিত, কেন নিহিত পূর্বে তার আলোচনা করিয়াছি। যেনেগোলে বলিতে ইউরোপের ইতিহাসে যে মনোভাব ও যে পর্বকে বোঝায় গোটে কয়েকটি তাহারই মহাকাব্য। কাউন্ট মানব-মনের চিন্তন ও বুদ্ধির অস্তিত্বের মহাকাব্য। এই কাব্যের নামক কাউন্ট অস্তিত্বের কূল হইতে তত্ত্বের কূলে, অপর্যন্তর ভ্রম হইতে পূর্ণতার ভ্রমে যাত্রা করিয়াছে। নাকি সমুদ্রে তাহার ভগ্নাবুবি হইয়াছে কি চর নাই, তাহার লক্ষ্য ভ্রান্ত কি শুদ্ধ সে প্রশ্ন অব্যাহত। তত্ত্ব ও পূর্ণতাতে পৌছিয়াছে দুর্ভাগ্যবীর আকাঙ্ক্ষাটাই এই কাব্যের প্রাণ, সেই প্রাণের পরিচয় দিয়াই গোটে গোট করিয়াছে।

গোটে পরবর্তীকালেও এই জেদীর মহাগ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভগবত 'লে বিজাহেবল', টলস্টয়ের 'ওয়া এণ্ড পীস', হাডির 'দি ডাইনস্টেন', প-র 'বাক টু মেক্সেলো' প্রভৃতি যুগের মহাগ্রন্থ রচনার চেষ্টা। কিন্তু বোধ করি চেষ্টামাত্রের চেয়ে অধিক নয়।

গোটে যুগের পরবর্তী শত বৎসরের মধ্যে মানুষের জীবন আরও চলিতর, ব্যাপকতর হইয়া পড়িয়াছে এবং তুলনায় মানুষের ব্যক্তিত্বের দূর আরও বৃদ্ধতর হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই যুগ-সংস্কৃতি মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনাও ক্রমে বৃদ্ধতর হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্ভাবনা কখনো পূর্ণ হইবে কিনা জানি না! কেননা বর্তমান ভ্রম ও জীবন পরিমাপের ক্ষমতা ব্যক্তির বিধানের চেয়ে দীর্ঘতর দূর আবিস্কার। সে দূর কি? পূর্বতন সৈববিধান চলিবে না, বর্তমানের ব্যক্তিক বিধানও অচল। তবে আর কি বিধান হইতে পারে? বর্তমান না সেই নতন বিধান উদ্ভাবিত হয়, ততদিন যুগের মহাগ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আর নতন বিধান উদ্ভাবিত হইলেও যুগের মহাকবির আবির্ভাবের ক্ষমতা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগ সেই মহাকবির আবির্ভাবের ক্ষমতা, সেই মহাকাব্যের সম্ভাবনার ক্ষমতা অপেক্ষা করিয়া আছে। ততদিন গোটে কয়েকটি অবচীনতম মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

প্রবন্ধমাধ্যম বিধি

বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান

ঐত্ৰজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্.এ.প্রকাশ

১

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় অনেকগুলি বাসিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপকভাবে শ্রীশিক্ষার আয়োজন হুকুং হইল। এই ব্যাপারে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যাবাকারের রাজা রাধাকান্ত সেব, কলিকাতা স্কুল-বুক ও স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালভার, জোড়পাংকা রাজ-পরিবারের রাজা বৈজ্ঞান্য রায়-প্রমুখ বিজ্ঞানগাহী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহায়ত্বের সন্দর্ভাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌরমোহন শ্রীশিক্ষার গণক জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ‘শ্রীশিক্ষাবিধায়ক’ নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিয়াছিলেন : ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিহুদী হিন্দুমহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া শ্রীশিক্ষা যে এ-দেশের শাস্ত্রীয় রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ নয়, তাহারই প্রবাদের চেষ্টা আছে। দুই বছর পরে পুস্তকখানি তৃতীয় বার পরিবর্তিত আকারে প্রচারিত হয়। এই সংস্করণে সংযোজিত “দুই শ্রীলোকের কথোপকথন”-এর নিম্নোক্ত মূল হইতে সে-সময় সাধারণ গৃহস্থকরের মেয়েরা বিজ্ঞাচর্চার কত দূর অনগ্রসর ছিলেন, তাহার একটি চিত্র পাওয়া যায়—

“অ। ওসো। এক যে অনেক মেয়া হানুং সেখাপন্ন করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ব্যাঃ। কামে কই হবে ইহা ভোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মনে নিঃ পূর নিদি। সাংসেবো এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছে, ইহাতেই সুখি এত কালের পর আবারের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জানি হয়।

এ। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাণ্ড। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উ। ওন গো। ইহাতে আমাদের ভালো বড় ভাল লাগে হইতেছে : কেননা একেবারে শ্রীলোকেরা সেখাপন্ন করে না, ইহাতেই তাহারা আর পড়ার মত অভ্যাস থাকে। কেনর পর যাদের কাণ্ড করি কাল কাটায়।

এ। ভাল। সেখাপন্ন শিকিলে কি পরের কাণ্ড করি করিতে হয় না। শ্রীলোকের পর যাদের কাণ্ড রাগা বড়ো জেনাশিলি এজিমান্দ না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষ করিবে।

উ। না। পুরুষ করিবে কেন, শ্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু সেখাপন্নতে যদি কিছু জানে হয় তবে আর কাণ্ড করি সন্নিহিত অবকাশ হতে দুই বড় মেয়া পড়া নিঃ থাকিলে মনে পুর থাকে, এঃ আপনায় পড়াও বুঝি পড়ি নিতে পারে।

এ। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাস্য করি। তোমার কথায় বুঝিয়া যে সেখাপন্ন আবশ্যক হইবে। কিন্তু সে কালের শ্রীলোকের কামে, যে সেখা পড়া যদি শ্রীলোকের করে তবে সে বিয়া হয় এ কি লজা কথা। যদি এটা লজা হয় তবে কেনে আদি পড়ি না, কি জানি ভালো কপাল যদি তাহাৎ।

উ। না বইন, সে কেমন কথাই কথা। কাণ্ড আদি আবার ঠাট্টাসী নির্দিষ্ট ঠাই নির্দিষ্ট যে কোন গায়ের একত সেখা নাই, যে সেখা হানুং পড়িলে ঠাট্টা হয়। কেনইন বড়র সেখা হানিবা এ কথার পুঠি করিয়া দিলে ভাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত শ্রীলোকের বিজ্ঞান কথা পুঠানে ওনিয়াছি, ওঁ যান হানুং শ্রীলোকেরা আর লকসেই সেখাপন্ন

করে এমন গুণিতে পাই। লগ্নতি লাফাতে দেখে না কেন, বিবিয়া তো সাংসারের মত সেখাপড়া জানে, তাহালা কেন বাঁচে হয় না।

এ। ভাল। যদি দেখে নাই তবে এত দিন এ দেশের কোথা বাগুনে কেন গিয়ে নাই।

উ। ওহ মো। কখন কীলোক না বাগের বাড়ী থাকে, তখন তাহার কেমন বেলালো ও বাটরর সেবিয়া বেড়াই। বাগ বাড়ি সেখাপড়ার কথা করেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কাছ দাঁড়া বাড়ী না গিলিলে গরের দেয়লকা কেমন করিয়া চালাইবি। সন্ধ্যারের কর্ত সেম খোকা গিলিলেই বগুড়াকী প্রখাতি হবে। বহুলা অখ্যাতির গীরা নাই। কিন্তু জামের কথা কিছুই কহেন না।

এ। হাজি কেমন বুজবার কথা চিহ্নি। জাম আর সকল গাঁয়েই হো পাঠশালা আছে, তবে কতখা আসনাগাঠ সেখানে ছিল কেন গিয়ে না। তখন হো হালাকাল থাকে তেমে হাবে বাইবার থালা নাই।

উ। সেম সেম বিবি। বাড়ির পানে ডাকাইতে গেল না। যদি সোঁম কতখা বাড়ীর হালকের সেখাপড়া সেবিয়া সাব করিয়া কিছু গিয়ে ও পাঠশালা হাতে করে তবে তাহার অখ্যতি লগ্ন বেড়ে হয়। লকনে কহে যে এই মফা এটী দুটি বেটাহেলের মত সেখাপড়া গিয়ে, এ দুটি বড় অলং হবে। এখনি এই, সেমে না জামি কি হবে। যে শাহ বাড়ি তাহার অফুরে লাবা যায়।” পৃ. ১-৪

মিশনরী বালিকা-বিদ্যালয়গুলি এত করিয়াও জনপ্রিয় হয় নাই। দরিদ্র ঘরের— অনেক স্থলে নিয় বর্ণের যেথেরা অত্যন্ত হইলেও শিক্ষিত ও সম্মান পরিবারের কতখা যে সেগুলিতে যোগদান করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সম্মান হিন্দুরা মেয়েদের প্রকৃত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের গুরুত্বাভী ছিলেন না; তাহার বিপরীতী নিযুক্ত করিয়া অল্পপুরে কতখাদের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মে ভারত-হিষ্টরী ডিক্‌শনারীর বাটন্‌ বা বেধুনট কলিকাতায় হিন্দু ডিমেল স্কুল (বর্তমান বেধুন স্কুলের) প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং কালোপায়েগী বিবিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সম্মান ঘরের কতখাদের প্রকৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষালভের বাধাবিগতি দূর করেন। তদবধি সেমে প্রাথমিক প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ অন্যতকালমধ্যে আমরা কোন কোন বঙ্গমহিলাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখি। তাহাদের রচনা ইংরাজী ও গুপ্ত-সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রে সাদরে স্থান লাভ করিত।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ছাপার হস্তকে বঙ্গমহিলা-রচিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি কাব্য; নাম—‘চিত্তবিলাসিনী’; রচয়িত্রী—কৃষ্ণকামিনী বাসী। ওগু-কবি ইহার সমালোচনা-প্রদর্শে ‘সংবাদ প্রভাকরে’ (২৮-১১-১৮৪৬) লেখেন :— “আমরা পরমানন্দ-সাগর সলিলে-নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ‘চিত্তবিলাসিনী’ নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অকন্যাসগের বিদ্যাহুঙ্কর বিষয়ে যে সুপ্রকাশী এ-দেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ,……অবলাগণ বিদ্যাহুঙ্কর পূর্বক অকলীমগলে প্রতিষ্ঠিতা হইল ইহা আমাদের নিগের প্রার্থনা।”

১৮৪৬ সনে প্রকাশিত ‘চিত্তবিলাসিনী’ হইতে পরবর্তী ৪৭ বৎসরের মধ্যে যে-সকল গ্রন্থকারের সম্মান পাওয়া যায়, তাহাদের নাম ও রচনার উল্লেখ ১৮৬৪-৬৬ ও ১৮৬৬-৬৭ সনের সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে (General Report on Public Instruction) আছে :—

কৃষ্ণকামিনী বাসী : ‘চিত্তবিলাসিনী’ (কাব্য)—ইং ১৮৪৬। পৃ. ৭২।

বামনহুম্মরী দেবী (পাবনা) : ‘কি কি কুলংকার তিরোহিত হইলে এসেগের শ্রুতি
হইতে পারে’...৪ বৈশাখ ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ২০।

এই সন্দর্ভটির কুন্দিকা লোকনাথ ঞ্জের লিখিয়াছেন :— “ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক
হইবে না, বিদ্যার্জুনা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে বিদ্যার্জুনে নিবর্তন হইলে আবারের সৌন্দর্য
দ্রষ্টব্য যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালম্বারে কুন্ডিত হইতে পারেন, তাহা এসেগের লোকের
কল্পনাম করিয়া কেওনা আমার এই পুস্তক প্রচার করিবার অন্তর উদ্বেগ।”

৩। হরকুমারী দেবী (কালীঘাট) : ‘বিদ্যাসারিত্রলনী’ (কাব্য)...১২ আশ্বিন ১৭৮৩ শক
(ইং ১৮৬১)। পৃ. ৮৪।

পুস্তকে লেখিকা নিজ নাম এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

“পল্লবীতে বেই শ্রব্য না করে ডঙ্কণ।

তার আশ্রয় বর্ণ অগ্রে করিয়া গ্রহণ।

কত টি মিথুন রাশে হয় বেই নাম।

রচয়িত্রী সেই দেবী কালীঘাট ধাম।”

কৈলাসবাসিনী দেবী (দুর্গাচরণ গুপ্তের গরী) :

‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’ (সন্দর্ভ)...১৭৮৪ শক (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ৭২।

‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাজ্ঞান ও তাহার সমৃদ্ধি’...১৭৮৭ শক (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৩২।

৪। মার্ঘী সৌম্যমিনী সিংহ : ‘নারীচরিত’...ইং ১৮৬৪। পৃ. ২৪।

৫। রাখালমণি গুপ্ত : ‘কবিতামালা’...ইং ১৮৬৪। পৃ. ৭২।

৬। কামিনীহুম্মরী দেবী (নিবপুত্র) : ‘উর্জ্জ্বলী নাটক’...১২৭২ শাল (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৮৪।

নাটকখানিতে গ্রন্থকর্তার নাম “শিবজিতনাথ” আছে। কিন্তু ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত ইহার পরবর্তী
পুস্তক ‘বালা বোধিকা’র “উর্জ্জ্বলী নাটক রচয়িত্রী ক্রীমতী কামিনীহুম্মরী দেবী প্রণীত” মূল্যিত হইয়াছে।

৭। বলস্ককুমারী দাসী (বরিশাল) : ‘কবিতারঞ্জনী’।

বঙ্গমহিলারা ক্রমশঃ মাদিকশত্রের পৃষ্ঠাতেও আশ্রয়প্রাপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের
অনেকেই রচনা ১৮৬৩ সনে হইতে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’র “বামাগণের রচনা”-বিভাগে সাময়িক স্থান
পাইতে লাগিল। ফলে পরবর্তী ৪৭-এগার বৎসরে গ্রন্থকর্তার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইল। আমরা
ইহাদের জন-কঙ্কের নামোল্লেখ করিতেছি :—

কামিনীহুম্মরী দেবী : ‘বালা বোধিকা’...১২৭৪ শাল (এপ্রিল ১৮৬৬)। পৃ. ৩২।

‘উষা নাটক’... (আগষ্ট ১৮৭১)। পৃ. ৩২।

কৈলাসবাসিনী দেবী : ‘বিশ্বের শোভা’ (সন্দর্ভ)... (এপ্রিল ১৮৬৩)। পৃ. ১১৭।

দরহরী দেবী : ‘পতিভক্তা ধর্ম’ (সন্দর্ভ)... (জুন ১৮৬৩)। পৃ. ৭২।

নবীনকালী দেবী : ‘কামিনী কলঙ্ক’ (উপস্তান)... (এপ্রিল ১৮৭০)। পৃ. ২৪৩।

কুমারী দাসী : ‘পদ্মমালা’ (আগষ্ট ১৮৭০)। পৃ. ৬০।

অমলাহুম্মরী দাসী : ‘অবলা-বিলাপ’ (কাব্য)... (চৈত্র ১২৭৬ (ইং ১৮৭২)। পৃ. ৩৭।

লক্ষ্মীমণি দেবী : 'চিত্রদ্বয়ালিনী' (সাময়িক নাটক) : (ইং ১৮৭২)। পৃ. ১২২।

দেবালিনী : 'মনোরমা' (আখ্যায়িকা) : আশাঢ় ১২৮১ (জুলাই ১৮৭৪)। পৃ. ২৫।

স্বপ্নিনী দেবী : (প্রসঙ্গিক সর্বাধিকারীর পত্নী) 'ভার্যচরিত' (স্বাক্ষরানীর উত্তিহাস-মূলক আখ্যায়িকা) : ১২৮১ সাল (আশ্বিন ১৮৭৪)। পৃ. ৫৫।

বঙ্গমহিলার দলী (বহিঃপাল) : 'বৈদিকজ্ঞান' : ভাদ্র ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৫।

বিদ্যামোহিনী দালী : 'কবিতাহার' : ১২৮৩ সাল (বার্ঘ ১৮৭৭)। পৃ. ৭০।

তরঙ্গিনী দালী (কোমল) : (চন্দ্রমোহন ঘোষের পত্নী) 'নিবন্ধ তরু' (দম্পত্য ও কবিতা) : আশ্বিন ১২৮৪ (অক্টোবর ১৮৭৭)। পৃ. ৫৬।

সে-মুগে যথোচিত শিক্ষার অভাব এবং সাময়িক ও পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তথা স্বপ্ন করিলে এই সকল বঙ্গমহিলার দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে না।

পত্নীভাবের সপ্তম দশকে এমন একজন প্রতিভাশালিনী সাহিত্যিক অবিরুদ্ধ জন. দাঁড়াল পঞ্চ-পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম নৃতনত্বের আশ্রয় পাই। ইনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বপ্নমহিলার দেবী। প্রতিভার বাহু-স্পর্শে সর্বপ্রথম ইহার রচনাই শিল্পস্বয়ম্ভাবিত হইয়া উঠে, একথা বলা চলে। সাহিত্যেও সকল বিভাগেই তাঁহার দান বিপুল। এই সময় হইতেই প্রচুরতমক আশ্রয় এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের স্বপ্ন পাই, গীতাঙ্গী সাহিত্যে বিশিষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-বন্দিতার এই সকল পুত্রাঙ্গীর সাক্ষিপ্ত পরিচয়, রচনাবলীর তালিকা সহ, নিম্নে দিতেছি : স্বানভাবে সর্বত্র রচনার নিম্নরূপ দেওয়া সম্ভব হইবে না।

স্বপ্নমহিলার দেবী।— আত্মনামিক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জোড়ালোকের বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে স্বপ্নমহিলার দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা ; রবীন্দ্রনাথের ভগিনী। ১৮৬৭ সনের ১৭ই নবেম্বর ১৩ বৎসর বয়সে জ্ঞানকীনাথ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

স্বপ্নমহিলার মূল্যবান জীবন বাণী-সামান্য সমৃদ্ধ। তাঁবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গভাবভীষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার দান সুবিপুল। বঙ্গমহিলারের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। দীপ-নির্মাণ (উপক্ৰাস) : ১২৮৩ সাল (১৫-১২-১৮৭৩)। পৃ. ৩২১।

২। বঙ্গ উৎসব (ঐতিহাসিক উপক্ৰাস) : ১৮০১ শক (৪-১১-১৮৭২)। পৃ. ৪০।

৩। ছিন্নমূল (উপক্ৰাস) : (৪-১১-১৮৭২)। পৃ. ২৩৮।

৪। মালভী (উপক্ৰাস) : ১২৮৬ সাল (২৫-৩-১৮৮০)। পৃ. ৪৪।

৫। গাথা : ১২৮৭ সাল (২০-১২-১৮৮০)। পৃ. ২৫।

৬। পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) : আশ্বিন ১২৮৩ (২৭-৩-১৮৮২)। পৃ. ১৩৪।

৭। সবি সন্নিহিত : ১২২৩ সাল (১২-৮-১৮৮৩)। পৃ. ২৪৬।

৮। দিব্যরত্ন (ঐতিহাসিক উপক্ৰাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক (১৭-৩-১৮৮৭)। পৃ. ৮০।

৯। বঙ্গলীর ইমামবাড়ী (ঐতিহাসিক উপক্ৰাস) : শ্রাবণ ১২২৪ (৮-১-১৮৮৮)। পৃ. ২৪৬।

বিব্রোহ (ঐতিহাসিক উপক্ৰাস) : ১৪ শ্রাবণ ১২২৭ (২-৮-১৮৯০)। পৃ. ২৮২।

বিবাহ উৎসব (নাটক) : (১০-৪-১৮২২)। পৃ. ২৩।

নবকাহিনী (ছোট গল্প) : (১৭-৮-১৮২২)। পৃ. ১২৮।

খেলেতা বা পালিতা (উপন্যাস) :

১ম খণ্ড। ১২২২ সাল (১০-১০-১৮২২)। পৃ. ২৩৮।

২য় খণ্ড। কানুন ১২২২ (১৪-৩-১৮২৩)। পৃ. ১৮২।

ফুলের মালা (উপন্যাস) : (১২-৩-১৮২৪)। পৃ. ১৪২।

কবিতা ও গান : কার্তিক ১৩০২ (১-১২-১৮২৪)। পৃ. ২৪০।

কাহাকে ? (উপন্যাস) : জুলাই ১৮২৮। পৃ. ১২১।

কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা : ইং ১২০১, জ্যৈষ্ঠ। পৃ. ৮১।

সেবকৌতুক (কাব্য নাট্য) : ১৩১২ সাল (২৯-২-১২০৩)। পৃ. ২৬।

কনে-কল (প্রহসন) : বৈশাখ ১৩১৩, ইং ১২০৬। পৃ. ৪৮।

পাকচক্র (প্রহসন) : (২৮-২-১২১১)। পৃ. ৭০ + ১৮।

২১। শ্রদ্ধাকল্পা (নাটোপন্যাস) : (১৭-৪-১২১০)। পৃ. ৮২।

২২। নিবেদিতা (নাটক) : ৩ এপ্রিল ১২১৭। পৃ. ৩০।

২৩। দুশান্ত কাহানাট্য : (২০-১-১২১৮)। পৃ. ৩৬।

২৪। বিজিতা (উপন্যাস) : ১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭-৪-১২২০)। পৃ. ১৪৭।

২৫। স্বপ্নবাস্তি (উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪-১০-১২২১)। পৃ. ১৭২।

২৬। নিলন দ্বাত্রি (উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১২২৪। পৃ. ২৮৫।

২৭। দিবা-কমল (নাটক) : (১৪-৪-১২৩০)। পৃ. ১৮৩।

কর্ণকুমারী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকেরও রচয়িতা। তিনি অতীত যোগ্যতাব সহিত দীর্ঘকাল ‘ভারতী’ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ১২৩২ সনের ৩রা জুলাই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রসন্নবরী দেবী।— ইনি সার্ব আন্তরিক চৌধুরীর মেজা ভগিনী ও প্রিয়তমা দেবীর মাতা ; জন্ম— ১৮৫৭ সনে। ইহার পিতা— পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম-নিবাসী দুর্গাদাস চৌধুরী। ৪৭ বৎসর বয়সে পাবনা ভগাইগাছা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকুমার বাগচীর সহিত প্রসন্নবরীর বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাহার বানী উল্লেখযোগ্য হন ; সেই অবধি তিনি শিখারদেই কাটাষ্টয়াছেন।

প্রসন্নবরী শৈশব হইতেই সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার ‘বনলতা’ ও ‘নীহারিকা’ কাব্য দুইখানি তাহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহার রচিত আত্মবলীর কালাত্মকমিক তালিকা :—

১। আশ আশ তামিষী (কাব্য) : ১২৭৬ সাল (১৪-২-১৮৭০)।* পৃ. ১২।

২। পূর্ণব্রজি।* কলকাতা ২১ বৈশাখ ১২৮২ (ইং ১৮৭৪)। ১০

* এই পুস্তকের সমালোচনা এসময় ‘সাহায্যী’ (৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) দিখাইয়াছেন :—“কলকাতা যে বাড়ীর সকল লোক হইয়াছিল, তাহাতে প্রসন্নবরী এই ‘পূর্ণব্রজি’ প্রথম পাঠ করিয়াছিলেন। এখানে তাহা সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। এই পূর্ণব্রজিতে, আশ্বিনের বর্ষমান অবধি আশ্বিন হইল ও ভক্তিধর আশা প্রাপ্ত হইল। প্রসন্নবরী দেবী ভারতের মত অসংখ্য করিয়াছেন, আশ্বিনের বর্ষমান অবধি আশ্বিন হইল ও ভক্তিধর আশা প্রাপ্ত হইল।”

সুব্রাহ্ম প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে (কবিতা) : (১৭-১২-১৮৭৪)। পৃ. ২৬।

বনলতা (কাব্য) : ১২৮৭ সাল (২০-৪-১৮৮০)। পৃ. ১১২।

নীলগিরিকা (কাব্য) :

১ম ভাগ, ১২২০ সাল (২০-৮-১৮৮৪)। পৃ. ১৪২।

২য় ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৮১৮ বঙ্গ (১১-১২-১৮৮৬)। পৃ. ১৪২।

৬। আশ্বাবর্ত্ত (প্রবণ) : শৌর্য ১২২৪ (১২-১-১৮৮২)। পৃ. ১৭৭।

৭। অশোক (উপন্যাস) : ১২২৬ সাল (১০-৪-১৮৮০)। পৃ. ৬২।

৮। ভারতবর্ষ (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (৩-২-১৯১৭)। পৃ. ১১৬।

৯। পূর্বকথা (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (১২-১০-১৯১৭)। পৃ. ১৮৭।

১৯২২ সনের ২৪এ নবেম্বর প্রদর্শনীর পরলোকগমন করিয়াছেন।

মোক্ষদাহিনী মুখোপাধ্যায় (মোক্ষদা দেবী)।— ইনি ডবলিউ সি বোনার্ডার সহোদরা। বউবাজারের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিনোদ মন্ডলের পৌত্রি— শশিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মোক্ষদাহিনী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহার রচিত ‘বন-প্রবণ’ কাব্য সমালোচনাকালে সত্যচন্দ্র-লস্করিত ‘বঙ্গবর্নন’ (জৈষ্ঠ ১২৮২) যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃতযোগ্য :— “মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুগ্ধকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাপালিনী বটে।... আমরা এই গ্রন্থকর্ত্রীর অসঙ্গত প্রণয় প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। স্বেচ্ছায়ই অর্চনেন, বাঙ্গালার সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রীতি পরসম্মানে গৃহস্থ করে বাঙ্গালার পুণ্ড্র লেখকদিগের মধ্যে এমন পূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রীতি ‘বাঙ্গালীর বেধে’ নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মধ্যে জ্বলিওঁ কাতর। যাঁহি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীর্যবান বঙ্গপরিচর— দ্বন্দ্বিত। হেমচন্দ্রের এই কবিতায় উক্তই মোক্ষদাহিনী ‘বাঙ্গালির বাবু’ নিরোনায়ে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রংগার— লেখিকার সিঁদুলকুশরিচাহিকা— ‘মুখোপাধ্যায় পাঠের বোঙ্গা।’

রচনার নিম্নলিখিত-করণ আমরা মোক্ষদাহিনী-লিখিত “বাঙ্গালির বাবু” কবিতাটির কয়েক পাংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

“হায় হায় মই হায় বাঙ্গালীর বাবু!

মন্টা হ’তে চারটাবি দান্ন মুক্তি করা

সারাদিন বইতে ছব দালার পদরা।

উকীল, ডেপুটি কেম, কেম বা মাস্টার,

স্বচ্ছন্দ কেরানী কেম, ওচারদিল্লার,

বড় কল বড় হান, অফিসার কত

ধরায় মেছেন বাবু সরাদানা মত।

সারা দিন খেটে খেটে, বস্ত উঠে মুখে

শেগের বকাই হয় করে এসে মুখে।”

আমরা বোদ্ধাধিনীর রচিত এই তিনটি গ্রন্থের সম্বন্ধ পাইবাছি :—

১। বন-প্রস্থান (কাব্য)। ইং ১৮৮২।

২। সমল বন (ইতিবৃত্তমূলক উপজ্ঞান)। ইং ১৮৮৪ (১২ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৩২।

৩। কল্যাণ-প্রদীপ (জীবনী)। অগ্রহায়ণ ১৩০৫ (ইং ১২২৮)। পৃ. ৪২২।

১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (ইং ১৮৭০) “বিদিশপুত্র-নিবাসিনী” জনৈক মহিলায় সম্পাদনায় বঙ্গবহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র—‘বঙ্গবহিলা’ (পাক্ষিক) প্রকাশিত হয়। তিনবার্হি, এই “বিদিশপুত্র-নিবাসিনী” দ্বারা কেহই নছেন,— বোদ্ধাধিনী মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বোদ্ধাধিনী স্বামী।— ইহার জন্ম ১৮৫৮ সনের ১৮ই আগষ্ট। পিতার নাম—হাত্যগচন্দ্র মিত্র। ৪৭ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বোদ্ধাধিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত, বউবাজার-নিবাসী অকুর গঙ্গের প্রণৌর ভ্রূগাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৮৪ সনে দ্বিতীয়বোদ্ধাধিনীর বৈধবা ঘটে।

দ্বিতীয়বোদ্ধাধিনী দাম্পত্য বর্ষ হইতেই কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত ‘অঙ্গকণা’ বাংলা-শাসিতো তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। দ্বিতীয়বোদ্ধাধিনীর গ্রন্থগুলির তালিকা :—

১। জনৈক বিশ্বমহিলায় পদ্মাবলী : (১২ ক্ষেত্রাবলি ১৮৭২)। পৃ. ১৭।

২। কবিতাহার (কাব্য) : ২২ মাঘ ১২৭২ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৩২।

৩। ভারত-সুন্দর (কাব্য) : ১ কার্তিক ১২৮২ (ইং ১৮৮২)। পৃ. ৮৮।

৪। অঙ্গকণা (কাব্য) : ১২২৪ সাল (ইং ১৮৮৭)।

৫। আভাষ (কাব্য) : ১২২৭ সাল (৪-৪-১৮৯০)। পৃ. ১৪১।

৬। সত্যানিনী বা স্বীকৃতিবাহী (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য) : ১ কার্তিক ১২২২ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১০৬।

৭। শিবা (কাব্য) : ১০০৩ সাল (২৮-৪-১৮৯৬)। পৃ. ১৪৮।

৮। অর্ঘ্য (কাব্য) : ১০০২ সাল (১০-২-১২০২)। পৃ. ৮২।

৯। স্বদেশিনী (কাব্য) : ১০১২ সাল (২৪-২-১২০৬)। পৃ. ২৭।

১০। সিদ্ধপাশা (কাব্য) : ১০১৪ সাল (৮-৪-১২০৭)। পৃ. ৮২।

দ্বিতীয়বোদ্ধাধিনী তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) ‘স্বাক্ষরী’ নামে মাসিক পত্রিকা হইতাবে পরিচালন করিয়াছিলেন। ১২২৪ সনের ১৮ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কামিনী দাস।— ১৮৬৪ সনের ১২ই অক্টোবর বামরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বালগা গ্রামে এক বৈদ্য-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখক চরিত্রের সেন। ১৮৮৬ সনে কামিনী বেবুন কলেজ হুল হইতে ইতিহাসের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সনে টাউন্টরি সিবিলিয়ান কেমারনাথ কলেজের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০২ সনে তাঁহার বৈধবা ঘটে।

কামিনী আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যখানি সাহিত্য-সমাজে তাঁহাকে স্বামী আসন দান করিয়াছিল। কামিনী কালের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। আলো ও ছায়া (কাব্য) : ইং ১৮৮২ (১ নবেম্বর)। পৃ. ১৬৮।

২। নির্দোষ (কাব্য) : (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ. ৮০।



স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৪৪-১৮৫৩



कामिनी राय

१९४४-१९००

- ৩। শৌর্যাদিকী (কাব্য) : ১৮১২ শক (ইং ১৮২৭)। পৃ. ৬০।
- ৪। গুণন (শিতকাদোর কবিতা) : ১৩১১ সাল (১৪-৪-১২০৪)। পৃ. ৬৬।
- ৫। দর্শনপুত্র (গল্প) : ১৩১৪ সাল (১৪-৭-১২০৭)। পৃ. ৪২।
- ৬। অশোক-বৃতি (কবিতা) : (২ জুন ১২১০)। পৃ. ৩২।
- ৭। আত্মিকী (কবিতা) : ইং ১২১০ (৪ জুন)। পৃ. ১০০।
- ৮। মালা ও নির্মালা (কাব্য) : ইং ১২১০ (২৬ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১১০।
- ৯। অশোক-দগীত (সনেটগুচ্ছ) : ইং ১২১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৭৮।
- ১০। অম্বা (নাট্যকাব্য) : ইং ১২১৪ (৮ এপ্রিল)। পৃ. ১০৪।
- ১১। দিতিমা (গল্প নাটক) : ইং ১২১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ. ৬২।
- ১২। বাসিকা শিল্পার আদর্শ—অতীত ও বর্তমান (নিবন্ধ) : (১ সেপ্টেম্বর ১২১০)।
- ১৩। ঠাকুরমার ডিঠি (কবিতা) : (১৭ মে ১২২৪)। পৃ. ২৬।
- ১৪। দীপ ও বৃক্ষ (কাব্য) : ইং ১২২২। পৃ. ১৭৬।
- ১৫। জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ) : ইং ১২৩০। পৃ. ৭০।

১২৩০ সনের ২৭এ সেপ্টেম্বর কাহিনী ব্যয়ের বৃত্তা হইয়াছে।

বিনয়কুমারী বসু (ধর্ম) :—ইনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদয়ার কন্যা। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ডাঃ ভয়রভদ্র ধরের সহিত ইহার বিবাহ হয়; এই বংশেরল মঙ্গলারূপ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' ইহার নামের শেষে "বসু" আছে, কিন্তু পৌষ-সংখ্যায় "ধর্ম" বেশিতেছি। বিনয়কুমারী কবিতা 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'দালী', 'প্রবীণ' প্রভৃতি বাসিকপত্রে সাধারণ স্থান লাভ করিত। আমরা ঠিকাই ছুইখানি কাব্যের উল্লেখ পাইয়াছি; উহা—

- ১। নব মূল (কাব্য) : (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ২০।
- ২। নিষ্ঠুরতা (কাব্য) : (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১)। পৃ. ১০২।

প্রবীণা বসু (নাগ) :—ইনিও মনোমোহন ঘোষের ভাদিনেত্রী,—কনিষ্ঠা সহোদয়ার কন্যা। ইহার শিহ্নালয়—বিক্রমপুর। ১২২৭ সালে বিলাত-কোরত ডাঃ পলাকান্ত নাগের সহিত প্রবীণার পরিণয় হয় (৩^০ "৩৩দিনে"—'প্রতিমা' মঙ্গলারূপ ১২২৭)। অতি অল্প বয়সেই ইহার কাব্যপ্রতিভা স্পষ্টিত হয়। ১২২০ সাল হইতে ইহার রচিত কবিতা 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী', 'নবভাস্কর', 'সাহিত্য' (১২২৮-১৩০০, ১৩০৪-৫), 'প্রতিমা' প্রভৃতি সৌ বৃন্দের জ্যেষ্ঠ পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রবীণার এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

- ১। প্রবীণা (কাব্য) : জ্যৈষ্ঠ ১২২৭ (ইং ১৮২০)। পৃ. ১২৪।
- ২। ত্রুটি (কাব্য) : ইং ১৮২২। পৃ. ১৪৮।

প্রবীণা অকালে পরলোকগমন করেন; ১৩০০ সালে ঐহার "বৃত্তা" হয় (৩^০ "প্রবীণা নাগ" কবিতা : ঐন্দ্রেশ্বরপ্রদাস ঘোষ—'সাহিত্য' পৌষ ১৩০৩)।

মানকুমারী বসু :—১৮৬০ সনের ২৪এ ভাদ্রয়ার বশোহর ফেলার ঐশ্বরপুর গ্রামে মাতুলেশ্বর মানকুমারীর জন্ম হয়। ঐহার পিতার নাম স্বানন্দমোহন বসু ঐশ্বরী। ১৮৭০ সনে, ৪শ বৎসর বয়সে,

বিজ্ঞানস্বকী এামের বিশ্বশব্দর বহুর্ধ সচিত তাঁহার বিবাহ হয়। উনি বঙ্গর পূর্ষ হইতে-না-হইতেই তাঁহার বৈধবা ধটে। বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে মনোমুগ্ধাৱী মন বসিত না, তিনি শেষে লাহিতা-সেবায় মাস্থনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা দিতেছি—

- ১। গ্রন্থপ্রসঙ্গ বা হার্যাপো প্রণয় (গড়-গড়) : ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ১০০।
- ২। বনবাদিনী (উপন্যাস) : ভাঙ্গ ১২২৫ (৫-২-১৮৮৮)। পৃ. ২৩।
- ৩। বামালী রক্ষসিঙ্গের বৃহৎ (সম্বর্ত) : (১৫-৭-১৮২০)। পৃ. ১২।
- ৪। ছুইটি প্রবন্ধ : ১২২৮ সাল (২২-১২-১৮২১)। পৃ. ০২।
- ৫। কাব্যকুসুমালি (কাব্য) : ইং ১৮২০ (২ অক্টোবর)। পৃ. ২৭১।
- ৬। কনকালি (কাব্য) : ১০০৩ সাল (২২-১০-১৮২৬)। পৃ. ২৬০।
- ৭। বীরকুমার-বধ কাব্য : ১০১০ সাল (১০-৫-১২০৪)। পৃ. ২০৪।
- ৮। শুভ সাধনা (গড়-গড়) : ইং ১২১১। পৃ. ১৮৪।
- ৯। বিকৃতি (কাব্য) : চৈত্র ১৩০০ (১২-৪-১২২৪)। পৃ. ০১১+১।
- ১০। সোনার গাথী (কাব্য) : (২-১-১২২৭)। পৃ. ৫০।
- ১১। পুতান চবি (সাধাৱিক) : (২৪-৭-১২০৬)। পৃ. ১০১।

ছোট গল্প রচনাযে মনোমুগ্ধারী শিক্ষক ছিলেন। ‘কুমার-পুত্রসারে’র প্রথম (১০০০), তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে (১০০৪-৬) তাঁহার গল্প স্থান পাইয়াছিল। ১২৪০ সনের ২৬৫ ডিসেম্বর, ৮১ বঙ্গর বঙ্গল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কুমারকুমারী দেবী।— ইনি বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার ভবিনার ঠাংলঙর রাধা চৌধুরীর পত্নী, কবি সেবকুমার রাধা চৌধুরীর জননী। কুমারকুমারী স্বামীর নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া বীথ মবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির কালাহরুক্ষিক তালিকা দিতেছি; তিনি কোন পুস্তকেই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই :—

- ১। প্রেমলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ মাস ১২২৬ (২০-১-১৮২০)। পৃ. ২০৪+৭। ইহা “কোন মহিলা কষ্টক প্রাপ্ত।”
- প্রেমলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ আশ্বিন ১২২২ (ইং ১৮২২)। পৃ. ২৬৮।
- প্রবন্ধকালি (সম্বর্তাবলী) : ১০০৭ সাল (৩০-২-১২০০)। পৃ. ২৭+১৬।
- শান্তিলতা (উপন্যাস) : (২৭-২-১২০২)। পৃ. ২৪৭।
- সুখ-উদ্ভিদা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : ১০১২ সাল (৩-২-১২০৪)। পৃ. ২০৩।

• কুমারকুমারী দেবী ‘ভারতী ও বালক’র পৃষ্ঠায় ‘প্রেমলতা’ নামে একবারি উপন্যাস দ্বাৱাৱাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুমারকুমারী দেবীর ‘প্রেমলতা’ ব্যতির ইহাে কুমারকুমারী তাঁহার উপন্যাসব্যতির নাম পরিবর্তন করিয়া ‘পালিতা’ রাখেন (‘ভারতী ও বালক’, বৈশাখ ১২২৭ এইক)। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ‘প্রেমলতা বা পালিতা’ নামে, ১২২৯ সালে (১৮-১-১৮২২), পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১০০। আদি ‘মহিলা-সাধক-ওবিতমালার’ মধ্যস্থক ‘কুমারকুমারী দেবী’ পুস্তকে ইহার যে প্রকাশকাল বিখ্যাত, তাহা ঠিক নহে।

কৃষ্ণকুমারীর পুস্তকগুলি স্বীকৃতিস্বরূপে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। 'প্রেমলতা'-পাঠে বিভাগ্যস্বরূপ এইরূপ অভিন্ন প্রকাশ করেন :— "সমাজচরিত্র চানিবার পক্ষে ইহা একখানা অমূল্য গ্রন্থ। 'বাধীন' দ্বারা হইলে ইহার পকি-পকি লংঘন হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" সাহিত্য-লম্বাই বক্তব্য 'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া সিদ্ধিগাছিলেন :— "আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি সত্য মূল উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার দৃষ্টি হয় নাই। প্রত্যেক পবিবারে এক একখানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।" ১৩২২ সালের তাম্র মাসে কৃষ্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে (ঐ 'ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২২)।

সর্বোচ্চকুমারী দেবী।— ইনি হুগ্গলিখ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ ভূগের ভগিনী। ইহার জন্ম— ৪ নবেম্বর ১৮৭৪ তারিখে। মল বংশের বংশে (ইং ১৮৮৩) কলুটোলায় সেন-বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনের সহিত ইহার বিবাহ হয়; যোগেন্দ্রনাথ সত্বেশ্বরের পদবর্তী উকীল ছিলেন। সর্বোচ্চকুমারী বিবাহের পর নিজের চোঁচা সোণালতা শিখিয়াছিলেন। ১২২৪ সাল হইতে তিনি 'ভারতী'তে ও ১২২৭ সাল হইতে 'সাহিত্যে' লিখিতে শুরু করেন। ইহার রচিত এই কথখানি গ্রন্থপুস্তকানি নিম্নলিখিত :—

- ১। হালি ও মল্ল (কাব্য) : মার্চ ১৩০১ (ইং ১৮২৪)। পৃ. ২২৪।
- অথোকা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (৩-৭-১২০১)। পৃ. ২৭৫।
- ৩। কাচিনী বা কুহু গল্প : ১৩১২ সাল (৩-১১-১২০৪)। পৃ. ৩১১।
- ৪। নতুন (কাব্য) : (২৩-২-১২১০)। পৃ. ১২২।
- ৫। অদ্বৈত-লিপি (গল্প) : (২২-৩-১২১৪)। পৃ. ১১৭।
- ৬। কুলদানি (গল্প) : (৮-১০-১২১৫)। পৃ. ১৪৫।

১২২৬ সনে সর্বোচ্চকুমারীর মৃত্যু হইয়াছে (ঐ 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)।

অমৃতকুমারী বাসন্তী।— ১৮৭০ সনে পাবনা জেলার ডাঙ্গাবাড়ী গ্রামে অমৃতকুমারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দনাথ সেন প্রাচ্যল্যায়ী একজন উকীল ছিলেন। কবি রজনীকান্ত সেন এই গোবিন্দনাথেরই ভ্রাতৃপুত্র। অমৃতকুমারীর বিবাহ হয় তেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কৈলাসগোবিন্দ নাথের সহিত। বিবাহের বৎস হইতেই তাঁহার অন্তরে কবিত্বশক্তির উদ্বেগ হয়; বিজ্ঞানসাহী স্বামীদেব সুলোচনে আনিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি বিকশিত হয় ও তিনি বিজ্ঞানচর্চা করিয়া স্বযোগ লাভ করেন। 'বাবাঘোষিনী পত্রিকা', 'সাহিত্য', 'মহাভারত' প্রভৃতি মাসিকপত্র ও 'হৃদয়-পুস্তক' অমৃতকুমারীর গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি এই :—

- ১। কবিতালহরী : (১০-২-১৮২২)। পৃ. ২১।
- ২। অমৃতকুমারী (কাব্য) : (১২-১০-১৮২৫)। পৃ. ২৪।
- ৩। স্মৃতি ও পুষ্টি (কাব্য) : ১৩০৪ সাল (২-২-১৮২৭)। পৃ. ১৪১।
- ৪। বোকা (নোক-কবিতা) : সংবৎ ১২৪২ (২৪-৪-১২০৩)। পৃ. ২১২।
- ৫। প্রভাতী (উপন্যাস) : ইং ১২০৫ (১০ জুলাই)। পৃ. ৪১।

• ইতিমধ্যে আশ্বিন মাসের ১৩১০ সনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "কৃষ্ণকুমারী"-রচিত 'কৃষ্ণিকা' নামে একখানি কাব্য আছে। ইনি ও কৃষ্ণকুমারী দেবী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

১। জুটী কথা (গল্প) : ১০১২ সাল (৩-২-১২০৩)। পৃ. ৩২।

২। ভাব ও ভক্তি (কাব্য) : ১০১৩ সাল (২৪-১-১২০৭)। পৃ. ১৩৬।

৩। গল্প : ১০১৩ সাল (১৭-৪-১২০৭)। পৃ. ১৭৭।

৪। প্রেম ও পুণ্য (কাব্য) : ১০১৭ সাল (২০-৪-১২১০)। পৃ. ১৮০।

ইহা ছাড়া তিনি ভাগবতের সারাংশ সহিত 'ঐতীকলীলামৃত' (ইং ১২০২) ও পরে 'ঐতীক বেলিদলাপ', 'ঐতীরামকীর্তি হৃদ্য', 'ঐতীকেশব সহস্র নাম' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৪৩ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে অজ্ঞানত্বের দ্বারা হইয়াছে।

রাসলক্ষ্মী।— রাসলক্ষ্মী ছিলেন— কিশোরীলাল সরকারের মাতা। তিনি সরল ও প্রাণল, ভাষার আনন্দকথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'আমার জীবন' বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়— ১২৮০ সালে (২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৩)। ১৩০৪ সালে ডাঃ সরলীলাল সরকার পিতামহীর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। রচনার নিবর্ণন-স্বরূপ রাসলক্ষ্মীর 'আমার জীবন' চাইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার মা বলিলেন, এই যে, আমাদের দলানে ঠাকুর আছেন, তাঁহারি নাম গদ্যমাধব, তিনি ঠাকুর। কলা তোমাঘের যে লোক নবীর কুল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল, সে মাছব। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি বলিয়াছিলে, ভাব হইলে গদ্যমাধবকে ভাকিও, আমাঘের গদ্যমাধব আছেন। তবে যে কালি এখন ভাব হইল, আমরা গদ্যমাধব! গদ্যমাধব! বলিয়া কত ভাকিলাম, আইলেন না কেন? মা বলিলেন, ভাব পাইয়া কীমতে কীরিতে গদ্যমাধব! গদ্যমাধব! বলিয়া ভাকিয়াছিলে। গদ্যমাধব তোমাঘের কাল্য অনিয়া এই মাছব পাঠাইয়া দিয়া তোমাবিগকে বাটীতে আনিগাছেন। আমি তখন মাকে ভিজ্ঞাপা করিলাম, মা! গদ্যমাধব দলানে থাকিবা কেনন করিগা আমাঘের কাল্য অনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব বাধেই আছেন, একত্র অনিতে পায়া। তিনি সকলের কথাই শ্রবন।

সেই পরমেশ্বর আমাবিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে টংবানে থাকিবা ভাবে, তাহাই তিনি শ্রবন। বড় করিয়া ভাকিলেও তিনি শ্রবন, ছোট করিয়া ভাকিলেও শ্রবন, মনে মনে ভাকিলেও শ্রবনা থাকেন। একত্র তিনি মাছব নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাঘের? মা বলিলেন, হা, এই এক পরমেশ্বর সকলেদি, সকল লোকেই তাঁহাকে ভাবে, তিনি আমিকর্তা। এই পৃথিবীতে বস বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভাল বাসেন, তিনি সকলেই পরমেশ্বর।

বাক্যবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু, তাহা আমি এ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, তাহাই শ্রবনা থাকি, এই মনে আমি। মা বলিলেন, তিনি ঠাকুর, একত্র

১। গ্রন্থের সংস্করণের পুঙ্খকর এই একাংশকাল জেল লাইব্রেরী-সমিতির হস্তিচ-পুঙ্খকরিতা তালিকা হইতে দৃষ্ট।
২। দ্বিতীয় সংস্করণের পুঙ্খকর হস্তিচ-বাক্যবিক; রাসলক্ষ্মী লিখিয়াছেন :— "১২১০ সালে ১৮৭৩ সালে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বর্ষ ১২৭৪ সালে মনে এখন হইয়া বস, তবে আমার বাক্যবিক উপর্যুক্ত কথার ছিল।"

স্বপ্নের মনের ভাব জ্ঞানিতে পারেন। আর ঐ কথা শুনিয়া আমার মনে অনেক সখ্য হইল। বিশেষ সেই বিবল হইতে আমার বৃদ্ধির অঙ্কুর চুইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমারে ঠাকুর, তাহাও আমি সেই বিবল হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভয়না হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে তাকিলেও তিনি ক্ষমক, তবে আর কিসের ভয়, এমন যদি আমার ভয় কুটে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। আর ঐ কথা আমার চিরস্মারী হইয়াছে, বা বলিবাচেন, আমার পরমেশ্বর আছেন।”

মুগ্ধালিনী সেন।— ইনি লাত্জিমোহন ঘোষের কন্যা, শৈশবে পাটকপাড়ার কুমারিকাণী টাঙ্গুচন্দ্র দিগ্বেলের সহিত পরিণীতা হন। অল্প কাল পরে উভয় সৈখ্য ঘটে; কামি-বিয়োগ-বিদূর অবস্থায় ইনি কাব্যচর্চায় প্রগুণ হন। কয়েক বৎসর পরে ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। তাঁহার রচিত এই চারিখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

- ১। প্রতিপলি (কাব্য) : ১৩০১ সাল (১০-৮-১৮২৪)। পৃ. ১৮৪।
- ২। নিক্সিটী (কাব্য) : ১৩০২ সাল (১-৪-১৮২৪)। পৃ. ১১৩।
- ৩। কল্লোলিনী (পুস্তিকা) : ১৩০৩ সাল (ইং ১৮২৬)। পৃ. ২৩৭।
- ৪। বনোবীণা (কাব্য) : বাখ ১৩০৬ (২৪-৪-১২০০)। পৃ. ২৪২।

নগেন্দ্রবালা মুন্সোকা (সরস্বতী)।— ইহার পিতার নাম নৃনাগোপাল সরকার। ১৮৭৮ সনে নগেন্দ্রবালায় জন্ম হয়। ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি ওরলি জেলার স্বর্গভিষা গ্রাম-নিবাসী নগেন্দ্রনাথ মুন্সোকার সহিত বিবাহিত হন। বিবাহের পর হইতে নগেন্দ্রবালা কবিতা-সুচনার হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত এই সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

- ১। মর্দগাথা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৪-২-১৮২৬)। পৃ. ১৭০।
- ২। প্রেম-গাথা (কাব্য) : অগ্রহায়ণ ১৩০৪ (১০-১২-১৮২২)। পৃ. ১৪৪।
- ৩। নারীপর্ষ (সম্বর্ড) : (৪-১২-১২০০)। পৃ. ১০৮।
- ৪। অমিত্রাণা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (২৪-৩-১২০২)। পৃ. ২১০।
- ৫। ব্রহ্মগাথা (কাব্য) : (২০-১২-১২০২)। পৃ. ২৪০।
- ৬। খলেশ্বর (কাব্য) : (১৭-৩-১২০৩)। পৃ. ২২।
- গার্হস্থ্যার্থ (সম্বর্ড) : (১২-১২-১২০৪)। পৃ. ১২৮।
- বদন্ত গাথা (কাব্য) : (২৩-১-১২০৪)। পৃ. ৩১।
- কণা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১৮-৬-১২০৪)। পৃ. ৬০।
- সুভূম গাথা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১২-১২-১২০৪)। পৃ. ২০।
- ১১। স্ত্রী (সামাজিক উপদ্রাঙ্গ) : ১৩১৩ সাল (২-৮-১২০৬)। পৃ. ৭৮।

১৩১৩ সালে নগেন্দ্রবালায় মৃত্যু হইয়াছে।

প্রিয়দম্বা বেবী।— ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সনে পাবনা জেলার ভূপাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সনে প্রিয়দম্বা বেবী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়িকী তান্ত্রায়াস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাচ বৎসর ঘাইতে-না-ঘাইতেই তাঁহার বৈধবা (১৮-২-১৮৯৫) মতে।

শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে গ্রন্থসংগ্রহ অল্পরূপে ছিল। ১২২২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বামাবোঝানি পুঁথিক' প্রকাশিত "বুল" নামে একটি ক্ষুদ্র সম্বর্ধই তাঁহার দ্বিত্ত প্রথম রচনা। পর-বৎসর 'ভারতী' ও 'বালকে' (কার্তিক ১২২০) তাঁহার একটি "গান" 'বালিকার রচনা' হিসাবে দ্বিত্ত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে 'ভারতী'তে তাঁহার পত্র-পত্র বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বকবি হিসাবে গ্রন্থসংগ্রহ ব্যক্তি অর্ধেক করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :—

১। বেথু (কাব্য) : (১-২-১২০০)। পৃ. ৬২।

২। তান্ত্র (শোক-কবিতা) : (১৮-১১-১২০৭)। পৃ. ৩৫।

পদ্মলেখা (কাব্য) : (১০-১-১২১১)। পৃ. ১৫৮।

৩। অজ্ঞ (কাব্য) : আশ্বিন ১৩০৪ (ইং ১২২৭)। পৃ. ১২৫।

৪। চন্দ্রা ও পাটল (কাব্য) : (ইং ১২৩২)। পৃ. ৩৮।

ইহা ছাড়া তিনি তিনবারনি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—'অনাথ' (১৮-২-১২১৪), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঙ্কজ' (ইং ১২২০) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৫১ সালের কাঙ্ক্ষন মাসে গ্রন্থসংগ্রহ বন্ধ হইয়াছে (ইং 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৫১)।

সরলা দেবী :— ইনি স্বর্ণহারা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ; জন্ম—১৮৭২ সনের ২ই সেপ্টেম্বর। ১৮২০ সনে ইনি বেথুন কলেজ হইতে কৃত্তিকের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২০৫ সনে পত্রাবের আশ্বিন-মাসে পণ্ডিত রামচন্দ্র লস্কর চৌধুরীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১২২৩, ৬ই আগষ্ট প্রায়ভক্তের মৃত্যু হয়।

জীবনের দীর্ঘকাল বেথুনবাসে নিত্যক উৎসর্গ করিলেও সরলা দেবী মাতৃভার্যার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। স্বল্পতপকে শৈশবাবধি সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অক্লান্ত ছিল। ১২২২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বালকে' তাঁহার দ্বিত্ত প্রথম রচনা— "দুর্ভিক্ষ (বালিকার রচনা)" প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সনের নবেম্বর-সংখ্যা 'সখা'র তাঁহার পুণ্ডরিকপ্রাপ্ত রচনা— "শিশু বাতার প্রতি ক্রিষ্ণ যবহার করা কর্তব্য" স্থানলাভ করে ; রচনার শেষে লেখিকার বয়স "১২ বৎসর ১১ মাস" বেওড়া আছে। ১২২৪ সাল

"ভারতী"তে আবার আবার উনি বৎসরের লেখা 'ভক্তিবিদ্যা' ['ভারতী ও বালক', ফেব্রু ১২২২] ও 'মালবিকা-অগ্নিহিত' ['ভারতী ও বালক', শ্রাবণ, কাঙ্ক্ষন, চৈত্র ১২২৩] পত্র তাঁর লেখা চিত্র। সে চিত্র সাহিত্যে রামায়ণ মণ্ডিতমাত্র একজন নবীর উপর তাঁর রাগ—না তাকে হুই হার বাস্তবের দ্বারা করে নেওড়া। যদিও রচনাগুলি চিত্রিত ওই appreciation দ্বারা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেতন লেখক সাহিত্যসম্প্রদায় ও সাহিত্যের ভাব্যবস্তু বহির্ভূত হারে নিজেদের বেশি পরিচয় করে করায় :—ঈশ মনুষ্যের আত্মিক বস্তুদের দ্বারা বহির্ভূত আবার লেখকগুলি সত্যে না কি নিজের সাহিত্য অভিব্যক্ত দ্বারা করেছিল—তা তাঁদের দ্বিত্ত বহির্ভূতের দ্বারা-একজন সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু বহির্ভূতের দ্বিত্তি করে অস্তিত্ব সিদ্ধি করে তবুও বহির্ভূতের দ্বিত্তি ছিল হুই। বহির্ভূতের দ্বিত্তি সাহিত্যের একজন দ্বিত্তি হুই। দ্বিত্তিত্ব সত্যে আবার মনুষ্যের সত্য তাঁর মনের বিল হুই। তাঁর উদ্দেশ্য করে "বহির্ভূত দ্বিত্তিত্ব" পত্র শ্রুতি তাঁর সত্য লেখক হুই এক হুই কি হুইয়ের হুই হুই হুইছিল। তাই বহির্ভূত তাঁর চিত্রাবলি ছিল একটি সাহিত্যিক ক্ষুদ্র রচনা হুই।

হটতে আবদ্ধ করিয়া সরলা দেবী 'ভারতী'তে বহু গল্প-শব্দ রচনা ও স্বরলিপি প্রকাশ করিয়াছেন ১০০০ দাশপদ আখিন-গাথা। 'ভারতী' ও 'বালকে' তাঁহার রচিত "বন্দে মাতরং" গানের স্বরলিপি খান পাঠ্য আছে। তিনি অনেক কাল 'ভারতী'ও সম্পাদন করিয়াছেন। একবা তাঁহার রচনা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাও অর্জন করিয়াছিল। সরলা দেবী তাঁহার স্তম্ভিৎস্বাণ বলিয়াছেন :—

সরলা দেবীর বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা খুবই কম। তিনি নিচেরকি জীবনকৃতিতে বলিয়াছেন :—

"আমি পাঁচ আবার সব দেখাইয়া 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই বিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। আমার পাঠ্য বা পাঠকদের সুখে হুখে। আমার সোনা-কুমারীরা দায়িত্ব সাপ্তাহিক ভেনিকে হাঙ্গামাকরী হেতে। কিন্তু প্রবুৎ বঙ্গী ৪৫ বি—৪৫০ কলমে চাইলে কোলম্বার আট আবার এদিনে হাসান 'বঙ্গবর্ধন' নামে কতকগুলি রচনা ও, বড় বড় লেখকদিগেরে সাহিত্য ঠিকি ও বাঙ্গালী বক্তৃতা, 'বঙ্গের বীণা' শিল্পিত হুখানি পুস্তিকা ও জীবনীকার হুখেই আবারিক বিবেচন বই চাড়া। জায়েব থেকে হুএকবার আবেকার লেখকগি বই আকারে হাসানার চেষ্টা করে দার্বদে হুখেই। 'কবিশিল্পি' সত্যি হুতিন ফক্সা বেগে, মেগঙাগায়েব পকেটে টাকা করে' কুম্বদান হুখে দেয়।"

আবার সরলা দেবীর লিপিত এই কথখানি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাঠ্যার্থি :—

১। নতগান (স্বরলিপি সহ) : বৈশাখ ১০০৭ (ইং ১৯০০)। পৃ. ২১৮।

২। বঙ্গোদীর পিতৃদন : (২৬-১-১৯০০)। পৃ. ২।

৩। ভারত স্ত্রী-মহাশয়ল : (৭-৩-১৯১১)। পৃ. ২৪।

৪। নব-বর্ধের স্বপ্ন (গল্প) : জ্যৈষ্ঠ ১০২৪ (১৪-৭-১৯১৮)। পৃ. ১৪২।

৫। কালীপূজার বলিধান ও বর্ধনানে তাঁহার উপযোগিতা (২২-১২-১৯১৯)। পৃ. ২১।

৬। শ্রীমত বিজয়কুমার দেববর্ধারস্ত্রীত শিবরাত্রিপূজা (ইং ১৯১১)।

৭। বেদবাণী (আচার্য বিজয়কুমার দেববর্ধার উপদেশাবলী) সরলা দেবী কর্তৃক লিপিত :—১ম পত্র (ইং ১৯১১) : ৭ম পত্র (ইং ১৯১৩) ইং ১৯৪৭—৪০।

১৮ আগষ্ট ১৯৪৪ তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে, সরলা দেবী মৃত্যু হইয়াছেন। মৃত্যুর অবাবহিত পূর্বে তিনি সাপ্তাহিক 'সেপ' পত্রিকা (১১-১১-১৯৪৪—২-৬-১৯৪৫) "জীবনের কব : পাঠ্য" নামে জীবনকৃতি বিবৃত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার "বীজনাশ" প্রবন্ধটিও ('ভারতবর্ষ', কাটিক ১৯৪৬) পাঠ্যতা।

২

—গত শতাব্দীতে এখন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের সম্মান পাঠ্য, ঠাছাড়া সাহিত্যসেবা করিয়া প্রতীতি অর্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের রচিত গ্রন্থ বর্তমান শতাব্দীতে মুদ্রিত হইয়াছে : তাহাদের কেহ কেহ আবার পুস্তকাকারে কোন কিছুই প্রকাশ করিয়া দান নাই। এজন্য কবেক জনের গহিচর দিতেছি :—

জানকামাশিল্পী-দেবী :— ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মশাহর মেসায় নরেন্দ্রপুর গ্রামে জানকামাশিল্পীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম অন্তর্য্যচরণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৪২ সনে, আট-বৎসর বয়সে, হুগলি

দেবেশ্বরনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যোজ্ঞনাথ ঠাকুরের সহিত জ্ঞানদানমিনীর বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহ ও নিষ্ঠের ফল-সেই জ্ঞানদানমিনী নিজেস্বক শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আত্মিক অনুরাগে ছিল। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা তাঁহার কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত চইয়াছিল। শতাব্দীর 'ভারতী'তে তাঁহার এই তিনটি রচনা স্থান পাইয়াছিল :—

- ক. প্রাণ, ১২৮৮ : ইংরাজ-নিষা ও দেশভূষণ
খ. অগ্নি, ১২৮৮ : স্বী-শিক্ষা
গ. অগ্রদূত, ১২৮৮ : কিতাব গার্টেন।

১২২২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৭) জ্ঞানদানমিনী 'বালক' নামে দ্বিচন্দ্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। দ্বীপ্রসাদ 'ভীষ্মবৃতি'তে লিখিয়াছেন :— "বালকদের পাঠ্য একটি দ্বিচন্দ্র কাগজ ব্যতিরিক্ত ভ্রম বোধকর। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, স্বদেশ বলস্বত প্রভৃতি আমাদের ব্যতিরিক্ত বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখা চলিতে পারে না তাহারা, তিনি সম্পাদক হইয়া আশাও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।" জ্ঞানদানমিনীরও কোন কোন রচনা 'বালক'ের পৃষ্ঠা অনঙ্গত করিয়াছিল। এক বৎসর মগেরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত চইয়া যায়।

জ্ঞানদানমিনীর নিকট হইতে আমরা দুইখানি হস্তলিখিত দিওপাঠ্য পুস্তক লাভ করিয়াছি :
পেঙলি—

১। টাক ভুয়া ভুয়া ভুয়া (নাটিকা) : (৩-৬-১২১০)। পৃ. ১৭।

২। সাত ভাই চন্দা (নাটিকা) : (২৩-১২-১২১১)। পৃ. ৪২।

(১৩১১ সালে বিশ্বভারতী এই দুইখানি নাটিকার দ্বিচন্দ্র নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন)

১৩৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট, ২০ বৎসর বয়সে, জ্ঞানদানমিনী পরলোকগমন করিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী :— শরৎকুমারীর জন্ম ১৮৬১ সনের ১৫ই জুলাই। তাঁহার পিতার নাম—শরৎকুমার বসু (কলিকাতা কোরবাপানের বহু-বংশজাত) ; তিনি ১৮৬০ সনে ঢাকার উপলক্ষে স্বদেশ লাভের পরম করিয়াছিলেন। শরৎকুমারীর শৈশব লাহোরেই কাটে। ১৮৭১ সনের ১২ই মার্চ মাস্কুলের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশের অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., এটর্নির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়চন্দ্র স্বকবি ছিলেন ; স্বামীর দ্বারা শরৎকুমারীও মাতৃভাষার পরম অনুরাগিনী ছিলেন। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে তাঁহার বহু রচনার সন্ধান মিলিবে। তাঁহার প্রথম রচনা—"কলিকাতার ব্রীসমাজ" ১২৮৮ সালের ভাদ্র ও কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এক মাত্র 'ভ্রতবিবাহ' ছাড়া শরৎকুমারীর আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। "মহ্মদপুর লাইব্রেরি (বঙ্গবর্ন-কার্য্যালয়) হইতে 'ভ্রতবিবাহ' প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে (২৩-০-১২১২)। এই সাময়িক চিত্রখানি বঙ্গসাহিত্যে যেবিকারে একটি বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে। দ্বীপ্রসাদ ১৩১০ সালের অক্টোবর-সংখ্যা 'বঙ্গবর্ন'ে ইহার যে সমালোচনা করেন, তাহাই তাঁহার 'সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে পুঙ্খভিত্তি হইয়াছে ; তিনি লিখিয়াছিলেন :— "এখন সত্যিই সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই।"

পরংমুনায়ীর শেখবীবন বৈধবা অবসার কাটে; স্বামীর মৃত্যুর (৭-২-১৮২৮) ২২ বৎসর পরে—
১২২০ সনের ১১ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

সরলাবালা দাসী।— বাংলায় যে-কোনো সুপরিচিত শোক-কাব্য আছে, তাহার মধ্যে সরলাবালা দাসীর ‘প্রবাহ’ অঙ্গতম। তিনি কিশোরীলাল সরকারের বক্তা, ডাঃ সরলালাল সরকারের তপস্বী। ১২৮২ সালের ২৫২ অগ্রহায়ণ তাঁহার জন্ম, এবং ১২২৪ সালে রায়-বাহাদুর নহিমুদ্দিন সরকারের পুত্র পরশুসেনের সহিত বিবাহ হয়। ১৩০৫ সালের কাঠিক মাসে তাঁহার বৈধবা হতে।

তৎকাল বঙ্গ হইতেই সরলাবালার কাব্যাহরণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২২৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ‘ভারতী ও বালকে’ প্রকাশিত ‘লক্ষ্মাবতী’ নামে কবিতাটিই যোগ হয় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। ‘সাহিত্য’, ‘ঐন্দ্র’ প্রভৃতি বহু সাময়িক-পত্রিকাতে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট গল্প রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে; তাঁহার প্রথম গল্প—‘থরের লতী’ তৃতীয় বর্ষের ‘সাহিত্যে’ (কাঠিক ১২২২) মুদ্রিত হয়। ‘উৎসাহ’, ‘মাহাবী’, ‘উষোদন’ প্রভৃতির পৃষ্ঠা অল্পসংখ্যক করিলে সরলাবালার বহু গল্প-গদ্য রচনার সম্বন্ধ মিলিবে। তিনি যে-কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তালিকা:—

১। প্রবাহ (শোককাব্য) : ১৩১১ সাল (৮-১০-১২০৪)। পৃ. ২৫৩।

২। চিত্রপট (গল্প) : (১৪-১-১২১১)। পৃ. ২০৪।

৩। নিবেদিতা (ভীকনী) : জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ (১০-৮-১২১২)। পৃ. ৪৩।

৪। কুমুদাণ (ভীকনী) : ১৩৪৪ সাল (১-৩-১২৩৮)। পৃ. ১৪৩।

লক্ষ্মাবতী বঙ্গ।— ইনি বনামধ্য রামনারায়ণ বহুর বক্তা। ইহার বহু কবিতা ‘সাহিত্য’ ‘ঐন্দ্র’, ‘নবভারত’, ‘প্রবাসী’ প্রভৃতির পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজকে আনন্দ দান করিয়াছে। তাঁহার রচিত কোন পুস্তক-পুস্তিকায় সম্বন্ধ পাই নাই।

হিরণ্ময়ী দেবী।— ইনি শরৎচন্দ্রের সোটা বক্তা। ১২২২ সালে প্রকাশিত ‘বালকে’ ইহার একটি প্রাথমিক রচনা মুদ্রিত হয়। ইহার পর ১২২৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ভারতী’তে বহু গল্প-গদ্য রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকাকারে কোন কিছুই রাখিয়া গান নাই। ইনিও অঙ্গতর সম্পাদিকা-রূপে তিন বৎসর ‘ভারতী’ পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। ১২২৪, ১০ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সারদামুখরী দেবী।— ইনি প্রধানতঃ বেশবচন সেনের জননী। ১৮২২ ও সনে ইহার বিবৃত আত্মকথা যোগেন্দ্রলাল ঝাংস্ট্রের ১২১৪ সনের জাহ্নগারি মাসে ‘বেশবচননী দেবী সারদামুখরীর আত্মকথা’ নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

— **পঞ্চমিনী বঙ্গ**।— ১৮৮৪ সনে ঢাকা জেলার বিরূপপুর পরগণার মীনগর গ্রামে পঞ্চমিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিবাহনচন্দ্র গুহ মুন্সেফী। তের বৎসর বয়সে বঙ্গমোহিনী গ্রামে হুমুসবঙ্গ বঙ্গর মোষ্ঠ পুত্র আশুস্বর্গ্যবহুর সহিত পঞ্চমিনীর বিবাহ হয়। সতের বৎসর পূর্ব হইতে-না-হইতেই ২ সেপ্টেম্বর ১২০০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সকল কবিতাষ্ট্র বিবাহের পরে রচিত। ১২০১ সনে ‘হেলেনা’ কাব্যের লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র বীর কৃষিকা সহ ‘স্বতি-কণ’ নামে পঞ্চমিনীর কবিতাগুলি প্রকাশ করেন। পর বৎসর পরে ১২১৩ সনে ইহার পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ বাহির হয়; এই সংস্করণে খাতনামা গণিত হরিদ্রাধ নে কর্তৃক ‘স্বপ্নাবলী’ কবিতাটির ইংরেজী অধিবাদ গান পাইয়াছে।

স্বরমাহুন্দরী ঘোষ।—^১ ইনি ঢাকা জেলার মালখানপুর-নিবাসী উদ্দেশ্যে বহুর কন্যা, জন্ম— ১২৮১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। ১২৯০ সালের ১২এ অগ্রহায়ণ বিক্রমপুরে বহুঘোষগিরী গ্রামের চন্দ্রকান্ত ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিশিকান্তের সহিত স্বরমাহুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ১২৯৬ সালে স্বামীর রচিত ‘অশ্রু’ নামে কবিতা-পুস্তক তাহার কয়েকটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। ১৩০৩ সালে প্রথম বর্ষের ‘সুন্দরী-পুস্তক’ও স্বরমাহুন্দরীর একটি রচনা দেখিতে পাই। তাহার রচিত এই কথনামি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়াছি :—

১। সন্দিরী (কাব্য) : ১০০৭ সাল (১১-৮-১২০১)। পৃ. ১৪৪।

২। রত্নিনী (কাব্য) : ১৩০২ সাল (৭-৮-১২০২)। পৃ. ১৪৪।

৩। বিদ্যার কথা : (১৩০২-১২১৪)। পৃ. ১২।

বিশ্ব শতাব্দীতে প্রতিভাশালিনী বহু মহিলা-সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছে; কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহারদের কেহ কেহ স্বামী আসন লাভ করিয়াছেন। তাহারদের কথা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নহে।

স্বামীর সহিত এই সময়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘সাহিত্যিক পত্র সম্মেলনে বহুমহিলা’ প্রকাশিত হইবে।

চিত্র-পরিচয়

মহাকবি গোটেবের অসংখ্য চিত্র আছে, কিন্তু সব চিত্রে তাহার চিত্রিত্ব বিভিন্ন রূপে ফুটিয়া উঠে নাই। যদি একটি মাত্র চিত্র তাহার গভীর জ্ঞান, কবিমনোচিত অঙ্গবৃত্তি, তাহার নৈতিক মানবিকতার আভাস পাইতে হয়, তবে দেখিতে হইবে ক্রাফোর্ডের স্টেডেল শিল্পভবনে রচিত টিপ্‌বাইন-অঙ্কিত চিত্র।—চিত্রটি এই সংখ্যায় দুশপাত রূপে প্রকাশিত হইল। গোমে অবস্থানকালে টিপ্‌বাইন ও গোটেব একই গৃহে বাস করিতেন অন্যতর কলকোলাহল হইতে বহুদূরে। তাই হৃদয় টিপ্‌বাইন যেমন কতিয়া গোটেবের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তেমন আর কোনো শিল্পী পান নাই। তাহাড়া গোটেবের কাহিরের রূপটি অঙ্কন করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, অঙ্কনের ভ্রমের সন্ধান পান নাই।

গোটেবের প্রিয়তম নগর বোম্বের অভীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টিপ্‌বাইন গোটেবকে আঁকিয়াছিলেন। পঞ্চাংশটে সেসিলিয়া বেভেলার সমাধি ও বুরবিসপী আব্দুলবানান-পর্বতমালা।—সহিত ছবিটিতে বোম্বের আব্দোলোচ্ছল আকাশ এবং বর্ণাঢ্য প্রকৃতির অল্পমাত্র আভাস।

গোটেব তখন ‘ইম্বিলেনিয়া’-রচনার ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারই ইচ্ছিত পাণ্ডিত্য, অর্ধভর তত্ত্ব, বন্দী অগ্রেস্টেণ্ড ও পাইলেটস্‌ আদিগেঁড়ে ভাষ্যনার পূজ্যদ্বিতীয় ইম্বিলেনিয়ার নিকট।—আ.

লঘুগুরু। প্রবন্ধাবলী। গ্রন্থালম্বের বহু। প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, লিমিটেড, ১৪ বক্স চাট্‌মোন্ট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ইবানীং। গ্রন্থপরিচয় বহু। প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, লিমিটেড। মূল্য দুই টাকা।

ইন্ড্রাজিতের বাত। ইন্ড্রাজিত। প্রকাশক ঐক্য লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাত্‌ তিন টাকা।

গ্রন্থালম্বের বহু বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থপরিচিত ও গ্রন্থিতরিত শুধু নয়, মনস্ত বা অন্তরনীর। পরন্তুগ্রন্থের বেনামীতে লেখা তাঁর গ্রন্থাত রচনাবলীতে যে সকৌতুক বুদ্ধির দীপ্তি, যে শানিত অথচ বুদ্ধিত বিদ্রুপ লেখা বাহ, ঠিক বসরচনা না হলেও, এই গ্রন্থগুলিতেও তারই ছোঁয়াত লেগে বিশেষ একটি মানিত গ্রন্থ উত্তর হয়েচে। এ হল লেখনীর ভগ্ন, লেখার তরীর ভগ্ন, একান্তভাবে বিশ্বদিতর নয়। ইংরেজিতে বাক্য স্টাইল বলে, বাংলায় বাহ প্রতিশব্দ দেওয়া কঠিন, বা বিশেষ একটি ব্যক্তিত্বের বাওনিবন্ধ রূপ, তারই কারণে, বহিও এই গ্রন্থগুলি বিভিন্ন লবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা, লম্বা বিশ্বগুলির মধ্যে অচ্ছেদ্য লম্বা কিছু নেই, তবুও পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্তই আকৃষ্ট করে রাখে। বাংলা ভাষা, পরিভাষা, বানান, সাহিত্যের আদর্শ, হল, কঠি, তা ছাড়া ব্যঙ্গালির নাম-তর নিয়ে যে আলোচনাগুলি এই গ্রন্থে নিবন্ধ হয়েচে, তাতে বিতর্ক হয়তো অনেক উঠতে পারে, কিন্তু রচনিতা আশনার বক্তব্য কেবল হৃদয় ও হৃদ্য ভাষার প্রকাশ করেছেন সেই এক উপভোগের বিষয়, এবং বিজ্ঞা এবং বিনয় উভয়েরই পরিচয় পরিষ্কৃত থাকতে বাহ থেকে বিতর্কায় পৌছবার কোনো হুযোগ কাউকে দেওয়া হব নি। অধিক কী, এ লব বিষয়ে জিত মত থায়া শেখণ করেন উভাও এই গ্রন্থাতে চিন্তা স্বরবার মতো নতুন কিছু হুত্ব লেখে উপকৃত হবেন, এরূপ মনে হয়। ভাষাকি-কবিতায় বা ব্যঙ্গালি ভ্রমণভ্রমের জীবিকালম্বা বা ঘনীকৃত তৈল এ-লব সম্পর্কে গ্রন্থালম্বের বাহুর মন্বা যে বিশেষ শিক্ষাগ্রন বা প্রণিধানযোগ্য হুবে, এ কথা বলাই বাহুলা। অত দিকে এই গ্রন্থের প্রার্থনা, তিনি, ইষ্টীয় আদর্শ প্রকৃতি কতকগুলি রচনা গ্রন্থালম্বের বহু ও পরন্তুগ্রন্থ উভয়ে বিশেষ লিখেছেন এ কথা বলা বাহ; এ-লব ক্ষেত্রে লেখক আশার বা আশনার বা আর-কারও মানলিক হুত্বতার অর্থ্য্য ভ্রান্ত সংকার ও ভ্রান্ত মুহমিকার বাহাত খটিয়েছেন নত, অগ্রন্থ ব্যবচ্ছেদ করেছেন লেও হয়তো ঠিক, তবু বক্তব্যের ও বাহনের ক্রৈশিত্যে মনোহরণ যে করেছেন সে বিষয়েও লম্বাহ নেই। সর্বশেষ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে; গ্রন্থটি ছোটো হলেও হৃদয় এবং লেখকের আন্তরিক ভ্রান্ত চমৎকার প্রকাশ। এই গ্রন্থের লঘুগুরু নাম এই কারণেই সার্থক যে, গ্রন্থকার আশাত-লম্বা বিষয়েরও আন্তরিক গুরুত্ব বুদ্ধিযেছেন আর গুরু বিষয়ও তাঁর আলোচনায আদৌ গুরুত্বার হব নি। কয়েকটি ভ্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।—

১০০ পৃষ্ঠায় দেখছি, “হনি ভবিততে বাংলা অক্ষর সয়ল করবার গুরু হুত্বাচন তুলে দেওয়া হয়, তখন অবন্ত হু তুলির বহুপ্রাধোণ দরকার হবে।” বাহুরবর্গকে অভাবতাই হুদয় দরে নিয়ে অকারের একটি চিহ্ন হনি কল্পনা করা বাহ (বিশভারতী) পত্রিকাতে এ প্রস্তাব আত নতুন নয়) তা হলেও হব না কি ?

১০২ পৃষ্ঠায় অগ্রগ্রন্থক শব্দের দৃষ্টান্তে ‘বলাকা’র উল্লেখ এইভাবে হয়েচে, “অনেকে কবিতায় ক্রৌ অর্থে ‘বলাকা’ লিখেছেন।” অনেকে লিখেছেন কি না জানি নে, এবং অনেকের লেখাতেও হুত্বতো বিশেষ কতিবুদ্ধি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভাষাগ্রন্থের ‘বলাকা’ নামকরণে ও এই গ্রন্থের বিখ্যাত একটি

কবিতার শব্দটির ঐতপ 'তুল' প্রয়োগে দুশকিল বাড়িয়েছেন : বাংলা ১০০২ সালেও তিনি জাননপ্রত্যাপন হংগপ্রেষ্টার বর্ণনায় লিখেছেন "আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চকল"। এইসব লেখা বাংলা সাহিত্য থেকে মুছে ফেলবার কোনো উপায় এখন নেই, 'বলাকা' শব্দের এতপ প্রয়োগকে তুল না ব'লে শব্দের অর্থ-প্রসারের দৃষ্টান্তরূপে বেনে দেওয়াই ভালো।

'অব্যবহারী' হয়েও বাংলা ছন্দ লম্বাৎ লেখক বা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা ছন্দোবিৎ বা ছন্দোবিজ্ঞানীদের বিশেষ মননেরই যোগ্য। কিন্তু, "কেবল কানের উপর নির্ভর করে অক্ষর-রূপের সম্পূর্ণ নিষয় রচনা করা চলে না" এ কথা হুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না। কেবল জিজ্ঞাস্য উচ্চারণ-রীতি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধর্মবিবেকের উপর নির্ভর করেই যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ সম্ভব—আলোচ্য ক্ষেত্রে আমাদেরই চিন্তার জড়তা বা সংস্কারের বাধা থাকতে নির্ণেয় ও সম্পূর্ণ নিয়ম নির্দেশ করা অতিশয় দুষ্কর, এই পর্যন্তই বলা যেতে পারে। ছাপা পাতা চোখের সামনে রেখে অক্ষরগণনার খোঁকা লাগতে পারে—একত্র কবিতায় 'আমো' 'আমারি' লেখা, অন্যত্রক ভীততা মাত্র। লেখকরা যদি সাহস বেধান (অবত, ছন্দে দখলও বেধানো চাই) পাঠকরা ঈর্ষাই ঐ সম্পর্কে দ্য-কিছু কুসংস্কার থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে পারবেন। ১০০ পৃষ্ঠার ইমিত করা হয়েছে 'নিখিয়ে দিত' পদ্যবলীতে 'বরষার' ছন্দের স্বভাবলিঙ্গ চার জনির (বরের?) ব্যতিক্রম হয়েছে। এখানে চোখের দেখাতেই ব্যতির উদ্ভব হচ্ছে ব'লে মনে হয়। আসলে এই শব্দের উচ্চারণ আমরা করি শিখরে (হ-ব), সি-বি—যে উচ্চারণ সাধারণতঃ করি নে। তাই বরষান্নাথ এতপ প্রয়োগ (কবিতাতে ব্যাপিয়ে পড়ে, উড়িয়ে গোখর-রেখ, হারিয়ে-কেলা বাঁধি আমার পালিয়েছিল হুঁচি ইত্যাদি) অমজ্ঞ করেছেন, অমজ্ঞ ছন্দোবিচারে প্রত্যেকটি নির্ণেয় ব'লে গণ্য হবে।

পূর্বেই বলেছি, এগুলি তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা।—প্রকাশকের প্রতি নিবেদন, মুদ্রণপ্রদাদ আরও কন হলে শোভন হ'ত এবং এতের মলাট ও আখ্যাপত্র আর-একটু আধুনিকরূপিত~~ত~~তথ্য পরিচ্ছন্ন করলে দোষ হ'ত না।

আলোচ্য অন্ত দুখানি বইয়ের লেখক-ভূমন বাংলা সাহিত্যে নব আগন্তুক যে নব লেখাতেই তার প্রচুর প্রকাশ আছে। ইবানীঃ এতপ লেখা আরও অনেক লিখেছেন বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন এবং সে লেখাকে 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ বা রচনা ব'লে পরিচিত করার একটি রেওয়াজ চ'লে গেছে। আট লম্বাৎ 'ব্যক্তিগত' কথাটার ব্যাপ্তি করবার আছে। হয় কথাটি অর্থহীন, বেন 'দোনার পাথর বাট', নয়তো অন্যত্রক। অবত, 'ব্যক্তিগত' কথাটার অর্থহীন এই ব্যবহারের 'হেতু' কী বুঝি। এতপ লেখায় লেখকের ব্যক্তিত্বের বিশেষ ছাপ থাকে বা থাকা উচিত ; এ লেখার কেন্দ্রস্থলে লেখক-ব্যক্তিটি বিশেষ ক'রে আছে—আছে তাঁর নিজেই প্রবন্ধ, তাহলে লাগা আর দখি লাগা। কিন্তু, আট মাত্রেরই তো এ তপ অল্পবিস্তর থাকা চাই। লেখার (ভেদনি আকাশ ও অস্ত্র আটে) ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ ছাপকেই কাঁচিল বলে এবং এই কাঁচিলই রচনার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন, সাহিত্যে বা মঙ্গলতবে এ কথা নূতন নয়। কিন্তু, তা বলে কেননা আটই ব্যক্তি-গত নয় (কেন্দ্র লেখাকে 'ব্যক্তিগত' বলা হচ্ছে সেও নয়), ব্যক্তিতে গিয়ে দখাৎ বা সমাপ্তি নয়, বরং ব্যক্তি-আগন্তুকী-ব্যক্তিব্যগ্রত বললেই ঠিক বলা হয়।

আসলে প্রত্যেক রচনাতেই ব্যক্তি আর বিশ্বে অবিস্ফোষভাবে, অন্তরীকৃতভাবে, বর্তমান। ব্যক্তির আপন চেতনায় ও উপলব্ধিতে বা বিশেষ রূপ ভণ্ড ও বৈবাহিক নিয়ে ধরা দিয়েছে তা বিশ্বেরই বিশেষ বিশেষ আশায়ে ধরা— তা বিশ্বগত, তা নইলে তার প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা বা পার্থক্য ছিল না। তা হলে মালোচ্য রচনাবলীকে বলা যায় কী? এ তো বর্ণন নহ, বিজ্ঞান নহ, গল্প বা কবিতা নহ, 'প্রবন্ধ' বলতেই বা বৃষ্টি তাও নহ। খেয়ালী রচনা বা খেয়ালী নিবন্ধ (খামখেয়ালী নাই বা বলা গেল?) বললেই যে দেখি নে। এ তরীতে ব্যক্তির পেশাল, বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ মেজাজ (mood) কাণ্ডারী হয়ে বসেছে। এক বাণী খাট থেকে অস্ত্র বাণী খাটে পাড়ি জমানোই এ ব্যাক্সার লক্ষ্য নহ— কিছু জেউ খাওয়া, কিছু পালন এবং গায়ে হাওয়া লাগানো, উষ্মাত্তর কিছু কণকাকর্ণ গ্রন্থি চূর্ণ চূর্ণ উন্মিলনের শিখর থেকে চলে কদা, হুতো কণকালের মস্ত নৌকো উল্লিখে ব্রোতে হাবুডুদ খাওয়া, হুতো হুতো বটের বিলম্বিত তটাবলীর অভ্যন্তরে আত্মীয় নিয়ে দিব্যবস্ত্রে মগ্ন হওয়া, এই তার নির্বিশেষ 'উদ্বেগ'। এ তরীতে রচনার বিলিতি যে-সব লেখক নমিচ্চারা হয়েছেন তাদের নাম আমাদেরও উল্লেখ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এতল লেখা কবলাকান্ত শর্ম্মার সময় থেকেই বাংলাতেও চলে আসছে। দ্বীপপ্রবাসের বিভিন্ন প্রবন্ধে এর একাধিক নমুনা মিলবে; তাঁর পঞ্চকৃত ঐষ এইমাতীষ রচনারই একটি অনুল্লীষ মালিকা বলা চলে।

ইমানীঃ বইটিতে একটি পরিহালগণ্টী তীক্ষ্ণতী তীক্ষ্ণতী মনের পতিচর আছে চরে চরে। রচনাগুলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে; প্রায় প্রত্যেকটিতে বেন এক-একটি ছোটো গল্পের আভাস আছে। কিন্তু গ্রন্থকার গল্প না লিখে গ্রন্থক লিখেছেন যে একস্ত পাঠকের কোনো খেব হবে না— গল্পটা তো মল কয়েকটি রেখার চানে আঁকা ছবির মতো ছুটেই উঠল, সেই সঙ্গে কথার খেলায় ও ভাবনার কোণে একটি বিনীত ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেটি কম লাভ নহ— বস্তুতঃ সেইটিই পরম লাভ বলা যেতে পারে। মলে, পাঠকের এই লেখকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই বোধ হবে, বেন সকালে সন্ধ্যায় সববে মার অলমবেও চা বা কচ্চি-শিক্তি আর তায়কুটুনহুতি কত অবসরে এর সঙ্গে একই আসরে বসে বহ মাজ্জা বেওচা গেছে; ইনি নিয়ে ইবিও নাগরোচিত (— নাগরিকোচিত) কৌতুকহাস্যের সীমা কখনো পেরোন না, অস্ত্রের উপভোগ থেকে থেকে অটুহাস্তে মনিত প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পলিকা আর কল্পলীতে পদগ্রাম নিয়ে ব্যক্তিকর্ণটিকে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে নিজস্ব একটি বর্ণণে অতিকৃত বা উনকৃত ক'রে সার্থক্য মাহুবেব সীমান ও চরিত্রের এক-একটি স্পূর্ণ চিত্র কৃষ্টিয়ে তুলেছেন। পরিমল মাহের হাতে যে বর্ণণ আছে সেও তাঁর নিম্নে কারখানাঘরে তৈরি, তাতেও হুটো বিক্কেব চরিত্র টিক রেখে চেহারা একটু উনিব-বিশ করা হয়েছে— যেটুকু না হলে ষেচ হু, ক্যারিকচার হু না— পরগ্রামের সঙ্গে তাঁর মূখ্য তত্ভা এই একটা যে, এই আর্টিষ্ট নেপথ্যে নহ লব্ধা আমাদের সামনেই বেন মাহির হয়েছেন, মার এর ধবিক্রম ও ষ্টি কৌতুকবের বিবর বেনন মস্ত পাচজন তেমনি লেখক নিম্নেও। মাহাবিত্র ভল্লোকবের বহ বিভিন্ন ছবি, বহ ককণ অভিজ্ঞতা, ম্হ অমৃত অবহাবিপাক এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে পাওয়া বাবে (ম্হ-এক হস্মে এক-একটা বিশেষ 'পরিমিত্তি'র স্পূর্ণ পরিবেশ-সম্মনেও লেখকের অসামান্য দক্ষতা দেখা যায়)— তার কোনোটিকে বাধ দিয়ে অস্ত্র কোনোটি উল্লেখ করা যায় না। তন্ম 'বহবচন' এবং 'পিউনবন' বর্তমান পাঠকে বিশেষ করে চমৎকৃত করেছে। একবচন ছেড়ে ষিবচন গ্রন্থোমে মিল্লার দক্ষতা অনেইশ্বেই আছে; কোন কদুদ্যার সাহায্যে এতল লোকউসাত-দিন-সাত-রাত্রি সৌমস্পূর্ণ আসাপচারিতে অস্ত্রকে

আপ্যাদিত করিতে পারেন— সে একমুখা আবিষ্কার। তেমনি চাপরাশীপুত্রব শিউনখন হারোয়ারির উপর যে খাঁসি লিখে বিবিসিডালয়ের পি-এইচ. ডি. নেবার ডেটার আছে, সে তো যে-কোনো বিষয় নিয়ে যে-কোনোতপ ডাক্তারি বা পি-এইচ. ডি. -প্রার্থীর আদর্শ বলা হতে পারে। অর্থাৎ, পরিমল বাবু ডাক্তার “এন. এ. বা প্রেমে পড়তে” ধারণা ইতিপূর্বে বহু রাত জাগতে হয়েছে, এখন থেকে তেমন কোনো কুহু “না” করেও তাঁরা বীসি-রচনা সন্মর্ষ ও ডাক্তারি-সাথে সিদ্ধকাম হবেন এবং শিউনখন বা তাঁর চরিত্রকারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন আশা করা যায়।

উল্লিখিত তালিকার তৃতীয় বইখানিতে পাঠককে আর একবার মানসিক কষ্ট-পরিবর্তন ও লেখার রীতি-পরিবর্তনের ক্ষম প্রস্তুত হতে হবে। ছদ্মনামা লেখক ধরা দিতে চান, অথচ ধরা যেন নি। রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দ উদ্ভূত করে আদর্য ও বলতে পারি— যে মাথবী, ডীক মাথবী, তোমার বিধা কেন! বাই হোক, স্তম্ভনারকচি স্তম্ভর এই লেখকের স্বাভাবিক একটি সংকোচে ও ব্রীডায় এই লেখাগুলির কল্পনাকার ও বাগ্‌ইবদ্য বড়ো স্তম্ভর স্তুতি পেয়েছে, হস্তরায় সার্থকও হয়েছে। এগুলি সাপ্তাহিক ‘সেপ’ পত্রিকার এক-বৎসর-কাল ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির প্রকাশ না হলেও আকার-আয়তন ছিল কতকটা প্রতিনিধি। এই কটোছটা অনলিঙ্গ-মুদ্রার দায় নিয়েও লেখক যে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন রস-পরিবেশন করতে কৃতকার্য হয়েছেন সে তাঁর অল্প কর্মতার পরিচয় নহ। কিন্তু, ক্ষমতা এক কথা, আর আদ্যাসুতর ক্ষতি আর এক কথা। সম্পাদকের দৃষ্টি বা অদৃষ্টোচ্চর সেবাদা সত্তাহে সত্তাহে ধারে দেখা না দিলে ইঙ্গিতই এ খাতা হতেতো খুলতেন না আরবেই সেও এক কথা, আর কেবলমাত্র ভিতরের ভাগ্যদায় যখন-খুশি বেরন-খুশি লিখতে বসি পেতেন, তা হলে এ রচনা আরও রসোত্তীর্ণা, আরও ভ্রমবতী, আরও লম্বুগতি নিঃসরই হ’ত সে হল আর এক কথা। বিদগ্ধভবনের চিত্তবিনোদনের উপযোগী তথা অবসর-সময়ে চেক্‌চেরাশেখারী বিবাসনে বা উড়ু-উড়ু ডাবনের সঙ্গদানের উপযোগী নানা গুণই এ রচনাগুলিতে আছে। লেখক যেন লাইব্রেরিলোকবিহারী সাহিত্যরসিক ব্যক্তি বলে লেখার ছন্দে ছন্দেই ধরা দিয়েছেন, বিবর্তনাকার ও তাঁর সমাগ চোখ আর কান সর্বদা খোলা আছে; এ লেখাগুলিতে কথা অর্থাৎ গল্প আছে, কৌতুক আছে, কটাক আছে, কল্পনা আছে, কবির আছে, পদে পদে ভাবাত্তার চমৎকারিত্ব আছে— বার বার মন বলে গুটে, ‘সাধাস!’ কিন্তু, বনের পাখিকে ধরা হয়েছে খবরের কাগজের পাঁচার, এরকম একটা বোধও যেন সকল উপভোগের তলে তলে থেকে মনকে শূঁড়া দেয়। আর্টিস্টের কাছে তালিম থাকা চাই, কিন্তু সেটি সম্ভাব্যসাধ্য থাকে এসে না পড়লেই হল। আবার, প্রায় রবীন্দ্রনাথের ভাবাতেই বলতে হয়— না, না, ডাকবে না, ডাকবে না, মনন করে বাইরে থেকে। যে উপলক্ষের খুঁজিটি ধরার সকালে ‘মানন্যমহার’ মূললেই চোখে পড়বে, যে উৎসাহমাতা অম্মভাতার বা সম্মানমাতার-নাম টিকানা টেলিকোন পাইকেই হতেতো স্তম্ভাকরে লেখা আছে— সে যে আসল উপলক্ষ নহ, সে যে আসল প্রেরণামাতা নহ, মনে হয় এ সত্যের ভাগও-ভালো। কিন্তু, বেলা যায়, বেলা যায়, ডাকের বেলা যায়, এ হয়ে ঐকপ কোনো সত্য বা সত্যাতাসকেও মনের মধ্যে আশ্রয় দেওয়া যায় না। লেখাগুলি ভালো সেগেছে বলেই লেখার এটমৌলিক ভ্রটি কথ্য বলতে হল। এবং এ কথাও বলতে হল যে লেখক দৃষ্টি মুহাসোবে ত্যাগ করতে পারলে সুখের বিষয় হ’ত। একটি হল ধর্য তর্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ বা ছন্দাংশ উদ্ভূত করা।

‘যার একটি হল ইংরেজি পদ, ইংরেজি পদমূল্য’ ও ‘ইংরেজি বাক্যের অতিপ্রবেশ’। ইঙ্গিতের অনিবার্ণ মালাপই উপভোগ্য : কোনো-কোনোটি চমৎকার : এবং খেয়ালী রচনা যখন, ‘ডায়েরির অভিমানে তর্ক তোলা বাড়াবাড়ি হবে— কেবল অল্প কয়েকটি রচনা কণ্ঠস্বাধী বিষয়ে বা ব্যাপারে একমুহুরে ভড়িত বলে তাদের সাহিত্যিক মূল্য অল্প বা নেইও বলা চলে, এই গ্রন্থে শেক্সপির সংকলন বা ১৫৫টি ভালো ছিল। কয়েকটি উল্লেখ করছি, যেমন, জনৈক পাণ্ডিকার প্রতি, চিত্রির তাত্ত্বিক, ইব্বিজগতি। টেন ফেল ও ব্যাঙ্ক ফেল নিয়ে লেখক আশ্চর্যস্রোত পল্প ভবিষ্যেছেন বলছেন হবেন। সোনার কাঠি, সিন্ধুর বেনিন, চুরিবিজ্ঞা, ইন্দুসুনিয়া, বিজ্ঞানাগুরী চটা, নীলকুঠি, পাকা চুল, তমালগাছ— এতদ্ব্যতীত দেবীপত্রে তৈরি করতে বললেও বোকা যাবে বিস্তারিত বৈচিত্র্য কতদূর। শেবোক্ত রচনায় একটি সংলগ্ন তিষ্ঠ মনে উঠেছে, সেইটির উল্লেখ করেই এই গ্রন্থমালাচিন্তা শেষ করা যেতে পারে। তমাল আর কামবোত এক বস কি ? বস্তুত : তা নয়। ইঙ্গিতই অস্বাভাবিক করেছেন ঠিকই, কৃন্দাবিনিমিত্ত এই তত্ত্ব সংখ্যা-প্রাচুর্য আছে। এর সৌন্দর্য কিসে তা বলা যায় কি ? ফুলে নয়, ফলে নয়, শব্দে নয়, বিশালতায় বা নিবিড়তায় নয়— তবে কিসে ? ছাত্রাকারে পাশা প্রশংসা বিস্তার করে যে এক-একটি নবিত্ববৃত্ত চিত্তকাম বিতান রচনা করে, পাখ্যকাণ্ডের যে একটি কুসোমাধানে কালো গুণ— শ্রীমদিকা তাতে কী এমন শ্রী দেখেছেন ? তা তো বলা যায় না। একমাত্র ভাবরসেই মন স্থির রয়েছে কৃকপ্রিয়া কৃকবর্ণ এই তমাল গাছে। ইঙ্গিতই এই প্রসঙ্গে কবি ওয়াইল্ডওয়ার্থের Yarrow Unvisited ও Yarrow Visited কবিতার উল্লেখ ও তাৎপর্য করেছেন তাতেও উক্ত রচনাকবির দৃষ্টি ও দৃষ্টি সঙ্কেত কুল ধারণা হতে পারে। শেবোক্ত রচনায় রচনা বটে—

And is this— Yarrow ?

কিন্তু, শেষের দিকে কবি বলেছেন—

I see— but not by sight alone

... where'er I go,

Thy genuine image, Yarrow !

Will dwell with me— to heighten joy

And cheer my mind in sorrow.

কামেই, যাপর কেটে গেছে, কলিও কাটেবে— তার পর নতন সত্যসুখে নতন ক’রে ও দহা ক’রে তমাল গাছটিও কেউ দেখবে না এ কথা বলা যায় না।

কানাই নাথ

দ্রষ্টব্য : এই সংখ্যায় মুদ্রিত বর্ণমালাগুলি কানাই নাথের দ্বারা ‘অসমীয়া লোকসভা’ দ্বারা।